ভাবলুম, সত্যিই তো, যাঁর জন্যে এসেছি, তাঁর নাম জানি না—এ কথা কে বিশ্বাস করবে! তবু চোর তো আমি নই। কিন্তু এরা তাও বিশ্বাস করে না! আশ্চর্য্য! তারপর আমার তল্লাসী হলো। কাছে ব্যাগে তিন টাকা পনেরো পয়সা ছিল, তাছাড়া রুমাল, ফাউন্টেন পেন, রিস্ট-ওয়াচ...সব তারা কেড়ে নিয়ে একটা বড় খামে মুড়ে কোথায় রাখলে, জানি না। আমি হাজতে পড়ে রইলুম। ভাবছিলুম, রামনাথের মামার যে কষ্টই ভোগ হোক, আমার মত দুরবস্থা তো হয় নি! কলকাতার হোটেল আছে বিস্তর কিন্তু হাজত-ঘরও আছে, এ জ্ঞান আজ হলো!...



রাত প্রায় সাড়ে দশটা...দেখি, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। রাগে সর্ব্ব শরীর জ্বলে উঠলো। কালা বুড়ো বেঙ্গল পুলিশ! কিন্তু নিষ্ফল রাগ! এ রাগে আমিই জ্বলে মরবো! ও বুড়োর পাকা দাড়ি থেকে পায়ের ঐ সাদা জুতো জোড়াটায় অবধি তাতে কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটবে না!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমার ঘরের দরজা খুলে ইনস্পেক্টর বললেন

—এসো হে ছোকরা, তুমি যে চোর নও, হিন্দু হোস্টেলে থাকো, তার একবার তদারক করে আসি—তারপর রিপোর্ট লিখে তবে [illegible]...প্রাণ গেল তোমাদের জ্বালায়!

সর্ব্বনাশ! আমায় নিয়ে এই রাত্রে হোস্টেলে তদারক! টী-টী পড়ে যাবে যে! এর মধ্যে আগাগোড়া সব মিথ্যা, জানি! তবু সেখানকার সকলে বলবে কি! এর পর ওখানে থাকাও চলবে না যে! চোর বলে কেউ বিশ্বাস না করুক, নিশ্চয় ভাববে, হয় রেলকে ফাঁকি দিতে গেছলুম, নয় কিছু একটা বিদিকিচ্ছি কাণ্ড করেছি! এর চেয়ে কোনো স্বদেশী-সদেশী ব্যাপার জড়িয়ে দিলে তবু নয় ইজ্জৎ বাঁচতো! বাঁচতো বলি কেন, ইজ্জৎ তাতে বেড়ে যেতো এক নিমেষে!

আমি বললুম,—মাপ করুন, মশায়, এই রাত্রে...

হেসে ইনস্পেক্টর বললেন,—তাই বল, ছোকরা! ও সব বাজে কথায় কেন আর ভোলাও বাপু! ক'বার জেল খেটেছ, বল—loitering এ চালান লিখে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি...

এ আবার কি! মহা বিপদ! এত রাত্রে হোস্টেলের ফটক বন্ধ—দরোয়ান পুলিশ দেখে ফটক নয় খুললো, তারপর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টও উঠলেন—কিন্তু এই রাত্রে ঘুম ভাঙ্গালে তাঁর মেজাজ যা হবে—ওঃ! অথচ এদিকে হাজত, তারপর ঐ loitering-এ চালান!... চট্‌ করে বুদ্ধি এলো! বললুম, রামনাথের কাছে চলুন নয়,...সে কি বলে...!

ইনস্পেক্টর বললে—এই রাত্রে অতখানি পথ হাঁটা...

আমি বললুম—গাড়ীভাড়া আমি দেবো,...

ইনস্পেক্টর বললেন,—তোমার টাকা সঙ্গে আছে বটে।

তিনি থামলেন, পরে বললেন—কিন্তু টাকা তো জমা হয়ে গেছে...এখন দিতে গেলে গোল হবে।

আমি বললুম—রামনাথের কাছে চেয়ে গাড়ী ভাড়া দেবো......।

ইনস্পেক্টর বললেন—বেশ, তাই চল...।

গাড়ী ডাকা হলো। আমায় নিয়ে ইনস্পেক্টর বাবু চললেন......আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে রামনাথের মেশে।

মেশের দরজা বন্ধ। বিস্তর ঠেলাঠেলির পর দোর খোলা পাওয়া গেল। রামনাথকে

তোলা হলো। বেচারা উঠলো – আমায় দেখে বললে,—বেশ, তুই তো খুব এ! বড় মামা ষ্টেশনে কি কষ্ট যে পেয়েছেন খোঁজাখুঁজি করে...তারপর এক গাড়ী ভাড়া করে এখানে এসে ওঠেন...গাড়ী ভাড়া দেছেন দু'টাকা। ষ্টেশন থেকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট দু টাকা...ভাবো ..

আমি বললুম—আমার অবস্থা জানিস না তো! আমি পুলিশের হাতে গ্রেফতার ...দুঃখে আমার চোখে জল এলো!

রামনাথ আঁৎকে উঠলো,—গ্রেফ্তার! তার মানে?

মুহূর্তে সব কথা পরিষ্কার হয়ে গেলো। রামনাথের বড় মামাও বাইরে এলেন—আমায় দেখে তিনি বললেন - এই তো! এই ছোকরাকে চোর বলে ধরে ছিল না! আঃ, সকলে মিলে কি মারটাই না মেরেছে! অতগুলো লোক!...তা, কে জানতো, বল?...

আর জানা...

তবে আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলো এই যে, যে ইনস্পেক্টর-বাবুটি একটু আগে আমায় নিঃসন্দেহে চোর বলে সন্দেহ করেছিলেন, তিনি হেসে আমায় বললেন,—কিছু মনে করো না, ভাই...ভুল সকলেরই হয়!

আমি বললুম,—তা বলে এমন মারাত্মক ভুল, মশায়!

রামনাথ বললে—তখনি তো এর মুখে সব শুনেছিলেন......

ইনস্পেক্টর বললেন,—পুলিশে চাকরি করে সন্দেহ করা একটা রোগ জন্মে গেছে, ভাই। তার উপর সেই বুড়ো ভদ্রলোকটিকেও যদি সে সময় পাওয়া যেতো! তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন। তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসে আমার এক কনষ্টেবল। তিনি বলেন,—চুরি-টুরি নয়—তবে ছোকরার মতলব একটা-কিছু ছিল বটে! কাজেই... এমনি ছাড়তে পারি না তো, বিনা-তদারকে।...তা তাঁরও বিপদ কম নয়—তিনি বেঙ্গল পুলিশে কাজ করতেন। তাঁর এক বিধবা আত্মীয়ার ছেলে কলকাতায় পড়ছিল, সে বর্ম্মায় চাকরী করবে বলে ক্ষেপে ওঠে—তার মা মগের মুল্লুকে ছেলে পাঠাতে রাজী হয় নি, তাই ছেলে মার কাছে এক বিদায়-পত্র লিখে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। ছেলেটির এক

বন্ধু তার সন্ধান পেয়ে তার মার কাছে চিঠি লেখে, যদি কেউ আসেন তো তাকে সে ধরিয়ে দেয়—আর সেই লোক ছেলেটিকেও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। সে ছেলের নাম নোদো। এই শুনে ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসেন কলকাতায় ঐ ছ'টার ট্রেণে। বেঙ্গল পুলিশ বলে ওঁর মনে খুব গর্ব্ব যে উনি এলেই ছেলে পাকড়াও হবে। ভদ্রলোক বদ্ধ কালা ..কি কস্টে যে তাঁর কথা বুঝেছি !...

ইনস্পেক্টর বাবু বললেন,—এখন একজন এঁর হয়ে জামিন দাঁড়ান। আজ রাত্রের মত, এঁকে ছেড়ে দি তার পর কাল থালাশের হুকুম মিলবে। এই কষ্টটুকু করতে হবে !

রামনাথের মামা বললেন—আমার জন্যই এত কষ্ট পেয়েছে বেচারা ! চোরের মার খেয়েছে ! চলুন, আমি জামিনের কাগজে সই দিয়ে আসি থানায় গিয়ে !...

তাই হলো। পরের দিন আমার ছুটি মিললো কিন্তু রামনাথের মামাকে খুঁজতে গিয়ে যে বিপদে পড়েছিলুম, তা আর বলবার নয় !

রামনাথের মামা আমায় হোটেলে খাইয়েছিলেন। তা খাওয়ান তারপর থেকে আমার বন্ধুর দল আমায় 'মামা' বলে ক্ষ্যাপানো ধরেছে !

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে

থাক্‌বনাক বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে,
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণীপাকে।
দেশ হতে সে দেশান্তরে
ছুটছে ঝড়া কেমন ক'রে,
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে যে বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে।

কেমন ক'রে পার ডুবুরি সিন্ধু ছেঁকে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গ-পানে।
জাপ্‌টে ধরে ঢেউএর ঝুঁটি
যুদ্ধ-জাহাজ চল্‌ছে ছুটি,
কেমন ক'রে আনছে মাণিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে।
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে ওঠে জোয়ার-বানে।

কেমন ক'রে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে
কিসের অভিযানে মানুষ চল্‌ছে হিমালয়ের চূড়ে।
তুহিন-মেরু পার হয়ে যায়
সন্ধানীরা কিসের আশায়,
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্ পুরে।
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল্ হ'তে আসছে উড়ে!

কোন্ বেদনায় কোটে টিকি চণ্ডুখোর ঐ চীনের জাতি
এমন ক'রে উদয়-বেলায় মরণ-খেলায় উঠ্‌ল মাতি।
আয়র্লাণ্ড্ আজ কেমন ক'রে
স্বাধীন হতে চল্‌ছে ওরে,
তুরস্ক ভাই কেমন ক'রে কাট্‌লো শিকল রাতারাতি।
কেমন ক'রে মাঝ-গগনে নিব্‌ল "গ্রীকের" সূর্য্য-বাতি।

কেমন ক'রে জার্ম্মানীরা যুদ্ধে হারার শ্রান্তি ভোলে
জাহাজ-ডুবির ভুল্‌ল ক্ষতি, উজান্ বেয়ে উঠ্‌ল কূলে।
কেমন ক'রে লাল রুষিয়ায়
কুলি-মজুর রাজ্য চালায়,
কেমন ক'রে বিশ্ব শুষে আমেরিকা উঠ্‌ছে ফুলে।
পূর্ব্বাচলের তোরণ-দ্বারে জাপানী জয়-নিশান তুলে।

আমাদের এই সোনার ভারত, সর্ব্বনাশ্ এর করল কা'রা ?
সকল থেকেও আমরা কেন সবার চেয়ে লক্ষ্মীছাড়া ?
পুষ্পে ফলে ধান্যে পাটে
বান ডেকে যায় মোদের মাঠে,
সে সব গিয়ে কোথায় ওঠে লুটে নিয়ে যায় কাহারা ?
মোদের দেশের নদীর ধারার জল, না ওরা, অশ্রুধারা ?
রইব নাক বন্ধ খাঁচায় দেখব এ সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ বাতাস চন্দ্র তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে
দশ দিকেতে পড়ব লুটে,
পাতাল ফেড়ে নামব নীচে উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে।
বিশ্ব-জগৎ দেখ্ব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে।

নজরুল ইস্‌লাম

দেয়ালা

এক যে ছিল গাছ তার ছিল এক ছাওয়া ; এক যে ছিল মাঠ তার ছিল এক গাছ ; আর এক ছিল যে কুঁড়ে তার ছিল একটা ঝাঁপ—সেটা কখন খুলতো কখন বন্ধ হতো। ঝাঁপ যখন বন্ধ হতো তখন ঘরটা কিছুই দেখতো না, অন্ধকারে পিদুম জ্বালিয়ে কুঁড়ে নিজের ভিতরটার দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকতো—পিদুমের আলো ঝিমোতো, ঘরের জিনিস-পত্র ঝিমোতো, ঘরের মধ্যে যে কুঁড়ে মানুষগুলো তারাও ঝিমোতো। কিন্তু ঝাঁপ খুল্‌লে আর রক্ষে নেই—পিদুমের আলো পিলসুজ ছেড়ে দৌড় দিত—সেই সে মাঠে যেখানে গাছে আর গাছের ছাওয়াতে কথা চলা-চলি করছে ! ছাওয়া শুধোচ্ছে গাছকে—ভাই কি দেখছিস ?

ছোট গাছ সে এদিকে ওদিকে চায়, চোখের পাতা মেলে আর বলে মাঠ দেখছি!

মাঠের পরে কি ভাই?

মাঠের পরে একটা তালগাছ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তারপর?—

গাছটা হঠাৎ চুপ করে আর স্থির হয়ে চেয়ে থাকে। গাছের ছাওয়া সেও চুপচাপ গল্প শোনবার জন্যে সটান শুয়ে থাকে মাটিতে।

ধূ ধূ মাঠের ধুলো মাটি, খোয়াই জোড়া রাঙা মাটি বাঁধের ধারের পোড়ামাটি—তারাতো চেনেনা ছোট গাছ আর তার এতটুকু ছাওয়াকে, তারা চলে যায় সেই যে তালগাছ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তার কাছে, আর বলে—দেখলে কিছু?

তাল গাছ দাঁড়িয়েই থাকে—হেলেনা, দোলেনা বলেনা কিছু। তেপান্তর মাঠ স্তব্ধ হয়ে ভাবে—এত উঁচু থেকেও দেখা যায় না? অবাক হয়ে মাঠ চেয়ে থাকে—খুব উঁচুতে যে নীল আকাশ তারই পানে, আর মনে-মনে বলে—আকাশকে কেমন করে শুধোই ওখান থেকে ও কি দেখতে পাচ্ছে? মাটি শুধোতে পারে না আকাশকে সে কি দেখছে; আকাশ বলতে পারে না মাটিকে সে যা দেখছে। এই ভাবে এ ওর দিকে চেয়েই আছে; দুপুর বেলা সবাই সবার দিকে দেখছে কিন্তু কেউ কিছু বলেনা, কয়না!

চুপচাপ থেকে-থেকে গাছের চোখের পাতা ঝিমিয়ে এল, গাছের সাথী ছাওয়া মাটিতে নেতিয়ে পড়ে, ঘুমের ঘোরে দেয়ালা করে বলে উঠল—মাঠের পরে তালগাছ পাহারা দিচ্ছে, তারপর?

ছোট গাছ হঠাৎ চটকা ভেঙে জেগে উঠে বল্লে—তালগাছটার মাথার উপরে একটা পাখি উড়ছে, যেন ঘুরে ঘুরে কি খুঁজে চলেছে!

গাছের ছাওয়া ছোট্ট একটা নুড়ির উপরে দাঁড়িয়ে বল্লে—আমি দেখবো।

বাতাস এতক্ষণ চুপ করে ছিল, বলে উঠল—ই স্ স্! ছোট গাছ হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

মাঠের শেষে পাহারা দিচ্ছিল যে উঁচু গাছ সে এইবার মাথা নেড়ে বল্লে—দেখবেই তো, দেখবেই তো! লজ্জায় ছোট গাছের ছাওয়া মাথা হেঁট করে মাটিতে মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যার আকাশের কোলে দেয়ালা দিচ্ছিল একখানি মেঘ, একবার সে রঙ্গীন আলোয় রাঙ্গা হয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়লো—নীল আকাশের আঁচলের আড়ালে। এমন সময় গাছ বলে উঠল—ছাওয়া! সাড়া নেই! গাছ ফিরে-ফিরে দেখে ছাওয়া পালিয়েছে। গাছ মাটিকে বল্লে—ছাওয়া গেল কোথা?

মাঠ বল্লে—এই তো ছিল, গেল কোথায়?

তালগাছ বল্লে—ছাওয়ার মতো কে যেন ঐ পূব মুখে রোদে পুড়তে পুড়তে চলে গেল আমি দেখেছি।

আকাশ বল্লে—শুধোই তো রোদকে ছাওয়া যায় কোন খানে?

সেই তালগাছের ওপারে যে তেপান্তর মাঠ, তার ওপারে যে নদী, তারও ওপারে যাকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, তার কোনে যে রোদ সে দেয়ালা দিয়ে হেসে বল্লে—বলবোনা।

তার পরেই আলোর চোখ ঢুলে পড়লো। সবাই এমন কি গাছের পাতা, ফুল, পাখি, ঘাটে, মাঠে হাটে, যে যেখানে ছিল বলে উঠল, কোথায় গেল সে? কোন দেশে? গাছ আর মাঠ আর আকাশ আর বাতাসের মন ছোট ছাওয়াকে খুঁজে যখন কোথাও পেলে না তখন তারা মুখ আঁধার করে ভাবতে লাগলো—গেল কোথায়, এই ছিল? তারপর সবাই ঘুমিয়ে গেল ঘরে বাইরে; শুধু তারাগুলো থেকে-থেকে দেয়ালা করে চায় আর ভাবে গেল কোথায়?

গাছ ঘুমোয়, গাছের পাতা ঘুমোয়, মাঠ-ঘাট ঘুমোয়, মেঝের পড়ে কুঁড়ে মানুষ ঘুমোয়—সবাই স্বপন দেখে ছাওয়া তাদের বড় হয়েছে! সেই সে এতটুকখানি ছাওয়া—যে মাঠের শেষ দেখতে চাইতো, পাখিদের সঙ্গে পাখি হয়ে উড়ে পালাতে চাইতো আকাশের শেষে—সে এখন সেই সব তেপান্তর মাঠের চেয়ে সেই নীল আকাশের চেয়ে বড় হয়ে গেছে! ভয়ে গাছ-পালা মাঠ-ঘাটের গা ঝিম্-ঝিম্ করতে থাকে আর এক একবার চমকে উঠে তারা স্বপন দেখে, দেয়ালা করে হাসে, কাঁদে চায় আর ঘুমায়। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে সাঁৎরে চলে একটার পর একটা বাদুড় ছাওয়াকে খুঁজতে-খুঁজতে দূর-দূর দেশে! সেই সময় চুপি-চুপি আলো আসে—

একটুখানি চাঁদের আলো— বাতাসের গায়ে আলো পড়ে, গাছের শিয়রে আলো পড়ে ঘুমের ঘোরে সবাই বলে—ছাওয়া ? ঘুম ভাঙানো পাখী ডেকে বলে—ওই যে আলো, ওই যে ছাওয়া ! চমকে উঠে গাছ দেখে ছাওয়া !

ছাওয়া বলে—তারপর ?

গাছ বলে—ধু ধু করছে তার মাঝে একটি গাছ পাহারা দিচ্ছে—চুপ করে দাঁড়িয়ে।

ছাওয়া বলে—দেখনা ভাই ভাল করে তার পরে কি ?

গাছ বলে—সেই একটি গাছ তারপরে রয়েছে আলো, না আলো তো নয়, একটা আলো মাখা মেঘ !

ছায়া বলে—সে আবার কি ?

গাছ বলে—তা জানিনে ভাই কিন্তু কালো ঠিক তোর মত ঠাণ্ডা রং তার। হঠাৎ ছাওয়ার উপর দু ফোঁটা জল পড়ে।

ছাওয়া বলে—ওকি কাঁদছিস কেন ?

গাছ মাথা দুলিয়ে বলে—কাঁদবো কেন ?

ছাওয়া বলে—এই দেখ না জল।

কুঁড়ে তার ঘরের ঝাপখানা ঝুপ করে বন্ধ করে দিয়ে বলে—বিষ্টি রে বিষ্টি।

টিপির টিপির জল ঝরে, আকাশ ঝিলিক দিয়ে থেকে-থেকে দেয়ালা করে, বাতাস করে সারারাত এপাশ ওপাশ। তারপর রাত কাটে সকাল হয়, আকাশ জেগে ওঠে, আলো জেগে ওঠে, গাছপালা জেগে ওঠে, পাখি জেগে ওঠে, সেই সঙ্গে তাদের ছাওয়ারাও জেগে ওঠে।

ছোট গাছের ছাওয়া বলে গাছকে—আজ কি খবর ?

গাছ বলে—আজ দেখছি কি জানিস ?

ছাওয়া বলে—কি ?

গাছ বলে—সেই আমাদের পাতায় ঢাকা কুঁড়ি আজ ফুটেছে।

ছাওয়া বলে—তারপর ?

গাছ বলে—প্রজাপতি তাকে দেখতে এল সোণার ডানা মেলে।

ছাওয়া বলে—তারপর ?

গাছ বলে— রোদ পড়ল তার গায়ে, বাতাস তাকে দুলিয়ে গেল।

ছাওয়া বলে—ওকে আমায় দে।

গাছ বলে—এই নে দেখ্ কেমন সুন্দর ফুল।

ফুলকে বুকে নিয়ে ছাওয়া বলে—ফুল। ফুল কথা কয় না।

ছাওয়া গাছকে বলে—ফুল কথা কয়না যে ?

গাছ বলে ঘুমিয়ে আছে, জাগায়নি। ফুল ঘুমিয়ে থাকে ছাওয়ার বুকে, ছাওয়া নড়ে চড়ে ফুলকে দেখে। গাছ নড়ে চড়ে শুধোয়—কি করছে ?

ছাওয়া বলে—ঘুমোচ্ছে। এক এক সময় বাতাস এসে ফুলকে ছুঁয়ে যায়, ছাওয়া বলে দোলা করছে আমাদের ফুল। কুঁড়ের ঝাঁপ খুলে দেখে মানুষ গাছের তলায় ঝরা ফুল, তার গায়ে ছাওয়া হাত বোলাচ্ছে। কুঁড়ে মানুষের ছেলেটা বেরিয়ে আসে, ফুল তুলে বেড়ায় গাছে গাছে।

গাছ বলে—কি করবি ফুল নিয়ে।

ছেলে বলে—খেলা করবো। ফুল তুলে ছেলে চলে যায়। মেয়ে আসে, সে এতটুকু—গাছে হাত পায় না, ছাওয়ায় ছাওয়ায় ফুল কুড়িয়ে বেড়ায়।

ছাওয়া বলে—কি করবি ফুল নিয়ে ?

মেয়ে বলে—ওকে মালায় গেঁথে ধরে রাখবো।

ছাওয়া বলে তারপর খেলা হলে ফিরিয়ে দিবি তো ?

মেয়ে 'দোবনা' বলে ফুল আঁচলে তুলে নেয়।

ছাওয়া তার পা জড়িয়ে বলে—'নিয়ে যেওনা।'

গাছ বলে—যাক না নিয়ে, কাল সকালে দেখবি তোর ফুল পালিয়ে এসেছে তোর বুকে। দিন কাটে, রাত কাটে, ফুলের স্বপন দেখে গাছ আর গাছের ছাওয়া দুজনে মিলে ; সকালে কুঁড়ি ফোটে গাছে, ফুল ফেরে ছাওয়ার কোলে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দখিন হাওয়া

দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
তোমায় আমি দেখবো ব'লে
ঘর ছেড়ে যে এলাম চ'লে ;
পরশ পেয়ে পরাণ দোলে
তাই তোমারে দেখতে চাওয়া !
দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
এই যে হঠাৎ বাতায়নে
এসেই হেসে সঙ্গোপনে
পালিয়ে গেলে কোন বিজনে
মিছেই হ'ল পিছে ধাওয়া !
দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
চেনা দিয়েও রইলে অচিন
চিরদিনের তুমি নবীন,
বসন্তের এ অল্প ক'দিন
লুকিয়ে শুধু আসা-যাওয়া !
দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
বাজাও বাঁশী কুঞ্জবনে
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে ;
দোল দিয়ে যায় উতল-মনে
পথ-ভোলা-গান তোমার গাওয়া !
দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
অঙ্গে ঝরে এ কোন সুবাস ?
গন্ধে আকুল ধরার নিশ্বাস ;
অরূপ তব রূপের আভাস
আজকে যেন যাচ্ছে পাওয়া !

দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
অভ্র-মেঘে বেড়াও ভাসি
ছড়িয়ে লঘু শুভ্র হাসি,
ফুটিয়ে জলে জুঁইয়ের রাশি
ঢেউয়ের তালে তোমার নাওয়া !

দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
ফাগুন রাতের পৌর্ণমাসী
মন করে গো কোন্ উদাসী ;
খেয়ার ঘাটে দেখ্তে আসি
তোমার হাসির নৌকা বাওয়া !

দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
পালাও তুমি নয়ন চুমে
জড়িয়ে আসে নয়ন ঘুমে
জাগ্‌লে দেখি শ্যামল ভূমে
খেল্‌ছে শুধু তোমার ছাওয়া !

দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
কোন্ মায়াবীর মন্ত্র প'ড়ে
দিচ্ছ নূতন বিশ্ব গ'ড়ে ?
তোমার বিজয় নিশান ওড়ে
ফুল-দোলাতে-দোলন খাওয়া !

দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !
বনের কচি সবুজ পাতে
চাঁদের আলোর আল্‌পনাতে
লিখ্‌ছ তুমি আপন হাতে
কোন্ অজানার দাবী-দাওয়া !
দখিন হাওয়া, ওগো দখিন হাওয়া !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

রেল প্রদর্শনী

মৌচাকের পাঠক-পাঠিকারা, তোমরা অনেকেই নানা জায়গায় প্রদর্শনী দেখেছো, কিন্তু চলন্ত রেলগাড়ী প্রদর্শনী কখনও দেখনি। এই রকম একটা প্রদর্শনী রেলগাড়ী



সম্প্রতি ইষ্টার্ণ বেঙ্গল্ রেলওয়েতে চ'লেছিল। এই রেলগাড়ীর নাম Demonstration Train। এই ট্রেণে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি ছিল :-

কৃষি বিভাগ (Agricultural Department)

শিল্প বিভাগ (Industries ,,)

স্বাস্থ্য বিভাগ (Public Health ,,)

সমবায় বিভাগ (Co-operative ,,)

পশু-চিকিৎসা বিভাগ (Veterinary ,,)

ভারতীয় চা-কর সভা (Indian Tea Cess Committee)

ই-বি, রেলওয়ে বিজ্ঞাপন বিভাগ (Publicity Department)

এই সকল বিভাগের প্রত্যেকটির জন্য একখানা ক'রে স্বতন্ত্র গাড়ী ছিল, সেই সকল গাড়ীতে প্রত্যেক বিভাগের নানা রকম শিক্ষাপ্রদ জিনিষ সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। এই সকল বিভাগের গাড়ী ছাড়া ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য একখানা খাবার গাড়ী (Restaurant Car) ছিল। এই ট্রেণ রাত্রে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যেতো এবং জন সাধারণের দেখবার জন্যে সারাদিন স্টেশনে



দাঁড়িয়ে থাকতো। বিকালে মাঠে প্রকাণ্ড সভা হ'তো, সেই সভায় ওই সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞরা দেশের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন, তারপর রাত্রে বিনামূল্যে ইলেকট্রিক্ আলোয় বায়স্কোপ দেখানো হ'তো। চা-কর সভা সমবেত সকলকে বিনামূল্যে চা ও বিস্কুট খাওয়াতেন। এইভাবে এই ট্রেণ গত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে রওনা হ'য়ে একমাসে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের চওড়া লাইনে (Broad Gauge) ত্রিশটি বড় বড় জায়গায় ঘুরেছে। প্রত্যেক জায়গায় অসংখ্য লোক এই ট্রেণে প্রদর্শনী দেখতে আসতো, সময়ের অভাবে অনেক লোককে নিরাশ হ'য়ে যেতে হ'য়েছে। এই ট্রেণের উদ্দেশ্য বাঙলার কৃষক ও জনসাধারণকে শিক্ষা

দেওয়া—যাতে এই প্রদর্শনী দেখে এবং বিশেষজ্ঞদের উপদেশ শুনে তাঁরা কৃষি প্রভৃতির উন্নতি সাধন ক'রে দেশের অবস্থা ভাল ক'রতে পারে। প্রত্যেক জায়গায় লোকে যে রকম আগ্রহে এই প্রদর্শনী রেলগাড়ী দেখতে এসেছিলো তাতে মনে হয় এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।



এই ট্রেণ এক মাস ঘুরে গত ২৩ মার্চ ক'লকাতায় ফিরে ২৬শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ পর্য্যন্ত চার দিন কলকাতার জনসাধারণের দেখবার জন্য খোলা ছিল। কলকাতায়ও চারদিন দর্শকদের খুব ভিড় হ'য়েছিল।

এই ট্রেণটা দেশের লোকে কি ভাবে দেখে সেইটা পরীক্ষা করবার জন্যে একমাস চালানো হ'য়েছিল। উপস্থিত এটাকে খুলে ফেলা হ'লো, কিন্তু দেশের জনসাধারণ শিক্ষালাভের জন্য যে রকম আগ্রহে এই চলন্ত প্রদর্শনী দেখেছে, তাতে এই রকম ট্রেণকে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান করবার কথাবার্ত্তা চ'লছে। তাহ'লে ভারতবর্ষের অন্যান্য রেলওয়েরাও এই রকম প্রদর্শনী গাড়ী তৈরী করতে পারে। খুব সম্ভব আগামী সেপ্টেম্বর মাস থেকে আবার এই ট্রেণ চলবে এবং এটা স্থায়ী হ'লে এই ট্রেণ বৎসরে

২০০ দিন ক'রে এইভাবে ঘুরে বেড়াবে। ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অনেক টাকা খরচ ক'রে দেশের শিক্ষার জন্যে প্রথম এই নূতন পথ দেখালেন, সে জন্য তাঁরা দেশের সকলের ধন্যবাদের পাত্র।



মৌচাকের পাঠক-পাঠিকাদের যারা এই প্রদর্শনী রেল্‌গাড়ী দেখনি, তাদের ধারণার জন্যে এই সঙ্গে তার ক'খানি ছবি দেওয়া হ'লো। এবার এই রেলগাড়ী চললে তোমরা দেখতে ভুলো না। *

শ্রীনির্ম্মল দেব

— —

বন্দোবস্তের বজ্রবাঁধন

কর্ত্তা ছেলেবেলা পড়েছিলেন, কোন দেশে যেন সাত বৎসর সুফলা আর সাত বৎসর অফলা হয়েছিল। এক বুদ্ধিমান লোক, সাত বৎসর অফলা হবে, এই খবর জানতে পেরে সুফলার সময় একেবারে সাত বৎসরের মতো খোরাকের বন্দোবস্ত করে রেখেছিল—কাজেই তার আর অফলার সময় কোন কষ্ট হয়নি।

* প্রদর্শনী রেলগাড়ীর ছবিগুলি ই. বি. রেলওয়ের পাবলিসিটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত এ. কে. গুহ মহোদয়ের অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

এই গল্প পড়ে অবধি কর্তার ছেলেবেলা থেকে সব কাজে আগে থেকে বন্দোবস্ত করে রাখবার বেজায় ঝোঁক। কর্তার বিশ্বাস, যেখানে যা কিছু বিপদ হচ্ছে, সে কেবল ঐ আগে থেকে করে না রাখার দোষে! সেবার ঝড়ে যখন হালদারদের আটচালা উড়ে গেল, কর্তা দৌড়ে গিয়ে জানিয়ে দিয়ে এলেন সকালবেলা ঈশান কোনে মেঘ দেখা দিয়েছে, এই লক্ষণ দেখেই তারা যদি আটচালাটাকে কালদীঘির ঐ বটগাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি দড়া দিয়ে বেঁধে ফেলতে পারত তাহলে এ কাণ্ডটি ঘটত না! আর একবার নাপিতদের ছেলেটা যখন জলে ডুবে মারা গেল, কর্তা নাপিতকে ডেকে বল্লেন—"তোমার-ই তো বাপু দোষ পরামানিক। যে দিন থেকে দেখেছ, তোমার গিন্নি পুকুর ঘাটে নাইতে গেলে ছেলেটাও হামাগুড়ি দিয়ে পুকুর ঘাটে যাবার জন্যে কান্না সুরু করেছে, সেই-দিনই উচিত ছিল, ছেলেটাকে সাঁতার শিখিয়ে রাখা!"

বন্দোবস্ত করার রোগ কর্তাকে এমন পেয়ে বসেছিল যে কর্তার বন্দোবস্তের জ্বালায় বাড়ির লোকজন ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত! সময় নেই, অসময় নেই, কর্তার মাথায় যেই না এসে ভাবনা ঢুকত, অমনি তার বন্দোবস্ত সুরু করে দেওয়া চাই—তাতে যাই হোক!

সেবার কর্তার এক মেয়ে হয়ে কর্তার মাথায় কন্যাদায়ের ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়েছিল; সেবার কর্তা কি রকম বন্দোবস্ত করে আঁতুড় ঘরের মধ্যেই মেয়ের বর জুটিয়ে এনেছিলেন, সে কথা লোকে এখনও বলবা দেয়।

আর সেবার পূজোর ছুটিতে কোন খবর না দিয়েই কর্তার বাড়ীর ফটকে এক-গাড়ী আত্মীয় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, কর্তার বাড়ীতে তাঁদের জন্যে তখন কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কর্তা তাড়াতাড়ি ফটক বন্ধ করিয়ে তাঁদের যত্ন অভ্যর্থনা আর খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত সুরু করে দিয়েছিলেন। সব বন্দোবস্ত সাঙ্গ হয়ে গেলে কর্তা ফটক খুলে ফটকের বাইরে যে কাউকে পান-নি এ বলা-ই বাহুল্য! কেন যে তাঁর আত্মীয়েরা এমন সুবন্দোবস্ত ছেড়ে চলে গেলেন, তা এখনও কর্তা ভেবে উঠতে পারেন নি।

সব চেয়ে মজা হয়েছিল যেবার রাজপুতনায় ডাকাতের ভীষণ উপদ্রব সুরু হয়।

বাংলা-মুলুকে বসে সে সব ডাকাতির খবর লোকে মজা করে পড়ত, কেবল কর্ত্তার চোখে ঘুম ছিল না। তিনি ভাবতেন রাজপুতানায় যখন ডাকাতি সুরু হয়েছে, আর রাজপুতানা থেকে এ দেশ অবধি যখন সোজা রেলের পথ রয়েছে, আর তা দিয়ে নিত্যই কত লোক আনাগোনা করে, তখন এ দেশেও এসে পড়া কিছুই বিচিত্র নয়। এই দুর্দ্দান্ত ডাকাতদের হাতকে কি করে ঠেকানো যায় তারই চিন্তা আর তারই বন্দোবস্ত করতে তাঁর দিন গেল।

দিন দিন কর্ত্তার বাড়ীতে খাঁড়া, তরোয়াল, লাঠি, সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় পালোয়ান, লেঠেল, জমাদার এসে লাগল। ডাকাত এলে তাদের সঙ্গে কেমন লড়াইটা চলবে রোজ বিকেলে মাঠের উপর তারই মহলা চলত।

বন্ধুরা কর্ত্তার কাণ্ড দেখে বল্লেন, "এ কি ব্যাপার! এ যে রীতিমত যুদ্ধের বন্দোবস্ত করে তুললে দেখছি!"

কর্ত্তা বল্লেন "যুদ্ধ না হলে ডাকাতরা তো আর অমনি এসে ধরা দেবে না।"

বন্ধুরা বল্লেন "কোথায় কোন দেশে ডাকাত—তার জন্যে এমন ভীষণ বন্দোবস্ত, এ পাগলামির দরকার কি? বন্দোবস্তর বাড়াবাড়ি করে তুললে সুবিধের বদলে যে অনেক অসুবিধাই এসে জোটে!"

কর্ত্তা বল্লেন "দেখ তো, ডাকাতরা একবার আসুক না এ দেশে। কর্ত্তার বন্দোবস্তটা দেখে লোকেরাই বা কি বলে, আর ডাকাতরা-ই বা কি বলে, তখন শুনো।"

বন্ধুরা বল্লেন—"তোমার বন্দোবস্তই তোমার তোমায় শেষে মজাবে, এ আমরা বলে দিলুম।"

কর্ত্তা চটে উঠে বল্লেন—"বন্দোবস্ত দেখলেই তোমাদের চোখ টাটায়!"

সেদিন রাত্রে কর্ত্তা বিছানায় শুয়ে বোধ হয় তাঁর বন্দোবস্তের বিষয়েই স্বপ্ন দেখছিলেন; কে এসে খবর দিলে, ডাকাতের দল দেখা গিয়েছে! কর্ত্তা ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় এসে দেখেন, কালো আকাশের পারে নবমীর চাঁদটা অস্ত যাচ্ছে, আর তারই ঝাপসা আলোয় দেখা যায়, লাঠি-সোঁটা কাঁধে একদল ডাকাত ধীরে ধীরে তাঁদেরই পাড়ার দিকে যেন এগিয়ে আসছে!

কর্ত্তার বুক একবার আনন্দে, একবার ভয়ে দুলে দুলে উঠল। কর্ত্তা ভয়ের ভাবটা মগজ থেকে এক ঝাঁকানিতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর-ই বন্দোবস্তর জন্যে আজ সমস্ত পাড়া রক্ষা পাবে, তাঁরই বন্দোবস্তর জন্যে এত বড় ডাকাতের দল ধরা পড়বে, আর কাল সকালে হিতবাদী আর স্টেট্‌স্‌ম্যানে তাঁর বন্দোবস্তর কি রকম জয় জয়কার পড়ে যাবে, এই ভেবে তিনি আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলেন।

পালোয়ান-সর্দ্দারের কাছে গিয়ে কর্ত্তা তার পিঠ চাপড়ে সাহস দিয়ে বল্লেন—'সর্দ্দার এমন বন্দোবস্ত করে রাখব যে ডাকাতদের সাধ্যিও নেই তোমার দলের লোককে একটি ছুঁচ ফোটায়!"

নানা পরামর্শ দিয়ে কর্ত্তা পালোয়ানের দলকে পাঁচিলের ধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এমন বন্দোবস্ত রইল যে সাহস করে একবার ডাকাতের দলকে ঘিরে ফেলতে পারলে আর তাদের নিস্তার থাকবে না।

কর্ত্তা উপরের বারান্দা দিয়ে দেখতে লাগলেন, ডাকাতের দল আসতে আসতে ক্রমে তাঁরই ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর-ই বাইরে থেকে কড়্‌কড়্‌ করে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল! কর্ত্তার কথামতো পালোয়ানের দল পাঁচিলের গা ঘেঁসে একেবারে নিঃসাড় দাঁড়িয়ে রইল—কেউ সাড়া দিলে না!

কর্ত্তা মনে-মনে বল্লেন—"বন্ধুরা বড় ঠাট্টা করেছিল—এখন কেমন? আমার বন্দোবস্ত না থাকলে বন্ধুরা তো কোন ছার, পাড়াকে পাড়া-ই যে উজোর হয়ে যেতো।" কাল সকালে যখন প্রকাশ পাবে কর্ত্তা এই প্রবল ডাকাতদের বন্দী করেছেন, বন্ধুরা তাই শুনে কর্ত্তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁর বন্দোবস্তের কি রকম শতমুখী প্রশংসা সুরু করবে, এই ভাবতে ভাবতে কর্ত্তা ডাকাত, পালোয়ান সবার কথা ভুলে গেলেন—তিনি আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য সুরু করলেন।

হঠাৎ কর্ত্তা দেখতে পেলেন, একে একে সব কটা ডাকাত পাঁচিল টপ্‌কে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ নীচে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে পালোয়ানের দল চারিদিক থেকে ছুটে এসে নিমেষের মধ্যে ডাকাতদের ঘিরে ফেল্লে। কিন্তু তার পর-মুহূর্ত্তে কর্ত্তা সভয়ে দেখলেন—পালোয়ানদের হাত থেকে লাঠি তরোয়াল সব খসে গেছে, তারা ভয়ে থরথর করে কাঁপছে, আর ডাকাতরা তাদের হাতে একে একে বেঁধে ফেলতে সুরু করছে!

এ কি অদ্ভুত কাণ্ড হল ? কথার তো এমন উল্টোপাল্টা হয়ে যাবার বন্দোবস্ত ছিল না ?—কর্ত্তা এই কথা ভাবছেন এমন সময় পিছন দিকে শুনতে পেলেন একটা লোক বলছে—"ইস্কো বাঁধো।" কর্ত্তা ভয়ে পিছন ফিরে দেখলেন দুজন পাগড়ী বাঁধা লোক এগিয়ে এসে তাঁর দুহাতে দুটো লোহার কড়া এঁটে দিলে।



লোকটা তখন বল্লে—"লে চলো!" কর্ত্তা দেখলেন পাগড়ী-বাঁধা লোক দুটো তাঁকে দু'হাত ধরে টেনে তুলছে!

কর্ত্তা অবাক হয়ে শুধোলেন - "কোথায় যেতে হবে?"

লোকটা জবাব দিলে—"থানায়!"

কর্তা বল্লেন—"থানায় যেতে হবে ? বোসো, আগে তার বন্দোবস্ত করি !" বলে কর্তা হৈ চৈ করে চাকর-বাকর ডেকে থানায় যাবার বন্দোবস্ত সুরু করলেন !

কিন্তু পুলিসের লোক তাঁরা বন্দোবস্ত বোঝে না, বল্লে—"পরোয়ানা আছে" বলে কর্তাকে হিড়্-হিড়্ করে টানতে-টানতে চালান করে নিয়ে গেল !

সেই [illegible] কোন বন্দোবস্ত করা— পালোয়ানদের সঙ্গে [illegible] পুলিসদের বিশ্রী বন্দোবস্তকে অভিশাপ [illegible] গিয়ে যখন উঠলেন, তখন রোজকার বন্দোবস্ত [illegible] এক [illegible] পেলেন না।

এত কষ্টের পর কর্তা [illegible] শুনলেন, তিনি বাড়ীতে ডাকাত পুষে চারিদিকে ডাকাতি করে বেড়াবার বন্দোবস্ত করেছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে—তাঁর তো চক্ষুস্থির !

কর্তা বল্লেন "কখনই নয়, আমার বন্দোবস্ত কেবল ডাকাতদের ঠকাবার জন্যেই, ডাকাতি করবার জন্যে নয়।"

বিচারক মশাই বল্লেন—"সে রকম প্রমাণ আমাদের কাছে কিছু আসেনি।"

কর্তা বল্লেন—"আমি প্রমাণ করে দেব।" এই বলে ডাকাতি করবার বন্দোবস্ত আর ডাকাত ধরবার বন্দোবস্তের মধ্যে কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, এবং কর্তার বন্দোবস্ত যে ডাকাতির বন্দোবস্তের সঙ্গে আদপেই মিলছেনা, বরং ডাকাত-ধরবার-বন্দোবস্তর সঙ্গে অনেক মিলে যাচ্ছে এই নিয়ে কর্তা বিচারক-মশাইএর সঙ্গে তর্ক সুরু করলেন !

কিন্তু বিচারক-মশাই বন্দোবস্তের চুল চেরা জিনিস বিশেষ বোঝেন না। তিনি সোজাসুজি জবাব দিলেন "আপনি নির্দোষ এ কথা সোজাসুজি প্রমাণ করতে পারেন করুন, নৈলে জেলে যেতে হবে।"

নিরুপায় কর্তাকে তারই বন্দোবস্তের চেষ্টা দেখতে হল।

যা হোক, বন্ধুবান্ধবদের সাক্ষী ডাকিয়ে অনেক হাঙ্গামার পর কর্তা খালাস পেলেন।

কর্ত্তা ছাড়ান পেয়ে বন্ধুদের বল্লেন—"বড্ড বান্দোবস্তের ভুল হয়ে গিয়েছিল। পুলিসের হাতে যাতে না পড়তে পারি তারই একটা বন্দোবস্ত যদি আগে থেকে করে রাখতে পারতুম, এ হাঙ্গামাটি ঘটত না।"

সেই থেকে কর্ত্তা কাজে কর্ম্মে আরো বেশী রকম বন্দোবস্ত করার মন দিলেন।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অমলের ছুটী

সবে মাত্র গরমের ছুটি পড়েছে, ছুটি হোতে হোতেই অমল তার মাসীর কাছ থেকে চিঠি পেল, তাকে ছুটির কয়দিন মাসীর কাছে থাকতে হবে। মার কাছ থেকে অনুমতি পেতে বেশী দেরী হোল না। প্রকাণ্ড লম্বা ছুটি দিন পনেরো আমোদে আহ্লাদে কাটালে তো আর পড়া নষ্ট হবে না! অমল মাসীর খুব প্রিয়—বছর দুই হোল মাসীর বিয়ে হয়েছে—এর মধ্যে মাসীর সঙ্গে অমলের একবারো দেখা হয় নাই। আর মেসোমশায়কে সে তো একেবারেই দেখে নাই।

অমলদের বাড়ী থেকে মাসীর বাড়ী বেশী দূর নয়—ট্রেণে তিন-চার ঘণ্টার রাস্তা। এইটুকু রাস্তা অমল অনায়াসে একলা যেতে পারবে। কিন্তু যাওয়ার সময় পুশী বেড়ালকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতেই হবে! পুশীকে সে কখনও হাত ছাড়া করে না—পুশীই হচ্ছে তার একমাত্র খেলার সাথী। বেড়ালকে নিয়ে যাবার সময় মার সঙ্গে একটু গণ্ডগোল হোল মা বল্লেন, তুই একলা যাবি যা, সঙ্গে আবার ঐ নেজুড় নিয়ে কি হবে। মা অবশ্য বেড়ালটিকে মোটেই দেখতে পারতেন না। কারণ রান্না ঘরে কিম্বা অন্য কোন জায়গায় কোন খাবার জিনিষ বেড়ালের দৌরাত্মে খুলে রাখবার উপায় ছিল না। অনেক রকমে মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে অমল তার দুই একটা জিনিষপত্র ও পুশী বেড়ালকে নিয়ে ষ্টেসনে এসে পৌঁছুল।

ট্রেণে তেমন ভিড় ছিল না। একখানা টিকিট কিনে সে একটা কামরার একধারে গিয়ে বসল। ট্রেণে বসে সে নানা রকম কথা মনে-মনে ভাবতে লাগল। কি আমোদেই

তার দিনগুলো সেখানে কাটবে! মাসীর সঙ্গে দিনরাত গল্প, বিকেলে বেড়ান, পুকুরে রোজ সাঁতার, আম-বাগানে কাঁচা আম পেড়ে ছুরি দিয়ে কুচি-কুচি করে কেটে নুণ দিয়ে খাওয়া—এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ষ্টেসনের পর ষ্টেসন পার হয়ে যেতে লাগল।

২

ভাবতে ভাবতে সে চলেছে, কিন্তু কখন যে ট্রেণ থেমেছে তা তার খেয়ালই নাই। এমন সময় টিকিট বাবু তার সামনে এসে হাজির! জামার পকেট থেকে টিকিট বার কোরে তার হাতে সে দিল। টিকিটটা অনেকবার ভাল কোরে দেখে ফিরিয়ে দেবার সময় টিকিট-বাবুর নজর পড়ল পুশীর উপর। নজর পড়বার মাত্র গম্ভীর ভাবে বল্লেন,—এই বেড়ালের ভাড়া?



"এই বেড়ালের ভাড়া"

অমল তো আকাশ থেকে পড়ল—সামান্য একরত্তি পোষা বেড়াল—তার আবার ভাড়া—একথা তো সে কখনও ভাবেনি। এখন উপায়, তার হাতে তো পয়সা আর মোটেই নাই। সে অনেক কাকুতি-মিনতি করে তার দুরবস্থার কথা টিকিটবাবুকে খুলে বলল কিন্তু কিছুতেই তার মন ভিজল না। তিনি বললেন—তোমার নাম কি, এখানে কোথায় কার বাড়ী যাবে?

অমল সমস্ত কথা খুলে বললে, আর বললে, যে তার মাসীর কাছে নিয়ে গেলে সে হয়ত ভাড়া ও জরিমানা দুই দিতে পারবে।

সমস্ত কথা শুনে টিকিটবাবু যেন অনেক কথা বুঝতে পারলেন, এবং একটু হাসলেনও : তারপর খুব গম্ভীর হয়ে বললেন,—তোমার মাসীর কাছে নিয়ে যাওয়া আমার কাজ নয়, তারপর একটু ভেবে বল্লেন—আচ্ছা, আমার সঙ্গে এসো।

পুশীকে কোলে নিয়ে, আস্তে আস্তে অমল টিকিটবাবুর সঙ্গে যেতে লাগল। তখন বেলা অনেকটা পড়ে এসেছে ; দুঃখে, কষ্টে, অপমানে অমলের মনের অবস্থা যে কি রকম হয়েছিল তা আর বর্ণনা করা যায় না। তার এতো আনন্দ ও উৎসাহ কখন কোথায় উড়ে গিয়েছে। সে ভাবছিল, এই বন্দী অবস্থায় যখন মাসীরা দেখবেন তখন তাঁরা কি ভাববেন ! এই সব ভাবতে-ভাবতে অমলের চোখে দুই এক ফোঁটা চোখের জলও এল।

টিকিটবাবু পথে যেতে-যেতে অমলকে বললেন,—তোমার মাসী যদি রেলের ভাড়া না চুকিয়ে দেন তবে তোমার কি হবে জানো ?

অমলের তখন কথা বলার কোন ক্ষমতা ছিল না, সে কোন রকমে ক্ষীণ গলায় বলল— না।

টিকিটবাবু বললেন,—"তোমার জেলও হতে পারে।

৩

ছোট একটা একতলা বাড়ী—সামনে একটা ঘর। সেই ঘরের মধ্যে একটি টেবিলের সামনে অমলকে বসতে বলে টিকিট-বাবু বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। টেবিলের উপর মাথা রেখে আসন্ন বিপদের কথা ভাবতে-ভাবতে অমল এক রকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পুশী বেড়ালটীও যেন অমলের অবস্থা বুঝতে পেরে এক ধারে চুপ কোরে বসে থাকল।

বাবুটী তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে হাসতে-হাসতে তাঁর স্ত্রী অমলের মাসীকে অমলের আগমন খবর দিলেন এবং কেমন কৌশল করে তাকে বিপদে ফেলে নিয়ে এসেছেন, তাই হাসতে-হাসতে বলতে লাগলেন।

অমলের মাসী তো রেগেই অস্থির। তিনি বল্লেন,—আচ্ছা তুমি বেশ লোকতো, সব জিনিষ নিয়েই ঠাট্টা, দেখ দিকিনি এই টুকু ছেলেকে কি ভাবনাতে ও বিপদে ফেলেছ। আচ্ছা, দিদি এই ব্যাপার শুনলে কি বলবেন বলতো।

মাসী অমলের জন্যে আগে থেকেই ভাল-ভাল খাবার তৈরী করে রেখে ছিলেন। একটা রেকাবিতে ভাল খাবার সাজিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে এসে দেখলেন অমল টেবিলের উপর মাথা রেখে কাঁদছে। আহা, বেচারা কাঁদবেই বা না কেন! তার উপর দিয়ে কি রকম ঝড় আজ বয়ে গিয়েছে! মাসী ধীরে ধীরে এসে অমলের মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। অমলের মনের অবস্থা তখন এমন ছিল না যে মুখ তুলে দেখে। একটু পরে মুখ তুলে মাসীকে দেখবার মাত্র মাসী অমলকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে মাসী মেসো-মশায়ের সমস্ত দুষ্টুমী অমলকে খুলে বললেন।

মেসোমশায়ও সেখানে এলেন। সব কথা শুনে মেসোমশায়ের উপর অমলের যে ভীষণ রাগ হয়েছিল, তা কমে গেল এবং তারা সবাই মিলে সন্ধ্যায় জোৎস্নার আলোতে নানা রকম গল্প করতে লাগল।

শ্রীদীপ্তি সরকার

ময়নামতীর মায়াকানন

ষোলো

অতিকায় শ্লথ্

এই বানর-মানুষরা যে আমাদের আক্রমণ করিতে চায়, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রইল না! কারণ ক্রমে ক্রমে দলে ভারি হ'য়ে তারা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলে! তারা নানান রকম অঙ্গভঙ্গী ও চীৎকার ক'রে কি-সব বলতে লাগল, সেগুলো অর্থহীন শব্দ, অথবা তাদের ভাষা, তাও বুঝতে পারলুম না!

আমি বললুম, "বিমল, যদি বাঁচতে চাও, দৌড়ে ঐ হ্রদের ধারে চল! নইলে এরা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেললে আর বাঁচবার উপায় থাকবে না!"

বিমল বললে, "হুঁ!"

কিন্তু বানর-মানুষরাও বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেললে! কারণ আমরা হ্রদের দিকে ফিরতে না ফিরতেই ভয়ানক চীৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে তারা আমাদের আক্রমণ করলে!

সঙ্গে সঙ্গে বিমলও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে বন্দুক ছুঁড়লে, আমিও আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম—অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটো জীব তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে আছড়ে প'ড়ে ছট্‌ফট্ করতে লাগল!

বন্দুকের গর্জনে আর সঙ্গী-দুজনের অবস্থা দেখে বাকি বানর-মানুষগুলো হতভম্ব হয়ে মূর্ত্তির মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! জীবনে তারা আগ্নেয় অস্ত্র কখনো তো চোখে দেখেনি, কোন মায়া-মন্ত্রে আমরা যে তাদের দুই সঙ্গীর অমন দুরবস্থা করলুম এটা বুঝতে না পেরে ভয়ে ও বিস্ময়ে নিশ্চয় তারা অবাক হয়ে গেল!

সেই ফাঁকে আমরা হ্রদের দিকে ছুট দিলুম।......প্রায় যখন জলের কাছাকাছি এসে পড়েছি, তখন আবার আর এক বিপদ!......হ্রদের উপরে কয়েকখানা ছিপের মতন লম্বা নৌকা ভাসছে এবং প্রত্যেক নৌকার মধ্যে মানুষের মতন দেখতে অনেকগুলো ক'রে লোক!

নৌকাগুলো বেগে তীরের—অর্থাৎ আমাদের দিকে ছুটে আসছে! নিশ্চয় আরো একদল বানর-মানুষ জলপথ আগ্‌লে আছে! ভেবেছিলুম সাঁৎরে হ্রদের ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠে প্রাণ বাঁচাব, কিন্তু এখন দেখছি সে পথও বন্ধ!

পিছনে ফিরে দেখি, মাঠের উপরের বানর-মানুষদের দল আরো পুরু হয়ে উঠেছে! আহত সঙ্গী-দুজনের চারপাশে ঘিরে তাদের অনেকে উত্তেজিত ভাবে অঙ্গভঙ্গি করছে,—অনেকে আবার আমাদের লক্ষ্য ক'রে বিকট স্বরে চীৎকার ও লাঠি আস্ফালন করতেও ছাড়ছে না!

আমাদের তরফ থেকে বাঘাও লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে তাদের চীৎকারের উত্তর দিতে লাগল!

রামহরি বললে, "বাবু, এখন আমরা কোন্ দিকে যাই?"

বিমল বললে, "আবার বনের ভেতরে চল। সেখানে হয়তো লুকোবার একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে!

তা ছাড়া আর উপায়ও নেই। বিশেষ, বনের ভিতরে আত্মরক্ষারও সুবিধা বেশী। বন খুব কাছেই ছিল, আমরা আবার ছুটে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম—মাঠ ও নৌকা থেকে শত্রুরা উচ্চস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল!

একটা কোন গোপন স্থান খোঁজবার জন্যে আমরা বনের চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। কিন্তু সেখানে আবার এক নূতন আতঙ্ক! লুকোবার ঠাঁই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বনের এক জায়গায়, দোতালা বাড়ীর চেয়েও উঁচু একটা অতিকায় ভীষণ জানোয়ার দুই পা ছড়িয়ে ব'সে আছে এবং দুই হাত বাড়িয়ে মস্ত-একটা গাছ অতি-অনায়াসে মড়্‌মড়্ ক'রে ভেঙে ফেলচে! দেখতে তাকে অনেকটা ভাল্লুক ও বনমানুষের মাঝামাঝি!

বিস্ময়-স্তম্ভিত নেত্রে বিমল বললে, "ও কি সর্ব্বনেশে জন্তু?"

আমি বললুম, "অতিকায় শ্লথ!"

—"ও যদি আমাদের দেখতে পায়, তাহ'লে যে আর রক্ষে থাকবে না!"

"এর চেয়ে যে বানর-মানুষদের সঙ্গে লড়াই করা ভালো! এস, এস, পালিয়ে এস!"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম!

রামহরি বললে, "যেদিকে চাই সেইদিকেই বিপদ, এবারে সত্যিই বুঝি প্রাণটা গেল!"

বিমল হেসে বললে, "কৈ রামহরি, তোমার মহাদেবকে আর ডাকচ না কেন? আর একবার ডেকে দেখ, যদি তিনি এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন!"

রামহরি রেগে বললে, "মরতে বসেচ খোকাবাবু, এখনো দেবতা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা! হে বাবা মহাদেব! খোকাবাবু ছেলেমানুষ, তার অপরাধ ক্ষমা কর"—বলেই হাত জোড় ক'রে কপালে ছোঁয়ালে!

বিমল বললে, "কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বানরমানুষগুলো অবাক হয়ে কি দেখচে?

ওরা যে এখনো আমাদের আর আক্রমণ করলে না ? ওরা কি আমাদের বন্দুকের ভয়েই আর এগুচ্চে না ?"



আমি বললুম, "ওরা সবাই হ্রদের নৌকোগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে! বোধ হয় ওরা নৌকোগুলো ডাঙার আনার জন্যে অপেক্ষা করচে! নৌকো ডাঙায় এলেই ওরা একসঙ্গে দুই দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করবে!"

বিমল বললে, "নৌকোর ওপরেও গুলি চালাব নাকি?"

—"না, নৌকোগুলো এখনো দূরে আছে, বন্দুক ছুঁড়লে হয়তো ফল হবে না! বন্দুক যদি ছুঁড়তে হয়তো মাঠের দিকেই ছোঁড়ো, আরো দু-একজন মরলে বাকি বানর-মানুষগুলো ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে!"

—"তাই ভালো।"

আমরা দুজনেই শত্রুদের লক্ষ্য ক'রে বার-কয়েক বন্দুক ছুঁড়লুম। যা ভেবেছি তাই! বন্দুকের মারাত্মক শক্তি দেখে অনেকগুলো বানর-মানুষ লাফ মেরে আবার গাছের উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, অনেকে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল, মাঠের উপরে রইল খালি পাঁচ-ছটা আহত বা মৃত দেহ! কিন্তু তাদের ঘন ঘন চাৎকার শুনেই বুঝলুম, তারা আমাদের আশা একেবারে ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যায়নি—আড়ালে আড়ালে ওৎ পেতে ব'সে আছে!

হ্রদের দিকে তাকিয়ে বিমল বললে, "এইবারে এদের ব্যবস্থা করতে হবে!"

—"কিন্তু বিমল, নৌকোর ওপরে ওরা কারা রয়েছে? ওদের তো বানর-মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে না!"

—"হাঁ, তাইতো! ওরা তো বানর-মানুষদের মতন ন্যাংটো নয়—ওদের পরোণে জামা-কাপড়ের মতন কি যেন রয়েছে না?"

—"হ্যাঁ। বোধ হয় ওরা আমাদেরই মতন মানুষ!"

—"সংখ্যায় তো দেখচি ওরা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম নয়! তাহ'লে এখানে আমরা ছাড়া আরো মানুষ আছে! কিন্তু কি মতলোবে ওরা আমাদের কাছে আসচে? ওরা শত্রু না মিত্র?"

—"কিছুই তো বুঝতে পারচি না! হয়তো ওরা অসভ্য মানুষ, হ্রদের ঐ দ্বীপে থাকে।"

নৌকোগুলো ডাঙার খুব কাছে এসে পড়ল। একখানা নৌকোর উপরে হঠাৎ দুজন লোক দাঁড়িয়ে উঠল এবং দুহাত তুলে চাৎকার ক'রে ডাকলে—"বিমল! রামহরি! বিনয়বাবু! বাঘা!"

অমনেই বাঘা তীরের মত হ্রদের দিকে ছুটে গেল! আনন্দে আমাদেরও বুক যেন নেচে উঠল—এ যে কুমার আর কমলের গলা!

আমরাও এক দৌড়ে হ্রদের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম—সঙ্গে সঙ্গে একখানা নৌকো থেকে কুমার আর কমল ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল এবং বাকি নৌকোগুলো থেকেও উল্লসিত কণ্ঠে উচ্চ চীৎকার শুনলুম—"বিনয়বাবু!"

আনন্দের প্রথম আবেগ সামলে দেখি, আমাদের চারপাশে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে যারা, তারা কেউই অচেনা লোক নয়! তারা হচ্ছে আমাদেরই দেশের লোক, মঙ্গল-গ্রহের বামনরা বিলাসপুর থেকে তাদের বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই দ্বীপে এসেই তাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি হয়! পাঠকরা নিশ্চয়ই তাদের কথা ভুলে যান নি! *

....

মনের আনন্দে আমরা যখন কথাবার্তায় বিভোর হয়ে আছি, আচম্বিতে মাঠের দিক থেকে বিষম একটা গোলমাল শোনা গেল। ফিরে দেখি, বনের নানা দিক থেকে পিল্-পিল্ ক'রে দলে দলে বানর-মানুষ বেরিয়ে আসছে! দেখতে-দেখতে হাজার-হাজার বানর-মানুষে মাঠের এক দিক একেবারে ভ'রে গেল! হঠাৎ ভীষণ হল্লা ক'রে তারা একসঙ্গে আবার আমাদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'ল।

বিমলও আবার বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

কুমার বললে, "মিছে গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই বিমল! এস, আমরা নৌকোয় গিয়ে চড়ি গে! ওরা সাঁতার জানে না, জলকে বড় ভয় করে!"

আমি সায় দিয়ে বললুম, "হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমাদের কেউ মারা পড়ে, তাহলে আজকের এই মিলনের আনন্দ অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে।"

আমরা সকলে মিলে তাড়াতাড়ি নৌকোর উপরে গিয়ে উঠে বসলুম। বানর-মানুষরা যখন হ্রদের ধারে এসে দাঁড়াল, আমাদের নৌকোগুলো তখন তাদের নাগালের বাইরে

---

* যাঁরা গত বৎসরের "মৌচাকে" আমার "মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন" পড়েছেন, তাঁদের কাছে এই লোকগুলির নূতন পরিচয় দিতে হবে না। লেখক।

গিয়ে পড়েছে। নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের লক্ষ্য ক'রে তারা কতকগুলো বড় বড় পাথর বৃষ্টি করলে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছলো না। উত্তরে আমরাও বন্দুক ছুঁড়লে বানর-মানুষদের আরো কিছু শিক্ষা হ'ত বটে, কিন্তু আমাদের আর বন্দুকের টোটা নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হ'ল না।

নৌকোগুলো হ্রদের সেই দ্বীপের দিকে ভেসে চলল।

আমি বললুম, "কুমার, তোমরা কি ক'রে এখানে এলে সে কথা তো কিছুই বললে না?"

কুমার বললে, "আচ্ছা শুনুন, খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্চি।..... আপনারা যেদিন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন, সেইদিন রাত্রেই ঐ বনমানুষগুলো আমাদের আক্রমণ করে। ওরা যে কি ক'রে আমাদের খোঁজ পেলে তা আমি জানি না। তাদের সেই হঠাৎ আক্রমণে আমরা একেবারে কাবু হয়ে পড়লুম। লাঠির ঘায়ে আমার মাথা ফেটে গেল, বাবাও রীতিমত জখম হ'ল। তারপরে তারা আমাকে আর কমলকে নিয়ে নিজেদের বাসায় ফিরে এল। আমাদের নিয়ে ওরা যে কি করত তাও বলতে পারি না। তবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় একদিন আমরা একটা গাছতলায় প'ড়ে রইলুম। বনমানুষগুলো বড় বড় গাছের উপরে লতা-পাতা ডাল দিয়ে ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘর বানিয়ে বাস করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে যখন তারা গাছের উপরে ঘুমে অচেতন, আমি তখন কোন রকমে পকেট থেকে আমার ছুরিখানা বার করলুম। তারপর ছুরিখানা দাঁতে চেপে ধ'রে আগে কমলের বাঁধন কেটে দিলুম, তারপর কমল আমাকে মুক্ত করলে। শত্রুরা টের পাবার আগেই আমরা পালিয়ে এই হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হলুম, তারপর সাঁতার দিয়ে একেবারে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠলুম। ওখানে এই পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কিন্তু ওরা কি ক'রে ওখানে এল?"

কুমার বললে, "সে অনেক কথা। দ্বীপে গিয়ে শুনবেন। আজ বন্দুকের আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমাদের খোঁজে আপনারা এখানে এসেচেন!"

কে যেন আকাশের নীলিমাকে নিংড়ে হ্রদের জলে গুলে দিয়েছে,— কী স্বচ্ছ-নীল

তার রং! তার তলা পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের কিরণ-প্রদীপ জল্-জল্ ক'রে জ্বলছে এবং কত রকমের মাছ যে সেখানে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে স্পষ্ট তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

আগ্নেয় গিরির আগুন-জিভগুলো এখন আমাদের চোখের খুব কাছেই লক্-লক্ ক'রে উঠচে এবং গাছের পর গাছের সবুজ আঁচল-ঢাকা সেই ছায়া-নাচানো দ্বীপটিও একেবারে আমাদের কোলের সাম্‌নে এসে পড়েচে!.........তারপরেই আমাদের নৌকোগুলো একে একে তীরে গিয়ে ভিড়ল।

দ্বীপে যে-লোকগুলি আশ্রয় নিয়েচে তাদের সর্দ্দার ছিল সোনাউল্লা। সে বাঙালী মুসলমান, বিলাসপুরের জমিদারদের ষ্টিমার তারই জিম্মায় থাক্‌ত। দ্বীপে নেমে আমাকে সেলাম ঠুকে সে বললে, "বাবুজী, আজ আগেই আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে তো?"

—"হাঁ সোনাউল্লা, তাহ'লে বড় ভালো হয়,—আমাদের ভারি ক্ষিদে পেয়েচে। তুমি তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু রেঁধে আমাদের খাইয়ে দাও।"

—"কিন্তু বাবুজী, আমরা যে মুসলমান!"

—"ভাই সোনাউল্লা, আমরা এখন ভগবানের নিজের রাজত্বে বাস করচি... হয়তো এইখানেই আমাদের চিরকাল বাস করতে হবে। এখানে কেউ হিন্দুও নয়, কেউ মুসলমানও নয়— এখানে শুধু এক জাত আছে, সে হচ্ছে মানুষ-জাত! দলাদলিতে মানুষ যে-সব জাতের সৃষ্টি করেচে এখানে আমরা তা মানব না। তুমি যাও সোনাউল্লা, আগে তোমার হাতের রান্না খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করি, তারপর তোমাদের কাহিনী শুনব।"

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় মৌচাকের পাঠক-পাঠিকা,

এই বৈশাখে তোমাদের শুভ আশির্ব্বাদ নিয়ে মৌচাক আট বছরে পা দিল। মৌচাক তার আন্তরিক ভালবাসা ও প্রীতি তোমাদের সকলকে জানাচ্ছে এবং তোমাদের সকলের ভালবাসা কামনা করছে।

গত বৎসর তার যে সব ত্রুটি হয়েছে, সে জন্যে সে তোমাদের ক্ষমা প্রার্থনা কোরছে। এই বৎসরে যাতে সে সব রকম তোমাদের আনন্দ দিতে পারে, তার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা কোরবে।

এই বৈশাখে যাঁদের লেখা মৌচাকে বেরিয়েছে, তাঁদের অনেকের লেখা বাংলা দেশের গৌরব। তাঁদের লেখা পেয়ে মৌচাক ধন্য হয়েছে। এই সব লেখা মৌচাক তোমাদের উপহার দিয়ে সে কত আনন্দ অনুভব কোরছে। এই রকম ভাল ভাল লেখা মৌচাক প্রতি মাসেই সংগ্রহ কোরে তার মৌচাক পূর্ণ কোরবে।

"ময়নামতীর মায়াকানন" ও "ভোলার পেত্নী" দুই তিন মাসের মধ্যে শেষ হবে। এর পরে আর দুটো খুব ভাল উপন্যাস আমাদের হাতে এসেছে।

এবার থেকে মৌচাকের আট পাতা বেশী করে দেওয়া হ'ল। আশা করা যায় এতে তোমরা সকলেই খুব খুশী হবে। আমাদের সব চেয়ে বেশী দুঃখ এই যে তোমাদের কাছ থেকে আমরা ভাল লেখা মোটেই পাই না। রোজই অনেক লেখা আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় বটে কিন্তু সেগুলো ছাপাবার উপযুক্ত নয়। তোমাদের লেখা ছাপাতে পারলে আমাদের খুব আনন্দ হয়। মৌচাকের এই একটা প্রধান উদ্দেশ্য। আশা করি, এই নূতন বৎসরে তোমরা ভাল ভাল লেখা পাঠিয়ে মৌচাক পরিপূর্ণ করে তুলবে।

নববর্ষে সব রকমে তোমাদের আশা পূর্ণ হোক এই শুভ ইচ্ছা জানিয়ে মৌচাক আজ বিদায় নিচ্ছে।

ইতি— সম্পাদক

সবজান্তা

সে দিন লণ্ডনে একখানা পুরোনো ডাকটিকিট ৬৮০ পাউণ্ডে বিক্রি হয়েছে।

বার্লিনে মোটা মানুষদের একটা ক্লাব আছে। এই ক্লাবের পাঁচ জনের একত্রে ওজন ২৮ মন। এই ক্লাবের সভ্য হোতে হলে ওজনে অন্ততঃ ৪ মন ১৫ সের হওয়া চাই।

শিক্ষক—"পাওনাদার" কথার মানে কি?

ছাত্র—যে লোক বাড়ীতে এলে বলে দিতে হবে, বাবা বাড়ী নাই।

প্রথম পথিক—হাসপাতালে যাবার সোজা রাস্তা বলে দিতে পারেন?

দ্বিতীয় পথিক—ঐ জানলা থেকে লাফিয়ে পড়ে হাত পা ভাঙ্গুন, হাসপাতালের সোজা রাস্তা পাবেন।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রতিবৎসর ৪০,০০০ বই আসে।

ছাপাখানা আবিষ্কারক গুটেনবার্গের মুদ্রিত একখানা বাইবেল ২৫,০০০ পাউণ্ডে সেদিন বিক্রি হয়েছে।

সেদিন লণ্ডনে সামুদ্রিক মাছের একটা প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে একটা মাছ দেখান হয়েছিল যা ছয় বৎসর কোন খাবার মুখে দেয় নাই। এবং সে নাকি আরো তিন বৎসর অনাহারে থাকতে পারবে। এই মাছের নাম Proteous.

জাভায় খুব বড় বড় টিকটিকি পাওয়া গিয়েছে, এক একটা দশ ফিট লম্বা এবং দশটা কোরে পা আছে।

পৃথিবীর মধ্যে জাভায় সবচেয়ে বেশী ঝড় হয়। তারপর মধ্য-আমেরিকা; হিসাব কোরে দেখা গিয়েছে পৃথিবীতে প্রতি দিনে ৪৪,০০০ বার ঝড় বৃষ্টি হয়।

সারা রুশিয়ায় সবচেয়ে বৃদ্ধ লোক আছে তার বয়স এখন ১৪৫ বৎসর; রুশিয়ায় আর একজন বৃদ্ধা আছেন তার বয়স হচ্ছে ১৩৬ বৎসর।

এবারের পুরস্কার

কোন খেলা খুব ভালো!

(১) হকি (২) ক্রিকেট (৩) দৌড়ান (৪) সাঁতার (৫) ফুটবল (৬) টেনিস (৭) মাছধরা (৮) কুস্তি।

(ক) উপরে যে আটটী খেলা লেখা হোল, সেগুলো খেলার গুণ অনুসারে পর পর নম্বর দিয়ে সাজিয়ে আমাদেরকে পাঠিয়ে দাও। তোমাদের মতামত এলে তোমাদেরই ভোট অনুসারে সেই খেলাগুলো আমরা সাজিয়ে ফেলব। তারপর এই ভোট অনুসারে খেলার যে লিষ্ট তৈরী করা হবে, তোমাদের প্রেরিত প্রত্যেকের মতামতের সঙ্গে একেবারে যার মিলবে কিম্বা খুব কাছাকাছি হবে, তাকে ১০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা।

(খ) মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকারাই কেবল এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন এবং মতামতের সঙ্গে গ্রাহক নম্বর পাঠান চাই। প্রত্যেক গ্রাহক একটার বেশী মতামত পাঠাতে পারবেন না। ২৫শে বৈশাখের মধ্যে উত্তর আসা চাই।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতিন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত



বাপরে বাপ্



৮ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ [দ্বিতীয় সংখ্যা

মা-হারা

বড় সে দুরন্ত ছেলে, একটু সুযোগ পেলে,
করে তোলপাড়,
কভু বসে বই নিয়ে, কখনো বাগানে গিয়ে,
ছুটে আসে, এপার ওপার।

তোলে ফুল, ছেঁড়ে পাতা, গাছের নোয়ায় মাথা
ঝুঁটি ধরে টেনে,
কচি কাঁচা ফল কত, আনে পেড়ে সাধ মত,
ফেলে দেয় মার কোলে এনে ;

চলে পুকুরের পাড়ে, ছিপ হাতে চারি ধারে,
আসে ঘুরে ফিরে,
দণ্ড দুই বসে থেকে, স্থির হয়ে কেবা শেখে,
পরে মাছ কিসের ফিকিরে !

খুঁজিতে পাখীর ছানা, গাছেতে চড়িতে মানা,
তবুও দুপরে,
মা যদি গো চোখ বোঁজে, ঘুমায়ে আছেন বোঝে,
ওঠে গিয়ে জানালা উপরে,

যায় না দুয়ার খুলে, শব্দ পাছে হয় ভুলে,
খোলা জানালায়,
পার হয়ে চলে ধীরে, ভরা রোদে ঘুরে ফিরে
আগ ডালে আলগোছে যায়!

দেখে মা'র বুক ঘেঁষে, যেন কত ভালবেসে,
ছানা আছে শুয়ে
হাত তার নিতে চায়, মন মানা করে তা'য়
দেখে শুধু, তাই আসে থুয়ে!

পোষা কুকুরের সাথ, ছুটোছুটি দিন রাত,
পুষি মেনিটিরে,
তাড়া করে নিয়ে ফেরা, সকল কাজের সেরা,
বার বার সারা বাড়ী ঘিরে।

খালীর টিকিটি টানে, কারো কথা নাহি মানে,
যায় পাকশালে,
দু চারিটি ভাজা ভুজি, চকিতে করিয়া পুঁজি,
পিঠ্-টান তখুনি আড়ালে।

লীলার অবধি নাই, অধিক বলিয়া তাই,
কাজ নাই আর,
নতুন কিছুই নয় তোমরাও মনে হয়,
এই মত করো বার বার !

সেদিন সাঁঝের বেলা, কোথায় কিসের মেলা,
কত কথা বলে,'
দিদিমার হাতে তারে, সঁপি দিয়া, বারে বারে
বোঝাইয়া মা গেলেন চলে।

দুরন্ত ছেলেটি ফেলে, দুদণ্ড চলিয়া গেলে,
মনে জাগে ভয়,
মায়ে তাই তাড়াতাড়ি, ফিরিয়া এলেন বাড়ী
আজ তাঁর পরম বিস্ময় !

নাই কোথা সাড়াশব্দ, একেবারে সব স্তব্ধ,
যেন ভরা রাত,
দেখেন ঘরেতে গিয়ে, কোলেতে মাথাটি দিয়ে
জড়াইয়া দিদিমার হাত ;

পাগল ঘুমায়ে আছে, চোখের কোণার কাছে
দুটি ফোঁটা জল,
ঠোঁটে কাঁদনের লেখা, আঁকিয়া দিয়াছে রেখা
কেঁপে কেঁপে ওঠে বক্ষতল।

দিদিমা বলেন, এলে, তুমিত চলিয়া গেলে,
আঁচল ধরিয়া,
না ডাকিতে কাছে এসে, কখন ঘুমাল শেষে
একেবারে অবাক করিয়া !

শুনিতে কাহিনী কথা, আজ তার মন কোথা ?
চুপ একেবারে !
এমন গরম দিনে, ঘুমাল সে পাখা বিনে,
গুটিসুটি হয়ে এক ধারে !

ও শুধু তোমারি জোরে, বেড়ায় দুস্টামি করে'
করে আবদার,
তোমারে দেখেনা যেই, অমনি সে নিমেষেই,
ফিরে পায় স্বভাব তাহার !

যেন গোপালের মত, ছেলে সে সুবোধ কত,
চিনে উঠা দায় !
যা' পায় সে খায় তাই, কোনই বালাই নাই,
যা' বলি তা শোনে সমুদায় !

ছেলের সুখ্যাতি কথা, মার মনে সুখ ব্যথা
দুই নিয়ে আসে,
হাত বুলাইয়া গায়, আশীষ করেন তায়
ধীরে ধীরে শো'ন গিয়ে পাশে ।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

সুন্দর সুইজারলাণ্ডে

ইয়োরোপের ম্যাপ খুলে দেখতে পাবে ইয়োরোপের মাঝখানে জার্ম্মানী-অষ্ট্রিয়া-ইতালী-ফ্রান্স ঘেরা একটি ছোট দেশ আছে, ম্যাপেতে দেখতে পাবে দেশটি পাহাড় ও হ্রদে ভরা, এ হচ্ছে সুইজারলণ্ড—ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেশ। অনেকে এ দেশকে আমাদের কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেন। যদিও ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় মঁ ব্লাঁ (Mont Blanc) সুইজারলণ্ডের উত্তর দক্ষিণে ফ্রান্সদেশে, কিন্তু আল্পস্ পাহাড়ের সারি ও ইয়োরোপের সুন্দর হ্রদের মালা এই দেশে। এই হ্রদ ও পাহাড়ের সুন্দর দেশের কথা তোমাদের কিছু বলব।

দেশটি আয়তনে ছোট, ১৫ হাজার বর্গ মাইল মাত্র, বাংলার চেয়ে অনেক ছোট, কিন্তু এই ছোট দেশ দেখতে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে সকল জাতির ভ্রমণকারীরা আসেন। এ থেকে এদেশের আয় বড় কম নয়। সুইজারলণ্ডের কোন বড় সহরে গেলে দেখবে শুধু হোটেল আর হোটেল, তাতে সব বিদেশী নানা জাতির লোক ভরা। কোন বড় হোটেলে গেলে মনে হয় জায়গাটা যেন পৃথিবীর সব জাতির মিলনের জায়গা। আমি এখন সুইজারলণ্ডের পাহাড়ের মাথায় একটি ছোট সহরে আছি। আমি যে ছোট হোটেলে আছি, সেখানে একজন রাসিয়ান, একজন জার্ম্মান, একজন ইতালীয়ান, ইত্যাদি ইয়োরোপের নানাদেশের লোক ত আছেনই, তাছাড়া একজন কালিফোর্নিয়া থেকে এসেছেন, একজন ভেনেজুয়েলা (Venezuela) থেকে এসেছেন। Venezuela কোথায় তোমাদের বলব না, তোমরা ভুগোল দেখে জেনে নেবে। এই বিদেশী লোকদের থাকা খাওয়া খেলা বেড়ানোর ব্যবস্থা করানই হচ্ছে সুইজারলণ্ডের লোকদের প্রধান ব্যবসা। বিগত যুদ্ধের পরের হিসাব আমার জানা নেই। যুদ্ধের আগের হিসাব কিছু দিতে পারি। যুদ্ধের আগে ১৯০৫ সুইজারলণ্ডে দু'হাজারের ওপর বড় হোটেল ছিল। সে বছর বিদেশীদের কাছে থেকে লাভ হয়েছিল ৭৫লক্ষ পাউণ্ডের ওপর। সে বহুদিনের কথা, তারপর আরও অনেক হোটেল হয়েছে। সুইজারলণ্ডের কোন কোন সহরে অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ লোক হচ্ছে বিদেশী।

অনেক লোক বেড়াতে, পাহাড়ে উঠতে, ও হ্রদে বেড়াতে আসে। অনেকে স্বাস্থের জন্য আসে, এখানে পাহাড়ের ওপর জায়গাগুলি খুব স্বাস্থ্যকর। বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগীদের জন্যে সানাটোরিয়াম বা স্বাস্থ্য-নিবাস কয়েকটি জায়গায় আছে। লেজাঁ বলে একটি জায়গায় যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ছেলেদের জন্য সানাটোরিয়াম আছে, এখানে সূর্য্যের আলো লাগিয়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। ভাল হাওয়া, ভাল খাবার ও পরিপূর্ণ বিশ্রাম হচ্ছে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা; তার সঙ্গে সূর্য্যের আলো লাগিয়ে চিকিৎসা করতে পারলে আরও ভাল। কিন্তু যক্ষ্মা যদি হাড়ে হয় তা হলেই সূর্য্য-কিরণে চিকিৎসা চলে, বুকে হলে চলে না। ছেলেমেয়েরা গা খুলে কেমন রোদে পড়ে



স্লেজ

আছে তার একটি ছবি দিলুম। এখানে ছেলেমেয়েদের একটি স্কুলও আছে, যাদের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, বা সহরে থাকলে যাদের সহজে যক্ষ্মা হতে পারে এই রকম সব ছেলেদের এখানে রাখা হয়, তারা খেলাধূলা পড়াশোনা করে, তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য চিকিৎসাও চলে। ছেলেরা স্কুলের সামনে সব রোদে কেমন দড়ি টানাটানি কোরছে তার একটি ছবিও দিলাম। এই যে সব ছেলেমেয়েরা দেখছ, তারা বেশীর ভাগই

সুইজারলণ্ডের নয়, কেউ ইংলণ্ড থেকে এসেছে, কেউ রাসিয়া থেকে এসেছে, কেউ বা চিন বা আমেরিকা থেকে এসেছে। আমাদের দেশেও সব দুর্বল-স্বাস্থ্য ছেলে-মেয়েদের জন্য এরকম ভাল জায়গায় স্কুল হওয়া দরকার।

সুইজারলণ্ডের আর একটি আকর্ষণ হচ্ছে, শীতকালে বরফে খেলা। এখন ফেব্রুয়ারী মাস, তোমাদের ওখানে দক্ষিণের বাতাস বইছে, কিন্তু আমাদের এখানে বরফ-পড়া শেষ হয়নি। আমি সুইজারলণ্ডের একটি পাহাড়ের মাথার সহর থেকে তোমাদের লিখছি। জায়গাটি পাঁচ হাজার ফিট উঁচু হবে। কিন্তু আজ সকাল থেকে সারাক্ষণ বরফ পড়ছিল, দুপুর বেলা থেমেছে। এই বরফ পড়া না দেখলে কিছুতেই বোঝা যায় না এ কি ব্যাপার। বরফ বল্লে আমরা গ্রীষ্মকালে যে রকম বরফ খাই, তার কথা মনে হয়। কিন্তু এ বরফ সে রকম শক্ত বা ভারী মোটেই নয়, মনে হয়



ছেলে-মেয়েদের খেলা

যেন সাদা আকাশ থেকে সাদা ফুলের পাঁপড়ি ঝরে পড়ছে, অথবা কে যেন চারিদিকে চিনি বা লবন ছড়িয়ে দিচ্ছে অথবা যেন পেঁজা তুলো দিয়ে কে চারিদিক ঢেকে দিচ্ছে, মনে কর যেমন বিষ্টি পড়ে, সেই বিষ্টির প্রতি ছোট বড় ফোঁটা জলের ফোঁটা হয়ে

না পড়ে, প্রতি. ফোঁটা বকুল ফুলের মত বা পেঁজা তুলোর মত জমে গিয়ে পথে ঘাটে মাঠে বাড়ীর ছাদে চারিদিকে জড়িয়ে পড়ছে, ঝমঝম শব্দ নেই, ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে না। চারিদিক দুধের সরের মত সাদা রংএ ঢেকে দিয়েছে। এই বরফ ঢাকা পাহাড় বন গ্রাম মাঠ দেখতে বড়ই সুন্দর। চারিদিক সাদায় সাদা, একটি শুভ্রনির্ম্মল স্বপ্নের মত, পথেতে কাদা নেই, বাড়ীর ছাদে ময়লা নেই, মাঠে সবুজ রং নেই, চারিদিক সুন্দর সাদা।

সমস্ত সকাল বরফ পড়ার পর তখন বরফ-পড়া থেমেছে, কুয়াসা ভেদ করে সূর্য্যের আলো চারিদিকে ঝিকমিক করছে, সবাই বরফে খেলা করতে বাহির হয়েছে।



স্কি-খেলা

বরফের গোলা করে ছুড়ে মারামারি করা হচ্ছে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা। সব স্কুলের সামনে দেখবে টিফিনের ছুটিতে বা স্কুলের পরে সব ছেলেমেয়েরা বরফ ছুঁড়ে খেলা করছে। তাছাড়া বরফের মানুষ-গড়া হচ্ছে সুন্দর খেলা। শীতকালে পাহাড়ের ওপর এত ঠাণ্ডা যে বরফ গলে যায় না। বরফ জমিয়ে বেশ মানুষের মূর্তি গড়া যায়।

. কিন্তু সব-চেয়ে সুন্দর ও মজার খেলা হচ্ছে স্কি-করা। বরফ যখন পথে বা মাঠে বেশ ভাল পড়ে গেছে, তখন সবাই, পায়ে বুট জুতোর সঙ্গে দুটি লম্বা কাঠ (ski) মজবুৎ করে বেঁধে হাতে দুটি ছড়ি নিয়ে বাহির হয়, ছড়ির শেষে একটি ছোট চাকা লাগান থাকে। এই স্কি পরে গড়ান রাস্তা দিয়ে বা উঁচুনীচু ঢেউ খেলান মাঠে, ওপর থেকে নীচে বেশ সোঁ করে গড়িয়ে চলে যাওয়া যায়। বরফ পড়ে পথ-মাঠ এমন মসৃন হয় যে ওপর থেকে নীচে চলে যেতে বড় আমোদ বোধ হয়, পা পিছলে আপনি চলে যায়। অবশ্য জায়গাটা ঢালু হওয়া দরকার যাতে ওপর থেকে নীচে পিছলে চলে আসা যায়। যে ছবিটি দিচ্ছি, তা দেখে স্কি কি তা বুঝতে পারবে।



কিন্তু সব ছেলেমেয়ের ভাগ্যে স্কি পাওয়া জোটে না। কারণ স্কির দাম আছে। কিন্তু প্রায় সব বাড়ীতে ছোট স্লেজ (Sledge) বা চাকাহীন গাড়ী আছে, তাতে একজন বা দু'জন বসে পথ দিয়ে বেশ গড়িয়ে নেমে যাওয়া যায়, ছবিতে দেখবে একটি ছোট ছেলে ও একটি মেয়ে ছোট গাড়ীতে বসে বরফের ওপর দিয়ে নেমে চলেছে, গোড়ায় ঘোড়ার মুখের লাগামের মত একটি দড়ি আছে, মেয়েটি সে দড়ি ধরে

বসেছে, পেছনে আর ছ'টি ছেলেমেয়ে ঘাড়ে স্কি নিয়ে দাঁড়িয়ে। স্কি স্লেজিং করতে গেলে প্রথমে বরফ চাই, তারপর উঁচুনীচু জমি চাই, তাই সুইজারলাণ্ডে সবাই আসে।

বরফের ওপর আর একটি খেলা আছে স্কেটিং। এর জন্যে মসৃন সমতল জমি চাই, বরফ খুব পেছলান ও শক্ত হওয়া দরকার। বরফ পড়ে গেলে কোন সমতল বৃহৎ জায়গায় বরফ সমান করে স্কেটিং করবার জায়গা করতে হয়। স্কেটিং হচ্ছে জুতোর তলায় আধখানা চাঁদের মত বেঁকা একখানি লোহার পাত বেঁধে বরফের ওপর চলা, দৌড়ান, নাচা ইত্যাদি। অনেক জায়গায় পায়ে এরূপ স্কেট (Skate) বেঁধে লোকে হকি খেলে। একখানা ছবি দিচ্ছি, তাতে দেখবে, পায়ে স্কি বেঁধে একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে কেমন ঘোড়ার সঙ্গে বরফের ওপর ছুটছে। বরফ পড়া পথের ওপর চাকা-ওয়ালা গাড়ী যেতে পারে না, কারন চাকা বসে যাবে, তখন স্লেজ বলে চাকাহীন গাড়ী ঘোড়ার সঙ্গে যুতে দেওয়া হয়। বরফ-ঢাকা পথে চারিদিক বরফ ঢাকা পাহাড় বন মাঠের মধ্য দিয়ে এই স্লেজ (Sledge) করে যাওয়া বড়ই আনন্দকর।

লেজাঁ, শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু
সুইজারলাণ্ড

নৌকা

মৌচাকের মধুলোভী তরুণ পাঠকদল, তোমরা, বোধ করি, সকলেই গঙ্গার ঘাটে নৌকো দেখে থাকবে। সকলেই না দেখে থাকতে পারো, কিন্তু অনেকেই যে দেখেছো, এ কথা আমি জানি। যদি জিজ্ঞাসা করি, কোন্ কোন্ জিনিষের সাহায্যে নৌকো চলে, বলতে পারবে? এবং তাদের মধ্যে বিশেষ দরকারী কোন ক'টি জিনিষ? নিশ্চয় বুদ্ধি ক'রে ভেবে তোমরা বলবে,—হাল, পাল আর দাঁড়—এই তিনটে জিনিষই নৌকো চলার প্রধান উপকরণ। ঠিকই তাই। তাদের মধ্যে কোনটির কি

কাজ, গুছিয়ে তাও বোধ করি বল্‌তে পারবে। পারো আর না পারো, শোনো; শুনলেই আরও ভালো ক'রে বুঝতে পারবে।

হাল জিনিষটা নৌকোর গতি নির্দ্দেশ করে। কোন্ দিকে নৌকো যাবে, হালের সাহায্যে মাঝি তাই ঠিক ক'রে দেয়। ডাইনে, বামে, বা সামনে, মাঝি হাত দিয়ে হালটা সেই মতো ঘুরিয়ে ইচ্ছে মাফিক নৌকো চালায়। নৌকো ঘুরোতে ফিরোতেই ঐ হালটাকেই ঘুরোতে ফিরোতে হয়। এই হালটা থাকে নৌকোর পিছনে—জলের মধ্যে খানিকটা ডুবোনো। গভীরতায় তার স্থান এবং গতির দিকে তার দৃষ্টি। শক্ত কাঠে তা তৈরি। মাঝি তার মালিক।

পাল জিনিষটা তৈরি পুরু কাপড় দিয়ে। বাতাসের সাহায্য নেবার জন্যে এই পাল জিনিষটার দরকার। যে মুখে যে দিকে বাতাস বয়, সেই বাতাসের সাহায্যে নৌকোর চলার কাজে লাগাবার জন্যে পালের প্রয়োজন। ইচ্ছামতো পাল খাটিয়ে, বাতাসের শক্তি ও গতি দিয়ে সেই পালটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, তারই সহায়তায় নৌকোর গতি ঠিক করা হয়। যে দিকে নৌকো চল্‌বে, সে দিকে সেই মুখে যদি হাওয়া বয়, তবে তো কথাই নেই; সেই হাওয়ার সাহায্য ভারী কাজে লেগে যায়। আর যদি সেই মুখে হাওয়া না-ও বয়, তা হলেও বিপরীত দিক গামী বাতাসকেও তেড়া-বেঁকা ভাবে পালের সাহয্যে সরিয়ে-ঘুরিয়েও নৌকো-চলার কাজে লাগানো হয়ে থাকে। বাতাসে ফোলা পালের সাহায্যে নৌকো কলকল-ছলছল করে দ্রুতগতিতে জলের উপর দিয়ে তরতর ক'রে চলে যায়, এই পাল-তোলা নৌকো বড় সুন্দর দেখতে। অনেক দূর থেকে এই পাল তোলা নৌকো দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

এইবারে দাঁড়ের কথা বল্‌ব, শোনো। দাঁড়ও কাঠ দিয়ে তৈরি। যেমন ক'রে তোমরা সাঁতার কাটো; অর্থাৎ হাত ও পা দিয়ে জল টেনে টেনে যেমন ক'রে তোমরা জলের উপর ভেসে ভেসে এগিয়ে যাও, দাঁড়গুলো হচ্ছে তেমনি নৌকোর হাত পা। তারি আঘাতে জল টেনে টেনে নৌকো এগিয়ে চলে। সময় মতো ও দরকার মতো আস্তে আস্তে বা জোরে জোরে, জলের গায়ে এই দাঁড় মেরে মেরে, হাত পা ছুঁড়ে শরীরকে যেমন তোমরা জলে সাঁতার কাটাও, তেমনি করে এই দাঁড়ের সাহায্যে নৌকো চালানো হয়

এখন, এই তিনটে জিনিসই নৌকো চালানোর প্রধান উপকরণ। গুণ ব'লে আরও একটা জিনিস আছে—সেটা গুণ অর্থাৎ রশি বা দড়ি দিয়ে তৈরি। তাই মাস্তুলের সঙ্গে লাগিয়ে, ডাঙায় ডাঙায় তাই ধরেও নৌকোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রধান জিনিষ ঐ উপরের তিনটি। এর মধ্যে হাল জিনিষটাই সব চেয়ে দরকারী।

নৌকোর যে মাঝি অর্থাৎ নৌকো চালানোর যে প্রধান কর্ত্তা, সেই থাকে হালের গোড়ায় বসে, হালের মুঠো চেপে ধরে। নৌকো চালাতে হালটা খুব মজবুৎ হওয়া দরকার, যেন না ভেঙে যায় এবং মাঝি খুব পাকা হওয়া দরকার যেন সে ঐ হালের অধিকার ঠিক রাখতে পারে। নৌকোর গতি তার হাতে; নৌকোর বিপদ আপদ বাঁচানো তার মুঠোর মধ্যে, নৌকোর যাত্রা নিদ্ধারণ তারই বুদ্ধি ও বিবেচনার আয়ত্বে, হাল ধারণ করেই ঐ মাঝিই নৌকোর গতি নিদ্ধারণ করে।

হালটাকেই তাই নৌকার নিদ্ধারণ নাম দিচ্ছি। তার তুলনায়, পালটা কতকটা বিজ্ঞাপন এবং দাঁড়টা হল আস্ফালন। কোনও কাজ উদ্ধার করতে, কোনও যাত্রাকে জয়যুক্ত করতে এই তিনটে বস্তুই প্রয়োজন। তবে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে এই নিদ্ধারণ। আস্ফালন ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন তার নীচে।

মৌচাকের মধুপিয়াসী পাঠক-পাঠিকা, উন্নতির বন্দরে যাত্রা পথের লক্ষ্যে তোমাদের দেশের নৌকাখানিকে চালাতে তোমরা কোন্ স্থানটি নিতে চাও? সব ক'টি স্থানই তোমাদের ভাগ ক'রে নিতে হবে কিন্তু যেটি হচ্ছে নিদ্ধারণ, যেটি লক্ষ্য-পথের প্রধান সহায়, সেইটি তোমাদের মধ্যে যারা পাকা, যারা বুদ্ধিমান, তারই ভাগ ক'রে নাও। বিজ্ঞাপন বা আস্ফালনের পদগুলো যারা অপেক্ষাকৃত হাল্কা তাদের দিও। প্রকাশের চেয়ে গভীরতার দিকে যার মুখ, পশ্চাতে যার স্থিতি, দূরদর্শী যাহার দৃষ্টি, সেই তোমাদের মধ্যে মাঝি হয়ে, এই দেশের নৌকোটাকে চালাবে এই আমার ইচ্ছে।

ছাখো, যাত্রার সব চাইতে নিঃশব্দ বাহন হচ্ছে নৌকো। সময়ের গতির সঙ্গে তার মিল আছে বলে যান-বাহনের মধ্যে সেই নৌকোই হচ্ছে সব চেয়ে ভালো বাহন। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী, রেলের গাড়ী—সব তাতেই ভারী শব্দ, ভারী ঝাঁকানী, ভারী হাঙ্গামা। আর এই নৌকোটি দেখ্‌তেও যেমন সুন্দর, যাত্রাও তার তেম্‌নি নিঃশব্দ, আড়ম্বর হীন এবং গতিও তেম্‌নি মনোরম ও কবিত্বময়।

জগৎ মানে যা গতিশীল। যা যাচ্ছে, চল্‌ছে, যং গচ্ছতি—সেই জগৎ। সংসারও তাই—যা সরছে, থাকছেনা, যা স্থিতিশীল নয়। চল্‌তে যখন সকলকেই হচ্ছে এবং হবে, চলা যখন অনিবার্য্য, এই জীবন যাত্রা যখন সকলকেই করতে হবে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সকলেই যখন এই যাত্রা পথের পথিক, তখন তারি মধ্যে প্রধান ও সুন্দর যে একটি বাহন নৌকা, তারই একটা দরকারী দিক্ তোমাদের জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের এই তরুণ জীবনযাত্রা শুভ হোক, সুন্দর হোক, সঙ্গে সঙ্গে এই আশীর্ব্বাদ করছি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জলার পেত্নী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যতীন বাবুর কথা

নারয়ণগঞ্জ থেকে অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হোলো। আমাকে সঙ্গে থাকবার জন্য তিনি অনেক অনুরোধ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখলে তাঁর শত্রুদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে এই ভয়ে সঙ্গে গেলুম না। হঠাৎ একদিনের জন্য কলকাতায় গিয়ে একজন লোক নিয়ে ফিরতে দেখলে সন্দেহ তো হোতেই পারে। আমি তাঁকে কালীগ্রামে যাবার গাড়ীতে তুলে দিয়ে ঢাকায় চলে গেলুম।

দুদিন ঢাকায় থেকে একদিন সন্ধ্যাবেলা আবার দাড়িগোঁফ চড়িয়ে কালীগ্রামে যাবার গাড়ীতে চড়ে বসা গেল। কালীগ্রামে যখন পৌঁছলুম তখন প্রায় সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে। আমার কাছে বেশী মালপত্র ছিল না, মাত্র একটি বড় ব্যাগ। তার মধ্যেই কাপড়-চোপড় ও চেহারা বদলাবার কিছু-কিছু সাজ-সরঞ্জাম ছিল। ব্যাগটি হাতে নিয়ে আমি অপূর্ব্ব-বাবুর বন্ধু সদাশিববাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম।

সদাশিববাবু আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কে আপনি! কি চাই?

আমি তাকে বল্লুম যে, আমার নাম স্ফটিকচন্দ্র ঘোষ, কালাগ্রাম থেকে মাইল ত্রিশ দূরে কুসুমপুর নামে একটা জায়গায় যাব। কিন্তু এখন সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে আজকে রাত্রিটার মতন এখানে একটু জায়গা চাই, কাল সকালে চলে যাব।

সদাশিববাবু বল্লেন—কি আশ্চর্যি! আপনি তো বড় বিপদে পড়েছেন দেখছি! এ দেশে থাকবার জায়গাই বা কোথায় পাবেন? আপনাকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়লুম তো দেখ্‌ছি।

আমি বল্লুম—আজকের রাতটা কাটাবার মতন একটু জায়গা আমায় কোরে দিন।

সদাশিববাবু অনেকক্ষণ চিন্তা কোরে বল্লেন—দেখুন, স্ফটিকবাবু, আমার এখানে তো জায়গা নেই তবে আপনাকে একটা জায়গা বলে দিচ্ছি সেখানে গেলে আজকের মত নিশ্চয় জায়গা পাবেন।

আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলুম এই রকম উৎসাহ দেখিয়ে বল্লুম—আপনি আমাকে বাঁচালেন মশায়। কোথায় সে জায়গা দয়া কোরে বলে দিন।

সদাশিববাবু আবার কিছুক্ষণ চিন্তা কোরে বল্লেন—দেখুন, এখান থেকে কিছু দূরে আমার গুরুদেব থাকেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর ওখানে অনেক জায়গা পড়ে আছে। অনেক অতিথি এসে সেখানে দু-চার দিন কোরে থাকে আবার চলে যায়। আপনি যদি সেখানে যান তা হোলে আপনার কোনো কষ্ট হবে না।

আমি সদাশিববাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লুম—আমায় যদি দয়া কোরে একজন লোক দেন। আমি তো সে আশ্রম চিনি না।

সদাশিববাবু বলে উঠলেন—আরে কি আশ্চর্যি! এখানে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর আশ্রমের কথা যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সেই বলে দেবে। আচ্ছা আপনি দাঁড়ান।

এই অবধি বলে তিনি হাঁক দিলেন—কালীচরণ।

ডাক শুনেই কালীচরণ আজ্ঞে যাই বলে ছুটে এল। সদাশিববাবু তাঁকে বল্লেন—এই ভদ্রলোকটাকে গুরুদেবের আশ্রমে নিয়ে যাও তো। তাঁকে বোলো যে আমি এঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আজ রাত্রের মত ওখানে থাকবেন।

সদাশিববাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে তো কালীচরণের সঙ্গে বেরিয়ে পড়া

গেল। তখন সন্ধ্যা হোয়ে গিয়েছে। চারিদিক অন্ধকার। আকাশে কাস্তের মত একফালি চাঁদ উঠেছিল, তার আলোতে পথ দেখে আমরা এগিয়ে চলতে লাগলুম। অনেকক্ষণ হাঁটবার পর আমরা প্রকাণ্ড একটা জলার ধারে এসে পড়লুম। অপূর্ববাবু বোধ হয় এই জলাটার কথাই বলেছিলেন। জলার মধ্যে সরু-সরু রাস্তা। এই একটা রাস্তা ধরে আমরা জলার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। দু-দিকে জল যতদূর পর্য্যন্ত চোখ যায় আর কিছু নেই। মাঝে-মাঝে ছোট-খাট পাহাড়ের মত এক একটা বড় পাথর জল থেকে উঁচু হোয়ে রয়েছে। জায়গাটা যেমন নির্জ্জন তেমনি ভয়াবহ। সেই রাস্তা দিয়ে অনেকক্ষণ এঁকে-বেঁকে চলে আমরা একটা পাহাড়ের ধারে এসে পৌঁছলুম।

এইখানেই স্বামী কৃসগানন্দের আশ্রম। পাহাড়ের গায়ে গুহার মতন কোরে তিন চারটে বড় ঘর করা হয়েছে। একটা ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ধূনী জ্বলছে দেখা গেল। ধূনার সামনে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। কালাচরণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে গুরুদেব কোথায় ?

সন্ন্যাসী বল্লে—তিনি গাঁয়ের মধ্যে গিয়েছেন, ফিরতে একটু রাত্রি হবে।

এই অবধি বলে সে আমার আপাদমস্তক বেশ ভালো কোরে একবার দেখে নিলে।

কালাচরণ বল্লে—আমাদের বাবু এই ভদ্রলোকটাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সন্ন্যাসী কালাচরণের কথার কোনো জবাব না দিয়ে ধূনীতে শুকনো কাঠ দিতে লাগল। কালাচরণ আর আমি ঘরের এক কোনে গিয়ে বসলুম। কালাচরণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়ে আমাকে বল্লে—ইনি হচ্ছেন কৃসগানন্দ স্বামীর প্রধান শিষ্য। এঁর নাম যোগানন্দ।

আমরা ঘরের কোনে বসে আছি, একটু পরেই সন্ন্যাসীও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ বসে-বসে রাতও বেশী হোয়ে গেল। শেষকালে কালাচরণ বল্লে—বাবু আপনি বসুন, রাত হোয়ে যাচ্ছে এবার আমি যাই। বেশী রাত হোলে আবার যেতে পারব না। জলার ওধারে ঐ যে বড় পাহাড় দেখলেন সেখান থেকে বাঘ আসে।

এ কথার পরে আর কি কোরে তাকে আটকে রাখা যায়! একবার মনে হোলো কালীচরণের সঙ্গে ফিরে যাই, রাত্রি বেলা অপূর্ববাবুর বাড়ীতে গেলেই হবে। কিন্তু

তখুনি আবার মনে হোলো যে কাজে এসেছি হয়ত এখানে থেকে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। যখন এসে পড়েছি তখন তার শেষ পর্য্যন্ত না দেখে যাওয়া নয়। নানারকম ভেবে কালীচরণকে বল্লুম—আচ্ছা যাও তুমি, তোমাকে আর কতক্ষণ ধরে রাখ্‌ব।

কালীচরণ আমাকে নমস্কার কোরে চলে গেল। সে চলে যাবার কিছু পরেই যোগানন্দ ফিরে এসে আমার কাছে বসল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম স্বামীজির ফিরতে কি অনেক রাত্রি হবে ?

যোগানন্দ বল্লে- না, অন্য দিন তো এর আগেই ফিরে আসেন, আজ দেরী হচ্ছে কেন জানিনা।

যোগানন্দের সঙ্গে অন্য কথাবার্ত্তা হোতে লাগ্‌ল। সে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগ্‌ল। আমার বাড়ী কোথায়, কি করি, এখানে কত দিন থাক্‌ব ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন। তার প্রশ্নের ঠেলায় একেবারে বিব্রত হোয়ে পড়তে লাগ্‌লুম। চারিদিক বাঁচিয়ে কোনো রকমে হাঁ না বলে তার কথার জবাব দিয়ে যেতে লাগলুম।

যোগানন্দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চল্‌ছে এমন সময় আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে একটা গর্জ্জন শুনতে পাওয়া গেল। সে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ! শব্দটা হোতেই আমি যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—এ কিসের শব্দ ?

যোগানন্দ আম্‌তা-আম্‌তা কোরে বলতে লাগ্‌ল—জলার মধ্যে অনেক ভূত-পেত্নী বাস করে, এ তাদেরই হাঁক ডাক।

ভূত পেত্নীর কথায় আমার কোনো কালেই বিশ্বাস নেই। যোগানন্দের কথাও বিশ্বাস হোলো না। তার ওপর সে যেমন আম্‌তা-আম্‌তা কোরে কথাগুলো বল্লে তাতে মনে হোলো যেন সে আসল কথাটা চাপা দিচ্ছে। বসে বসে ভাবছি এমন সময় আবার উপরি-উপরি দুবার সেই ভীষণ গর্জ্জন শুনতে পাওয়া গেল। এবারে সেই গর্জ্জন শুনে স্পষ্ট মনে হোলো এ ডাক নিশ্চয় কোনো জানোয়ারের; অন্য প্রশ্ন না কোরে আমি যোগানন্দের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগ্‌লুম।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা চলেছে এমন সময় কৃষ্ণানন্দ স্বামী ফিরে এলেন। ইনি লম্বা-চওড়া মূর্ত্তি। মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় জটা পিঠ অবধি ঝুলে পড়েছে। গেরুয়া বসন না থাকলে ডাকাত বলে মনে হোতো। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই আমি তাকে প্রণাম করলুম। স্বামীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কে তুমি?

আমি বল্লুম—আমি ঢাকা থেকে আসছি আপনাকে দর্শন করতে।

ও আচ্ছা, বস—বলে তিনি ধুনীর পাশে গিয়ে বসলেন।

যোগানন্দ তাঁকে বল্লে—এঁকে সদাশিব বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

যোগানন্দের কথা শুনে স্বামিজী আমার দিকে কট্‌মট্ কোরে চেয়ে রইলেন। তাঁর চাউনী দেখে মনে হোতে লাগ্‌ল যেন আমার সেখানে যাওয়াটা তাঁর মোটেই পছন্দ হয়-নি। আমি একটু পরে তাঁকে বল্লুম—আমি এসেছি আপনার শিষ্য হোতে। দিন দুয়েক থেকেই চলে যাব। দয়া কোরে আমাকে আপনার শিষ্য কোরে নিন।

এই বলে পকেট থেকে একটা গিণি বের কোরে তাঁর পায়ের কাছে রেখে আবার প্রণাম কল্লুম।

গিণিটা দেখে স্বামিজীর মুখ একটু প্রফুল্ল হোলো। তিনি বল্লেন—এটা সন্ন্যাসীর আশ্রম। তোমার যতদিন ইচ্ছা থাক।

পর পর তিনি আমায় কতকগুলো প্রশ্ন করলেন। সে রাত্রে আমি আর কিছু খেলুম না। যোগানন্দ আমায় আর একটা গুহার মতন ঘর দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—তুমি এই ঘরে থাক। আর দেখ, রাত্তিরে যদি কোনো রকম আওয়াজ শুনতে পাও তো ভয় কোরো না। এখানে ও-রকম আওয়াজ প্রায়ই হোয়ে থাকে।

যোগানন্দ চলে যাওয়ার পর গুহার মুখটা বেশ কোরে বন্ধ কোরে দিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। সে রাত্রে আর কিছু শুনতে পেলুম না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি জলার মধ্যে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। অনেকক্ষণ একদিকে এগিয়ে যাবার পর একটা পাহাড়ের গায়ে দেখি কতকগুলো গুহা তৈরি করা রয়েছে। আমি সেই গুহা দেখবার জন্য ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখি যে তার মধ্যে একখানা বেশ পরিষ্কার গুপ্তঘরের মতন ঘর রয়েছে। ঘরখানা দেখেই আমি

স্থির করলুম যে আজই সন্ন্যাসীদের ওখান থেকে এইখানে চলে আসতে হবে। ঘরখানা ও তার চারপাশের জায়গাগুলো বেশ ভাল কোরে দেখে সন্ন্যাসীর আশ্রমে ফিরে এলুম। আমি ফিরতেই কৃষ্ণানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় গিয়েছিলে ?

আমি বল্লুম জায়গাটা বড় সুন্দর তাই ঘুরে ফিরে একটু দেখে বেড়াচ্ছিলুম।

কৃষ্ণানন্দ বল্লেন—একলা এখানে ঘুরে বেড়িও না। চারদিকে চোরাবালি রয়েছে, একবার সেখানে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কৃষ্ণানন্দ আমাকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরে বল্লেন—কবে শিষ্য হবে ?

আমি একটু ভেবে বল্লুম— আজ আমি একবার কুসুমপুরে যাব। তিনচার দিন পরে ফিরে এসে তখন দিন ঠিক করা যাবে।

শিষ্য হোতে কি কি করতে হবে, গুরুকে কি কি দিতে হবে কৃষ্ণানন্দ তারই একটা ফর্দ্দ আমায় দিলেন। কাল রাত্রে একটি গিণি পেয়ে তিনি যে আমায় খুব একজন বড় লোক ঠাউরেছেন তা তাঁর ফর্দ্দের বহর দেখেই বুঝতে পারা গেল।

যা হোক সকালবেলা তাঁর সঙ্গে গল্পসল্প কোরে সন্ন্যাসীর আশ্রম থেকে বেরিয়ে একটা নির্জ্জন জায়গা দেখে দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে অপূর্ব্ববাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম।

অপূর্ব্ববাবু আমাকে দেখে তো আনন্দে আটখানা! আমাকে বল্লেন—আসুন, ফটিক বাবু। কতদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হোলো। সব ভাল তো ?

অপূর্ব্ববাবুর কানে কানে বল্লুম—ফটিকবাবুর দাড়ি ছিল, আমি যতীন আপনার ছেলেবেলার বন্ধু, বাড়ী আগ্রায়।

অপূর্ব্ববাবু বেশ চালাক লোক। আমার কথা শুনে একেবার হালচাল বদলে ফেল্লেন। তিনি একেবারে আমার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ কোরে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে অপূর্ব্ববাবুদের দেওয়ানজীর সঙ্গে আলাপ হোলো। দেওয়ানজী অতি বৃদ্ধ। বয়স বোধ হয় আশী পার হোয়ে গিয়েছে। তাঁর চেহারা দেখে ও কথাবার্ত্তা শুনে তাঁকে ভালমানুষ বলেই মনে হোলো। তিনি আমাকে আগ্রা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরে বল্লেন—এখানে এখন কিছুদিন থাকা হবে তো ?

আমি বল্লুম —হাঁা থাকব বলেই তো এসেছি। কিন্তু আজই আমায় একবার যেতে হবে, এখান থেকে দুটো ষ্টেশন পরে এক জায়গায়। সেখান থেকে ফিরে এসে কদিন অপূর্ব্বর কাছে থাকব।

দুপুর বেলা অপূর্ব্ব বাবুর ঘরে তাঁকে একলা পেয়ে কাল রাত্রির সমস্ত কথা বল্লুম। অপূর্ব্ব বল্লে —হাঁা কাল রাত্রে আমি তিনবার সেই ভীষণ গর্জ্জন শুনতে পেয়েছিলুম।

আমি বল্লুম —জলার মধ্যে একটা গুহার সন্ধান পেয়েছি, আজ রাত্রে সেইখানে থেকে কিসের আওয়াজ হয় তা বের করবার চেষ্টা করব।

অপূর্ব্ব বাবু আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লেন—বলেন কি? একলা সেই জলার মধ্যে থাকবেন? যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়!

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লুম - আপনি কিছু মাত্র চিন্তিত হবেন না। বিপদের কোলেই আমরা বাস করি। বিপদ নিয়েই আমাদের কারবার। বিপদের ভয়ে চুপ কোরে বসে থাকলে আমাদের চলে না।

অপূর্ব্ব বাবু আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লেন —এ রহস্য যদি ভেদ করতে পারেন তা হোলে আপনার কাছে চিরঋণী হোয়ে থাকব যতীন বাবু।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত কোরে কাল রাত্রে যে যে ঘটনা ঘটেছিল কলকাতায় জীবানন্দ বাবুকে তা লিখে পাঠালুম। তারপরে সন্ধ্যার একটু আগে গোটা দুয়েক বড় মোমবাতি, একটা বালিশ ও একখানা বিছানার চাদর নিয়ে জলার সেই গুপ্ত গৃহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। একটা নির্জ্জন জায়গা দেখে দাড়ি-গোঁফগুলো পরে ফটিকচন্দ্র ঘোষ সেজে নিলুম। সোজা রাস্তায় না গিয়ে পাছে আমায় কেউ দেখতে পায় এই ভয়ে অনেকখানি ঘুরে সেই গুপ্ত ঘরে গিয়ে পৌঁছলুম। তারপর ঘরের মেজেটা ভাল কোরে ঝেড়ে চাদরটা পেতে একটা বাতি জ্বেলে বসলুম।

সেদিন বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জমা হচ্ছিল। সন্ধ্যার পরে একবার একটু চাঁদ উঠেছিল কিন্তু তখুনি তা মেঘে ঢেকে গিয়ে আকাশ একেবারে অন্ধকার হোয়ে গেল। বৃষ্টি হবে মনে কোরে আমি ঘরের মধ্যে বসে রইলুম। বসে বসে ঘুম আসতে লাগ্‌ল। কতক্ষণ এইভাবে আর বসে থাকা যায়! শেষকালে বালিশের নীচে রিভলভারটা রেখে আমি শুয়ে পড়লুম।

কিছুক্ষণ শুয়ে আছি। তন্দ্রায় চোখ একেবারে জড়িয়ে এসেছে এমন সময় সেই বিরাট গর্জ্জন শুনে চমকে উঠলুম। তাড়াতাড়ি বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা টেনে নিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসা গেল। বাইরে ভীষণ অন্ধকার। তবুও পাছে কেউ চিনতে পারে এজন্য অন্ধকারে মিশে থাকবার জন্য মাথা থেকে পা অবধি ঢাকা একটা কাল আংরাখা পরে নেওয়া গেল। তারপরে যে দিক থেকে শব্দটা এসেছিল সেই দিক লক্ষ্য কোরে চল্লুম। কিছুদূর চলেছি, কাছে কিংবা দূরে কিছুই দেখা যায় না। এমন সময় আবার সেই আওয়াজ! এবারে মনে হোলো আওয়াজটা যেন বিপরীত দিক থেকে এল। ফিরে তখুনি আবার সেই দিকে ছুটলুম। ছুটেছি তো ছুটেছি, মাঝে-মাঝে এক এক ঝলক বাতাস গোঁ-গোঁ কোরে জলের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। মনে হোতে লাগল যে, এখুনি ভয়ানক বৃষ্টি আসবে। আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না কোরেই চলেছি, এমন সময় আবার সেই আওয়াজ!

এবারে উপরি-উপরি দুবার সেই রকম শব্দ হোলো, আর মনে হোলো যেন জলের ভেতর থেকে আওয়াজটা এল। দেখে শুনে আমি ভড়্‌কে গেলুম! মনে হোলো একি সত্যিই ভূতের কাজ নাকি? ভাবতে-ভাবতে একদিকে চলেছি এমন সময় অনেক দূরে একটুখানি আলো দেখা গেল।

সেই আলো লক্ষ্য কোরে আমি চল্লুম। চলেছি তো চলেইছি। প্রায় আধ ঘণ্টা চলবার পর দেখলুম এক জায়গায় একটা ভাঙা ঘরের ভেতরে কতকগুলো কাঠ জ্বালিয়ে আগুন করা হয়েছে। ঘরের চারদিকে জল। কোনো দিক দিয়েই সেখানে যাবার উপায় নেই।

অনেকক্ষণ ধরে ঘরখানার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলুম এক জায়গায় সরু একটু ডাঙা রয়েছে। সেখান দিয়ে কোনো রকমে একজন লোক ঘরের মধ্যে যেতে পারে। আর দেরী করা নয় ভেবে রিভলভরটা বাগিয়ে ধরে খুব সাবধানে সেই রাস্তাটুকু পার হোয়ে ঘরের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

ঘরখানা দেখলেই মনে হয় অনেক দিনের পুরোনো সেটা। ছাদ আর দু-পাশের দুটো দেওয়াল আস্ত আছে। অন্য দেওয়াল দুটোতে বড় বড় গর্ত্ত। এরই একটা গর্ত্ত



শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

দিয়ে সেই আলো আমি দেখতে পেয়েছিলুম। আমি আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম। দেখলুম একটা লোক—মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া-ঝাকড়া, হাত পায়ের নখ যে তার কত কাল কাটা হয়নি তার ঠিকানা নেই, আগুনের সামনে গালে হাত দিয়ে চুপটি কোরে বসে আছে।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখে আবার সেই সরু রাস্তা দিয়ে ডাঙায় চলে এলুম। কে এই লোক! এর সঙ্গে অপূর্ব্ব বাবুদের কোনো রহস্য জড়িত আছে কি? এই ভীষণ জনহীন জলার মধ্যে একা একটা ভাঙা ঘরে এ রকমভাবে বসেই বা কেন? যা হোক সেদিনে আর কিছু করা হোলো না। ভাবতে ভাবতে সেই গুপ্ত ঘরে ফিরে এলুম। রাত্রে আর ঘুম এল না। বসে বসেই ভোর হোয়ে গেল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ফটো-শিকারী

বন্দুক লইয়া অনেকেই শিকার করিতে যায়, একথা তোমরা যান। বাঘ ভালুক সিংহ হাতী অনেকে অনেক কিছু বন্দুক দিয়া বনে জঙ্গলে মারিয়া আনে। আজকাল নতুন একদল শিকারী নতুন রকমে জন্তু শিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের কথাই তোমাদের বলিব। এঁরা বন্দুকধারী শিকারী নন, এঁরা ছবি তুলিবার ক্যামেরা লইয়া জন্তুদের ছবি তুলিয়া বেড়ান। তোমরা হয়ত মনে করিবে—"এ আর এমন শক্ত কি? কল টিপে দিলেই ছবি তোলা হয়ে গেল!" ব্যাপারটি আসলে কিন্তু তা নয়। ভীষণ জঙ্গল, এমন জঙ্গল যে সেখানে মাঝে মাঝে সূর্য্যের রোদ প্রবেশ করে না, তার মধ্যে প্রাণটি হাতে করিয়া এই সকল ফটো শিকারীদের ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এমন অনেক জন্তু আছে যে সামান্য পাতা পড়ার শব্দ পাইলেই তাহারা ভোঁ দৌড় দেয়। বাঘ সিংহ ইত্যাদির ছবি দিনের বেলায় তোলা এক রকম অসম্ভব বলিয়া তাহা রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ খুব জোরালো আলো জ্বালিয়া ছবি তুলিতে হয়।

এই সময় বাঘ হয়ত জল খাইতে আসিয়াছে, অথবা শিকার সন্ধানে বাহির হইয়াছে। যে ফটো তুলিবে, তাহার সঙ্গে একজন বন্দুক লইয়া তৈয়ার থাকে—কি জানি বাঘ বা সিংহ হঠাৎ যদি আক্রমন করে তবে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে।

এই রকম করিয়া ছবি তোলা অপেক্ষা দূর হইতে গুলি করিয়া জন্তু মারা ঢের সহজ। কারণ তাহাতে শিকারীর প্রাণের ভয় ঢের কম। আজকাল আফ্রিকাতে অনেকে এই রকম করিয়া ছবি তুলিবার জন্য যাইতেছে। চিড়িয়াখানার খাঁচার বদ্ধ জন্তুদের অপেক্ষা জন্তুদের স্বাধীন অবস্থার ছবি অনেক ভাল এবং স্বাভাবিক হইবারই কথা। কিন্তু এই প্রকার ছবি তুলিয়া আনার বিপদ এবং ভয়ও ভয়ানক বেশী।

জঙ্গলের মধ্যে হাতীদের ছবি তোলা একটি অসম্ভব কাজ বলিলেই হয়। হাতী যদি কোনো রকমে জানিতে পারে, যে, কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে তবে সে আর সে মুলুকে থাকিবে না। পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড শরীর ভীষন বেগে অথচ কোনো প্রকার শব্দ না করিয়া পলায়ন করিবে। অনেক সময় ফটোগ্রাফার হয়ত সব ঠিকঠাক করিয়া ছবি তুলিবার কল টিপিতে যাইবে—মুখ তুলিয়া দেখিল হাতী অদৃশ্য হইয়াছে! এক মিনিট আগে হাতী ছিল, এক মিনিট পরে সেই হাতী কোথায় গেল তাহা কেহ বলিতে পারিবে না। হাতীদের শ্রবনশক্তিও যেমনি প্রখর—ঘ্রাণশক্তিও তেমনি। ঘ্রাণশক্তি যেন আরও বেশী প্রখর বলিয়া মনে হয়। এক মাইল দূরে লোক থাকিলে হাতী তাহা টের পায়। তবে হাওয়া উল্টা দিকে থাকিলে সব সময় বুঝিতে পারে না। কোনো রকম সন্দেহ হইলে হাতী ক্রমাগত শুঁড় আকাশের দিকে তুলিয়া তুলিয়া গন্ধ পাইবার চেষ্টা করে। মানুষের গন্ধ পাইলে হাতী পলায়ন করে, অনেক সময় আবার শত্রুকে নিকটে দেখিলে আক্রমণও করে। হাতীর আক্রমণ বড় ভয়ানক। হাতীর দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষাকৃত কম। ফটোগ্রাফার যদি কোনো রকম শব্দ, এমন কি পাতা নড়ারও নয়, না করিয়া হাতীর একেবারে সামনে ক্যামেরা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে হাতী অনেক সময় কিছুই বুঝিতে পারে না। অবশ্য এই সময় হাওয়া হাতীর দিক হইতে ফটোগ্রাফারের দিকে থাকা

চাই। হাতীর ছবি তুলিতে হইলে সকল সময় হাওয়ার গতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এমন অনেক সময় হইয়াছে যে ক্যামেরার সামান্য কট্ করিয়া শব্দ হইবার সঙ্গে সঙ্গে হাতী তাহার দুই কান খাড়া করিয়া শুঁড় আকাশের দিকে করিয়া দেয়। হাতীর এই অবস্থা দেখিলে বুঝিতে হইবে হাতী শত্রুর সন্ধান খোঁজ করিতেছে। ইহা আক্রমণ করিবার পূর্ব্ব লক্ষণ।

আমরা ভারতবর্ষে যে রকম হাতী দেখি, আফ্রিকার হাতী তাহা অপেক্ষা অনেক



হিপপটেমাস

বড়। আফ্রিকার জঙ্গলে মাঝে মাঝে এমন হাতী দেখা যায় যার উচ্চতা ১২ ফিট। ইহাদের দাঁতও খুব বড় হয়। ১১ ফুট ৫½ ইঞ্চি দাঁতও দেখা গিয়াছে। এক একটি দাঁতের ওজনও দেড় মন দু মনের কম হয় না। শরীরের তুলনায় হাতীর বুদ্ধি অত্যন্ত কম। এমন কি হাতীকে বুদ্ধিহীন বলিলেও চলে। ভারতবর্ষের এবং আফ্রিকার হাতীদের আরও অনেক বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের দেশের হাতীরা রোদ সহ্য

করিতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্ব আফ্রিকার হাতীরা প্রায় সারাদিন রোদের দিকে পিঠ পাতিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। শুইয়াও থাকে;

আফ্রিকার হাতী এক সময় অগন্য ছিল। সিংহ ভাল্লুক ইত্যাদি জন্তুও তাই ছিল। কিন্তু শিকারীদের পাল্লায় পড়িয়া ইহাদের সংখ্যা ক্রমশ কম হইয়া আসিতেছে। কয়েক রকমের জন্তু প্রায় লোপ পাইবার অবস্থা। গণ্ডার হাতী, হিপপটেমাস, জিরাফ ইত্যাদি জন্তুদের সংখ্যা যেমন ভাবে দিন দিন কমিয়া আসিতেছে তাহাতে একদিন এই সকল জন্তুর আর কোনো চিহ্নই থাকিবে না। ৩০০ বছর পরের লোকেরা এই সকল জন্তুদের নাম হয়ত বইএ পড়িবে কিন্তু চোখে আর দেখিতে পাইবে না। তখনকার লোকেরা আমাদের তোলা ছবি দেখিয়া বুঝিতে পারিবে কোন জন্তু কেমন



জিরাফ

ছিল। পুরাকালের অতিকায় জন্তুদের কোনো ছবি নাই। আমরা তাহা আন্দাজে কল্পনা করিয়া লই।

জিরাফের ছবি তোলাও ভয়ানক শক্ত। মানুষ বা অপরিচিত কিছু দেখিতে পাইলেই ইহারা দৌড় দেয়। একবার একটি জিরাফের পিছন পিছন মোটর দৌড় করাইয়া, মোটর যখন জিরাফের পাশে পাশে চলিতেছে, তখন তাহার ছবি তোলা হয়।


ক্যামেরার সামনে সিংহী

মোটর এই সময় ঘন্টায় ৩০ মাইলেরও বেশী জোরে দৌড়াইতেছিল। জিরাফও তাই। ছবি তুলিবার পরেই গাড়ীখানি একটা গর্তে পড়িয়া একেবারে চুরমার হইয়া যায়। কিন্তু লোকজন এবং ক্যামেরা আশ্চর্য্য রকমে বাঁচিয়া যায়। জিরাফ অত্যন্ত নিরীহ জন্তু, ঘাস পাতা খাইয়া জীবনযাপন করে, কিন্তু ইহাদের উপরেই শিকারীদের অত্যাচার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। জিরাফ ১৮ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বড় বড় ঝোপঝাপের উপরের পাতা ইহারা অনায়াসেই খাইতে পারে। কিন্তু জল খাইবার সময় ইহাদের বড় বিপদে পড়িতে হয়। ঘাড় যথেষ্ট লম্বা হইলে কি হয়, ইহাদের পা আরো ভয়ানক লম্বা। জল পান করিবার সময় ইহারা সামনের দুই পা দুপাশে ঝাঁকানি দিয়া দিয়া ফাঁক করিয়া দিয়া তারপর

গলা বাড়াইয়া জল পান করে। "ওকাপি" বলিয়া এক প্রকার জন্তু আছে, তাহারা খানিকটা জিরাফের মত। কিন্তু এই জন্তু অত্যন্ত দুর্লভ। আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে বাস করে। মানুষ দূরের কথা, সেখানে রোদও প্রবেশ করিতে পারে না।



গণ্ডার

হিপপটোমাস স্বাধীন অবস্থায় বেশীর ভাগ সময় জলেই থাকে। সেই জন্য ইহার ছবি তোলার সুযোগ ফটোগ্রাফওয়ালা বড় সহজে পায় না। কয়েকটি হিপপটোমাসের ছবি ডাঙ্গার উপরে তোলা হয়। প্রায়-শুকনো নদীতেও হিপপটোমাসের ছবি তুলবার সুযোগ হঠাৎ পাওয়া যায়। হিপপটোমাস দেখিতে অত্যন্ত কদাকার কিন্তু স্বাধীন অবস্থায় ইহাকে প্রায়-দেখিতে ভালো মনে হয়। বন্দী অবস্থায় ইহারা প্রচুর পরিমাণে খাইতে পায় কিন্তু কোনো প্রকার খাটুনি নাই, সেই জন্যই বোধ হয় ইহাদের শরীর মোটা হইয়া যায় এবং ভুঁড়িও হয়। মানুষের যেমন হয় আর কি। জঙ্গলী অবস্থায় কিন্তু হিপোকে খাদ্য পাইবার জন্য বেশ কষ্ট করিতে হয়, এমন কি অনেক সময় বাসা ছাড়িয়া অনেক দূরেও যাইতে হয়। সকল সময় প্রচুর খাদ্য পায় না। এই কারণে জঙ্গলী হিপোর শরীর বেশী মোটা হয় না— ভুঁড়িও গজায় না

অনেক দিন আগে আফ্রিকার সব খানেই হিপো খুব বেশী দেখা যাইত, এখন কিছু কমিয়াছে। সভ্যতা যত বাড়িয়া চলিয়াছে এই সকল জন্তুদের সংখ্যাও তত কমিয়া চলিয়াছে। পশ্চিম আফ্রিকার প্রান্তে লিবেরিয়া নামক স্থানে এক প্রকার বামন-হিপো দেখা যায়। ইহারা শুকরের মত দেখিতে।

হিপপটোমাস এমনি বেশ শান্ত এবং নিরীহ- কিন্তু ক্ষেপিয়া গেলে জলের নৌকা উল্টাইয়া লোকজন মারিতে কসুর করে না। বন্দুকের গুলি খাইয়া হিপো জলের তলায় ডুব মারে ঘণ্টা কয়েক পরে মরা অবস্থায় ভাসিয়া উঠে। অসভ্য জাতিদের অনেকে খুব মজা করিয়া হিপো মাংস খাইয়া থাকে।

এই খানে যে সকল ছবি দেওয়া হইল তা সব মরিয়াস মাক্সয়েল নামক একজন সাহেব ইস্ট-আফ্রিকাতে তোলেন। অনেক সময় এই সকল ছবি তুলিবার জন্য তাঁর প্রাণ যাবার মত হইয়াছিল। দিনের পর দিন শুধু একটি বিশেষ জন্তুর ছবি তুলিবার জন্য তিনি প্রায় অনাহারে ভীষণ জঙ্গলে যাপন করিয়াছেন। এই ছবি ছাড়া ঐ সাহেব আরো অনেক জন্তুর ছবি তুলিয়াছেন।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

কাদুলা

(১)

এক বুড়ো আর বুড়ী, তাদের না ছিল কি? ঘর বাড়ী ক্ষেত খামার সব ছিল, ছিলনা কেবল একটিও ছেলেমেয়ে।

একদিন—তখন সারা দিনের পর বৃষ্টি পড়া থেমেছে, বুড়ী তাদের ঘরের দাওয়ায় বসে চরকা কাটছে আর দেখছে পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে কাদা মাটি নিয়ে কেউ শিব গড়ছে, কেউ বা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে রাস্তার ধারে খেলা জুড়েছে। এমন সময় তার স্বামী বুড়ো কাঠ কেটে এনে ধপ্ করে কাঠের বোঝা উঠানের মাঝে ফেলে পা ধুতে চল্লো। বুড়ী তাড়াতাড়ি উঠে বুড়োকে বল্লে—"ওগো, আজ আমার বড্ড খেলা

করতে ইচ্ছে করছে, কেন বল দেখি ? চল আমরা হু'জনে ওই ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কাদার পুতুল গড়ে খেলি গে।"

বুড়ো হো হো ক'রে হেসে বল্লে—"দূর, আমরা কি কচি খোকাখুকী যে মাটীর পুতুল নিয়ে খেলা ক'রব ?"

কিন্তু বুড়ী তাতে মোটেই কান দিলে না—সে গিয়ে কাদার পুতুল গড়তে চোলে গেল।

বুড়ো বল্লে—"যদি খেলতেই হয় তো রাস্তা ছেড়ে ওই ওপারে চল—সেখানে কেউ নেই। এমন ক'রে লোক হাসান কেন ?"

যেতে যেতে হু'জনে দেখে ষষ্ঠীতলায় বৃষ্টির জলে মাটী কাদা হয়েছে। বুড়ী বসে গেল সেখানে কাদার পুতুল গড়তে। বুড়ো এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে লাগল—কেউ এসে পড়ে কি না।

এদিকে বুড়ী গড়তে গড়তে বেশ একটা বেনে খোপা বাঁধা ছোট্ট খুকী পুতুল গড়ে ফেলেছে আর অমনি সেটি উঠেছে খিল-খিল ক'রে হেসে আর হাত পা নেড়ে নানা রকম কথা বলতে লেগেছে। বুড়ী খুব আশ্চর্য্য হয়ে চেঁচিয়ে বুড়োকে ডেকে বল্লে—"ওগো দেখ'সে পুতুলটা যে বেঁচে উঠলো।"

বুড়ো কাছে আসতেই মেয়েটি "বাবা" বলে ঝাঁপিয়ে বুড়োর কোলে উঠে বসলো। বুড়োবুড়ীর আহ্লাদ ধরে না। ভাবলে ষষ্ঠী ঠাকরুণ বুঝি এতদিনে তাদের উপর কৃপা করলেন। তারা মা ষষ্ঠীকে গড় করে মেয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরল। কাদার মেয়ে—নাম হল "কাদুলী"।

মেয়ে হয়েছে—বুড়ী পাড়ায়-পাড়ায় সেটা জানিয়ে আনন্দ-নাড়ু গড়তে বসে গেল। আর বুড়ো গেল গাঁয়ের যত ছেলেমেয়েদের নেমন্তন্ন করতে আর বাজনদারদের বায়না দিতে। বুড়ো বুড়ীর ঘরে ধুমধাম বেধে গেল।

কাদুলী এসেই পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে খেলা জুড়ে দিলে। কাদুলী কাদা দিয়ে ছোট্ট-ছোট্ট মাটির ঘর-বাড়ী গড়ে, হাতী গড়ে, ঘোড়া গড়ে, রাজা গড়ে, রাণী গড়ে, যা গড়ে তা সত্যি হয়ে ওঠে। নদী গড়ে তো তাতে জল বয়, পাহাড়

গড়ে তো তাতে গাছ গজায়, ঘর গড়ে তো তাতে মানুষ যাওয়া আসা করে, খাঁচ' গড়ে তো তাতে শোলার পাখী সত্যি সত্যি গান গায়। এই রকম নানা খেলাতে খুব আমোদে দিন যাচ্ছে, এমন সময় বর্ষা কাল শেষ হল। মেঘ আর জল দেয় না, মাটি আর কাদা হয় না। খেলা বন্ধ হল—জলে কাদায়। ওদিকে কাদুলী—সেও দিন দিন শুকোতে আরম্ভ করলে। সে আর খেলে না, বাড়ী থেকে বার হয় না। ছেলেরা খেলতে ডাকলে বলে—"কি নিয়ে খেলবো, কাদা নেই যে।"

(২)

বর্ষাকাল একেবারে চলে গেছে। মাঠ ঘাট রোদে আলো হয়ে উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। সূয্যের তাপে সব কাদা শুকিয়ে গেল। চারিদিকে ফল ফুল দেখা দিলে।

এই সময় একদিন কাদুলীর মা বুড়ী দাওয়ায় বসে চরকা কাটছে, এমন সময় সেই আর এক দিনের মত বুড়ো কাঠের বোঝা মাথা থেকে নামিয়ে উঠানের মাঝে ফেল্লে। বুড়ো কাদুলীকে ডাকলে। কাদুলী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বুড়ো দেখলে সে কাদুলী আর নেই—শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে।

বুড়ো বল্লে—"যা খেলা কর গে।"

কাদুলী বল্লে—"কাদা নেই খেলব কি নিয়ে ?"

বুড়ো বল্লে—"নাই বা রইল কাদা। চল্ কত ফুল ফুটেছে দেখবি চল্!"

এই বলে বুড়ো-বুড়ী কাদুলীকে কোলে ক'রে বেড়াতে বেরুল। যেতে যেতে কাদুলী যেন কেমন কেমন কর্‌তে লাগল। বুড়ো ভাবলে তার শীত করছে, সে তার দোলাইটা মেয়ের গায়ে ভাল করে জড়িয়ে দিলে। তারপর বুড়োবুড়ী সেই ষষ্ঠী তলায় এসে উপস্থিত হল।

সেই খানে গাছের ফাঁক দিয়ে সূয্যের তেজ কাদুলীর গায়ে লাগলো। বুড়োবুড়ী অবাক হয়ে দেখতে লাগল—তাদের বড় আদরের কাদুলী ক্রমে ক্রমে শুকোতে শুকোতে মাটিতে পাত হয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর আর তাকে দেখা গেল না। ঠিক সেই সময় গাছের তলায় যেখানে কাদুলী ছিল সেখানে একটি ঘাসের ডগায় হলদে ফুল দেখা দিলে। ঠিক যেন সবুজ সাড়ী পরা সোনামুখী মেয়েটি! ফুলে শিশির পড়ছে—যেন কার চোখের পাতা জলে ভিজেছে! বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে সেই ফুলটি তুলে বুড়ীর হাতে দিলে। ষষ্ঠীতলায় দু'জনের চোখের জলের বান এলো।

শ্রীমতী সুরূপা ঠাকুর

— —

চমৎকার

(গল্প)

ও পাড়ার তেজু হালদার ! দু-একটা কথা যা বলে—ভারী ঠিক ! পাশের ঘরে ছেলেরা বসে পড়ছিল, —ক্লাশের পড়া—তারা চেঁচিয়েই পড়ছিল,—

প্রখর রবির তেজ শিরে সহ্য হয় হে
তার তাপে বালু তাপে, কভু সহ্য নয় রে !

তেজু বললে,—তপ্ত বালিও সহ্য হয়, কিন্তু তার চেয়েও অসহ্য লাগে কি, বলো তো ...

আমি আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম .....

তেজু হেসে বললে,—বড় লোকের বচনও সহ্য হয়, কিন্তু তার মোসাহেব বা তার টাকায় ভুঁড়ি-উঁচু আর পাঁচজন আশ-পাশ থেকে যে-সব আস্ফালন করে সে ভাই দস্তুর মত অসহ্য ! আবার তার চাইতেও অসহ্য—চালিয়াতের চালদার গল্প !

আমার তারিফ শোনার আগেই তেজু বললে,—শোনো তাহলে এক মজার কথা বলি, সে একেবারে চমৎকার !

হাতে কোন কাজ ছিল না, সন্ধ্যা হয়েছে, আকাশে প্রচণ্ড কালো মেঘ জমে যেন প্রলয়ের কালো নিশান উড়িয়ে দেছে—সে সিগ্‌ন্যাল্ দেখে বাড়ীর বার হওয়া শুধু গোঁয়ার্তুমি ! বন্ধুরা কেউ আসে নি ; শুধু তেজু আর আমি। আমি ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে জল চড়িয়ে দিচ্ছি গরম করবার জন্য—সেই জলে দু' পেয়ালা চা বানিয়ে দু'জনে পান করবো...বললুম,—বল, শুনি।

তেজু বললে, —ম্যাট্রিক দেবার পর শ্যামবাজারে মামার বাড়ী গিয়ে কিছুদিন থাকতে হলো। সেখানে পিণ্টু মাসীর বিয়ে। বিয়েয় বিস্তর আত্মীয়-কুটুম্ব জড়ো হয়েছিল— এই দলে এসে জমেছিল, দাশুদা। দাশুদা কি রকম দূর সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। থাকে জয়পুর, নয়, রাওয়ালপিণ্ডী—এমনি দূরের কোন্ সহরে ! দাশুদার বাবা আসেননি

—তিনি নাকি সেখানকার মস্ত কন্ট্রাকটার—দেদার পয়সা তাঁর। দাশুদাও হাতী চড়ে, উটে চড়ে বহু পাহাড়, বিস্তর মরুভূমি পার হয়েছে। এমনি সব গল্পে আমাদের দলের সকলের তাক তো সে লাগিয়ে দিলেই; তাছাড়া গুরুজনদের দলেও এমন সব রাজা-মহারাজার কথা পেড়ে বসতো যে শুনলে অবাক হতে হয়! আমরা অবাক হয়ে ভাবতুম, দাশুদার জীবনই সার্থক সার্থক সে জন্মেছিল। তার উপর এই কলিকাতা সহরটার উপর রাগ ধরে গেছলো। কি ছাই মোটর আর ইলেক্ট্রিক ট্রাম একটা হাতীতে চড়বার উপায় নেই! উট? মৌচাকের পাতায় উটের ছবিই দেখেছি! পাহাড় মরুভূমি—জিয়োগ্রাফিতেই তাদের নাম শুনেছি, আর ম্যাপে কালির হিজিবিজি থাকলেই বুঝেছি ঐগুলো পাহাড়!

বাইসিক্ল? দাশুদা বললে—আরে রামচন্দ্র, বাইসিক্লে চড়তে আমার কোনো কালে সাধ হয় না! চ দিকিনি আমাদের ওখানে...আমাদের বাড়ীর পাসে এক সাহেব থাকে—একেবারে আনকোরা জার্ম্মাণির সাহেব—তার একটা এরোপ্লেন আছে। সেই এরোপ্লেনে চড়ে আমরা চায়না চলে গেছলুম! বেলা তখন আটটা কি ন'টা বাজে,—সাহেব বললে,—Well Dasu, এরোপ্লেন চড়বে? আমি বললুম,—চড়বো। ব্যস, চড়ে বসলুম—হুস্ করে সাহেব চালিয়ে দিলে। একেবারে দেখতে দেখতে পঞ্জাব, কাশ্মীর ছাড়িয়ে, হিমালয় পর্ব্বত পার হয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে হাজির হলুম চায়নায়! গ্রেট্ ওয়াল অফ চায়না, পড়েছিস তো? সেই গ্রেট্ ওয়াল অফ চায়না একটা উইয়ের ঢিপির মত দেখাচ্ছিল। আমি বুঝতে পারিনি।

সাহেব বললে—ওই ঢিপিগুলো কি, বলতো?

আমরা বাধা দিয়ে বলে উঠলুম,—ঢিপি বললে সাহেব?

দাশুদা বললে,—ঢিপি বলেনি, সাহেব বললে, টিপ্পু। ঢিপিকে জার্ম্মাণরা বলে, টিপ্পু। আমি বললুম,—না, কি ও? সাহেব তখন বলে দিলে ওই হলো গ্রেট ওয়াল অফ চায়না। শুনে আমার ভয় হলো, ওরে বাবা, বাড়ীতে না বলে এসেছি, একেবারে চায়নায়! ফিরতে কত দেরী হবে! নীচের দিকে চেয়ে দেখি—পিকিনের রাজবাড়ী; চীনেম্যান পাহারা দিচ্ছে, আর চীনা সেনাদের প্যারেড চলেছে। আর এক জায়গায়

দেখি, মস্ত মাঠ,—আর সেই মাঠে হোগলার চালা বেঁধে প্রায় বিশ হাজার চানেম্যান জুতো সেলাই করছে! সাহেব আমায় বললে,—চান দেখলে, রুশিয়া দেখবে? আমি বললুম,—আজ থাক, বাড়ীতে বলে আসিনি! তখন সাহেব এরোপ্লেন ঘুরিয়ে বাড়ী ফিরে এলো! বেলা তখন সাড়ে দশটা। আমি যে একেবারে ইণ্ডিয়া ছেড়ে চায়না গেছলুম, তা কে বলবে! ভাব দিকিনি, কোথায় ইণ্ডিয়া, আর কোথায় চায়না—খেয়ে দেয়ে আমি দিব্যি কলেজে গেলুম!...

আমরা অবাক! চায়নার গল্প শুনে অবাক নয়—দাশুদার আজগুবি গল্পের দৌড় দেখে অবাক! বাবাঃ, দাশুদার কাছে সেই চালিয়াৎ চন্দরও হার মানে! কিন্তু তর্ক চলে না—মামার বাড়ীতে দাশুদার ভারী খাতির! একে তো তারা বরাবর বিদেশে থাকে—তার উপর তার বাবার নাকি ঢের পয়সা আছে। রাজা-উজীরের কথা ছাড়া কথাই কয় না! মামা সেদিন কি একখানা গহনা দেখাচ্ছিলেন মেয়েদের, দাশুদা বলে উঠলো, এ ভালো নয় মামা,—গহনা দেখেছিলুম সেবার সমরখন্দের রাজার গায়ে—সমরখন্দের রাজা যেবার বরোদার দরবারে আসে......

মামা মুখে কিছু বললে না বটে, কিন্তু যে-ভাবে দাশুদার দিকে তাকালে, তাতে অবিশ্বাস মাখানো!...

যাক, দাশুদা গল্পের জোরে একেবারে তুক্কব হয়ে উঠলো! রাগে আমাদের গা জ্বলে উঠতো—কিন্তু ম্যাপে ছাড়া ইউ-পি, পাঞ্জাব, চায়না, কাশ্মীর তো দেখিনি, কাজেই কি তর্ক তুলবো! বিয়ে চুকে গেলে একদিন খুব বৃষ্টি হয়ে কলকাতার রাস্তা নদী হয়ে দাঁড়ালো, তখন ভুলু ক'খানা বাঁশ বেঁধে ভেলা করে জলে ভাসাচ্ছে দেখে আমরা আমোদ পেয়ে মহা হৈ চৈ বাধিয়ে তুললুম। ভুলু বলে উঠলো—পথে নদী দেখেচো, দাশুদা? দাশুদা মুখখানা বেঁকিয়ে বলে উঠলো,—হুঁঃ, কি এ! সেবার দিল্লীতে একজিবিশন দেখতে গেছলুম—হঠাৎ রাত্রে যমুনা এমন ফেঁপে উঠলো যে জল বেড়ে ঘর-বাড়ী ডুবে সব একশা—আমি তখন কুতুব মিনারে গেছলুম—কুতুব থেকে ঝাঁপ খেয়ে সাঁতরে একদম আগ্রার তাজমহলের চূড়ায়!

ভুলু বললে,—চালাকির কথা, অত খানি সাঁতরে! যা বলেছে! হাত পা [illegible] যাবে না!

দাশুদা বললে,—সে কি টান্ যমুনার! আমি খালি জলের উপর শুয়ে রইলুম, টানে ভেসে ঘণ্টা তুয়েকের মধ্যে একেবারে আগ্রায়! এ তো আশ্চর্য নয়—তোমরা যদি যমুনা দেখতে তো বলতে, এ আর আশ্চর্য কি!...থাকো সকলে এই লক্ষ্মীছাড়া সহরে—যমুনার কি জানবে?

ভুলু বললে,—আচ্ছা, চল্তো গঙ্গা নাইতে এক দিন! কেমন সাঁতার কাটো, দেখি......

দাশুদা বললে,—গঙ্গা ভালো নদী নয়, জলে অনেক রোগের ব্যাসিলি আছে। যমুনার জল চমৎকার! কালো জল সাধে কি যমুনার ধারে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাতেন!

কোথাকার কথা কোথায়! ওস্তাদ ছেলে বটে!

তার এই সব গল্পের জ্বালায় আমারা আড়ালে বসে কেবলি জল্পনা করতুম,—একটা এমন কিছু ঘটানো যায়...যাতে দাশুদার সব দর্প চূর্ণ হয়!...কিন্তু কি করে... সে কি করে?...

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো!...

বাড়ীতে মামীমারা মাসিমারা সকলে বললেন—নবদ্বীপ দেখতে গেলে হয়! সঙ্গে কে যাবে? মামারা তো যাবেন না!...

বড় মাসিমা বললেন দাশু খুব চৌখোস চালাক ছেলে, ট্রেনে যেতে হলে ওকেই নিতে হয়!

দাশুদা বললে,—অল্ রাইট!

তাই ঠিক হলো। ই-আই-আর-এর টাইম টেবল্ ঘেঁটে স্থির হলো সকালে সাড়ে ছ'টার ট্রেনে চড়ে বেলা সাড়ে দশটায় নবদ্বীপে পৌঁছুবো—তারপর সারাদিন সেখানে ঠাকুর-টাকুর দেখে রোদ পড়লে সন্ধ্যা ছটায় নবদ্বীপ ছেড়ে রাত্র সাড়ে ন'টায় এসে হাবড়ায় পৌঁছুবো। নবদ্বীপে চড়িভাতি করে খাওয়া দাওয়া! আমরা যাবো, আর দলের গাইড হয়ে যাবে দাশুদা!

যাবার দিন দাশুদার যা ভাব হলো—ওঃ, নড়তে চড়তে আমাদের খালি হুকুম করে! একজন চাকর সঙ্গে চললো। মোট হলো মন্দ নয়—প্রাইমাস্ ষ্টোভ, এলুমিনিয়মের হাঁড়ি ডেকচি,—তাছাড়া চাল ডাল ঘী আনাজ তরকারী!...

মামিমা-মাসিমারা আর আমরা—দলে সবশুদ্ধ চৌদ্দ জন, তার উপর একটা চাকর! দাশুদা টিকিট কিনতে হিম্‌শিম্ খেয়ে গেল! কোথায় টিকিট নিতে হয়, জানে না—ইণ্টার ক্লাসের টিকিট! চোদ্দখানা ইণ্টার আর চাকরের একটা থার্ড ক্লাস। ইণ্টারের টিকিট এক টাকা বারো আনা করে, আর থার্ড ক্লাস টিকিট এক টাকা পনেরো পয়সা। তিনখানা দশ টাকার নোট নিয়ে দাশুদা একবার এদিক একবার ওদিক করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা বললুম,—আমরা প্লাটফর্ম্মে যাই! দাশুদা বললে,—না, খবর্দ্দার! শেষে হারিয়ে যাবি!...


দাশুর চাঞ্চল্য যাত্রা

আমরা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে আছি,—ট্রেন ছাড়বে ৬টা ৩০ মিনিটে—ষ্টাণ্ডার্ড টাইম। বড় ঘড়ির পানে চেয়ে চেয়ে দেখছি কোথায় দাশুদা? ঘড়ির বড় কাঁটা বারোটার ঘর ছাড়িয়ে ১, ২, ৩ পার হয়ে গেল; দাশুদার দেখা নেই! বড় মাসিমা বললেন,—ওরে, দাশু গেল কোথায়? ট্রেন ফেল করবে না তো? আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি...দাশুদার মা বললেন,—কিছু ভাবিস্‌নে বৌ, সে ঠিক আসবে! বলে, দাশু হিল্লী দিল্লী মক্কা করে বেড়াচ্ছে, আর এ তো নবদ্বীপ!

আমরা মনে মনে বলছি, হে ঠাকুর, দাও এবার দাশুদার দর্প চূর্ণ করে। যাক্ ট্রেন ফেল হয়ে...না হয় নাই গেলুম নবদ্বীপ! ভুলু বলে উঠলো,—দর্পহারী মধুসূদন, তুমি যদি থাকো তো এ দর্প চূর্ণ কর!...

প্লাটফর্ম্মে খুব ভিড়!...হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে কে বলে উঠলো—কি রে তোরা... ফিরে দেখি, মামার এক বন্ধু গোপেশবাবু, ইনি ই-আই-আর এ চাকরি করেন।

ভুলু বললে, ব্যাপার খুলে! তিনি বললেন —আচ্ছা, আয়, তোদের বসিয়ে দিয়ে আসি। টিকিট আনতে গেছে যে, সে আসবেখ'ন...

কিন্তু তাকে কে চিনবে? সে যদি টিকিট এনে আমাদের খোঁজে?

গোপেশবাবু বললেন,—ভুলু নয় এখানে দাঁড়াক্...

তাই হলো!

আমরা ট্রেনে গিয়ে উঠলুম...মাসিমারা অস্থির হয়ে উঠছেন...কোথায় দাশু!...

ট্রেন ছাড়তে তিন মিনিট আর বাকী...তখন আমরাও ভাবিত হয়ে উঠেছি.. দাশুদার জন্য নয়; বিনা-টিকিটে ট্রেনে যাচ্ছি বলে যদি ধরে পুলিশে দেয়, এই ভয়ে...এমন সময় ভুলুর হাত ধরে টানতে টানতে দাশুদা এসে হাজির—গলদ-ঘর্ম্ম। পাঞ্জাবির হাতটা ফেঁশে গেছে, নিশেনের মত উড়ছে! কপালের কাছে একটা ছড়া দাগ, রক্ত পড়ছে, নাকটা ফুলে উঠেছে ...



গাড়ীতে এসে সে বসলো! আমরা সকলে এক কামরাতেই বসেছিলুম। বড় মাসিমা বললেন,—এ কি হয়েছে রে দাশু?

দাশুদা বললে,—এই জন্যেই তো তোমাদের বাঙলা দেশ পছন্দ করি না। এত বড় ষ্টেশন তার কোথাও যদি বন্দোবস্ত ভালো থাকে! টিকিট-ঘরের দশটা ফোকর—এ ফোকরে যাই, টিকিট চাই, বলে,—নবদ্বীপের টিকিট এ দোরে নয়, ও দোরে! এমনি ঘুরে টিকিট নেবার জন্য টাকা দিলুম...পিছন থেকে কি ভিড়, কি ধাক্কা! চেঞ্জ গেল ছিটকে পড়ে...তুলতে গিয়ে একটা খোঁড়ায় লাঠির গুঁতো লাগলো নাকে...তারপর পয়সাও গেল কতক হারিয়ে... রাম বল!

ট্রেন ছাড়লো। দাশুদা হিসেব বলতে লাগলো,— চোদ্দ খানা টিকিট এক

টাকা বারো আনা করে .. তা হলে চোদ্দ ইনটু এক টাকা বারো আনা হলো গিয়ে .. আমরাও অঙ্ক কষতে সুরু করলুম,—চোদ্দখানা ইণ্টার টিকিট চব্বিশ টাকা আট আনা আর একখানা থার্ড ক্লাশ এক টাকা পনের পয়সা—সব শুদ্ধ পঁচিশ টাকা এগারো আনা তিন পয়সা। ত্রিশ টাকা থেকে পঁচিশ টাকা এগারো আনা তিন পয়সা বাদ গেলে বাকী থাকে চার টাকা চার আনা এক পয়সা। দাশুদা পকেট ঝেড়ে সিকি-আধুলি টাকা-পয়সা জড়ো করে গুণে দেখে, আছে মোটে এক টাকা দু আনা দু'পয়সা! বাকী... ?

ভুলু বললে,—ক'খানা টিকিট কিনতে তিন টাকা হরির লুট দিয়ে এলে দাশুদা ?

দাশুদা চুপ...কপালের শিরগুলো ফুলে উঠেছে...বড় মাসিমা বললেন,—যাকগে পয়সা, ও যে প্রাণ নিয়ে ফিরেছে এই ঢের—

দাশুদা বললে, ছ্যা ছ্যা ছ্যা—এ কি ষ্টেশন! কোনো রকম বন্দোবস্ত নেই! হতো যদি আমাদের প্রতাপগড় ষ্টেশন...ওঃ ষ্টেশন-মাষ্টার নিজের ঘরে চেয়ার দিয়ে বসিয়ে টিকিট দেয়...

যাক, ট্রেন তো চলতে সুরু হলো। আমরা বললুম,—এই ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে থাকবে দাশুদা ?

দাশুদা বললে,—অন্যায় হয়েছে। খাকী সার্ট আর হাফ প্যাণ্ট হলো রেলোয়ে জার্নির একমাত্র যোগ্য পোষাক। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে কি মানুষ ট্রেনে যায়!...

ট্রেন চললো! দাশুদা দারুণ অস্বস্তি জানাতে লাগলো, এক পেয়ালা চায়ের জন্য! বড় মাসিমা বললেন,—তোমার যে দেরী হলো বাবা, নাহলে হাবড়া ষ্টেশনে খেলে না কেন!...

দাশুদার মা বললেন—কি যে বদ রোগ ধরেছে—চা না হলে ওর জুৎ আসে না শরীরে।

ভুলু বললে,—ব্যাণ্ডেলে চা খেয়ো, দাশুদা...গাড়ী থামে অনেকক্ষণ...৮-১৮য় ব্যাণ্ডেল।

চন্দননগর ছাড়তেই দাশুদা বললে—টাইম-টেবলটা দেখি...

দিলুম। দেখে দাশুদা বললে, —ঠিক হয়েছে। ওখানে প্রায় পনেরো মিনিট ট্রেন থামবে! চা খেয়ে নেবো!

আমরা এক সঙ্গে বলে উঠলুম,—ঐ ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে যাবে?

দাশুদা জামা ঝেড়ে বললে, —গেঞ্জি গায়ে দিয়েই যাবো—তাতে কি!

ব্যাণ্ডেলে গাড়ী থামতে না থামতে দাশুদা দোর খুলে তড়াক্ করে দিলে এক লাফ প্লাটফর্মে—যেমন লাফ দেওয়া অমনি আছাড়! আমরা হো-হো করে হেসে উঠলুম। মাসিমারা আহা-আহা করে উঠলেন—দাশুদা কারো পানে না চেয়ে এক দিকে তীরের মত উধাও হয়ে গেল!...

দাশুদার মা বললেন,—ভারী গোঁয়ার!...

ছোট মাসিমা বললেন,—একে গোঁয়ার্তুমি বলে না—এ বোকামি!

ছোট মাসিমার উপর সা খুশী হলুম!...

তারপর—দাশুদার দেখা নেই...বড় মাসিমা বললেন,—আবার কোথায় গেল... ছাখো দিকি বাপু, যদি গাড়ী ছেড়ে দেয়...

আমরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলুম, —দেখি, দাশুদা একটা খপরের কাগজ কিনে সেখানা মেলে ধরে দেখছে...

বললুম,— ঐ যে সামনে কাগজ পড়ছে...

মেয়েরা বলতে লাগলো—ওরে ডাক্ না—গাড়ীতে বসে কাগজ পড়া যায় না?

ভুলু বললে,—সাহেব মানুষ...!

বড় মাসিমা ধমক দিয়ে বললেন—তুই থাম্‌তো...তোর না দাদা হয়?...

আমরা চুপ!...তারপর গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা বাজা...আর দৌড়ুতে দৌড়ুতে দাশুদা এসে গাড়ীতে উঠলো...দৌড়ে কামরায় উঠতেই এক আছাড়! আমরা অবার হেসে উঠলুম...দাশুদা বললে —ই-আই-আর এর গাড়ীগুলো যেন কি!

তারপর নির্ব্বিবাদে চললুম। বাঁশবেড়ে, ত্রিবেণী, খামারগাছি, জিরাট ছাড়িয়ে বলাগড়ে পৌচেছি, দেখি, প্লাটফর্ম্মে দিব্যি আম বিক্রী করছে! বড় মাসিমা বললেন, —আহা, আম দ্যাখো কত!—কিছু নিলে হতো না, ঠাকুরঝি?

দাশুদার মাকে কথাটা বলা হলো। দাশুদা বললে—আম চাই ?

বড় মাসিমা বললেন, —তোমর নামতে হবে না বাবা। গোঁয়ার ছেলে তুমি... ওকে ডাকো না হয়!...

ডাকা হলো! সে উঠতে চায় না—প্লাটফর্ম্মে ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে! দাশুদা বললে,—হুঁঃ মাসিমা, নিয়ে আসি। বড় মাসিমা দুটো টাকা দিলেন আর একটা ঝাড়ন ...বললেন, দু'টাকার আনো তা হলে...

ভুলু বললে,—গাড়ী কিন্তু এখনি ছাড়বে...ভুলে যেকোনা যেন...

দাশুদা বললে,—তুই থাম্...

দাশুদা চলে গেল। দু টাকার আম কেনা...দাশুদা দর করতে না করতে ঘণ্টা বাজলো—ট্রেণও ছাড়লো। আমরা চীৎকার করতে লাগলুম—দাশুদা, ও দাশুদা...

কে বা শোনে! দাশুদা আমের দর করতে ব্যস্ত...ট্রেণ প্লাটফর্ম্ম ছেড়ে চললো—বড় মাসিমা বললেন—ওরে থামা, ট্রেণ থামা—ও যে পড়ে রইলো। কি ছেলে রে বাবা...চেন্‌টা ধরে টান্...

ভুলু বললে,—চেন্ টানলে ৫০৲ টাকা জরিমানা...

ছোট মাসিমা বললেন—তোমাদের যেমন!...ভুলু বললে, ট্রেণ থামবে না বেশীক্ষণ...ওই বা গেল কি বলে...

এখন উপায় ?

আমি বললুম,—টিকিটগুলো কোথায় ?

ভুলু বললে,—দাশুদার জামার পকেটে। এই যে...

দাশুদার উপায় কি হবে ?...ভুলু টাইম-টেবেল দেখে বললে,— বেলা চারটার আগে ট্রেণ নেই, বলাগড় থেকে নবদ্বীপ আসবার।

ট্রেণ এসে পরের ষ্টেশন সোমরাবাজারে থামলো—আমাদের মধ্যে তখনো নানা তর্ক আর জল্পনা চলেছে। ট্রেণ ছেড়ে দিলে...

আমরা টাইম-টেবেল দেখে বললুম,—পরের ষ্টেশন গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়া থেকে ট্রেণ ছাড়বে ১১টা ৫৭ মিনিট, সেই ট্রেণ বলাগড় পৌছুবে ১২টা ৭ মিনিটে।..

বড় মামিমা বললেন,—নন্দা যাক এই ট্রেণে। গুপ্তিপাড়ায় ওকে নামিয়ে দাও বাপু—ও পয়সা-কড়ি নিয়ে যাক। খেতে পাবে তবু ..কি, হলো! ছেলেটা একলা পড়ে থাকবে ..নবদ্বীপ মাথায় থাক...দেখ তো, এই ট্রেণে ফিরলে হাবড়ায় পৌঁছবে কখন?

টাইম-টেবেল দেখে আমরা বললুম, বেলা তিনটে ..

ছোট মাসিমা বললেন---এই ঝাঁ-ঝাঁ রোদে--আচ্ছা কর্মভোগ, বাপু তোমরা যাই বল—দাশুর অত কথা শুনে আমি তখনি বুঝেছিলুম, ও খালি ব্যাক্যিবাগীশ.. এখান থেকে এইখানে আসতে কি কেলেঙ্কারী চাই না করলে...এত বড় ছেলে ..

আমরা যা খুশী হচ্ছিলুম—ও: থ্রী চিয়ার্স ফর ছোট মাসিমা...

ভুলু বললে, এক কাজ কর না তার চেয়ে...এই ট্রেণে গুপ্তিপাড়া থেকে চড়ে বলাগড় থেকে দাশুদাকে তুলে চল ত্রিবেণী যাওয়া যাক...

ছোট মাসিমা বললেন,—সেই ভালো, নেহাৎ ধুলো-পায়ে বাড়ী না গিয়ে ত্রিবেণী হয়ে যাওয়া যাক—তাতে কষ্টও কম হবে—ত্রিবেণী স্নানটাও ঘটবে...

তাই হলো! গুপ্তিপাড়ায় নেমে আবার টিকিট কিনলুম---ত্রিবেণীর ট্রেণে চাপলুম...বলাগড়ে ট্রেণ আসতে দেখি, দাশুদা আমের পুঁটলি নিয়ে বসে আছে... আমাদের নামতে দেখে দাশুদা চেয়ে দেখলে, বললে—তোমরা ফিরলে কেন? আমি ফিরতি ট্রেণে তোমাদের সঙ্গে উঠে বাড়ী ফিরতুম। আমার জন্য ভাবনা ছিল না- খিদে পেয়েছিল খুব, তা কতকগুলো আম খেয়েছি—সারাদিনের মত আহারও হয়েছে... হুঁ:, তোমরা ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে কেন...

ছোট মাসিমা বললেন তা বোঝবার যদি তোমার শক্তি থাকতো তাহলে কি এমন বুদ্ধিমানের মত আম কিনতে নামতে, বাবা!...

ভুলু চুপি চুপি দাশুদার পাশে গিয়ে বললে—চায়না ঘুরেও যে কীর্ত্তি দেখাতে পারোনি, নবদ্বীপ-যাত্রায় তা দেখালে, দাশুদা..

দাশুদা বললে—কি, কি দেখিয়েছি...?

আমরা বললুম,—কি আর দেখাবে...যা দেখিয়েছ তা একেবারে চমৎকার ...

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সরস্বতীর সন্দেশ চুরী

মা হারা মেয়ে কল্যাণীর একমাত্র বন্ধু ও মা ছিল তার বৌদি। বৌদিদির বুকের মাঝে থেকেই কল্যাণী বড় হয়ে উঠেছে।

* * *

তার বৌদি ছিল একজন বড় কবি। দু তিনটা কবিতার বই লিখেছে আর প্রত্যেক মাসেই কতগুলি সুন্দর ছবিওলা পত্রিকা তার বৌদির কবিতা বয়ে নিয়ে আসত তাদের বাড়ীতে। বৌদি তার নূতন লেখা কবিতাগুলি প্রথমেই পড়ে শুনাত তার ছোট্ট কলিকে। কল্যাণী চুপ করে বৌদির মুখের দিকে চেয়ে শুনত আর অবাক হয়ে ভাবত —কি সুন্দর! পড়া হ'য়ে গেলে বৌদি জিজ্ঞাসা করত "কলি বুঝেছিস্!"

'হাঁ' 'হাঁ'

কল্যাণী তখনই খুব বিপদে পড়ত যখন বৌদি আবার হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করত "কি বুঝলি বল দেখি- ."

সে এদিক ওদিক চেয়ে দু তিনবার ঢোক গিলে বলত "খুব ভাল---"

বৌদি তখন তার গাল দুটো টিপে দিয়ে বলত, "দূর বোকা মেয়ে।"

বৌদিকে লিখতে দেখে তারও লিখবার খুব ইচ্ছে হত ; সে প্রায়ই ভাবত হাতের লেখা লেখার চেয়েও কি কবিতা লেখা শক্ত! আর যদিও বা তা নেহাতই হয় তবে গুণ অঙ্ক করার চেয়ে ত নয়! সে পড়ার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে যেত কাগজ কলম নিয়ে। কিছুই মনে আসত না। জানালা দিয়ে উড়ে আসা চড়াই পাখীগুলিকে বলত "যা এখন, লেখার সময় বিরক্ত করিস্ না।" পুষি ঘরে থাকলে তাকে খুব গম্ভীর ভাবে শাসিয়ে দিত "এখন মিউ মিউ করলে এমন মারব!" এত আয়োজন করে আর অনেক ভেবে চিন্তেও কিন্তু তার একটা লাইনও লেখা হয়ে উঠত না। কোন দিন বা টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়েই পড়ত আর কোন দিন চড়াই পাখীগুলিকে গাল দিয়ে বলত "না, তোদের জ্বালায় আর কিছু লেখার জো নেই।" এ রকম

কদিন করার পর কলি কি রকম আনমনা হয়ে উঠল। ক্রমে বৌদির নজর এদিকে পড়ল। সে প্রথমে ভেবে ঠিক করতে পারল না যে মেয়েটার হ'ল কি।

* * *

সেদিন দুপুরে হাতে কোন কাজ না থাকায় বৌদি মনে করল কল্যাণীর পড়ার ঘরটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে দেবে। সে এসে তার বই গুলি গোছাচ্চে, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ে গেল একখানা কাগজের উপর। তাতে পাঁচ ছয় লাইন কাটাকুটির পর লেখা আছে,

কল্ কল্
ছল্ ছল্
নদী চলে ছুটিয়া

পড়ে সে নিজে এক চোট খুব হাসল—এতটুকু মেয়েকে কবিতা রোগে ধরেছে দেখে। তারপর ঐ লাইনগুলির নীচে সুন্দর করে লিখে রাখল,

ঢেউগুলি
উছলি—
পড়ে যেন লুটিয়া

কল্যাণী সেদিন ক্লাশে কিছুই পড়া পারল না। আর কেমন করেই বা পারবে? তার মন ত আর সেদিন পড়াতে ছিল না। সে কেবলি ভাবছিল কি ক'রে কোন রকমে তিন লাইন মিলিয়ে বৌদিকে দেখাবে। তখন বৌদি চমকে গিয়ে ভাববে যে তার কালি ত আর এখন ছেলে মানুষটি নেই। সে এখন বড় হয়েছে—কুমারী কল্যাণী সেন — কেমন ভাল ভাল কবিতা লিখতে পারে।

সে মনে মনে সরস্বতীকে ডেকে কেবলি বলতে লাগল, "মা সরস্বতী, আমায় আর তিন লাইন মিলিয়ে দাও, আমি আমার আচারের পয়সা দিয়ে তোমায় রোজ সন্দেশ এনে দেবো।"

অন্য দিন কল্যাণী স্কুল থেকে এসে জামা না ছেড়েই ঘুমন্ত বৌদির গলা জড়িয়ে ধরে বলত, "বাঃ, বৌদি তুমি বেশ ঘুমুচ্ছ আর তোমার কলিয়ে খিদেয় মরছে।" আজ সে আর বৌদির ঘরে গেল না; একেবারে নিজের পড়বার ঘরে গিয়ে কি একটা,

লাইন লিখবে মনে করে সেই কাগজ খানা বার করল। কিন্তু যা দেখল তাতে তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল। সে কেবলি পড়তে লাগল.

কল্ কল্ ঢেউগুলি
ছল্ ছল্ উছলি
নদী চলে ছুটিয়া পাড়ে যেন লুটিয়া

বাঃ, কেমন মিলে গেছে, আর সে এত দিন চেষ্টা করেও একটা লাইন মেলাতে পারেনি। সে ভেবে কিছুতেই ঠিক করতে পারল না কে লিখে গেল — বৌদিও এ ঘরে খুবই কম আসে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল কয়েক দিন আগে সে বৌদির সঙ্গে 'জয়দেব' দেখতে গিয়েছিল। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভক্তি করত তাই শ্রীকৃষ্ণ একদিন লুকিয়ে এসে জয়দেবের কবিতার একটা খুব শক্ত লাইন লিখে দিয়েছিলেন। সেও ঠিক করল নিশ্চয়ই মা সরস্বতীর কাজ — আমি তাঁকে আজ এত ডেকেছি। একবার মনে করল বৌদিকে দেখাই, আবার ভাবল না আরও বড় করে লিখে দেখাতে হবে। সেদিন তার মনটা একটা আনন্দে ভরে গেল। সে কেবলই সরস্বতীকে ডাকতে লাগল। টব থেকে ও তিনটে গোলাপ এনে তার পড়ার ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গানো সরস্বতীর ছবিটার উপর গুঁজে দিল।

পরদিন সে অনেক কষ্টে আরও তিনটে লাইন লিখে রাখল,

ঝর্ ঝর্
সর্ সর্
বরষা ঝরিছে।

স্কুলে যাওয়ার সময় খাবারের পয়সা চারটে দিয়ে সন্দেশ এনে সরস্বতীর সামনে রেখে চলে গেল। ফিরে এসে দেখলে যে প্লেটখানা খালি। একটুও প্রসাদ নেই দেখে তার মনটা কি রকম হয়ে গেল। যাহোক সে আস্তে আস্তে সেই কাগজ খানা বার করে যা দেখল তাতে তার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। সে পড়তে লাগল,

ঝর্ ঝর্ বুক ভরা
সর্ সর্ ব্যথা নিয়ে
বরষা ঝরিছে বালিকা কাঁদিছে

এতে মা সরস্বতীর উপর তার ভক্তি বেড়ে গেল আরও অনেক। সে যে কত বার তাঁকে গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল তার ঠিক নেই। সে মনে মনে বলতে লাগল, মা সরস্বতী, আমায় একবার দেখা দেও, আমি তোমায় খুব ভালবাসব, জন্মদিনে বৌদির দেওয়া বড় ভাল পুতুলটা তোমায় দিয়ে দেব।

পরদিন রবিবার—স্কুলের ছুটি। কল্যাণী ঠিক করল যে দুপুরে সে খাটের নীচে লুকিয়ে থাকবে আর সরস্বতী যখন লিখতে আসবে তখন তাঁকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরবে, আর ছাড়বে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে সে কাগজটার মাথা লিখল,

কড় কড়
হুড় হুড়
বিদ্যুৎ চমকে

তারপর প্লেটে চার পয়সার সন্দেশ ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখে আলমারার পেছনে চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, কেউ এল না। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে তার ঘুম পাবার যোগাড় হল। এমন সময় বৌদি ঘরে ঢুকল। কল্যাণীর ভারি লজ্জা হতে লাগল যদি বৌদি তাকে এরকম চোরের মত বসে থাকতে দেখে ফেলে। এই মনে করে সে একেবারে গুড়ি সুড়ি হয়ে চোখ বুঁজে রইল। বৌদি রোজ যেমন করে থাকে, আজও তেমন লিখে রাখল.

আকাশের
বুক চেরা
রক্তের ঝলকে

সন্দেশটা নিয়ে যাবার সময় তার হাতের চুড়িগুলি প্লেটে লেগে হঠাৎ ঠং করে একটা শব্দ হল। কল্যাণী আশ্চর্য হয়ে চেয়ে দেখতে পেল বৌদি সন্দেশটা নিয়ে যাচ্ছে। তখন তার মনটা একটা আনন্দে ও দুঃখে ভরে গেল। তার খুবই আশা ছিল যে সরস্বতীকে দেখতে পাবে। সে আস্তে আস্তে এসে বৌদির পিঠে গুড়ুম করে এক কিল মেরে তার গলা ধরে ঝুলে পড়ে বলল "ওরে, চোর তুমি রোজ আমার সন্দেশ চুরি কর। আমি ভেবেছিলুম বুঝিবা সরস্বতী আসে।" কাগজের দিকে নজর করে দেখল যে তাতে আরও নূতন লাইন লেখা আছে। সে পড়তে লাগল,

ঝল্ ঝল্
ছল্ ছল্
নদী চলে ছুটিয়া
ঢেউ গুলি
উছলি—
পড়ে যেন লুটিয়া।
ঝর্ ঝর্
সর্ সর্
বরষা ঝরিছে

বুক ভরা
ব্যথা নিয়ে
বালিকা কাঁদিছে।
কড়্ কড়্
গুড়্ গুড়্
বিদ্যুৎ চমকে
আকাশের
বুক চেরা
বাজের পলকে।

শ্রীউমাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সুভাষবাবুর মুক্তির খবর তোমরা সকলেই পেয়েছ। এই সুখবরে আমরা সকলেই খুব আনন্দিত হয়েছি। ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবরে বিনা বিচারে কোন কারন না দেখিয়ে তাঁকে ধরে রাখা হয়। এই সুদীর্ঘ সময় বন্দী অবস্থায় থেকে তাঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়ে। এত খারাপ হয়ে পড়ে যে তিনি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। সমস্ত দেশবাসী তাঁর মুক্তির জন্যে কত প্রার্থনা করেছ। এতদিন পরে সুভাষবাবু আবার দেশের মধ্যে ফিরে এসেছেন। আশা করি তিনি সেরে উঠে আবার দেশের কাজে লেগে যাবেন।

সুভাষবাবুর জীবন মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের আদর্শ হওয়া উচিত। বাঙ্গালী চরিত্রের সমস্ত গুণ সুভাষবাবুকে মহৎ কোরে তুলেছে। এমন বিনয়ী, নম্র, স্বদেশ-হিতৈষী, স্বার্থত্যাগী যুবকের আদর্শ আমাদের ইতিহাসে বিরল। দেশের স্বাধীনতার জন্যে তিনি যে কষ্ট ভোগ করেছেন তা ভাবলে একদিকে যেমন মনে কষ্ট হয় আর একদিকে তেমনি আনন্দ হয়, যে এমন শুভ্র নির্ম্মল জীবন বাঙ্গালী জাতিকে ধন্য কোরেছে।

সবজান্তা

সেদিন কাপ্তেন সিগ্রেভ মোটরে ঘণ্টায় ২০৪ মাইল গাড়ী চালিয়ে ছিলেন।

ছোটছেলে— এখন আমি খুব ভাল ছেলে হয়েছি না মা?

মা—হ্যাঁ, খুব ভাল ছেলে তুমি।

ছোটছেলে— এখন তুমি আমাকে আগের চেয়ে খুব বিশ্বাস কর, না মা?

মা—নিশ্চয়, মা আবার ছেলেকে কবে বিশ্বাস না করে।

ছোটছেলে— তবে মা, রোজ রোজ আচারের শিশিটা লুকিয়ে রাখ কেন?

দলীপ সিংজী বিলাতে ক্রিকেট খেলায় খুব নাম কিনেছেন। সে দিন তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে মিড্‌লসেক্সের বিরুদ্ধে ২৫০টা রান করেছেন এবং তিনি "আউট" হন নি। বিলাতে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে পরিগণিত হয়েছেন। এটা আমাদের কম গৌরবের কথা নয়।



দক্ষিণ আমেরিকার একস্থানে পিঁপড়েরা তিন মাইল লম্বা সুড়ঙ্গ তৈরী করেছে। এই সুড়ঙ্গই তাদের সহর।

সেদিন একজন এরোপ্লেন চালক ২৫০০০ ফিট উপর থেকে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে অনায়াসে মাটিতে নামতে পেরে ছিলেন।

এখানে যে ছবিটা বের হোল এটা একটা ইংরেজ-মেয়ের ছবি, সে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা মেয়ে। তার পাশে যে লম্বা দুটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কত ছোট দেখাচ্ছে দেখ।

সে দিন বিলাতের একটা ডাক্তারী সভায় এই খবরটা বলা হয়েছিল ঃ একজন ডাক্তার একজন রোগীকে ৮,৮০০টা পিল খাইয়েছেন, আর একজন ডাক্তার আর একটা রোগীকে ৫৫ গ্যালন তরল ওষুধ খাইয়েছেন।

সম্পাদকের চিঠিপত্র

প্রিয় মৌচাকের পাঠক-পাঠিকা,

বৈশাখের মৌচাক পেয়ে তোমরা আমাকে অনেক ভাল ভাল চিঠি লিখেছ ; সে জন্যে তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। বৈশাখের মৌচাক তোমাদের খুব ভাল লেগেছে এবং তোমরা অনেকেই লিখছ যে সব কাগজের চেয়ে মৌচাকই ভাল। মৌচাক তোমাদের এত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে, শুনলে আমাদের কত আনন্দ হয়।

এবারে আমি খান কয়েক চিঠি পেয়েছি, সেই বিষয়ে কিছু বলতে চাই। দুই চার জন গ্রাহক লিখেছেন, যে এবারে তাঁরা ম্যাট্রিক্ পাশ কোরে কলেজে ঢুকবেন, সেই জন্যে তাঁরা আর গ্রাহক থাকতে চান না। আমাদের যতদূর জানা আছে অনেক বৃদ্ধ লোক মৌচাক পড়ে খুব আমোদ পান এবং অনেক বাড়ীর বাবা মারা নিয়মিত ভাবে তাঁদের ছেলেমেয়ের সঙ্গে মৌচাক পড়েন। আশা করি ম্যাট্রিক পাশ করা গ্রাহকরা হঠাৎ "বুড়ো" হয়ে পড়বেন না—এবং এও আশা করিনা যে তাঁরা মৌচাক ছেড়ে বঙ্গবাসী কিম্বা হিতবাদী পড়ে বেশী আমোদ পাবেন।

আমাদের কয়েকটী গ্রাহিকা—যাঁরা এই বৈশাখে "নতুন বউ" হয়ে পড়েছেন তাঁরাও ওই রকম লিখেছেন। তাঁদেরও অনুরোধ করছি যেন তাঁরা হঠাৎ "গিন্নী" না হয়ে পড়েন।

এবার মৌচাক সম্বন্ধে অনেক কবিতা ও চিঠি পেয়েছি, তার মধ্যে শ্রীমতী অশোকা সেনের কবিতাটী এখানে ছাপলাম —

নতুন আলোর মাঝে, নতুন বসনে সেজে,
এলে আজ, এলো বৈশাখ,
দ্বার পাশে ঘুরি ফিরি, পিয়ন আসিলে ধরি,
কোথা মোর কোথা মৌচাক ?
পয়লা সারাটী দিন, রাত্রিতে হইল লীন,
২রা সকাল বেলা উঠি,
সে দিনও বৃথাই যায়, মৌচাক আসে না হায়,
বৃথা মোরা দ্বার পাশে জুটী।

ক্রমে কাটে পাঁচ দিন, আশা হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
পেলাম না এখনও কেন ?
পিয়নটা ভারী ছাই, ইচ্ছা করে দেয় নাই,
দেরী কভু হয় নাত' হেন।
চয়ই সারাটা বেলা, সবাই ভুলেছি খেলা,
ঘর আর বার শুধু করি ;
ভুল করি প্রতি কাজে, মন মাঝে শুধু রাজে
মৌচাক আসিবে মধু ভরি।
"পিয়ন এসেছে, দিদি," "কেউ তোরা নিস যদি
ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেব হাড়, "
যাহা ছিল লেখা পড়া, কিছুই হ'ল না সারা
কাজ কর্ম্ম সবি হ'ল ছার।
দেখি গিয়ে দ্বার পানে, পিয়ন মৌচাক আনে,
ভাই বোন কাড়াকাড়ি করে,
পিয়নটা থতমত, উৎসাহ দেখে অত,
ভেবে নাহি পায় দেবে কারে।
মোড়ক খুলিয়া দেখি, বাঃ বাঃ একি, একি ?
মেয়ে হাসে মৌচাক দেখে,
প্রতি পাতা পুলি খুলি, দেখি সব গল্পগুলি
মধু যেন ঝরে তাহা থেকে।
শেষ হ'ল কলরব, ক্রমে থেমে গেল সব,
একে একে পড়া হ'ল শেষ
"মৌচাক খুব ভালো, মৌচাক কোরে আলো
এসেছে" ; সবাই বলে—"বেশ"।

নূতন ধাঁধা

১। ফুটবলের লীগ খেলা সুরু হয়েছে। কনক ছিল পাড়াগাঁয়। সে এসে খবরের কাগজ খুলে দেখে, খেলার 'রেজাল্ট' বেরিয়েছে এই রকম,—

	কটি ম্যাচ খেলা হয়েছে (Played)	জিত Won	হার Lost	ড্র Drawn	গোল For	Against	পয়েণ্ট
মোহনবাগান—	৩	৩	০	০	৭	১	৬
ক্যালকাটা —	৩	১	১	১	২	৩	৩
ডালহাউসি—	৩	১	১	১	৩	৩	৩
রেঞ্জার্স—	৩	০	৩	০	১	৬	০

কনক জানতো, মোহনবাগান ক্যালকাটাকে ৩—০ গোলে হারিয়েছে। কিন্তু অন্য ম্যাচের খবর, অর্থাৎ কে ক' গোল জিতেছে, তা সে জানতো না। সে তার বড়দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে, আর কে কাকে কত গোল দেছে তাই। বড়দা বললে, তার মনে নেই। কনক বললে,—আচ্ছা, রসো, এই টেব্‌ল্ থেকে হিসেব করে আমি বলে দিচ্ছি। সকলে বললে,—পারবি? কনক বললে,—নিশ্চয়। দশ মিনিট পরে কনক টেব্‌ল্ থেকে হিসাব কবে ঠিকঠাক বলে দিলে—কে ক' গোল দেছে, কে ক' গোল খেয়েছে। তোমরা এই টেব্‌ল্ থেকে কবে বল তো কে কাকে ক' গোলে হারিয়েছে, অর্থাৎ কে ক' গোল দিয়েছে, কে ক' গোল খেয়েছে।

বজ্রনাদ

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

১। সাঁতার
২। কুস্তী
৩। ফুটবল
৪। দৌড়ান
৫। ক্রিকেট
৬। টেনিস
৭। হকি
৮। মাছ ধরা

কোনো গ্রাহকেই ঠিক উত্তর দিতে পারেন পারেন নাই। তবে নিম্নলিখিত গ্রাহকগণ দৌড়ানোয় একটা ভুল করেছেন; সেই জন্য প্রাইজ কটা সমান ভাবে ভাগ কোরে দেওয়া হোল, অর্থাৎ সবাই ৫, টাকা কোরে পাবেন।

১। শ্রীবিনোদবিহারী রায়, কালীঘাট
২। সত্যরঞ্জন মিত্র, লাহিরিয়া সরাই
৩। শ্রীদেবগোবিন্দ গুপ্ত, রংপুর

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, কিরিণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতিন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত



মেলার পথে

শ্রীঊর্মিলা [illegible] অঙ্কিত

মৌচাক

৮ম বর্ষ]　　আষাঢ়, ১৩৩৪　　[তৃতীয় সংখ্যা

আষাঢ়ে

ভোর থেকে আজ মাদল বাজে আষাঢ় আকাশে,
থেকে থেকে বাদল হাওয়া বইছে বাতাসে ;
মেঘের কোলে কোমল কালো
শ্যামল করে দিনের আলো
গাছের মাথা আঁধার হলে দিচ্ছে ঢাকা সে।

দুপুর বেলার কাছাকাছি বৃষ্টি হ'ল শুরু,
মাথার উপর উঠল বেড়ে মেঘের গুরু গুরু ;
ঝাপসা আলোর অন্ধকারে
ঘরে ঘরে বন্ধ দ্বারে
বাজের ডাকে বুকের মাঝে করছে দুরু দুরু।

আম বাগানে ঝড় ঢুকে' ঐ করছে দাপাদাপি,
গাছের শাখা নুইয়ে ফেলে' বিষম লাফালাফি ;
বাঁশ বাগানের অন্তরালে
নাচ্‌ছে যেন তাল বেতালে ;
কলকলিয়ে জলটি চলে গাছের গোড়া ছাপি'।

আষাঢ় বুড়ির জট্ পাকানো কালো কেশের রাশে
সৃষ্টি যেন হুমড়ি খেয়ে দৃষ্টি ঢেকে আসে ;
থেকে থেকে বিজ্‌লী আলো
দাঁতগুলো তার দেখায় ভালো—
জগৎ যেন পূরবে মুখে একটি আঁধার গ্রাসে !

পথের উপর জল জমেছে—স্কুলের পড়া নাই,
একলা ঘরে চুপ্‌টি করে' উদাস মনে চাই ;
জানলা দিয়ে যতই তাকাই
বৃষ্টিধারার অন্ত না পাই,
কোথায় এত জল ছিল আজ ভাব্‌ছি বসে' তাই।

সন্ধ্যা হ'ল—বাদল ধারা তেম্‌নি তবু ঝরে,
হাঁপিয়ে উঠে মনটা আরো সঙ্গীবিহীন ঘরে ;
দুমাস হ'ল মোদের ছাড়ি'
দিদি গেছে শ্বশুর বাড়ী,
ভাইটি গেছে সঙ্গে তারি, মনটা কেমন করে।

এই ঘরে সব শু'তাম মায়ের কোলের কাছাকাছি,
কোথায় দিদি, কোথায় খোকা, কোথায় পড়ে' আছি ;
শোলক, সে আর শোনাই কা'কে ?
ভয় পেলে আর কেউ না ডাকে,
এম্‌নি হয়ে এক্‌লা বলো কেমন করে বাঁচি ?

মেঘের ডাকে চড়াৎ ক'রে পড়্‌ল কোথায় বাজ,—
কতদিনের কত না ভয় পড়্‌ছে মনে আজ !
ছাত-ফাটা ঐ গোয়াল ঘরে
গরু দুটো ভিজেই মরে,
মাকে বলে' কাল সকালেই লাগিয়ে দেব রাজ।

আজের মতন কালও যদি বৃষ্টি নাহি থামে,
ঝম্‌ঝমিয়ে সকাল থেকে বাদল যদি নামে !
দুক্রোশ এমন বেশী কিসে ?
মনে ভেবে রেখেইছি সে—
ঝিএর সাথে যাব দিদির শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে।

মায়ের হাতের কাজ মিটে না—কাজই এত কি যে !
রান্না আজি নাই বা হ'ল—বৃষ্টি জলে ভিজে'।
বড় হ'লে এমন কাজে
খাট্‌তে মাকে দেবই না যে,
সবাইকে মোর রাখ্‌তে সুখে খাট্‌ব আমি নিজে।

বৃষ্টি বাড়ে, জলের আওয়াজ উঠ্ছে বেড়ে কত,
বরুণ রাজা, মাপ করো ভাই আজকে দিনের মত;
এত জোরে চাল্লে জলে,
সৃষ্টি যে যায় রসাতলে!
আজ বাদলে তোমার পায়ে করছি মাথা নত!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুন্দর সুইজারলাণ্ড

দুইটা জিনিষের জন্যে পৃথিবী জুড়ে সুইজারলণ্ডের নাম। একটি হচ্ছে ঘড়ি, আর একটি হচ্ছে চকোলেট ও টিনে বন্ধ দুধ।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ভাল ঘড়ি তৈরী করতে পারে বলে সুইজারলণ্ডের খ্যাতি। এক এক বছরে লক্ষ লক্ষ ঘড়ি তৈরী হয়ে বিদেশে রপ্তানি হয়। সব বছর অবশ্য সমান বিক্রি হয় না। যুদ্ধের আগে এক বছরে দেখছি (১৯০৮), আড়াই লক্ষ সোনার ঘড়ি ও দেড় মিলিয়নের উপর রূপার ঘড়ি তৈরী হয়েছে। ১৯২৪এ ২৭৩ মিলিয়ন সুইস ফ্রাঙ্কের ঘড়ি বাহিরে রপ্তানি হয়েছে। ২৫ সুইস ফ্রাঙ্কে এক পাউণ্ড হয়।

তোমাদের বাড়ীতে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, তোমাদের ঘড়ি সুইজারলণ্ডে তৈরী কি না।

চকোলেট বেচে, টিনে বন্ধ দুধ বেচে, সুইজারলণ্ডের আয় বড় কম নয়। এ দুটি জিনিসই দুধ থেকে তৈরী হয়। সে জন্য লোকেরা গরুর খুব যত্ন করে। শীতকালটা অবশ্য গরুদের কিছু কষ্ট, কিন্তু সে সময়ের জন্য তাদের খাবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে খড় বা শুকনো ঘাস রেখে দেওয়া হয়। বছরের অন্য সময় তারা প্রায় সমস্ত দিন মাঠে ঘাস খেয়ে চরে বেড়ায়।

গরুদের ঘাস খাবার জন্যে পাহাড়ের গায়ে যথেষ্ঠ পরিমাণে মাঠ আছে। তা ছাড়া প্রতি বৎসর গ্রীষ্মের সময় গরু ছাগলদের দল বেঁধে তাদের পাহাড়ের তলা বা পাহাড়ের গায়ের গ্রাম থেকে পাহাড়ের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দিনরাত দু'তিন মাস ধরে গরুরা খোলা মাঠে ও তার পাশের পাইন বনের ভেতর ঘাস খেয়ে কাটায়।

এই Alp-drive বা পাহাড়ে ওঠার একটি বর্ণনা দিচ্ছি।

মে-মাসের শেষ, আকাশ নির্ম্মল রৌদ্রোজ্জ্বল, মাঠ বন সব ঘাসে ফুলে ভরে গেছে। গরুদের মালিক যখন বুঝলো এই হচ্ছে পাহাড়ে ওঠার উপযুক্ত সময়, তখন এক দিন সকালে তার সব গরু ও গরুদের রক্ষক চাকরদের জড় করলে। সমস্ত গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। সমস্ত গরুর পাল ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক একজন রক্ষককে এক এক দলের ভার দেওয়া হল, তারপর সমস্ত দল সাজিয়ে বড় সেনার রেজিমেন্টের মত গরুর পাল চল্ল—ঢং ঢং ঢং ঢং। ঘণ্টার আওয়াজে সমস্ত গ্রাম মুখরিত হয়ে উঠল। প্রত্যেক গরুর গলায় একটা বড় ঘণ্টা, যে গরুর যত বেশী দাম, তার গলায় তত বড় ঘণ্টা, কোন ঘণ্টা দু'তিন সের, কোন ঘণ্টা ১০।১২ সের ভারী। পালের আগে বা শেষে গরুদের মালিক চল্ল। তার আজ সুন্দর সাজ। সুইজারল্যাণ্ডের অনেক পুরাতন গ্রামে লোকদের প্রাচীনকালের সাজ দেখা যায়। তার সাদা সার্টের ওপর লাল ভেলভেটের ওয়েস্টকোট, পিঠে চামড়ার দড়ি ঝুলছে, তাতে পেতলের গরু ছাগলের ছোট মূর্ত্তি ঝলমল করছে। হলদে প্যাণ্ট হাঁটু পর্য্যন্ত, তারপর সাদা মোজা, শক্ত মোটা জুতো, তলায় লোহার খুর মারা। মাথায় গোল রঙীন টুপি। গরু-রক্ষকদের সাজও সুন্দর। গরুর পালের পিছনে, একটি গাড়ী চলেছে, তাতে দুধ রাখবার, পনীর তৈরী করবার বড় বড় তামার জালা ও কেট্‌লী; রাঁধবার বাসনপত্র, কিছু জামা কাপড় ও শোবার জিনিষে ভরা।

ঘণ্টার শব্দে চারিদিক মুখরিত করে গরুর পাল চল্ল! গ্রাম শেষ হল, শালবনের পাশের উঁচু পথ দিয়ে সমস্ত প্রান্তর শব্দে সচকিত করে চল্ল, আবার পাহাড়ের গায়ে কাঠের বাড়ী ভরা ছোট গ্রামে ঢুকল। সব ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করে গরুর পাল

দেখতে এল। সরাইখানার সামনে সবাই থামল। পথের ধারে পাথরের লম্বা চৌবাচ্চায় ঝর্ণার জল এসে পড়ছে, গরুরা জল খেতে আরম্ভ করল। গরুর মালিক ও রক্ষকেরা সরাইখানায় ঢুকে বিয়ার বা মদ খেয়ে নিলে। তারপর আবার সবাই চল্ল,—ওপরের দিকে আরও ওপরের দিকে, ওই যেখানে পাইন বন ছাওয়া সবুজ পাহাড়ের চূড়া নীল-আকাশের মধ্যে মিশে কোথায় হারিয়ে গেছে।

সন্ধ্যে বেলা সবাই পাহাড়ের ওপর এসে হাজির হল। কোন পাহাড়ে কোন খানে গরু চরান হবে আগে থেকে ঠিক করা থাকে। পাহাড়ে উঠতে পথের মাঝে মাঝে জালের দরজা, সমস্ত পাহাড় জালের বেড়া দিয়ে ভাগ করা। পাহাড়ের ওপর হয়ত কোন ছোট হ্রদের ধারে বা সমতল জমিতে কয়েকখানি ছোট কুঁড়ে, পাথর সাজিয়ে তার ওপর কাঠের তক্তার ছাদ দিয়ে তৈরী। এই ছোট কাঠ-পাথরের কুঁড়ে ঘরগুলি বহুদিনের তৈরী। বৎসরের পর বৎসর গ্রীষ্মকালে গরুর মালিকেরা এসে দু'তিন মাসের জন্য বাস করে, তারপর চলে যায়, ঘরগুলি খালি পড়ে থাকে।

গরুরা কচি ঘাস খেতে আরম্ভ করল, রক্ষকেরা কুঁড়ের সামনে বনের কাঠ কেটে আগুন জ্বাল্‌ল। কফি তৈরী হল, গাড়ী থেকে রুটি মাংসের বাক্স বাহির হল। খাওয়া শেষ করে গাড়ী থেকে দুধ রাখার জালা সব কুঁড়েতে সাজান হল, শোবার জায়গা তৈরী হল। রাতের বেলা গরুরা খোলা পাহাড়ে তারার আলোয় ঘুমাল, তার রক্ষকেরা কাঠের ছোট ঘরে শক্ত কাঠের ওপর ঘুমাল। ভোর বেলা, সব গরুদের জড় করা হল, দুগ্ধ দোহন হল। তারপর গরুরা যথেচ্ছা চরে বেড়াতে লাগল। দুধ থেকে কোন মালিক পনীর (Cheese) করতে আরম্ভ করে, কেউ বা বড় বড় জালা ভরে গাড়ী করে তলায় সহরে পাঠায়, কেউ বা দুধ জ্বাল দিয়ে মাখন তোলে। এক এক পালে ৭০।৮০ থেকে ১৫০।২০০ গরু থাকে। প্রতি দিন দুবেলা অনেক দুধ হয়; ১৯২৪তে সমস্ত সুইজারল্যাণ্ড গরুরা ২৫, ৪২২, ৫০০ কুইনটাল (Quintal) দুধ দিয়েছে, এক কুইন্‌টাল হচ্ছে এক শত পাউণ্ড, সবশুদ্ধ কত মন তোমরা হিসেব কোরো। তাছাড়া মাখন ও পনীর হয়েছে সাড়ে সাত লক্ষ কুইন্‌টলের ওপর। গরুদের জন্যে এত যত্ন নেওয়া হয় বলেই তাদের কাছ থেকে এত দুধ পাওয়া যায়;

আর পাহাড় বনে গরু চরাবার খুব সুবিধে, এখানে সিংহি বাঘ ভাল্লুক বা সাপ, মশা মাছি কোন বড় বা ছোট জন্তু নেই, গরুদের নিশ্চিন্ত মনে ছেড়ে দেওয়া যায়।

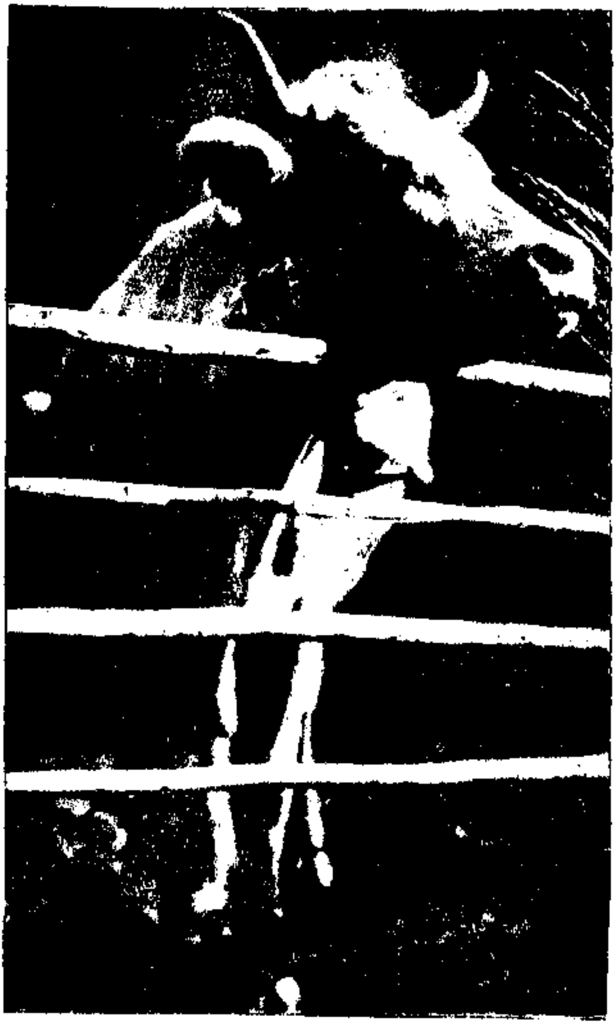
গরুর কথা এখানে শেষ করা যাক। এখন সুইজারল্যাণ্ডের বাড়ীর কথা বলি। সহরেতে অবশ্য আমাদের সহরের মত বড় বড় ইটের বাড়ী। কিন্তু গ্রামে সব বাড়ী প্রায় কাঠের। এই আগাগোড়া কাঠের বাড়ী বা Chalet—বড় সুন্দর দেখতে। সাধারণতঃ বাড়ীগুলি দোতলা, তেতলায় তাসের ঘরের মত তিন কোনা ছাদের মধ্যে ২।১ খানি ছোট ঘর। বরফ যাতে সহজে গড়িয়ে পড়তে পারে এ জন্য বাড়ীর ছাদ তাসের বাড়ীর মত দুদিকে গড়ান করতে হয়।



সুইজারলাণ্ডের ছেলেমেয়ে

পাইন বনের শেষে ঢেউ খেলান মাঠের ধারে পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে 'সাজান' তাসের ঘরের মত কাঠের বাড়ীর সারি; তাদের মধ্যে একটি গির্জ্জার চূড়া উঁচু হয়ে উঠেছে,—কয়েকটি পথ এঁকে বেঁকে উঁচু নীচু হয়ে চলে গেছে—এই হচ্ছে সুইজারলাণ্ডের গ্রাম। কোন কোন গ্রামে খুব পুরাতন সব কাঠের বাড়ী দেখা যায়, বাড়ীর সামনে কাঠের দেওয়ালে কোন ছোট পদ্য বা ভাল কথা খোদাই করে লেখা। কে সে বাড়ী তৈরী করেছিল কেউ বলতে পারে না, বংশের পর বংশ সেই বাড়ীতে জন্মেছে ও মরেছে। এখানে সব সহরেও প্রায় সকল বড় গ্রামে ইলেকট্রিকের আলো আছে। সুইজারলণ্ডে ইলেকট্রিক খুব সস্তা, কারণ এখানে ঝর্ণার জল থেকে ইলেকট্রিক তৈরী হয়, সমস্ত দেশ ইলেকট্রিকের তারে ছাওয়া, রেলগাড়ী বেশীর ভাগ ইলেকট্রিকে চলে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে বনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়।

আমি যে বাড়ী থেকে তোমাদের লিখছি, তার মেজে দেওয়াল ছাদ সবই কাঠের। তবে কাঠের ছাদের ওপর আবার টিন আছে। আমাদের দেশে দার্জ্জিলিং প্রভৃতি পাহাড়ে জায়গায় এ রকম কাঠের বাড়ী আছে, তা ঠিক সুইজ 'সালের' (chalet) মত হয়। আর তলায় কাঠের বাড়ী করা মুস্কিল, আমাদের দেশে এত গরম, রোদের এত তেজ ও এত বিষ্টি পড়ে, যে কয়েক বছরের মধ্যে কাঠের বাড়ী ফেটে চার খান হয়ে যাবে।



সুইজার লণ্ডের গরু

বাইরে আবার বরফ পড়ছে, কনকনে ঠাণ্ডা, বাইরে যদি জল বা তেল রাখা যায় সব জমে যাবে কিন্তু আমার ঘর বেশ গরম। ঘরের জানলা শুধু কাচের সার্সি লাগান তার

ওপর সাদা লেসের পর্দা ঝুলছে কাচের জানলা নয়, অথচ ঘর মোটেই ঠাণ্ডা নয়। এখানে শীতকালে কি করে ঘরবাড়ী গরম রাখে সে কথা তোমাদের বলি। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ প্রত্যেক ঘরে Fire-place বা আগুনের জায়গা থাকে। সেখানে কয়লা জ্বেলে আগুন করে ঘর গরম করতে হয়, ফায়ার প্লেসের ওপর চিমনী থাকে, সেটি দেওয়ালের ভিতর গাঁথা, দেওয়ালের সঙ্গে বাড়ীর ছাদের ওপর উঠে গেছে, সেইখান দিয়ে কয়লার ধোঁয়া বাহির হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য দেশে ঘর গরম করতে সাধারণতঃ ঘরে কয়লা জ্বালায় না। আমাদের বাড়ীতে যে ব্যবস্থা আছে, তার কথা বলছি।



বরফ ঢাকা গাছ

বাড়ীর একতলায় একটি বড় ঘরে একটি ইঞ্জিনের ছোট বয়লার আছে। সেই বয়লার থেকে মোটা লোহার পাইপ উঠে এসেছে, বাড়ীর প্রত্যেক ঘর দিয়ে চলে গিয়ে সমস্ত বাড়ীর ভেতর জালের মত জড়িয়েছে। প্রত্যেক ঘরে সেই পাইপের সঙ্গে একটি Heater যোগ করা আছে। এই হিটার বর্ণনা করা শক্ত; না দেখলে ঠিক ধারণা হয় না। মনে কর, ৪।৫ ফিট উঁচু ৭।৮টা লম্বা চেপ্টা ডবল পাইপ ওপরে ও তলায় দু'টি বড় গোল পাইপ দিয়ে যুক্ত করা। তলায় ইঞ্জিনের বয়লারে কয়লার আগুন জ্বালান হয়, তাহলে, বয়লারের মোটা পাইপ দিয়ে জল ও গরম বাতাস বা ষ্টিম ওপরে উঠে এসে বাড়ীর সব পাইপেতে ছড়িয়ে পড়ে প্রত্যেক ঘরের গরম জল ও বাতাসের

স্রোত বয়, তাতে হিটার গরম হয়ে ওঠে এবং তা থেকে সমস্ত ঘর গরম হয়। এ রকম ভাবে ঘর গরম করাকে central heating system বলে, এতে প্রত্যেক ঘরে আগুন জ্বালতে হয় না, এবং ঘরের প্রায় সব জায়গায় সমান ভাবে গরম হয়। অনেক জায়গায় বড় লোকদের বাড়ীতে ইঞ্জিনে কয়লা না পুড়িয়ে তেল পোড়ান হয়। অনেকে আবার ঘরে ইলেকট্রিক হিটার রাখেন, তার সঙ্গে ইলেকট্রিকের তার লাগান। সুইস্ টিপ্‌লে যেমন আলো জ্বলে ওঠে, তেমনি সুইস টিপ্‌লে হিটার গরম হয়ে ওঠে, সমস্ত ঘর গরম করে তোলে। আমাদের দেশে অবশ্য শীতকালে এত হাঙ্গামার দরকার হয় না! তবে যদি কেউ গ্রীষ্মকালে বাড়ী ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা বাহির করতে পারে তাহলে খুব ভাল হয়।

আমার ঘরের সামনে যে বরফ-ঢাকা সুন্দর যে গাছটি কাশের গুচ্ছের মত সাদা স্বপ্নের মত দাঁড়িয়ে আছে, তার একটি ছবি দিয়ে, আজকের মত শেষ করি, আগামী বারে সুইজারলণ্ডে আমার বেড়াবার কথা বলব।

শ্রীমনীন্দ্রলাল বসু

বাদল দিনে

টুপুর টুপুর ঝুপ ঝাপ্
আবার সুরু হল,
মাদল নিয়ে বাদল বুড়ো
আবার ফিরে এল
নিয়ে এল চপল হাসি
কালো ঘন মেঘের রাশি
ধানের ক্ষেতে স্রোতের নাচ্
আবার সুরু হল
মাদল নিয়ে বাদল বুড়ো
আবার ফিরে এল।

অনল লুটে বিদেশ থেকে
কচি ছেলের মনে
আনন্দের উতল হাওয়া
নদীর কল গানে
জলে জলে ছুটাছুটি
সুরু হল মাতামাতি
দুষ্টু ছেলের মনের কোনে
সুখের ঝড় এলো ;
টুপুর টুপুর ঝুপ ঝুপ
আবার সুরু হল।

তৃষ্ণা কাতর চাতক পাখী
ডাকে ফটিক্ জল
নূতন তর বেহাগ রাগে
গাচ্ছে ব্যাঙের দল।
মাঠে মাঠে ক্ষেতে ক্ষেতে
কল কল জল স্রোতে
পাখীর গানে ছেলের দলে
নাচন্ সুরু হল,
মাদল নিয়ে বাদল বুড়ো
আবার ফিরে এলো।

ঝর ঝরিয়ে ঝরছে জল
গাছের পাতা হতে
টুপ টুপ টুপ মুক্তা মালা
গাঁথছে যেন তাতে।

সূর্য্যিমামা অন্ধকারে
চোখ চেয়ে উঁকি মেরে
কালো মেঘের শীতল কোলে
বৃষ্টি কখন এলো
টুপুর টুপুর ঝুপ ঝুপ
কখন সুরু হল।

মায়ের কাছে কাঁদছে গিয়ে
ছোট ছেলের দল,
বাইরে যেতে মাগো মোদের
একটি বার বল,
ঐ দেখ মা সবে মিলে
নৌকা ছেড়ে দিচ্ছে জলে
বঁড়শী নিয়ে কতই ছেলে
মাছ ধরতে গেল,
মাদল নিয়ে বাদল বুড়ো
আবার ফিরে এল।

এমন দিনে কেমন করে
বলতো থাকি ঘরে ?
মনটা মোর বাইরে শুধু
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
একটি বারের তরে
আজ দে মা ছুটি মোরে
কাল থেকে মা দেখিস্ আমি
খুবই হব ভাল,
টুপুর টুপুর ঝুপ ঝুপ
আবার সুরু হ'ল।

শ্রীসুনীলবালা সেন

বাঁশীর ডাক

আমার ছেলেবেলার জীবনে ভারি একটা আশ্চর্য্য ঘটনা আছে। শুনলে তোমরা হয় তো বিশ্বাস করবে না—কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

তখন আমরা যে পাড়ায় থাকতুম, সে পাড়ার সব চেয়ে বড় মানুষ ছিলেন চৌধুরীবাবুরা। মস্ত বড় বাড়ি, মস্ত গাড়ি-জুড়ি, মস্ত তাঁদের নাম-ডাক। তাঁদের নহবৎ-খানায় রোজ সকাল-সন্ধ্যা নহবৎ বাজতো;—আমার বেশ মনে পড়ে সেই বাজনার শব্দে সকালে আমার ঘুম ভাঙতো, আর ঘুম থেকে উঠে সকালের আলো, সকালের বাতাস ভারি মিষ্টি মনে হতো। এঁদের বাড়িতে এক প্রকাণ্ড পেটা-ঘড়ি ছিল, কি গম্ভীর তার আওয়াজ—সে আওয়াজ কাঁপতে-কাঁপতে কত দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যেত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই ঘড়ি বাজতো—ঠিক সময়টিতে, কোনো-দিন একটু ব্যতিক্রম হতো না। এক-একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে এই ঘড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার ছোট মনটি বুক থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে কত দূরদূরান্তর চলে যেত—বুঝি আকাশের সেই শেষ-কিনারায়!

প্রত্যহ ইস্কুল যাবার সময় এই চৌ-তালা বাড়ির সামনে দিয়ে আমি যেতুম। মনে হতো এ যেন কোন গল্পে-শোনা স্বপ্নে-দেখা কাদের ইন্দ্রপুরী! প্রকাণ্ড লোহার ফটক—তার সামনে মস্ত পাগড়ি-মাথায় এক লম্বা সেপাই। অনবরত এধার থেকে ওধার পায়চারি করছে—বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই। তার হাতের চক্‌চকে ধারালো সঙিনটা রৌদ্রের আলোয় থেকে-থেকে ঝক্‌ঝক্ কোরে উঠতো। মনে হতো, যে ঐ বাড়িতে ঢুকতে যাবে ঐ সঙিনের খোঁচায় সেপাই তাকে তখনি গিঁথে ফেলবে!

বাড়ির চার পাশ মোটা-মোটা উঁচু লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা—যেন কেল্লায় বন্দী! সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও উঠানের একটুখানি ফালি, কোথাও পাথরে-বাঁধানো একটু রোয়াক, কোথাও বাগানের একটু টুকরো দেখা যেত। এক-জায়গায় দেখতুম সারি-সারি রকম-বেরকমের আট-দশটা ঘোড়া বাঁধা—যেমন ঝক্‌ঝকে তাদের রং, যেমন সুন্দর তাদের চেহারা, তেমনি তেজীয়ান! একবার ছাড়া পেলেই যেন

তীরবেগে ছুট দেয়! মনে হতো অনেক খানি তেজ যেন আট্‌কা পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে ;— তাদের সেই ছট্‌ফটানি তাদের পায়ের তলাকার পাথরের মেঝেতে খট্‌খট্‌-শব্দে বেজে উঠে চারিদিকে আগুনের ফিন্‌কি ছড়াতো। তারই পাশে ছিল মোটা-মোটা লোহার শিকলে বাঁধা লিক্‌লিকে সরু পা, ছুঁচালো মুখ, এক-সার কুকুর। ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ শব্দে অনবরত মাটি শুঁক্‌ছে —একটু রক্তের গন্ধ পেলেই যেন লাফিয়ে পড়্‌বে। এই ঘোড়া-শালের ঘোড়া দেখতে-দেখতে ভাবতুম হাতীশালটা কোথায়? কিন্তু গরাদের ফাঁক দিয়ে কোথাও খুঁজে পেতুম না ; বোধ হয় ঐ কোণের দিকে ছিল।

লোহার ফটক পেরিয়ে খানিক দূর গেলেই ছোট্ট একটি বাগান —সুন্দর কেয়ারি-করা! চারধারে ফুলের গাছ, তার মধ্যিখানে ময়ূরের পাখম-ছাড়ানো-পিঠ-দেওয়া এক সোনালি সিংহাসন। সকালে দেখতুম এই সিংহাসন খালি কিন্তু বিকেলে যখন পুঁটুদের বাড়ি আমি বেড়াতে যেতুম, তখন দেখতুম এই সিংহাসনে বসে একটি সুন্দর ছেলে—ঠিক যেন রাজপুত্তুর! বয়েস তার আমার চেয়ে কম। আমার চেয়ে রোগা কিন্তু আমার চেয়ে ফর্সা অনেক। বড়-বড় দুটি চোখ ; কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল—থোলো-থোলো হয়ে চাঁদ-পানা মুখের উপর এসে পড়েছে।

এই ছেলেটিকে দেখতে আমার বেশ লাগতো। মনে হতো ঠিক যেন গল্পের রাজপুত্তুর! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এ কোন্‌ দিন্‌ কোন্‌ অচিন্‌ দেশে চলে যাবে, সেখানে কত কাণ্ড করবে, তারপর সাত ডিঙা ভরে ধন-দৌলত আর রাজ কন্যাকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। ছেলেটি সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাব্‌ত। বোধ হয় সেই অচিন্‌ দেশের কথা।

রেলিঙের ধারে রোজ আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার সঙ্গে বোধ হয় তার ভাব করবার ইচ্ছে হতো। এক-একদিন সে তার সিংহাসন ছেড়ে আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতো! বোধ হয় সে আমাকে তার রাজ্যের পাত্তরের পুত্তুর, কি মিত্তরের পুত্তুর মনে করত,— যাকে সঙ্গে নিয়ে সে কোন্‌ দেশ-দেশান্তর চলে যাবে। আমি কিন্তু তাকে আসতে দেখেই ছুট দিতুম। তার সঙ্গে আলাপ করতে আমার কেমন ভয় হতো —যদি সে আমায় নিয়ে আমার মা-বাপকে কাঁদিয়ে কোন্‌ অজগর বনে চলে

যায় মৃগয়া করতে! সে যদি আমাদের পুঁটুর মতো হতো তাহলে তখনি আমি তার সঙ্গে আলাপ কোরে ফেলতুম। কিন্তু সে যে ছিল একেবারে অন্য রকম—রাজ-পুত্তুরের মতন! আমি ছুটে পালাবার সময় দেখতুম, সে লোহার রেলিং ধোরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে যেন অত্যন্ত কাতর-ভাবে। তার সেই চাহনি দেখে আমার কেমন মায়া করতো। আমি যদি তার কেউ আপনার-জন হতুম, তাহলে তার ঐ চোখের দুঃখ হাত দিয়ে মুছিয়ে দিতুম। আহা, ওর কি কেউ বন্ধু নেই?

ছেলেটা নিশ্চয় ছিল মায়াবী। নইলে রোজ পুঁটুদের বাড়ি যাবার সময় তাকে দূর থেকে একবার না-দেখে থাকতে পারতুম না কেন? রোজ ভেবেছি আর যাব না, কিন্তু যাবার সময় কেমন-কোরে যে গিয়ে পড়তুম, নিজেই বুঝতে পারতুম না। কিন্তু রেলিঙের এ-পাশ থেকে তাকে দেখতেই আমার আনন্দ ছিল, ও-পাশে যাবার লোভ আমার কোনো দিনই হয়নি, বরং বিতৃষ্ণাই ছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সে দিন চড়কের মেলা। চৌধুরীবাবুদের বাড়ির উত্তর কোণে চৌমাথায় মেলা বসেছে;—নানা রকম খেলনা বিক্রি হচ্ছে। এক জায়গায় একটা লোক ফানুস বিক্রি করছিল; আমি সেইখানে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। কত রঙের ফানুস—লাল, নীল, সবুজ, হলদে; একসঙ্গে তাড়া-করা। পেট-ফুলো সেই ফানুসগুলো সরু-সরু সুতোয় বাঁধা; সেই বাঁধনটুকু ছিঁড়ে নীল আকাশে উড়ে পালাবার জন্যে তারা ছট্‌ফট্ করছিল; কেবলই মাথা দোলাচ্ছিল। আমি ভাবছিলুম এদের একটা যদি কোনো রকমে ছাড়া পায়, তাহলে দেখি কতদূর সে উড়ে যায়—কতদূর—কতদূর! আমার হাতে যদি তখন কেউ একটা ফানুস দিত, আমি ঘরে না নিয়ে গিয়ে সেটাকে আকাশে ছেড়ে দিতুম। সে কেমন দুলতে-দুলতে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে কোথায় কোন্ স্বপ্ন-লোকে চলে যেত।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে পিছন থেকে কে আমায় কোলে তুলে নিলে। হাত দুটো তার খুব কড়া ঠেকলো বটে, কিন্তু তুলে নেবার ধরণে জোর নেই; যেন আদর আছে। সে আমাকে একেবারে সেই চৌধুরীবাবুদের কেয়ারি-করা বাগানের মধ্যে এনে হাজির করলে। আমার মন থেকে তখনও সেই রঙিন ফানুসের নেশা কাটেনি।

আমার কেমন বোধ হতে লাগলো ঐ ফানুসগুলোই যেন আমাকে এখানে উড়িয়ে এনেছে !

একটা ফুল গাছের ঝোপ্ থেকে গুঁড়ি-মেরে সেই ছেলেটি বেরিয়ে এলো। বুঝি এতক্ষণ সে লুকিয়েছিল ! তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার হাত-ধরে সে বল্লে —"তোমার নাম কি ভাই ?"

কি মিষ্টি গলার স্বর ! আমার সর্ব্বাঙ্গের অস্বোয়াস্তি এক মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আমি কোনো কথাই কইতে পারলুম না। সে আস্তে-আস্তে আমাকে ধোরে নিয়ে গিয়ে তার সেই সোনালি সিংহাসনে আমায় বসালে। তারপর সে আমার পায়ের কাছটিতে মাটিতে গা হেলিয়ে পা-ছড়িয়ে বসে পড়লো। আমি তন্ময় হয়ে তার সেই সুন্দর মুখখানি, টানা-টানা চোখদুটি একদৃষ্টে দেখছিলুম, হঠাৎ সে বলে উঠলো— "অমন কোরে কি দেখছ ? আমার সঙ্গে ভাব করবে না ?"

ভারি ইচ্ছা হতে লাগলো —ছুটে গিয়ে এই মিষ্টি আদরের জবাব দিই, কিন্তু গলা কেমন আট্‌কে গেল, চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠলো, চোখের কোণে জল আসতে লাগলো !

সে তার পাতলা টুকটুকে ঠোঁট-দুখানি একটু কাঁপিয়ে বল্লে— 'রাগ করেছ ভাই, ধোরে এনেছি বোলে ? নইলে তুমি যে আসতে চাওনা ! কি করব ? তোমার সঙ্গে তো বড্ড ভাব করতে ইচ্ছে হলো—তাই তো ধরে আনলুম। রাগ করতো আবার ছেড়ে দিই।" বোলে আস্তে-আস্তে তার সেই সুন্দর মুখখানি আমার মুখের কাছে এগিয়ে আনলে। ইচ্ছে হতে লাগলো সেই মুখখানি দু-হাতে ধরে বলি—না, না রাগ করিনি, রাগ করিনি ! কিন্তু পারলুম না।

সে হতাশ দৃষ্টিতে আমার নির্ব্বাক মূর্ত্তির দিকে খানিক চেয়ে রইল। দেখতে দেখতে তার মুখখানি শুকিয়ে এলো, চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠলো। একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ছেড়ে সে বল্লে—'আমার সঙ্গে ভাব করবেনা ? আমার বন্ধু হবেনা ? আচ্ছা বেশ, তোমায় ছেড়ে দিলুম।" বোলে সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আমি আর থাকতে পারলুম না, ছুটে গিয়ে তার মুখখানি দু-হাতে ধরে

আমার দিকে ফিরিয়ে নিলুম। সে হেসে বল্লে—"তবে তুমি আমার বন্ধু হলে ?" আমি ঘাড় নাড়লুম—"হ্যাঁ।"

সে মহা-আনন্দে আমার হাত ধরে টান্‌তে-টান্‌তে সমস্ত বাগানটা ঘুরিয়ে এক জায়গায় এনে দাঁড় করালে। সেখানে একটা গাছের ডালে বাঁধা লাল, নীল, হল্‌দে রঙের একতাড়া ফানুস - ঠিক তেমনিধারা, যেমন মেলার হাটে বিক্রি হচ্ছে দেখেছিলুম। সে সেই ফানুসগুলো নিয়ে এক-একটি কোরে বাঁধন খুলে উড়িয়ে দিতে লাগলো ;—একটুও মায়া করলেনা। মনের আনন্দে কি যে করবে, সে যেন খুঁজে পাচ্ছিলনা। ছাড়া-পাওয়া ফানুসগুলো উড়ে-উড়ে সন্ধ্যার কাপ্‌সা আকাশটাকে রঙে-রঙে একেবারে রঙিন কোরে তুললে। সব ফানুসগুলো যখন ছাড়া শেষ হয়ে গেল, তখন সে আমার দিক মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে—"আমার নাম সুরজিৎ। আমাকে তুমি সুর বোলে ডেকো—বুঝলে ?"

আমাদের দুজনকার খুব ভাব হয়ে গেল। এর পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই এই বাগানের মধ্যে আমাদের দুই বন্ধুর খেলার আসর, গল্পের আসর জমতে লাগলো। সুরর খেল্‌নার অন্ত ছিল না। ঘুড়ি-লাটাই, ফুট-বল, ব্যাট্‌-বল, লাট্টু, মারবেল—এসব তার অগুন্তি ছিল। মাঝে-মাঝে সে নতুন-নতুন রঙিন বাক্সয়-বন্ধ নানা-রকম ছবি-ওয়ালা বিলিতি খেলা নিয়ে আসতো। সেই সব খেলা সে আমায় শেখাতো। আমরা দু-জনে খেলতুম। এ-ছাড়া সুরর একটি সরু কাঠের বাঁশী ছিল। সে চমৎকার বাজাতো এই কাঠের বাঁশীটি। আমার ভারি ভালো লাগতো। আমি আশ্চর্য্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করতুম—"কোথা থেকে শিখ্‌লি ভাই বাজাতে ?" সে বলতো—"রাণী-মায়ের কাছে।"

রাণী-মা ছিলেন সুররই মা। সুর শুধু মা না বোলে কেন তাঁকে রাণী-মা বলতো জানিনা। কিন্তু তার মুখে ঐ রাণী-মা ভারি মিষ্টি শোনাত। মায়ের কত কথা সুর আমার কাছে বলতো। শুনতে আমার ভারি ভালো লাগতো—ঠিক গল্পের মতন। এই গল্প শুনে-শুনে মনে-মনে রাণী-মায়ের একটা ছবি আমি তৈরি কোরে নিয়েছিলুম। সেই ছবিটিকে ভালোবাসতে আমার ভারি ইচ্ছা করত। তাঁকে চোখে দেখিনি কিন্তু সুরর বাঁশীর সুরে মনে হতো যেন, তাঁরই মিষ্টি গলা শুনছি।

সুরর সঙ্গে এত ভাব হয়ে গেলেও আমার মনে হতো, সে যেন সামান্য ছেলে নয়—সে সত্যিকার রাজপুত্তুর। বিশেষ, সে যখন বাঁশী বাজাতো, আর রাণী-মায়ের গল্প বল্‌তো তখন যেন কোন্ দেশের কোন্ রাজপুত্র সুরজিৎ আমার চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠতো! আর ঐ চৌতলা প্রকাণ্ড বাড়িটাকে মনে হতো যেন কোন্ দূরদূরান্তরের রাজপুরী! আমি দূর-আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাবতুম সন্ধ্যাবেলায় বাজানো রাজপুত্র সুরজিতের এই বাঁশীর সুর বাতাসে ভাসতে-ভাসতে কোন্ রাজকুমারীর বুকে গিয়ে বাজচে কে জানে!

সুর হঠাৎ বাঁশি থামিয়ে হেসে আমায় জিজ্ঞাসা করতো—"অমন এক-মনে আকাশের দিকে চেয়ে কি ভাবছিস?"

আমি থতমত খেয়ে যেতুম। সুর বাঁশি ফেলে আমার হাতখানা তুলে নিয়ে তার গালে-মুখে বুলিয়ে দিত।

হঠাৎ এক দিন হাসি-খেলা গান-গল্প সব বন্ধ হয়ে গেল—সুরর অসুখ হয়ে। আমি যে দিন সেই বাগানে গিয়ে সুরকে প্রথম দেখতে পেলুম না, যখন দেখলুম সমস্ত বাগানখানা শূন্য, তখন আমার মনে হলো রাজপুত্র আমায় যেন একা ফেলে কোন্ দুর্গম দেশে চলে গিয়েছে; বাগানের বাতাস আর গাছের পাতা হা-হা কোরে কাঁদছে! একদিন গেল, দুদিন গেল, সপ্তাহ গেল, তবু সুরর দেখা নেই। আমাদের খেলার আসর যেমন শূন্য, তেমনি শূন্য রয়ে গেল। ইচ্ছে হতো—ভারি ইচ্ছে হতো—ঐ চৌতলা বাড়িটার মধ্যে গিয়ে সুরকে একবার দেখে আসি—একটিবার মাত্র, কিন্তু কি কোরে যাব ঠিক করতে পারতুম না। সুরর সঙ্গে দেখা হতো না, কিন্তু মাঝে-মাঝে রাত্রে ঘুমের মাঝে এসে সে যেন আমার বাঁশী শুনিয়ে যেত। আমি বাঁশীর শব্দে জেগে উঠতুম, কিন্তু জেগে সে-বাঁশী আর শুনতে পেতুম না। আশায়-আশায় কতক্ষণ জেগে থাকতুম, কিন্তু হায় সে বাঁশী আর বাজতোনা!

শুনলুম তার জ্বর-বিকার হয়েছে। শুনেই বুকটা ধড়াস্ কোরে উঠলো। আমার কাকার ছোট ছেলে ক্ষুদুর জ্বর-বিকার হয়েছিল। তার সেই অসুখের ছট্‌ফটানি, ধমকানি, আবোল-তাবোল গোঙানি—সব আমার দেখা ছিল। সুরর সেই একই

অসুখ হয়েছে শুনে আমার সমস্ত বুক আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো। ক্ষুদু পনেরো দিনের দিন মারা যায়; সুরর যদি তাই হয়? না, না! এ-কথা মনে আনতেই কান্না আসে! কিন্তু মন থেকে ঐ পনেরো দিনের আতঙ্কটা কিছুতেই দূর করতে পারতুম না। মনে-মনে ঠাকুরকে বলতুম হে ঠাকুর, ঐ পনেরোর দিনটা যেন না আসে!

চৌধুরী-বাড়ির সকাল সন্ধ্যার নহবৎ বন্ধ হয়ে গেল, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যে ঘড়ি বাজতো তাও আর শোনা যেতনা, সেপাইদের ঘরে রাত্রে মাদলেও আর কাঠি পড়ত না। পাড়ার লোকেরা সুদ্ধ যেন পা টিপে-টিপে চলতো —পাছে শব্দ হয়, পাছে খোকাবাবু চমকে ওঠে – পাছে তার অসুখ বাড়ে!

আমি স্কুল যাবার সময় সুরদের বাড়ির দিকে চেয়ে ভাবতুম —সে কোন্‌খানে কোন্‌ ঘরটিতে শুয়ে আছে তার রাণী-মায়ের কোলে মাথা দিয়ে। ভাবতে-ভাবতে মনে হতো যেন কেমনতর একটা ঝাপ্‌সা কালো ছায়া সেই বাড়ির গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে! দেখে আমার ভয় করতো। তারপর বিকেলে স্কুল থেকে ফেরবার সময় আমি আমাদের সেই খেলার বাগানের সাম্‌নে চুপিচুপি এসে দাঁড়াতুম। দেখতুম ছেঁড়া ন্যাকড়া-পরা ভিখারির দল চোখ মুছতে-মুছতে ফিরে যাচ্ছে। দেখে আমার কান্না পেত।

এই সব ভিখারিদের রোজ সন্ধ্যাবেলা সুর ভিক্ষা দিত। সে বলতো, তার রাণী-মা এই ভিক্ষা দেওয়ার খেলা তাকে শিখিয়েছেন। এই খেলাতে দেখতুম সুরর যেন সব-চেয়ে বেশী আনন্দ। এই ভিখারির দল এলে সে সব খেলা ফেলে, সব কিছু ভুলে এদের কাছে ছুটে যেত। তার সেই সুন্দর হাতখানি নেড়ে-নেড়ে সে কাউকে চাল, কাউকে পয়সা, কাউকে ফল বিতরণ করতো। আবার কখনো-কখনো কোনো গরীব মেয়েকে বাগান থেকে বেছে-বেছে একটি ফুল তুলে দিত। যে যা পেত, খুসি হয়ে হাসি-মুখে চলে যেত। এখন আর সুরর সেই ভিক্ষা দেওয়া খেলা নেই; এদের মুখে সে হাসিও নেই। তাদের সেই শুক্‌নো মুখ দেখে আমারও বুকটা শুকিয়ে আসতো।

দেখতে-দেখতে সেই সর্ব্বনেশে পনেরো দিনটা এগিয়ে এলো। সে দিন সকালে উঠেই শুনলুম—সুরর আজ খুব বাড়াবাড়ি, আজকের দিনটা কাটে কিনা! পনেরো দিনের দিন ক্ষুদু যখন মারা যায়, তখনও ঠিক এই কথাই শুনেছিলুম। সেই কথা

মনে পোড়ে বুকটা ছাঁৎ কোরে উঠলো। কেবলই মনে হতে লাগলো—সুরকে যদি আজ একটিবার দেখতে পাই, তাহলে তার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই!

সারাদিন সুরর জন্যে মনটা কেমন ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো। তাদের বাড়ির আশে-পাশে দিনের মধ্যে কতবার ঘুরে এলুম। কেবলই মনে হচ্ছিল কে যেন বলবে সুর ভালো আছে, কোনো ভয় নেই! ওদের বাড়িতে কত লোক এলো, কত লোক গেল, কিন্তু কেউ সে-কথা বল্‌লেনা। সবাই যেন মুখ-ফিরিয়ে চলে গেল। ক্ষুদু যেদিন মারা যায় ঠিক এমনিধারাই হয়েছিল।

রাত্রে যখন বুড়ি-ঝি বিছানা পেতে দিতে এলো, আমার তখন কেমন কান্না পাচ্ছিল। আমি বুড়িকে জিজ্ঞাসা করলুম—"বুড়ি, সুর কি সত্যি বাঁচবে না?"

বুড়ি বল্লে—"সবাই তো তাই বলছে ভাই!"

আমি বল্লুম—"ওরা তো রাজা, ওরাও কি ইচ্ছে করলে নিজের ছেলেকে বাঁচাতে পারে না?"

বুড়ি বল্লে—"ভাই, যম কি আর রাজা-প্রজা মানে?"

সুর তা হলে বাঁচবে না? আমি বালিশে মুখগুঁজে শুয়ে পড়লুম। বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আমি তো কই কাঁদিনি, তবু বুড়ি বল্লে—"কেঁদোনা ভাই, ঘুমোও।" মনে হলো বুড়ি যেন তার ডান হাত দিয়ে তার চোখ-দুটো একবার মুছে নিলে। রোজ রাত্রে শোবার সময় এই বুড়ির সঙ্গে আমি সুরর কত গল্পই করতুম। আজ আর কোনো গল্প করতে ইচ্ছে হলো না।

বুড়ি আমার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বল্লে—"ঘুমুলি ভাই?"

আমি বল্লুম—"না। আমার আজ আর ঘুম আসছে না। তুই যা।"

বুড়ি বল্লে—"দেখ্‌, চৌধুরীবাবুদের খোকাকে বাঁচাবার এক উপায় আছে—কিন্তু সে কি ওরা পারবে?"

আমি বিছানায় উঠে বসে বল্লুম—"কি উপায়, বুড়ি?"

সে বল্লে—"তাহ'লে আমাদের দেশের একটা গল্প বলি, শোন্‌।"

আমি চুপ কোরে রইলুম। বুড়ি গল্প বলতে লাগলো।

"সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন খুব ছোট—তোর চেয়েও বোধ হয় বয়স কম। আমি তখন দেশে আমার বাপের বাড়িতে থাকতুম। আমাদের দেশের রাজার সবে-ধন একমাত্র ছেলে! অনেক মানৎ, অনেক পূজো-স্বস্ত্যয়ন কোরে এই ছেলে হয়। এই ছেলের ভাতে রাজবাড়িতে মহা ধূম লেগে গেল। তেমন ধূম আমাদের দেশে কেউ কখনো দেখেনি! যাত্রা পাঁচালি তরজা, কত রকমের আমোদ যে হয়েছিল, তার ঠিক নেই। সাত দিন, সাত রাত্রি গাঁয়ের কেউ ঘুমোয়নি। দিন-রাত হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার! চারদিক থেকে এত লোক এসেছিল যে গাঁয়ে আর লোক ধরে না—বোধ হতো যেন মস্ত মেলা বসে গেছে! তার উপর, রাজা দেশ-বিদেশ থেকে যত বড়-বড় সাধু-সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ-ফকির নিমন্ত্রণ-কোরে আনিয়েছিলেন, তাঁর ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কোরে যাবার জন্যে। তাদের দেখবার জন্যেই বা ভিড় কত! এই সাধু-সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চানন-তলায়, কেউ চণ্ডীতলায় আসন পেতে বসলেন। সালু-মোড়া রাজবাড়ির পাল্কি, সামনে সেপাই-বরকন্দাজ এবং ভিতরে রাজপুত্তুরকে নিয়ে বটতলা থেকে পঞ্চানন-তলা, পঞ্চানন-তলা থেকে চণ্ডীতলায় সকাল-সন্ধ্যা সাধু-সন্ন্যাসীদের আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে ফিরতে লাগলো। সন্ন্যাসীরা কেউ পায়ের ধূলো দিয়ে, কেউ যজ্ঞের ভস্ম দিয়ে, কেউবা একটি রাঙা রুদ্রাক্ষ দিয়ে ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করলেন। কত দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, কত বাউল-ফকির যে কত রক্ষা-কবচ, সিদ্ধ-কবচ এবং হরেক রকমের মাদুলি দিলেন তার ঠিক নেই! মাদুলির ভারে সেই আটমাসের ছেলের গলা ও ঘাড় ঝুঁকে পড়লো, হাত আড়ষ্ট হয়ে গেল! বেচারা হাত-তুলে, ঘাড়-নেড়ে যে একটু খেলা করবে তার উপায় রইল না। সবাই বল্লে, হাঁ এ ছেলে নিরোগ তো হবেই, চাই কি অমরও হতে পারে!

"কিন্তু অদৃষ্ট যাবে কোথা? আট দিন যেতে-না-যেতেই ছেলে অসুখে পড়লো। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক চরণামৃত দিলেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না—অসুখ বেড়েই চল্লো। এত আমোদ-আহ্লাদ দুদিনের মধ্যেই কর্পূরের মতো উবে গেল। অমন জমজমাট গাঁ কানা-বাড়ির মতো হাঁ-হাঁ করতে লাগলো। রাজাবাবু

কেবল সন্ন্যাসীদের ছাড়লেন না। তিনি হুকুম দিলেন ছেলেকে না সারিয়ে কোনো সাধু-সন্ন্যাসী গাঁ-ছেড়ে যেতে পাবেন না। গেলে টের পাবেন! সন্ন্যাসীরা কেউ বটতলায়, কেউ পঞ্চানন তলায় বসে নানা রকম ক্রিয়াকাণ্ড সুরু কোরে দিলেন। রোজ-রোজ নতুন-নতুন মাদুলি, কবচ তৈরি হ'তে লাগলো। শেষে রাজাবাবু বলে পাঠালেন যে ছেলের গায়ে মাদুলি বাঁধবার আর জায়গা নেই। উপায় কি?

"এত কোরেও কিছুতে কিছু হলো না। ছেলে এখন-যায়, তখন-যায় হয়ে উঠলো। রাজবাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাড়ির চাকর দাসী সবাই চুপি-চুপি বলাবলি করতে লাগলো, ছেলে বাঁচবে না! তখন ছেলের এক মামা কোন্ সহর থেকে এক বড় ডাক্তার এনে হাজির করলে। ডাক্তার এসেই আগে তাড়াতাড়ি ছেলের বুক থেকে নিজের হাতে মাদুলি, কবচ সব খুলে ফেলে দিলে. কারো কথা শুনলে না. —বল্লে মাদুলির ভারে যে ছেলে নিশ্বেস নিতে পারছে না. দম আটকে আসছে!

"ডাক্তার আসতেই গাঁয়ে আবার হৈচৈ পড়ে গেল। লোক-জন এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো—এটা আন, ওটা আন্, সেটা আন্! গাঁ থেকে সহর পর্যন্ত ঘোঁড়ার ডাক বসে গেল। সেপাই বরকন্দাজ কেউ ডাক্তারের লেখা কাগজ হাতে ওষুধ আনতে ছুটলো, কেউ বরফ আনতে ছুটলো, কেউ আরো কত কি আনতে ছুটলো। এই গোলমালের মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসীদের দিকে আর কারো নজর রইল না; তাঁরা সেই ফাঁকে যার-যেখানে সরে পড়লেন। বটতলা, পঞ্চাননতলা ফাঁক হয়ে গেল, কেবল চণ্ডীতলা থেকে জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী নড়লেন না; তিনি অটল হয়ে বসে রইলেন।

"আমার মা ছিলেন এই রাজপুত্রের দাসী। এই ছেলের ভাতে তিনি পরণে পেয়েছিলেন গরদের সাড়ি, হাতে পেয়েছিলেন সোনার অনন্ত। আর আমি পেয়েছিলুম একখানি লাল চেলি, আর আমার ছোট ভাইটি পেয়েছিল একটি রূপোর ঝুমঝুমি!

"আমার ছোট ভাই তখন বোধ হয় বছর-খানেকের হবে। মা রাজবাড়ি থেকে একবার সকালে, একবার দুপুরে, একবার সন্ধ্যাবেলা এসে তাকে দুধ খাইয়ে

যেতো! সারাদিন সে আমার কাছেই থাকতো। সে কাঁদলে আমি তাকে কোলে বসিয়ে দোল-দিয়ে খেলা দিয়ে, ভুলিয়ে রাখতুম। রাত্রে সে আমার বুকটিতে হাত রেখে আমার পাশে চুপ কোরে ঘুমিয়ে থাকত। আমার ভাইটি ছিল ভারি লক্ষ্মী, আমাকে একটুও জ্বালাতন করত না। তার সেই কচি-কচি নরম হাত দিয়ে আমায়-যে জড়িয়ে ধরতো আমার এখনো তা মনে লেগে আছে।

"ডাক্তার আসতে দিন-দুয়েক রাজপুত্রের অসুখ একটু কম পড়লো। মা আমার ভাইটিকে দুধ খাওয়াতে এলে তাঁর মুখেই শুনলুম। কিন্তু দুদিন না যেতেই অসুখ আবার বেড়ে উঠলো। একদিন সন্ধ্যাবেলা মা এসে আমাকে চুপিচুপি বল্লেন —'আজ রাতটা বোধ হয় কাটবে না!' বোলে মা আমার তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমার ভাইটিকে একটু আদরও করলেন না, একটু দুধও খাওয়ালেন না। দেখে, মায়ের উপর আমার ভারি রাগ হলো। আমি ঝিনুকে-কোরে একটু গাই-দুধ আমার ভাইটিকে খাইয়ে দিতে গেলুম, কিন্তু সে খেতে চাইলে না; আমার কোলেই ঘুমিয়ে পড়লো। আমি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলুম। সে আজ আর আমার বুকে হাতটি রেখে ঘুমোল না আমার মনে কেমন অস্বোয়াস্তি হতে লাগলো। আমার ভালো ঘুম হলো না। আমি রাত্রে উঠে-উঠে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে লাগলুম। সে অকাতরে ঘুমতে লাগলো।

"পরদিন মা রাজ-বাড়ি থেকে একবারও এলেন না—ছেলেকে দুধ খাওয়াতে। আমার ভাইটিও এমন লক্ষ্মী যে সারাদিন কাঁদলে না, চুপটি কোরে পড়ে রইলো। আমি তাকে দুধ খাওয়াতে গেলুম, সে দুধ গিলতে পারলে না! আহা বেচারার দোষ কি? আমি ছেলেমানুষ কি দুধ খাওয়াতে জানি? বেচারা সারাদিন না খেয়ে পড়ে রইলো, কিন্তু এমনি লক্ষ্মী যে তবু একটু কাঁদলে না। আহা, ভাইটি আমার! মায়ের উপর ভারি রাগ হতে লাগলো। এমন লক্ষ্মী ছেলেকে হেনস্থা করে!

"সারা রাত্রির মধ্যেও মা এলো না। আমি একলাটি ভাইকে নিয়ে পড়ে রইলুম। পরের দিন সকালে এসে মা বল্লেন—"বোধ হয় মা-চণ্ডী মুখ-তুলে চাইলেন। রাজ-

কুমার আজ সাত দিন পরে চোখ মেলে চেয়েছে। কাল দিন-রাত কোথা দিয়ে কেমন কোরে কেটেছে, ভগবানই জানেন!" বোলে মা-আমার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

"আমার ভাইটি তখনো ঘুমচ্ছিল। আমার মা গিয়ে তাকে আদর কোরে ডাকলেন—"খোকন্! খোকন্! খোকন্ আমার!" খোকন্ কোনো সাড়া দিলে না। তার সেই রূপোর ঝুমঝুমিটা ধোরে মা তার কানের কাছে কত বাজালেন, কিন্তু ভাই-আমার আর জাগলো না।" বোলে বুড়ি চুপ করলো।

আমি ধড়মড় কোরে উঠে বসে বল্লুম—"কি হলো বুড়ি? তোমার ভাইয়ের কি হলো?

সে বল্লে—"কি হলো ভাই, তাতো বুঝতে পারলুম না। সে আর ঘুম থেকে জাগলো না। অনেকে অনেক কথা বল্লে। কেউ-কেউ বললে, ঐ যে চণ্ডীতলায় সন্ন্যাসী অচল অটল হয়ে বসেছিল, সেই নিশির ডাক দিয়ে আমার ভাইয়ের প্রাণটিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।"

আমার পাশ থেকে আমার ছোট ভাই সুটু বোলে উঠলো—"নিশির ডাক কি বুড়ি?" সে বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমোয়নি, শুয়ে-শুয়ে বুড়ির গল্প শুনছিল।

বুড়ি বল্লে—"নিশির ডাক? সে ভাই, বড় সর্ব্বনেশে কাণ্ড! তার কথা ভাবতেও বুকে কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

সুটু বল্লে—নিশির ডাকে কি হয় বুড়ি?

বুড়ি বল্লে—"জ্যান্ত-মানুষের প্রাণ-পুরুষ মরা-মানুষের দেহে চলে যায় আর অমনি দেখতে-দেখতে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, আর জ্যান্ত মানুষ ধড়ফড়িয়ে মারা যায়।"

সুটু বল্লে—"তাই বুঝি তোমার ছোট ভাই মারা গেল, আর তোমাদের রাজকুমার বেঁচে উঠলো?"

বুড়ি বল্লে—"আমাদের গাঁয়ের লোকেরা তো তাই বলে ভাই! তাদের কেউ-কেউ নাকি দেখেছিল জটা-জুটধারী ত্রিশূল-হাতে এক ক্ষ্যাপা ভৈরব সেই রাত্রের অন্ধকারে একটা ডাব হাতে কোরে আমাদের বাড়ির আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

সুটু বল্লে—"ডাব হাতে কোরে কেন?"

বুড়ি বল্লে—"ঐ ডাবের মধ্যে কোরেই তো প্রাণ-পুরুষকে নিয়ে যায়। ঐ ডাব

হচ্ছে মন্ত্র-পড়া ডাব। কাল-ভৈরবের পূজো দিয়ে, সাত দিন, সাত রাত্রি, অনাহারে, অনিদ্রায় অনবরত এক-মনে মারণ-মন্ত্র জপ কোরে সিদ্ধ-ভৈরবরা ঐ ডাবকে গুণ করে। ঐ ডাব তখন আর ডাব থাকে না;—ওর মধ্যে তখন কালপুরুষের আবির্ভাব হয়। সেই কালপুরুষ এসে তাঁর হাতের মৃত্যু-দণ্ডটি মানুষের বুকে ছুঁইয়ে বুকের ভিতর থেকে প্রাণটিকে খসিয়ে নিয়ে চলে যান।"

সুটু বল্লে—"যার প্রাণটাকে নিয়ে যায়, সে কিচ্ছু করতে পারে না?"

বুড়ি বল্লে—"তার সাধ্য কি কিছু করে! তার প্রাণ সুড়সুড়-কোরে কাল-ভৈরবের সঙ্গে চলে যায়।"

সুটু বল্লে "ওর কোনো উল্টো মন্ত্র নেই? যে-মন্ত্র জপ করলে কাল-ভৈরব আর কাছে ঘেঁসতে পারে না?"

বুড়ি বল্লে—"না, কোনো উল্টো মন্ত্র নেই বটে, কিন্তু নিশির ডাকে যদি সাড়া না দাও, তাহলে কাল-ভৈরবের ঠাকুরদাদাও তোমার কিছু করতে পারবে না।"

সুটু বল্লে—"নিশির ডাকে সাড়া দেওয়া কাকে বলে?"

বুড়ি বল্লে—"তা বুঝি জান না? ঐ মন্ত্র-পড়া ডাব নিয়ে ভৈরবরা নিশুথ রাতে, যখন চারিদিক অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, সবাই যখন ঘুমিয়েছে, কেউ কোথাও জেগে নেই, সেই সময় কালো ত্রিশূল হাতে, কালো কাপড় পোরে, বাড়ির দরজায়-দরজায়, বাড়ির জানলার কাছে-কাছে—যেখানে ছোট-ছোট ছেলেরা ঘুমোয়, সেইখানে ঘুরে বেড়ায়, আর আস্তে-আস্তে মিষ্টি গলায় ছেলেদের নাম ধোরে ডাকে। যে ছেলে ঘুমের ঘোরে সাড়া দেয়, কালপুরুষ এসে তার প্রাণটিকে বুক থেকে খসিয়ে নেয়—"

সুটু বল্লে—"যে সাড়া দেয় না?"

বুড়ি বল্লে—"তার কিছুই হয় না। সে যেমন ছিল, তেমনিই থাকে।"

"আর যে সাড়া দেয়?"

"তার প্রাণ-পুরুষটি তার ঐ সাড়া দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বুক থেকে বেরিয়ে আসে। তার পর চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনি ঐ মন্ত্র-পড়া ডাব প্রাণ-পুরুষকে নিজের দিকে টানতে থাকে। প্রাণ-পুরুষ ডাবের কাছা-কাছি এলেই ভৈরব-ঠাকুর ঐ ডাবের

মুখটি একবার খুলে ধরেই চট্-কোরে বন্ধ কোরে দেন আর প্রাণ-পুরুষ ঐ ডাবের মধ্যে আট্‌কা পড়ে যায়।"

"তারপর ?"

"তারপর ঐ ডাবের মুখটি একটুখানি ফাঁক-কোরে প্রাণ-সুদ্ধ ডাবের জল মরা-মানুষকে খাইয়ে দেয়—মরা-মানুষ সেই নতুন প্রাণ পেয়ে বেঁচে ওঠে।"

মুটু বল্‌লে—"প্রাণপুরুষ সেখান থেকে ফুড়ুৎ-কোরে পালিয়ে এসে নিজের দেহে ঢুকে পড়ে না কেন ?"

"তা কি আর পারে ভাই ? সে তখন বত্রিশ নাড়ির বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেছে—তার কি আর পালাবার যো আছে! সে তখন পালাতেও পারে না—থাকতেও তার ভালো লাগে না।"

"থাকতে ভালো লাগে না কেন ?"

"নিজের বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়িতে থাকতে কি মানুষের ভালো লাগে ? সে তবু বাড়ি ; এ যে নিজের দেহ ছেড়ে পরের দেহে বাস করতে হয়!—এ কি কম কষ্ট ? নিজের মা-বাপ থাকতে পরের মাকে মা বলতে হয়, পরের বাপকে বাপ বলতে হয় ; নিজের ভাই বোন কেউই আর তখন আপনার থাকে না।"

"সব পর হয়ে যায় ?"

"সব পর হয়ে যায়!"

"তোমার সেই ছোট-ভাইটি পর হয়ে গেলে, সে তোমায় চিন্‌তে পারত ?"

"পারত বৈ কি! সেই রাজকুমারের বড়-বড় চোখের ভিতর থেকে আমায় উঁকি-মেরে দেখে, সে আমায় খুব চিন্‌তে পারতো—এ আমি বেশ টের পেতুম। আমার মনে হতো সে যেন মাঝে-মাঝে ইসারা কোরে বলতো—দিদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে তোমাদের কাছে নিয়ে যাও।"

মুটু বোলে উঠলো—"তুমি তাকে কোলে নিয়ে ছুট্টে পালিয়ে যেতে না কেন ?"

"কি কোরে যাব ভাই ? সে কি আর তখন আমার ছোট ভাইটি আছে ? সে যে তখন রাজপুত্তুর—পরের ছেলে!"

"তোমার ভাই তাতে কাঁদতো ?"

"কাঁদতো বই কি ! আমার দিকে চেয়ে-চেয়ে তার চোখ-দিয়ে টস্‌-টস্‌-কোরে জল গড়িয়ে পড়তো !"

"তুমি তাকে খুব আদর করতে না কেন ?"

"আদর করতুম তো। কিন্তু সে আদর তো আমার ভাই পেত না – সে পেত আমাদের গাঁয়ের রাজাবাবুর ছেলে। যে গায়ে আমি হাত বুলোতুম সে গা তো আমার ভাইয়ের গা নয়, সে যে রাজকুমারের গা ; তাতে আমার ভাইয়ের প্রাণ খুশি হবে কেন ? সে তাতে আরো কাঁদতো। রাজার বাড়ির এত আদর-যত্নেও আমার ভায়ের প্রাণে কোনো সুখ ছিল না –এ আমি তার সেই মুখখানি দেখেই বুঝতে পারতুম। আহা, তার চেয়ে আমার ভাইটি আমাদের গরীবের ঘরে নুন-ভাত খেয়ে অনেক সুখে থাকতো।"

মুটু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বোলে উঠলো "এ তোমার গল্প, না ? এ সব কথা সত্যি না ; না বুড়ি ?"

বুড়ি বোল্লে –"না ভাই, এ সব সত্যি। এর একটুও মিথ্যে নয়।"

মুটু বল্লে –"এ গল্প ভালো নয়. একটা ভাল গল্প বল্‌ বুড়ি।"

বুড়ি বল্লে – 'না, আজ আর গল্প নয়, তোরা ঘুমো -রাত হলো।" বোলে বুড়ি বাসন মাজতে চলে গেল। আমি বুড়ির গল্পের কথা ভাবতে-ভাবতে শুয়ে পড়লুম।

মুটু দেখি অনেকখানিটা আমার কাছে সরে এসে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে। আমি বল্লুম –"কি রে মুটু ?"

মুটু বল্লে—'দাদা, বড় ভয় করছে !"

আমি বল্লুম—"কিসের ভয় ?"

'যদি নিশিতে ডাকে ?"

আমি বল্লুম—"সাড়া দেবো না।"

"যদি দিয়ে ফেলি ?"

"তা হ'লে ভারি মুস্কিল হবে কিন্তু !"

নুটু ভয় পেয়ে বোলে উঠলো —"তবে কি করব দাদা ? কি হবে!" বোলে সে কেঁদে ফেল্‌লে।

আমি তার গায়ে হাত-বুলিয়ে বল্লুম—"তোর কোনো ভয় নেই, আমি তোকে পাহারা দেবো।"

নুটু চোখ মুছতে-মুছতে বললে—"কিন্তু দাদা, তুমি যেন অন্যমনস্কে সাড়া দিয়ে ফেলো না।"

আমি বল্লুম—"না রে না, কোনো ভয় নেই! এখানে—এই সহরে নিশির ডাক কোথা থেকে আসবে ?"

নুটু বললে —"যদি আসে! তুমি দাদা, জানলাগুলো বন্ধ কোরে দাও!"

আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ কোরে দিলুম। নুটু আমার বুকের কাছটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমার ঘুম আসছিল না, আমি শুয়ে-শুয়ে ভাবতে লাগলুম—স্বপ্নর কথা।

রাত কত জানি না, বুড়ি হঠাৎ আবার ঘরের মধ্যে হন্তদন্ত এসে বললে—"কি রে তোরা ঘুমুলি ?"

আমি বল্লুম—"কেন, বুড়ি ?"

সে খুব চাপা গলায় বললে—"ভাই, তোরা আজ খুব সাবধানে থাকিস!"

আমি বল্লুম—"কেন, কি হয়েছে ?"

সে বললে —"বড় সর্ব্বনেশে কথা শুনে এলুম! চৌধুরীবাবুদের খোকাকে ডাক্তার বদ্যি এসে দিয়েছে —বিষ-বড়ি খাইয়েও কিছু হলো না!"

আমি বোলে উঠলুম—"বুড়ি, কি হবে ? আমি স্বপ্নকে একবার দেখতে পাব না ? কত দিন তাকে দেখিনি!"

বুড়ি আঁৎকে উঠে বোলে উঠলো—"না, না! এখন আর তাকে দেখতে ইচ্ছে করিসনি সর্ব্বনাশ হবে!"

আমি বল্লুম—"কেন বুড়ি ?"

বুড়ি বল্লে—"সে তুই ছেলেমানুষ বুঝতে পারবি না! তুই ভাই, আজ চুপ কোরে থাক। সুরর কথা আজ আর মনে তোলাপাড়া করিসনি।"

আমি বল্লুম—"তুই অমন করছিস কেন বুড়ি, কি হয়েছে?"

বুড়ি বললে—"ভাই, কি হয়েছে বুঝতে পারছি না; আমার ছোট ভাইটি যে-রাতে মারা যায় সে-রাতেও আমার বুক এমনি ধড়ফড় করেছিল। তখন কিছু বুঝতুম না, তাই ঐ সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল! আজ তোরা কারুর ডাকে সাড়া দিসনি বুঝলি?—কারুর ডাকে নয়।"

আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ-কোরে উঠলো! আমি ভয়ে-ভয়ে বল্লুম "তবে কি আজ নিশির ডাক হবে?"

বুড়ি বল্লে—"সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। দেখনা, আজকের রাতটা কি রকম ভয়ানক অন্ধকার হয়ে উঠেছে—কেবলই গা ছম্-ছম্ করছে! গাছ-পালাগুলো অবধি ভয়ে কাঠ হয়ে আছে! বাড়িগুলো যেন থর-থর কোরে কাঁপছে! আকাশের বুকের ভিতরটা যেন দুর-দুর করছে। আর বাতাসের গায়ে যেন প্রকাণ্ড একটা কাল্-প্যাঁচা কেবলই ডানা দিয়ে ঝাপ্‌টা মারছে—ঝপ্-ঝপ্-ঝপ্!

আমি বল্লুম—"কিন্তু ভৈরব-ঠাকুর কি এসেছে?"

বুড়ি বল্লে—"এসেছে বৈ কি! শুনলুম, চৌধুরীবাবুরা কোথা এক ভাম ভৈরবকে আনিয়েছে। আমি ছাদে উঠে দেখলুম, ওদের ঐ ঠাকুর-বাড়ির দিক থেকে কালো কুণ্ডলী ধোঁয়া উঠছে—বোধ হয় কাল-ভৈরবের পূজো হচ্ছে।"

আমি বল্লুম—"কিন্তু বুড়ি, সুটু যে ঘুমিয়ে রইলো! ও তো কিছু জানলে না।"

বুড়ি বল্লে—"ওকে জাগিয়ে দে ভাই, জাগিয়ে দে।"

আমি সুটুকে ধোরে ঠেলে দিতেই সে ধড়-মড় কোরে উঠে বসে ঢুল্‌তে লাগলো। আমি তাকে ঠেলা দিতে-দিতে বল্লুম—"সুটু আজ নিশির ডাক হবে—চুপ কোরে বসে থাক।"

সুটু ঘুমের ঘোরে আমার গলা জড়িয়ে ধোরে ফ্যাল্-ফ্যাল্ চোখে আমার দিকে

চেয়ে রইলো—কোনো কথা বল্লে না। আমি বল্লুম—"বুড়ি, তুই আজ আর এখান থেকে নড়িস্‌নি।"

বুড়ি বল্লে "তা আর বলতে! আমি এই সারারাত জেগে রইলুম।" বোলে সে আঁচল পেতে মাটিতে শুয়ে পড়লো। তারপর বল্লে—"দেখ্, আজ আর তু-চোখের পাতা এক করিস্‌নি, তাহলেই ওরা নিতুলি মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।"

আমি নুটুকে ধোরে বোসে রইলুম। পাছে ওরা নিতুলি মন্ত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, এই ভয়ে কিছুতেই চোখ বুজলুম না! নুটু কিন্তু আমার গায়ের উপরই ঘুমিয়ে পড়লো। একটু পরে দেখি বুড়িরও নাক ডাকছে। আমি ডাকলুম—"বুড়ি! বুড়ি!" সে সাড়া দিলে না। নুটুকে ডাকলুম "নুটু! নুটু!" সেও সাড়া দিলে না। নিশ্চয় ওরা নিতুলি মন্ত্রে এদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে!—এই কথা ভাবছি, এমন সময় কে যেন একটা ঝাপটা দিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে গেল। সব অন্ধকার! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—"বুড়ি! বুড়ি!" "নুটু! নুটু!" জবাব পেলুম না! সব একেবারে চুপ। আমি একা সেই থম্‌থমে অন্ধকারে অসাড় হয়ে বসে রইলুম! জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের অন্ধকারগুলো ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার আশে-পাশে, চারিদিকে কালো-কালো বিকট চেহারার নানা রকম মূর্ত্তি তৈরি করে দেখাতে লাগলো। আমি কাঠ হয়ে একদৃষ্টে সেই সব দেখতে লাগলুম। চোখ বুজতে পারলুম না, পাছে ঘুমিয়ে পড়ি!

কিন্তু নিতুলি-মন্ত্রে আমার চোখের পাতা ক্রমেই ভেরে আসতে লাগলো। শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগলো। মাথার ভিতরটায় কে যেন আস্তে-আস্তে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। হাত, পা, কোমরের খিলগুলো হঠাৎ যেন ফুস-কোরে খুলে গিয়ে আমার সর্ব্বশরীর এলিয়ে গেল। তারপর কি হলো জানি না।.........

"নিপু! নিপু!"

আমি ধড়্‌মড়্-কোরে বিছানায় উঠে বসে বল্লুম—"কি ভাই, কি ভাই সুর?"

"নিপু! নিপু!"

"এই যে ভাই সুর!—এই যে ভাই আমি!"

"নিপু! নিপু!"

"যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি!"

বলতে-না-বলতেই কে যেন আমাকে কোথা দিয়ে কেমন-কোরে একেবারে চৌধুরী-বাবুদের বাড়িতে সুরর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেল্লে। আমার যেন হঠাৎ টনক নড়লো—তাইতো এ কি করেছি! ঘুমের ঘোরে নিশির ডাকে সাড়া দিয়েছি! সর্ব্বনাশ! আমি থর্‌থর্-কোরে কাঁপতে লাগলুম। কে এসে আমার হাত ধরলে। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—"না গো না, আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই থাকব না। আমায় বাড়ি রেখে এসো!" কিন্তু সে আমার কথা কানে তুললে না। আমি আরো কাঁদতে লাগলুম। কে একজন নরম গলায় বললে—"ভয় কি তোমার, কিচ্ছু ভয় নেই।" বোলে সে আমার গায়ে হাত বুলোতে লাগলো।

আমি কেঁদে বল্লুম "ওগো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, আমায় তোমরা বাড়িতে রেখে এসো। নইলে আমার মা বড় কাঁদবে।" সে কি বলতে যাচ্ছিল, একজন খুব মোটা গলায় বোলে উঠলো—"বোধ হয় ছেলেটা টের পেয়েছে। তাই গোল বাধিয়েছে; নইলে এমন তো হবার কথা নয়! দাঁড়াও ওকে ঠাণ্ডা করছি।"—বোলেই সে-লোকটা এসে তার লোহার মতন শক্ত হাত দিয়ে আমার চোখ-ছুটো সজোরে চেপে ধরলে। অমনি আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এলো; সর্ব্বাঙ্গ শির্‌শির্ করতে লাগলো—বুকের ভিতরটা ধুক্-ধুক্ করতে-করতে হঠাৎ ধপ্ কোরে একেবারে থেমে গেল। তারপর কি হলো জানি না।.....

"নিপু এসেছিস্ ভাই? নিপু!"

হঠাৎ দেখি সুরো ও আমি একটা যেন হাত-পা ওয়ালা খুব ছোট্ট খুবরির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি কোরে রয়েছি। এই জায়গাটুকুর মধ্যে যেন কেবল সুরকেই ধরে, আমি যেন বেশী। তাই আমার কেমন কষ্ট হচ্ছিল;—খুব একটা আঁটি জামা গায়ে জোর কোরে পরিয়ে দিলে যেমন অস্বোয়াস্তি হয়, আমার তেমনি বোধ হচ্ছিল! মনে হচ্ছিল যে জামাটা যদি ফ্যাঁস্-কোরে ছিঁড়ে যায়, যেন একটু আরাম পাই।

সুর বল্লে "নিপু, তোর জন্যেই আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম ; নইলে কখন্ চলে যেতুম।"

আমি চীৎকার কোরে বোলে উঠলুম—"এরা জোর-কোরে—ভুলিয়ে আমায় ধরে এনেছে, তুমি আমায় এখ্‌নি বাড়ি পাঠিয়ে দাও।"

সুর বল্লে—"রাগ করছিস কেন ভাই ? এরা এনেছে বলেই তো তোর সঙ্গে দেখা হলো—নইলে তো আর দেখা হতো না। আমি যে চলে যাচ্ছি।"

"আঁা, চলে যাচ্ছিস ? কোথা যাচ্ছিস ভাই ?"

"সেই রাজকুমারীর কাছে।"

"কোন্ রাজকুমারী ?"

সেই যে নীল সাড়ী-পরা চাঁপার-বরণ রাজকুমারী আমার জন্যে বসে-বসে মালা গাঁথে।"

আমি বল্লুম —"সে তো গল্পের রাজকুমারী।"

সুর বল্লে—"আমিও যে গল্পের রাজপুত্র। তাইতো সেই গল্পের রাজকুমারী আমায় ডেকেছে—রাজকুমার এসো, আমার গলায় মালা দেবে এসো।"

আমি বল্লুম—"যদি না যাস্ ?"

সে বল্লে—"না গেলে যে আমার গল্প শেষ হবেনা।"

আমি বল্লুম—"নাই বা শেষ হলো।"

সে বল্লে—"তা কি হয় ? আমাকে যেতেই হবে।"

"তুই গেলে রাণী-মা যে কাঁদবেন।"

"তোরা তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস্। বলিস—সুর বোধ হয় মৃগয়া করতে গেছে—এই এলো বোলে, তুমি কেঁদোনা।"

"তবু যদি কাঁদেন ?"

"বলিস্ রাণী-মা কেঁদোনা ! তুমি কাঁদলে সুরও কাঁদবে।"

আমি বল্লুম—"না, না তোকে যেতে হবেনা।"

সে বল্লে—"রাজকুমারী আমার জন্যে যে-মালা গেঁথেছে, সে কি সামান্য মালা ! স্বপন-ফুলের গাছে দিনের-পর-দিন চোখের জল দিয়ে অনেক দুঃখে একটি ফুল ফোটে। এমনিতর হাজার ফুলে রাজকুমারী আমার গলার মালা গেঁথেছে।"

আমি বল্লুম—"সে নিশ্চয় মায়াবী মালা, সে মালা গলায় পরলে, তুই আর ফিরে আসতে পারবিনা।"

সুর বললে- "সে তো মায়াবী মালাই—মায়ার সুতো দিয়ে যে গাঁথা।"

আমি বল্লুম –"তবে তো কিছুতেই আর তুই ফিরে আসতে পারবি না।"

সে বললে—"কেন গল্পের রাজকুমারেরা তো মাণিকের পাতা, হীরের ফুল, মুক্তো-ফলের গাছ আনতে কত দুর্গম দেশে গিয়েছে, তারা কি ফিরে আসে নি? তেমনিতর আমিও আসব।"

আমি বল্লুম—"কি করে আসবি?"

সে বল্লে—"হয় তো কোন দিন আমার হাতের তলোয়ার লেগে আমার গলার মালার মায়া-সুতো ছিঁড়ে যাবে, আর অমনি মনে পড়ে যাবে রাণী-মাকে, মনে পড়ে যাবে তোকে; আমি ছুটে চলে আসব।"

আমি বল্লুম –সুর, তুই এমন নিষ্ঠুর হলি কি কোরে? আমাদের ছেড়ে যেতে তোর কষ্ট হচ্ছে না?'

সুর বল্লে—"দেখ-দিকিন্ আমার বুকে হাত দিয়ে।"

সুরর বুকে হাত দিয়ে দেখলুম তার প্রাণটা যেন ফেটে পড়ছে!

আমি বল্লুম—"ভাই সুর, তবে কেন যাচ্ছিস?"

সুর বল্লে –"তুই যে রাজকুমারার বাঁশী শুনিসনি, তাই বুঝতে পারছিস না। সে ডাক শুনলে কি আর থাকা যায়? নইলে দেখিস না, এই মানুষ ঘরে আছে, হঠাৎ কাঁদিয়ে-কেঁদে সে কোথায় বিবাগী হয়ে চলে যায়।"

আমি বল্লুম–"সুর, তোর জন্যে আমার বড় মন-কেমন করবে, আমার কান্না পাবে।"

সুর বল্লে –"আমার খেলনাগুলো তোকে দিয়ে গেলুম, তুই সেগুলো নিয়ে খেলিস্, মনে হবে যেন আমার সঙ্গেই খেলছিস। এই দেখনা, আমি অসুখে শুয়ে-শুয়ে তোর দেওয়া সেই ছবির বইখানা দেখতুম, আর আমার মনে হতো, তুই যেন গল্প বলছিস।"

আমি বল্লুম — 'কিন্তু তোকে দেখতে না পেলে রাণী-মা বড় কাঁদবে!"

সুর বল্লে—"তুই তাঁকে ভুলিয়ে রাখিস ভাই।"

আমি বল্লুম—"আমি কি কোরে ভুলিয়ে রাখব?"

সে বল্লে—তুই আমার মায়ের কাছটিতে থাকিস্। বলিস্—এই যে মা, আমি তোমার সুর! সন্ধ্যাবেলা ফুলের বাগান থেকে খেলা শেষ-কোরে এসে বলিস্—এই যে মা, আমি তোমার সুর, খেলা কোরে ফিরে এলুম। আমার বাঁশী শুনিয়ে তাঁকে বলিস্—এই দেখ মা, তোমার সুর কেমন বাঁশী বাজায়! আমার মুক্তোর মালাটা গলায় দিয়ে বলিস—এই দেখ মা, মুক্তোর মালা তোমার সুরর গলায় কেমন মানিয়েছে! মা মনে করবে, এই তো আমার সুর! সুর তো কোথাও যায়নি!"

আমি চীৎকার বোলে উঠলুম—"না, না, আমি রাণী-মায়ের ছেলে হোতে পারবো না। আমার মায়ের জন্যে বড় মন-কেমন করবে—আমার মা কাঁদবে, খুটু কাঁদবে!"

সুর বল্লে—"কিন্তু এরা যে আমার বদলে তোকে রাণী-মায়ের ছেলে হবার জন্যেই এখানে এনেছে।"

আমি বল্লুম—"না, না, আমি কিছুতেই তুমি হবনা, আমি নিপুই থাকবো! তোর দুটি পায়ে পড়ি, তুই আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দে!"

সুর বল্লে—"আচ্ছা, তোর ভয় নেই।"

আমি বল্লুম—"না, তুই ঠিক কোরে বল্—আমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিবি?"

সুর বল্লে—"দেবো, দেবো—আমি কথা দিচ্ছি তোকে ঠিক তোর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দোবা।"

আমি বল্লুম—"তবে এখুনি পাঠিয়ে দে।"

সে বল্লে—"দিচ্ছি। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?"

আমি বল্লুম—"কি?"

সে বল্লে—"সেখানে গিয়ে তোদের জন্যে যদি বড্ড মন-কেমন করে?"

আমি বল্লুম—"তা কি করবে? ঐ মায়াবী মালা গলায় পরলে আমাদের কথা হয় তো আর মনেই থাকবেনা।"

সুর বল্লে—"হয় তো সন্ধ্যাবেলা তোর কথা মনে পড়বে, হয় তো রাত্রে শোবার

সময় রাণী-মাকে মনটা খুঁজতে থাকবে, হয় তো সকালে উঠে ভাবতে থাকব—কৈ আমার চন্দনা পাখী তো ডাকছেনা—খোকাবাবু ওঠো, খোকাবাবু ওঠো !"

আমি বল্লুম—"তখন কি করবি ?"

সে বল্লে—"কি আর করব ? হয় তো সমুদ্রের ধারে একা গালে হাত দিয়ে ব'সে ভাববো—এই সমুদ্র পেরিয়ে যাই কেমন কোরে ? হয় তো রাজকুমারী আমার চোখের জল মুছিয়ে বল্‌বে, কেঁদোনা ! কিন্তু তবু মন কাঁদতে থাকবে ! তোরা হয় তো তখন ভুলে যাবি, কিন্তু আমি তোদের কথাই কেবল ভাব্‌বো আর কাঁদবো।"

আমি বল্লুম—"সুর, তবে তুই যাস্‌নি।"

সুর বল্লে—"সবাই তো যেতে মানা করছে, সবাই তো ছেড়ে দিতে কাঁদছে, কিন্তু তবু তো থাকতে পারছিনা ভাই ! রাজকুমারার ঐ বাঁশীর সুর যে প্রাণ টেনে নিয়ে চলেছে। ঐ সেই বাঁশীর ডাক ! নিপু, বিদায় দে ভাই। মনে রাখিস্ আমায় !"

আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম—"না সুর, না, যাস্‌নি !"

আমার কান্নার দু-ফোঁটা জল হাতে নিয়ে সে বল্লে—"এই আমার রইলো—তোর স্মরণচিহ্ন !"

আমি আরো চীৎকার কোরে কেঁদে উঠলুম—"না, না, তোকে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা।" বোলে তার হাত চেপে ধরলুম।

সুর আমার হাতটি বুকে খানিক চেপে চুপ-কোরে রইলো। তারপর আস্তে-আস্তে মুখ তুলে বল্লে—"ঐ আমার রথ এসেছে।" বোলে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে। বল্লে—"আর তোকে ধোরে রাখব না, তুই তোর মায়ের কাছে যা। আমায় বিদায় দে।" বল্‌তে-বল্‌তে সুর কোথায় মিলিয়ে গেল, আমিও যেন সঙ্গে-সঙ্গে মিলিয়ে যেতে লাগলুম। কি হলো কিছু বুঝতে পারলুম না। কেবল শুনলুম মা যেন অনেক দূর থেকে ডাকছে—"নিপু ! নিপু !"

* * *

"নিপু ! নিপু !"

আমি ধড় মড় কোরে উঠে চোখ মুছতে দেখলুম চোখের পাতা ভিজে।

"নিপু ! নিপু !"

আমি চোখ মুছে দেখি, মা-আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে।

"নিপু! নিপু!"

আমি বল্লুম—"কি মা?"

মা বল্লেন—"দেখবি আয়।"

আমি বারান্দায় গিয়ে দেখি সকালের সোনালি রোদে আকাশ ভোরে গিয়েছে; আর একখানি সোনালি চতুর্দ্দোলায় ফুলে-ফুলে সাজানো ফুলের মালা গলায় জরির জামা গায়ে বরের বেশে চলেছে রাজপুত্র সুরজিৎ—যেন কোথাকার কোন রাজপুরী থেকে তার বধূ আনতে।...

তার পর কত দিন ঐ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি—কত বর, কত বধূ নিয়ে ফিরে এলো দেখলুম, কিন্তু সুর আর এলো না।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

জলার পেত্নী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যতীনের কথা

সকালবেলা স্থির করলুম যেমন করেই হোক আজই অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্গে দেখা কোরে কাল রাত্রের সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলতে হবে। জলার মধ্যে যে লোকটা রাত্রে সেই ভাঙা ঘরের মধ্যে দেখা গেল তার সঙ্গে অপূর্ব্ব বাবুদের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা আগে তাই জানতে হবে। একবার মনে হোলো আজকের দিনটা এইখানে কাটিয়ে রাত্রি বেলা হঠাৎ সেই লোকটার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হোলে মন্দ হয় না! কিন্তু তার আগে একবার অপূর্ব্ব বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে পরামর্শ করাই ঠিক বলে মনে হোলো।

রোদটা ভাল কোরে ওঠবার কিছু পরে সেই গুপ্ত ঘর থেকে বেরিয়ে চৌধুরীদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। তারপর এক জায়গায় সুযোগ বুঝে দাড়ি গোঁফ খুলে ফেলে অপূর্ব্ব বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম।

শুনলুম অপূর্ব্ব বাবু তখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি। আমি তাঁর খাস বৈঠকখানায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তিনি ঘুম থেকে উঠে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম কি মশায় আপনি এত বেলা অবধি ঘুমোন?

অপূর্ব্ববাবু তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে বল্লেন - চলুন ওপরে যাই, আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

বৈঠকখানা থেকে তুলে অপূর্ব্ব বাবুর আমাকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি বলুন দিকিন?

অপূর্ব্ব বাবু বল্লেন ব্যাপার পরে বলছি। এখন বলুন দিকিন আপনাকে দেওয়ানজী এখন দেখেছেন কিনা!

আমি বল্লুম—না। আপনার চাকর ছাড়া আমায় আজ সকালে কেউ দেখেনি।

অপূর্ব্ব বাবু বল্লেন—তা হোলে আজ সমস্ত দিন আপনাকে আমার এই ঘরে লুকিয়ে থাকতে হবে। আজ রাত্রে দেওয়ানজীকে ধরতে হবে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম— কেন আবার নতুন কিছু হয়েছে নাকি?

অপূর্ব্ব বাবু বল্লেন - না নতুন ঠিক নয়, সেই পুরানো ব্যাপারই চলছে। কাল রাত্রেও জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাতি নাড়া চলেছিল। কিন্তু আমার ভাবনা হচ্ছে যে এদের ষড়যন্ত্র আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। শেষকালে হয়ত আমরা ওদের ধরেও কিছু করতে পারব না। তাই মনে করছি আজ রাতেই দেওয়ানজীকে ধরে ফেলব।

অপূর্ব্ব বাবুর কথাটা আমার মনে লাগল। মনে হোলো সত্যিই তো! এরা রোজ রাত্রে জানালায় দাঁড়িয়ে কি করে! হয়ত দেওয়ানজীকে ধরলেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ হোয়ে পড়তে পারে। দুজনে মিলে ঠিক করা গেল যে, সেদিন রাতেই তাদের ধরা হবে।

কাল রাত্রে জলার মধ্যে ভাঙা ঘরে যে দৃশ্য দেখেছি অপূর্ব্ব বাবুকে সে কথা আর কিছু বল্লুম না। দেখলুম নানান কারণে তিনি বিশেষ রকম বিব্রত হোয়ে পড়ছেন পর ওপরে আবার ঐ কথা শুনলে আরও বিব্রত হোয়ে পড়বেন। আমি তখুনি কলকাতায় জ্ঞানানন্দ বাবুকে সমস্ত কথা খুলে চিঠি লিখলুম। এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য তারও একটা পরামর্শ চেয়ে পাঠান গেল।

সমস্ত দিনটা অপূর্ব্ব বাবুর শোবার ঘরে বসে কাটিয়ে দিলুম, ঘর থেকে একবারও বেরুলুম না। কারণ যদি আমায় দেওয়ানজী দেখতে পায় তা হোলে হয় আজ রাত্রে তারা আলো নাড়া বন্ধ করতে পারে। সেদিন বিকাল বেলা অপূর্ব্ব বাবুর সদাশিব বাবুর বাড়ীতে যাবার কথা ছিল। যাবার সময় তিনি আমাকে বল্লেন আমি সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসব। আপনি ঘর থেকে বেরুবেন না।

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লুম—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি ঘর থেকে বেরুব না।

অপূর্ব্ব বাবু বেরিয়ে গেলেন। বসে থাকতে থাকতে অন্ধকার হোয়ে গেল। আমি যে সকাল থেকে এই ঘরের মধ্যে আছি এ চাকরটা তা জানত। আমার কথা কারুকে বলতে একে বারণ কোরে দেওয়া হয়েছিল।

বসে থাকতে থাকতে আটটা বেজে গেল তবু অপূর্ব্ব বাবুর দর্শন নেই। শেষকালে আলমারী থেকে একখানা বই পেড়ে নিয়ে পড়তে আরম্ভ কোরে দিলুম। পড়তে পড়তে নটা বেজে গেল তবু অপূর্ব্ব বাবু এলেন না। আমার মনে সন্দেহ হোতে লাগ্‌ল—তাঁর কোনো বিপদ হোলো না তো?

আরও কিছুক্ষণ বসে রইলুম কিন্তু সন্দেহ আরও বাড়তেই লাগ্‌ল। শেষ-কালে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে জলার সামনে যে ছাদ আছে সেই খানে গিয়ে দাঁড়ালুম।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। রাত্রি অন্ধকার, সামনে কিছুই দেখা যায় না। শুধু সেই অন্ধকারে গা মিশিয়ে এক একটা উঁচু পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টে সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি আর এমন সময় হঠাৎ সেই নির্জ্জন

শুনে চমকে উঠলুম। এবারকার গর্জ্জনটা এত জোরে হয়েছিল যে জলার পাহাড়ে ধাক্কা লেগে চারিদিকে তার প্রতিধ্বনি হোতে লাগ্‌ল। আমি যতদূর সম্ভব চোকটাকে বড় কোরে জলার মধ্যে দেখতে লাগলুম কিছু দেখা যায় কি না। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা কোরেও কিছু দেখতে পেলুম না। এই রকম অবস্থায় আবার একটা গর্জ্জন শুনতে পাওয়া গেল। তারপর যে দৃশ্য দেখলুম তা জীবনে কখনো ভুলব না। সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার হাত পা ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগ্‌ল।

দেখতে পেলুম হঠাৎ অনেক দূরে যেন দপ্ কোরে খানিকটা আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। তারপর সেই আগুনটা যেন দুলতে লাগল। এই রকম দুলতে দুলতে হঠাৎ সেটা ছুটতে আরম্ভ কোরে দিলে। সে কি ছুট! বোঁ বোঁ কোরে একদিকে ছুটে গিয়ে কিছুক্ষণ থামে তারপরে আবার ফিরে উল্টোদিকে ছুটতে আরম্ভ করলে।

প্রথমে মনে করেছিলুম আগুনটা বোধ হয় আলেয়া হবে কিন্তু অনেকক্ষণ ভাল কোরে দেখবার পর বেশ বুঝতে পারা গেল যে, সেটা আলেয়া নয়— সে একটা জন্তু। এতদূর থেকে দেখছি বলে তার পা মাথা ল্যাজ সব মিলিয়ে গোল মতন একটা জিনিষ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এ কি রকম আশ্চর্য্য জানোয়ার! এ রকম জানোয়ার দেখা ছেড়ে কখনো নাম পর্য্যন্ত শুনিনি। এই রকম সব নানা চিন্তায় মগজ ঘুলিয়ে উঠেছে এমন সময় আবার সেই গর্জ্জন।

এবারকার গর্জ্জন শুনে সেটা যে একটা জানোয়ার সে বিষয় আর সন্দেহ রইলো না। এরই গর্জ্জনে তা হোলে মাঝে মাঝে জলা কেঁপে ওঠে।

এতক্ষণ এই সব নানা রকম চিন্তায় কাটছিল হঠাৎ মনে পড়ল যে অপূর্ব্ব বাবু এখনো ফেরেন নি। তাঁর কোনো বিপদ হোলো না তো? আর চিন্তা না কোরে তখুনি বারান্দার নীচে নেমে পড়লুম থাম ধরে, তারপর বাড়ীর পাঁচিল টপ্‌কে জলার ধারের রাস্তায় পড়ে সদাশিব বাবুদের বাড়ীর দিকে দৌড়ে দিলুম। প্রায় আধ মাইল রাস্তা এই রকম ছুটে পার হবার পর দেখতে পেলুম যেন উল্টো দিক থেকে এক একজন দৌড়ে আসছে।

ওদিক থেকে যে দৌড়ে আসছিল সে আমাকে দেখতে পেয়ে ঘুরে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে বল্লুম—কে অপূর্ব্ব বাবু নাকি?

দূর থেকে উত্তর এল—হ্যাঁ, কে যতীন বাবু?

আমি অপূর্ব্ব বাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লুম—কি মশায় ছুটে চলেছিলেন কোথায়?

অপূর্ব্ব বাবু বল্লেন—আরে মশায় আজ জলার মধ্যে যা দেখেছি সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! ছুটে চলেছিলুম আপনাকে দেখাব বলে।

আমি বল্লুম—আমিও দেখেছি। আর আপনি আসছেন না দেখে মনে হোলো বোধ হয় কোনো বিপদে পড়েছেন। তাই সদাশিব বাবুর বাড়ীর দিকে চলেছিলুম।

অপূর্ব্ব বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লেন—কি কাণ্ড বলুন দিকিন?

—তাইত কিছুই বুঝতে পারছি না. এইটাই কি আপনার সেই জলার পেত্নী?

—না না এটা তো সে জিনিস নয়। এটাকে আমি স্পষ্ট দেখেছি একটা জানোয়ার। কি সে জানোয়ার তা বুঝতে পারলুম না। আর পেত্নীটাকে দেখেছি—সেটা জলের উপর দিয়ে ছুটছিল কিন্তু এটাকে দেখলুম ডাঙার ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করছে।

আমি অপূর্ব্ব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা আপনি যে আজ সদাশিব বাবুর বাড়ীতে গিয়েছিলেন দেওয়ানজী সে কথা জানতেন কি?

- হ্যাঁ জানতেন বৈ কি?

এর পর আর তাঁকে কোনো প্রশ্ন করলুম না। আমি ভাবতে লাগলুম যে অপূর্ব্ব বাবুদের দেওয়ানজীর সঙ্গে জলার এই অগ্নিময় জন্তুর নিশ্চয় কোনো সম্পর্ক আছে। হঠাৎ এই রকম একটা দৃশ্য দেখলে ভয়ে মরে যাওয়া অসম্ভব নয়। অপূর্ব্ব বাবুর কাকা যখন মারা যান তখন তাঁর দেহে কোনো রকম অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল না। আমার মনে হোতে লাগল রাত্রিবেলা অন্ধকার পথে একলা বাড়ী ফেরবার সময় হঠাৎ এই রকমের কোনো একটা দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে মারা যাওয়া অসম্ভব নয়।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা অপূর্ব্ব বাবুদের দরজা অবধি এসে পৌঁছলুম। তিনি দরজার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছেন এমন সময় আমি তাঁকে বল্লুম—আপনি যান, আমি অন্য রাস্তা দিয়ে আপনার ঘরে যাচ্ছি।

অপূর্ব্ব অবাক হোয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লেন—তার মানে!

—এখান দিয়ে গেলে এখন দেওয়ানজী আমাকে দেখে ফেলতে পারে। তা হোলে আজ রাত্রে তাদের ধরা মুস্কিল হবে?

— তা হোলে আপনি কোথা দিয়ে যাবেন?

— সে ভাবনা আমার। যেখান দিয়ে নেমেছিলুম ঠিক সেই রাস্তা দিয়েই ফিরে যাব, আপনি কিছু চিন্তা করবেন না।

অপূর্ব্ব বাবু আর বাক্যব্যয় না কোরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি পাঁচিল টপ্‌কে বারান্দার থাম বেয়ে ওপরে উঠে পড়লুম। অপূর্ব্ব বাবুর ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি তখনো তিনি আসেন-নি। আমি যাবার তিন চার মিনিট পরে এসে আমায় তাঁর ঘরে দেখে বল্লেন — অবাক কল্লেন মশাই আপনি?

—কেন?

—আমার বাড়ীর পথঘাট যে আমার চেয়ে আপনার বেশী জানা আছে দেখছি!

কি কোরে পাঁচিল টপ্‌কে ও থাম বেয়ে তাড়াতাড়ি আসতে হয় তা তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম। তারপরে আজ রাত্রে কি কোরে দেওয়ানজীদের ধরা হবে ও ধরার পরে কি কি করা হবে তারই পরামর্শ করা যেতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ বাদে অপূর্ব্ব বাবুর খাস খানসামা আমাদের খাবার নিয়ে এল। খাওয়া দাওয়া শেষ কোরে বাতি নিভিয়ে দিয়ে আমরা দুজনে ওৎ পেতে বসে রইলুম।

অপূর্ব্ব বাবুদের দেউড়ীতে ঢং ঢং কোরে বারোটা বাজার ঘণ্টা পড়্‌ল। তার কিছু পরেই খশ্ খশ্ কোরে কার পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। আমি জানলার ঝিলমিলিতে কাণ পেতে শুনলুম যেন কে একজন ভারি পা ফেলে ফেলে বারান্দা দিয়ে চলে যাচ্ছে। শব্দটা কিছুদূর গিয়ে মিলিয়ে যেতেই আমি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়্‌তে যাচ্ছি এমন সময় অপূর্ব্ব বাবু আমায় বাধা দিয়ে বল্লেন — সর্ব্বনাশ! করেন কি!

কেন ?

—একটু দাঁড়ান, এখনও সেই স্ত্রীলোকটী যে যায়-নি।

—তাইত ! আর একটু হোলে ধরা পড়ে সব মাটি কোরে দিয়েছিলুম আর কি !

আমরা ফিশ্ ফিশ্ কোরে কথা বলছি এমন সময় আবার কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। এবারকার শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর আমরা দুজনে দুটি রিভলভার নিয়ে আলো নিবিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে সেই ঘরের একটা দরজার কাছে দাঁড়ান গেল। তারপরে অপূর্ব্ব বাবু অতি সন্তর্পণে ঝিল্‌মিলির মধ্যে একটা হাত পুরে ভেতরকার ছিট্‌কিনিটা খুলে ফেল্লেন।

তিনি বল্লেন—দরজা একটুখানি খুলে একজন একজন কোরে ঢুকতে হবে। আমি আগে ঢুকি। আপনি ঢুকে ছিট্‌কিনিটা বন্ধ কোরে একটা আলমারীর পাশে লুকিয়ে পড়্‌বেন।

এই বলে অপূর্ব্ব বাবু দরজাটা একটু ফাঁক কোরে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। মিনিট দুয়েক সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমিও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

ঘরের মধ্যে কি অন্ধকার ! উঃ ! মনে হোলো যেন একেবারে অন্ধকূপে এসে পড়লুম ! দরজাটা বন্ধ কোরে দিয়ে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থাকা গেল। কিছুক্ষণ পরে সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন একটু আলো দেখতে পেলুম। দেখ্‌লুম দূরে জলার দিকের একটা জানলা খোলা রয়েছে আর সেই জানলা দিয়ে জলার দিকে মুখ বাড়িয়ে দুজন লোক দাঁড়িয়ে।

কোন দিকে যাব তাই ভাবছি এমন সময় কে যেন ফিশ্ ফিশ্ কোরে বল্লে—যতীন বাবু এই আলমারিটার পেছনে আসুন।

ডান দিকে একটা বড় আলমারি রয়েছে দেখে টপ্ কোরে তার পাশে লুকিয়ে পড়া গেল। দেখলুম অপূর্ব্ব বাবু আগেই সেখানে এসে জুটেছেন।

আমরা দুটিতে সেই আলমারীর পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। খানিক বাদে দেখা গেল দেওয়ানজী একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে জানলা দিয়ে হাত ঝুলিয়ে সেটা

দোলাতে আরম্ভ কোরে দিলে। আমি অপূর্ব্ব বাবুকে বল্লুম—এইবার—ধরা যাক্ —কি বলেন ?

তিনি বল্লেন—হাঁ, এই সময়।

আর একটি কথাও না বলে আলমারীর পেছন থেকে দুজনে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর আমি চীৎকার কোরে বল্লুম কে ওখানে ?

আমার কথা শুনে দেওয়ানজী টপ্ কোরে লণ্ঠনটা ঘরের মধ্যে এনে সেটাকে নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। আমি ততক্ষণে ছুটে তাদের কাছে গিয়ে রিভলভারটা এগিয়ে ধরে বল্লুম —খবরদার! পালাবার কি আলো নেভাবার চেষ্টা কোরো না। তা হোলে এই গুলিতে তোমাদের মাথা উড়িয়ে দেব।

দেওয়ানজী কাঁপতে-কাঁপতে লণ্ঠনটা মাটিতে ঠক্ কোরে রেখে দিয়ে আমাদের মুখের পানে হতভম্বের মতন চেয়ে রইল। আর সেই স্ত্রীলোকটী পাশে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় দিয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে।

অপূর্ব্ব স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়ে বল্লে—এ কে ?

দেওয়ানজী বল্লেন—ইনি আমার স্ত্রী।

—আপনারা রোজ রাত্রে এখানে এসে কি করেন ?

কোনো উত্তর নাই।

আমি বল্লুম—উত্তর না দিলে চল্‌বে না। আমি এখুনি পুলিশে খবর দেব।

এবার দেওয়ানজী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বল্লে—কেন আমরা কি অপরাধ করেছি ?

আমি বল্লুম—অপরাধ তোমাদের গুরুতর। তোমরা অপূর্ব্বর কাকাকে খুন করেছ আর অপূর্ব্বকেও খুন করবার চেষ্টায় ষড়যন্ত্র করছ।

আমার কথা শুনে বুড়ো তো হাউ হাউ কোরে কেঁদে উঠ্‌ল। সে বল্লে—দোহাই আপনার! আমি অপূর্ব্বর কাকার খুনের কথা কিছু জানিনা। সে আমার ছেলের মতন ছিল। আমাকে ছেড়ে দিন আমি আপনাদের কোনো ক্ষতি করিনি।

এবার অপূর্ব্ব বাবু বল্লেন—আচ্ছা রোজ আপনারা এখানে এসে কি করেন তা প্রকাশ কোরে বলুন তা হোলে আপনাদের ছেড়ে দেব।

দেওয়ানজী কিছুক্ষণ চুপ কোরে বল্লে—আচ্ছা আপনারা আমার কোনো ক্ষতি করবেন না বলে যদি প্রতিজ্ঞা করেন তা হোলে বলতে পারি। নচেৎ পুলিশেই দিন আর মেরেই ফেলেন কিছুতেই বলব না।

আমি কোনো কথা বলবার আগেই অপূর্ব্ব বাবু বলে ফেল্লেন—আচ্ছা আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি আপনাদের কোনো ক্ষতি করব না।

দেওয়ানজী বল্লেন—তা হোলে এখান থেকে আপনার ঘরে চলুন। সেখানে গিয়ে সব বলব।

সেই অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই অপূর্ব্ব বাবুর ঘরে গিয়ে বসলুম। তারপর দেওয়ানজী তাঁর কথা বলতে আরম্ভ করলেন। অদ্ভুত সে কাহিনী! সে কথা শুনতে শুনতে আমার ও অপূর্ব্ব বাবুর চোখ জলে ভরে উঠল। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ময়নামতীর মায়াকানন

সতেরো

খাঁড়া-দেঁতো বাঘ

আহারাদির পর একটা গাছতলায় পা ছড়িয়ে ব'সে সোনাউল্লার কাহিনী শুনতে লাগলুম :—

"বাবুজী, বামনদের উড়োজাহাজ যেদিন আবার পৃথিবীতে এসে নামল, * আমাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। তাই আপনারা উড়োজাহাজ ছেড়ে যখন নেমে গেলেন, তখন আমরাও আর থাকতে না পেরে নীচে নেমে পড়লুম। এই ফাঁকে বামনরা যে পালাতে পারে, মনের আনন্দে কারুরই আর সে কথা মনে রইল না।

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, তখনো ভালো ক'রে ভোর হয়নি। মনের

* ১৩৩২ ও ১৩৩৩ সালের "মৌচাকে" প্রকাশিত "মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন" দেখুন

খুসিতে নাচতে নাচতে, লাফাতে লাফাতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আমরা চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ঠিক সেই সময়ে ভয়ানক একটা



ট্রাইশেরাটপ্‌স

কাণ্ড ঘটল। আধা-আলোয় আধা-আঁধারে জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ প্রকাণ্ড কি-একটা বেরিয়ে এল,—আমাদের মনে হ'ল যেন একটা পাহাড় লাফাতে লাফাতে ছুটে আসছে!

প্রথমটা আমরা আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপরে পঙ্গপালের মতন সকলে মিলে ছুটতে লাগলুম! সেই রাক্ষসটাও যে আমাদের পিছনে পিছনে তেড়ে আসছে, তার পৃথিবী-কাঁপানো পায়ের শব্দ শুনেই সেটা বেশ বুঝতে পারলুম। মাঝে মাঝে মানুষের কাত্‌রানিও শোনা যেতে লাগ্‌ল—নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ কেউ তার কবলে গিয়ে পড়ছে!

আরো বেশী ভয় পেয়ে আমরা আরো বেশী বেগে দৌড়তে লাগলুম। কিন্তু পিছনের সেই বিষম পায়ের শব্দ আর কিছুতেই যেন থামতে চায় না! এমনি ছুটতে ছুটতে বন-বাঁদাড় ভেঙে আমরা যখন এই হ্রদের ওদিককার তীরে এসে পড়লুম, তখন আমাদের দম প্রায় আঁট্‌কে যাবার মত হয়েছে। আমরা সেইখানেই কেউ ব'সে আর কেউ শুয়ে প'ড়ে জিরুতে লাগলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ জিরুতে হ'ল না, হঠাৎ বাজের মতন এক ভীষণ চীৎকার শুনেই ফিরে দেখি, সেই পাহাড়ের মতন উঁচু রাক্ষসটা বনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে আসছে! আমরা সকলে তখনি হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলুম। আমাদের ভিতরে তিন-চার জন লোক সাঁতার জানত না, সে বেচারীরা একেবারে তলিয়ে গেল!

সেই সর্ব্বনেশে জীবটা লাফাতে লাফাতে জলের ধার পর্য্যন্ত এল। তারপর এতগুলো শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে, মনের দুঃখে আকাশপানে মুখ তুলে ভয়ানক চ্যাঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে!

অনেকক্ষণ সাঁতার কেটে আমরা শেষটা এই দ্বীপে এসে উঠলুম।

এখানে এসে প্রথম কয়দিন আমরা বনের ফলমূল খেয়ে কাটিয়ে দিলুম। তারপর হঠাৎ একদিন একরকম আশ্চর্য্য হাঁসের বাসার খোঁজ পেলুম – সে হাঁসদের ডানা নেই! তারপর থেকে ফলমূলের সঙ্গে সেই হাঁসের মাংস আর ডিম পেয়ে এখন আর আমাদের পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না।

কি বলচেন? আগুন কোথায় পেলুম? সেও বড় অবাক কারখানা, বাবুজী! ঐ যে পাহাড় দেখচেন, দিন-রাত ওর ভেতরে আগুন জ্বলছে! আমরা ঐখান থেকেই আগুন আনি!

আবার এই দেখুন, পাথর ঘ'ষে ঘ'ষে আমরা কেমন সব বর্শার ফলা, তীর আর ছুরি-ছোরা-কুড়ুল তৈরি করেছি। অস্ত্রগুলোতে কেমন ধার হয়েছে, দেখছেন তো? এই-সব ছুরি আর কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ক'খানা ডিঙিও বানিয়ে ফেলেছি, এখন দরকার হ'লে জলের উপরেও আনাগোনা করতে পারি! খোদাতালার দয়ায় আমাদের আর অন্য কোন কষ্ট নেই বটে, কিন্তু আজ ক'দিন থেকে নতুন এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে!

রোজ রাত্রে কি-একটা অদ্ভুত জন্তু আমাদের সন্ধান পেয়ে বেজায় উৎপাত সুরু করেছে! এর-মধ্যেই সে আমাদের দল থেকে পাঁচজন লোককে ধ'রে নিয়ে গেছে,—আমরা কিছুতেই তার হাত থেকে ছাড়ান্ পাচ্ছি না। এক রাত্রে চাঁদের আলোয় জন্তুটাকে আমি দেখেছি। দেখতে তাকে বাঘের মত বটে, কিন্তু সে বাঘ নয়। কারণ বাঘের চেয়েও সে ঢের বেশী বড়, আর তার মুখের দুদিকে হাতীর মত দুটো দাঁত আছে!

কি বল্লেন বাবুজী? সেকেলে খাঁড়া-দেঁতো বাঘ? সে আবার কি-রকম বাঘ?

তা সে বাঘই হোক্ আর যাইই হোক, আমাদের আর এ দ্বীপে থাকা পোষাবে না। এই বেলা প্রাণ নিয়ে এখান থেকে না পালালে একে একে সবাইকেই মরতে হবে! এখান থেকে কোথায় যাই, বলতে পারেন?"

আঠারো

জাহাজ! জাহাজ!

সোণাউল্লার গল্প শেষ হলে বিমল বললে, "সোণাউল্লা, তোমাদের বাহাদুরি আছে বটে! এই সৃষ্টিছাড়া মুলুকে তোমরা এমন ক'রে সংসার পেতে নিয়েচ।"

সোণাউল্লা দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "কিন্তু বাবুজী, এ সংসার আবার আমাদের তুলতে হবে! নইলে ঐ খাঁড়া-দেঁতো বাঘ নিশ্চয়ই আমাদের ফলার ক'রে ফেলবে!"

আমি বল্লুম, "আচ্ছা সোনাউল্লা, তোমরা এক কাজ করনা কেন? আমরা যে গুহায়

এতদিন ছিলুম, সে গুহাটা খুব বড় আর নিরাপদ। তার ভেতরে অনায়াসে একশো জনের ঠাঁই হ'তে পারে। চল, আমরা সকলে মিলে সেইখানে আবার ফিরে যাই।"

সোনাউল্লা বললে,"সে ঠাঁই এখান থেকে কত দূরে বাবুজী ?"

আমি বললুম, "তা ঠিক ক'রে বলতে পারি না। তবে আমরা যে পাহাড়ে থাকি, তার ওপরে চ'ড়ে দেখচি এখানে এই একটি বৈ দ্বীপ নেই। তা যদি হয় তাহ'লে আমরা নৌকোয় চ'ড়ে পুবদিকের ঐ জঙ্গলের কাছে গিয়ে নামলেই পাহাড়ের খুব কাছে গিয়ে পড়ব।"

সোনাউল্লা বললে, "তাহ'লে সেই কথাই ভালো। আমরা কাল সকালেই এখান থেকে পালাব। সকলকে খবরটা দিয়ে আসি" —এই ব'লে সে উঠে গেল।

রামহরি মুখ ভার ক'রে বললে, "এদের দলে মোছলমানই বেশী। গুহার ভেতরে এতগুলো মোছলমানের সঙ্গে থাকলে আমাদের যে জাত যাবে বাবু!"

আমি বললুম, "এতই যদি জাতের ভয়, তাহ'লে আজ এদের হাতের রান্না মাংস কি ক'রে খেলে রামহরি ?"

—"কে বললে আমি মাংস খেয়েচি ? সব আমি লুকিয়ে বাঘাকে দিয়েচি। আমি খালি ফলমূল খেয়ে আছি!"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "তাহ'লে তুমি এক কাজ কর রামহরি! আমরা আমাদের গুহায় ফিরে যাই, আর তুমি একলা এখানে বাস কর। এই দ্বীপে তোমার যে মহাদেব আছেন, তুমি রোজ প্রাণ ভরে তাঁর পূজা করতে পারবে আর তোমার জাতও রক্ষা পাবে!"

—"কি যে হাসো খোকাবাবু, সব ব্যাপারে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না"—বলতে বলতে রামহরি রাগে গস্ গস্ করতে করতে সেখান থেকে উঠে গেল।

... ...

পরদিন সকালেই আমরা ছিপে চ'ড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে আমরা যেখানে গিয়ে থামলুম ঠিক তার সামনেই সেই ভয়াবহ অরণ্য, যার ভিতরে পথ হারিয়ে আমাদের প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়ে উঠেছিল।

সেইখানে আমরা জিপ্ ছেড়ে নেমে পড়লুম। ডাঙায় উঠে বালুকা-প্রান্তরের দিকে তাকিয়েই আমি দেখতে পেলুম, দূরে—সমুদ্রের ধারে, আমাদের আশ্রয়-স্থান সেই সুপরিচিত পাহাড়টি আকাশ পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা দুই পরে আমরা আবার আমাদের সেই পুরাতন গুহার মধ্যে ফিরে এলুম।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়ে ভীষণ এক ঝড় উঠল—তেমন ঝড় আগে কখনো দেখিনি! সাগরের অনন্ত বুক থেকে তরঙ্গের এমন এক অশ্রান্ত কান্না ভেসে এল যে, পৃথিবীর আর সমস্ত শব্দ যেন কোথায় তলিয়ে গেল! ঝড়ের দাপটে আমাদের পাহাড়টা পর্য্যন্ত থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল।

আমি বললুম, "বিমল, এম্‌নি এক ঝড়ই আমাদের এই দ্বীপের দিকে টেনে এনেছিল, মনে আছে কি?"

বিমল বললে, "মনে আছে বৈকি! সে দিনের কথা কি এ জীবনে আর ভুলতে পারব?"

কুমার বললে, "আজকের এই ঝড়টা যদি দ্বীপটাকে আমাদের দেশের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারত!"

এম্‌নি গল্প করতে করতে আর ঝড়ের হাহাকার শুনতে শুনতে আমরা একে একে ঘুমিয়ে পড়লুম।... ... ...

হঠাৎ অনেকের চীৎকারে আর টানাটানিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল—শুনলুম কমল চীৎকার ক'রে বলছে, "বিনয়বাবু—জাহাজ, জাহাজ!"

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে দেখি, গুহার ভিতরে ভোরের আলো এসে পড়েছে আর আমার পাশে বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি অত্যন্ত উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি, তোমরা এত গোলমাল করচ কেন?"

বিমল বললে, "শীগগির উঠে আসুন বিনয়বাবু, দ্বীপের কাছে একখানা জাহাজ এসে নঙর ফেলেচে।"

শুনেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর ছুটে গুহার বাইরে গিয়ে পুলকিত নেত্রে দেখলুম, আকাশে বাতাসে কোথাও আর ঝড়ের চিহ্ন নেই এবং নীল-সমুদ্রের উপরে একখানি লাল রঙের প্রকাণ্ড জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

চোখের সামনে, সেই জাহাজের গায়ের উপরে ফুটে উঠল—গঙ্গা-ধোয়া, আম-কাঁঠালের বন-দিয়ে-ঘেরা, কোকিল-পাপিয়া-ডাকা আমাদের বাংলা-দেশের আসল ছবি!

উনিশ

ট্রাইশেরাটপ্‌স্‌

আনন্দের প্রথম আবেগটা কেটে গেলে পর সবাইকে ডেকে বললুম, "ভাই সব! আজ এতদিন পরে ভগবান আমাদের ওপরে মুখ তুলে চেয়েচেন! এতদিন পরে আবার আমাদের দেশে ফেরবার সুযোগ ঘটেচে, এমন সুযোগ গেলে আর পাব না! তোমরা সবাই মিলে চীৎকার কর, আর আমি আর বিমল সেই সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করি! তাহ'লেই জাহাজের লোকেরা শুনতে পাবে।"

আমাদের দল এখন খুব ভারি। কাজেই সকলে মিলে যখন চীৎকার করতে লাগল, সারা আকাশটা যেন কেঁপে উঠল! তার উপরে আমার আর বিমলের বন্দুকের আওয়াজ!

হঠাৎ জাহাজ থেকেও বার-কয়েক বন্দুকের শব্দ হ'ল!

কমল আনন্দে লাফাতে-লাফাতে বললে, "শুনতে পেয়েছে! শুনতে পেয়েছে! জাহাজের লোকেরা আমাদের চীৎকার শুনতে পেয়েছে!"

কুমার বললে, "ঐ যে, জাহাজ থেকে দুখানা নৌকো নীচে নামিয়ে দিচ্চে! ঐ যে, জনকয়েক লোকও দড়ীর সিঁড়ি বয়ে নীচে নামচে!"

রামহরি বললে, "দেখে মনে হচ্চে ওরা যেন জাহাজী গোরা!"

দুখানা নৌকো তীরের দিকে আসতে লাগল।

রামহরির কথাই সত্য। নৌকার উপরে যারা রয়েছে, তারা সকলেই নীল পোষাক পরা বিলাতী খালাসী।

নৌকো তীরের কাছে আসবামাত্র আমরা তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেলুম। আজ কতদিন পরে পৃথিবীর নূতন লোকের সঙ্গে দেখা! সাহেব হ'লেও তাদের যেন ভাই ব'লে মনে হ'তে লাগল!

একজন সাহেব আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর পোষাক দেখেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই তিনি জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী!

তিনি ইংরেজীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের দেখে তো ভারতবর্ষের লোক ব'লে মনে হচ্চে! কিন্তু আটলাণ্টিক মহাসাগরের এই অজানা দ্বীপে তোমরা এলে কেমন ক'রে? আমাদের জাহাজ ঝড়ের তোড়েই এদিকে এসে পড়েচে, নইলে এ দ্বীপে তো কখনো কোন জাহাজ থামে না!"

আমি বললুম, "সায়েব, আমরা মঙ্গল গ্রহে ছিলুম, সেখানকার উড়োজাহাজে চ'ড়ে এখানে এসেচি!"

—"কি বললে? তোমরা মঙ্গলগ্রহে ছিলে?"

—"হ্যাঁ, সায়েব!"

—"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ?"

—"না সায়েব! বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করুন।"

—"তা হ'লে তোমরা সবাই পাগল!"

—"হ্যাঁ সায়েব, প্রথমে আমাদের কথা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে বটে! কিন্তু পরে আমাদের সব কথা শুনলেই বুঝবে আমরা সত্যি বলচি কি না! আপাততঃ আমরা আর কিছু চাই না, এ ভয়ানক দ্বীপ থেকে আগে আমাদের উদ্ধার কর!"

—"এ দ্বীপকে ভয়ানক বলচ কেন?"

—"সায়েব, এখানে যে-সব ভীষণ জীবজন্তু আছে, তুমি স্বপ্নেও কখনো তাদের দেখ নি!"

—"সে আবার কি?"

—"এ দ্বীপের বাসিন্দা কারা জানো? পাহাড়ের মতন উঁচু ডিপ্লোডোকাস আর ডাইনোসর, হাতীর মতন বড় বড় ষাঁড়, উড়ন্ত সরীসৃপ বা টেরোডাকটাইল, খাঁড়া-দেঁতো বাঘ, দানব শ্লথ—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "থামো, থামো, আর পাগলামি কোরো না!"

—সেই সঙ্গেই গোরা খালাসীরা চারিদিক কাঁপিয়ে বিকট চীৎকার ক'রে উঠল!

ফিরে দেখি আমাদের কাছ থেকে খানিক তফাতেই, একটা ছোটখাট বনের ভিতর থেকে সাহেবের ব্যঙ্গ-হাসির মূর্ত্তিমান প্রতিবাদের মত কিম্ভূতকিমাকার প্রকাণ্ড এক জানোয়ার বেগে বেরিয়ে আসছে! কেবলমাত্র তার মুখটাই বোধ হয় সাত ফুটেরও চেয়ে বেশী লম্বা এবং তার মাথার উপরে ত্রিশূলের মতন তিনটে ধারালো সিং ও তার মুখখানা দেখতে যেন অনেকটা আমাদের জগদ্ধাত্রী দেবীর কাল্পনিক সিংহের মত! তার চেহারা দেখে বুঝলুম সে হচ্ছে ট্রাইশেরাটপ্‌স!



গরুড় পাখী

সাহেব আর গোরা-খালাসীরা চোখের পলক না ফেলতে এক ছুটে নৌকোর উপরে গিয়ে উঠলেন এবং বলা বাহুল্য আমরাও সকলে গিয়ে নৌকোর উপরে আশ্রয় নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করলুম না! নৌকো দুখানা জাহাজের দিকে চলল, সাহেব আমার করমর্দ্দন ক'রে বললেন, "তোমার কথায় অবিশ্বাস করেছিলুম ব'লে এখন আমি ক্ষমা চাইচি! আজ যা দেখলুম, জীবনে আর ভুলব না!"

* * * *

জাহাজ ছাড়ল,—মানুষের দেশে আবার আমাদের পৌঁছে দেবে ব'লে! আবার যে স্বদেশে ফিরতে পারব, এই আনন্দে আমাদের সমস্ত মন যেন আকুল হয়ে উঠল!

কিন্তু ঠিক শেষ মুহূর্ত্তেই এই দানব-রাজ্যের কয়েকটি সুপরিচিত দূত আকাশ-পথে আর একবার আমাদের দেখা দিলে। সেই গরুড়পাখী বা টেরোডাকটাইল! বিশ ফুট জুড়ে ডানা ছড়িয়ে তারা উড়ে যাচ্ছে দলে দলে!

যে দুটো পাখী আমাদের খুব কাছে ছিল, হঠাৎ তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল! কি বিষম তাদের ঝটাপটি, কি কর্কশ তাদের চীৎকার!

জাহাজ শুদ্ধ লোক ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে লাগল। অনেক গোরা-খালাসী হাঁটু গেড়ে ব'সে উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'ল, একজন পাদ্রী তাঁর ক্রুশখানা উঁচু ক'রে তুলে ধরলেন—সকলের মুখ দেখে মনে হ'ল, নিশ্চয়ই তারা তাদের উড়ন্ত প্রেতাত্মা বা নরকের দূত ব'লে ধরে নিয়েছে! স্ত্রীলোকরা আর শিশুরা তো কেঁদেই অস্থির—কেউ কেউ মূর্চ্ছিতও হয়ে পড়ল!

এমনি ভয়, বিস্ময়, আর্ত্তনাদের মধ্যে জাহাজ বেগে অগ্রসর হ'ল, গরুড়-পাখীরাও ধীরে ধীরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পাদ্রী-সাহেব বললেন, তাঁর পবিত্র ক্রুশ দেখেই সয়তানের দূতেরা ভয় পেয়ে আবার নরকে পালিয়ে গেল!

ময়নামতীর মায়াকানন ক্রমেই আকাশের নীলপটে মিলিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়গুলোকে দূর থেকে দেখাচ্ছে চিত্রে-লেখা মেঘের মত!

রামহরি বললে, "বাবু, দেশে ফিরে এবার আর আমি তোমাদের দলে ভিড়ব না!"

বিমল হেসে বললে, "কেন?"

—"তোমরা সব করতে পারো বাবু! আবার কোন্‌দিন হয়তো স্বশরীরে স্বর্গে যাবার [illegible] ধরবে! তোমাদের পায়ে দূর থেকেই নমস্কার!"

বাঘার [illegible] থাপড়ে কুমার বললে, "হ্যাঁরে বাঘা, তোরও কি ঐ মত?"

বাঘা [illegible] নেড়ে জবাব দিলে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ!" *

শেষ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

---

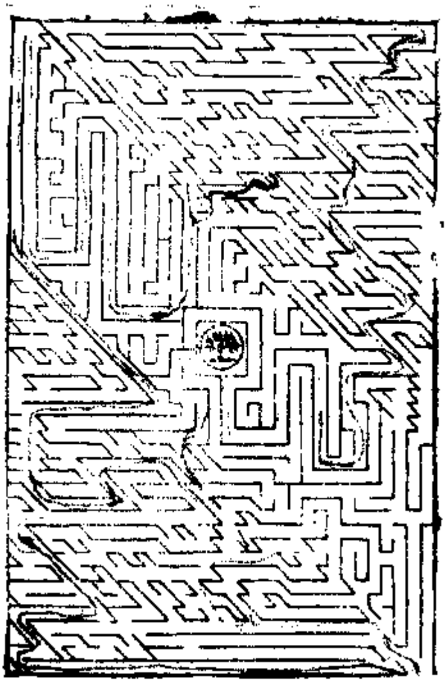
* এর পরে [illegible] "রক্তপতাকার দেশ"—সে হচ্ছে আর-একটী চমকপ্রদ, রোমাঞ্চকর ঘটনা।

এবারের ফুটবল খেলা

মাঠে এবারের 'লিগ' খেলা আরম্ভ হয়েছে। প্রথম বিভাগে তিনটী বাঙ্গালী টিম—মোহনবাগান, এরিয়্যানস আর ইষ্ট বেঙ্গল। এই তিনটী দলই এবারে মোটেই ভাল খেলছেনা। মোহনবাগানের খেলা যেন প্রতি বৎসর নেমে পড়ছে। এবারে ইউরোপিয়ানস্‌দের ভাল দল নাই। সেই জন্যে সবারই খুব আশা হয়েছিল যে মোহনবাগান এবারে অন্ততঃ লিগে প্রথম হোয়ে বাঙ্গালা খেলোয়াড়দের মান রাখবে। কিন্তু প্রথম হওয়া দূরের কথা মোহনবাগান ভাল স্থান পেলে হয়। এ পর্য্যন্ত মোহনবাগান যে কটী খেলা খেলেছে, তার মধ্যে ভাল খেলা হয়েছে ক্যালকাটা ও নর্থ ষ্টাফোর্ডসের সঙ্গে। প্রথমটীতে মোহনবাগান দুই গোলে জেতে এবং দ্বিতীয়টীতে "ড্র" হয়। আর যে সব খেলা হয়েছে তাতে কতক গুলোতে ড্র, কতক গুলোতে কোন রকমে এক গোলে জয় লাভ। আবার দুই একটীতে হারও হয়েছে। মোহনবাগানের খেলার এবার প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে, খুব খারাপ টিমের সঙ্গে ভাল খেলেও সে মোটেই গোল দিতে পারছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এই দোষটা রীতিমত practiceএর অভাবের জন্য। বড় বড় বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা ভাবেন যে তাঁরা যখন বড় বড় দলে খেলেন তখন মাঠে নামলেই খেলা ভাল হবে। সেই জন্যে অনেক সময় দেখা যায় যে এক বছর খেলার কোন অভ্যাস নাই, একেবারে লিগের ভাল খেলার দিন কোন কোন খেলোয়াড় মাঠে খেলতে নেমে পড়েন। তার ফল যা হয় তা তোমরা বুঝতে [illegible] পারছ! [illegible] কোন বিলিতী ক্লাবে এইরূপ হবার উপায় নাই। লিগ [illegible] য়ার দুই তিন মাস আগে ও পরে তারা নিয়মিত ভাবে practice করে। [illegible] ঙ্গালী ক্লাবরা যদি এই নিয়ম মানেন তবে বোধ হয় খেলার মাঠে গোলের [illegible] ন।

সুখের বিষয় দ্বিতীয় বিভাগে দুই একটী বাঙ্গালী ক্লাব বেশ ভাল [illegible]। এবং আশা হয় হয়তো এবারে এই বিভাগে বাঙ্গালী ক্লাব প্রথম [illegible] হাবড়া ইউনিয়নের খেলা বেশ ভাল হচ্ছে এবং তুলনা কোরলে প্রথম বি[illegible]গের অনেক ক্লাবের চেয়ে ভাল। আগামীবারে ফুটবল সম্বন্ধে আর কিছু লিখবার [illegible] আছে।

গোলক ধাঁধা



গাছের তলায় যেতে হবে—একটী সরু পেনসিল নিয়ে চলতে আরম্ভ কর—সাবধান লাইন কেটে ঢুকলে চলবে না।

সবজান্তা

৭৫ খৃষ্টাব্দে মালবেরী গাছের ছাল থেকে সর্ব্বপ্রথমে কাগজ তৈরী হয়।

পৃথিবীর সমস্ত রেল লাইন যদি সরল রেখায় পাতা যায় তবে তা চাঁদে গিয়ে ফের ফিরে আসা যায়। এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৭৭,৬৩৬ মাইল হয়।

আমেরিকায় একটা যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যাতে মানুষের মাথার চুল অনায়াসে তোলা যায়। এই যন্ত্র দিয়ে দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষের মাথায় ১০০,০০০ থেকে ২৫০,০০০ পর্য্যন্ত চুল আছে, আর মাসে আধ ইঞ্চি পরিমাণ চুল সকলেরই বাড়ে।

সে দিন পরিক্ষা কোরে দেখা গেছে যে একটী বড় হাঙরের ২৪,০০০ হাজার দাঁত থাকে।

সে দিন একজন অন্ধ লোকের গায়ে পার্শেলের মত লেবেল মেরে এক স্থান থেকে ডাবলিনের হাসপাতালে পাঠান হয়েছিল।

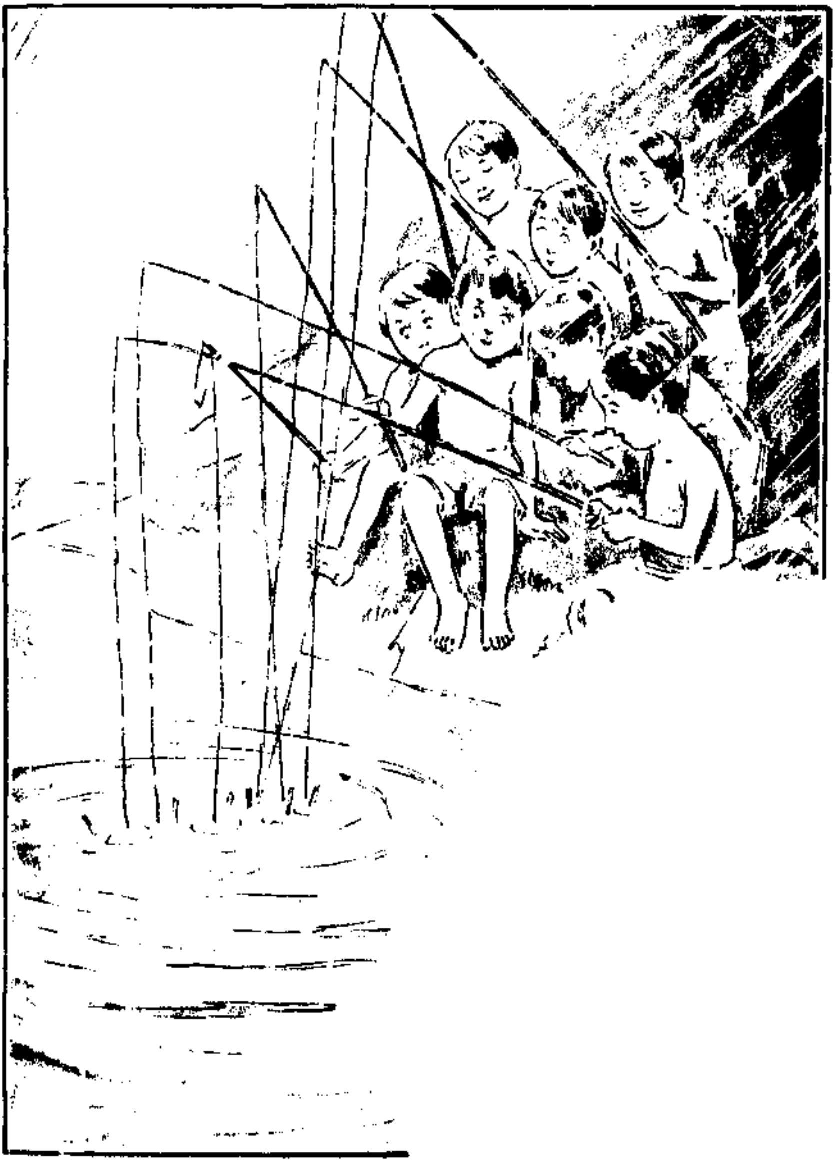
সে দিন একটা মুরগী ৩৬৫ দিনে ৩৫১টী ডিম পেড়েছে।

ধাঁধার উত্তর

মোহনবাগান—কলিকাতা	৩—০
কলিকাতা—ডালহাউসী	০—০
ডালহাউসী—রেঞ্জারস	২—১
মোহনবাগান—ডালহাউসী	২—১
কলিকাতা—রেঞ্জারস	২—০
মোহনবাগান—রেঞ্জারস	২—০

ইন্দুভূষণ দে (গাইবান্ধা), শ্রীবিজয়প্রসন্ন ও বসন্তপ্রসন্ন রায়, শ্রীসুধাময়ী দেবী ও শ্রীকরুণাময়ী দেবী (সাহেবগঞ্জ), শ্রীদেবীপ্রসাদ মল্লিক, রেবা মল্লিক, লিনা মল্লিক ও ইন্দুপ্রকাশ সরকার (রাঁচি), সুনিলকুমার বসু (কলিকাতা), শ্রীঅর্পণাবালা নাগ (কলিকাতা), দেবগোবিন্দ গুপ্ত (রংপুর), নির্ম্মলকান্তি সান্ন্যাল (কলিকাতা), অমিয়া, অমিতা, সমর ও বারীন (বেসীন বর্ম্মা), দীলিপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), কুমারী শোভারাণী দত্ত (কলিকাতা), দেবীদাস চট্টোপাধ্যায় (হাজারীবাগ), দীনেশকুমার পালিত (চন্দননগর), সনৎকুমার ঘোষ (শিবসাগর), মাধবানন্দ মাডগোকার (কারশিয়ং), মদনমোহন সেন (পাটনা), শ্রীহেনা মিত্র ও অমলেন্দু দাস (জব্বলপুর), বৈদ্যনাথ বাগচী (জামালপুর), প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), প্রফুল্লকুমার রায় (গোয়ালিয়র), বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), ননীগোপাল সরকার (জামসেদপুর), সরোজ, হিমাংশু, সুকুমার, ও সুনীলকুমার মিত্র (কটক), রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (কলিকাতা), সুবোধকুমার দে ও সরোজকুমার দে (রেঙ্গুন), অমলকুমার ঘোষ (ঢাকা), রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (পালিগাঁও), সমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সাগর), হিমাংশুশেখর ঘোষ (টাকী), শ্রীশান্তিলতা রায় (রাজসাহী), অমল, মুকুল, সুষমা, সরোজ (ঢাকা), সুশীলচন্দ্র মজুমদার (খুলনা), বিভূতিভূষণ বসু (মেদিনীপুর), কুমারী কনকলতা চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), সুধাময়ী বসু (কলিকাতা)।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, কিবিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত



মৌচাক

৮ম বর্ষ]　　　　শ্রাবণ, ১৩৩৪　　　　[চতুর্থ সংখ্যা

বর্ষা এল

বর্ষা এল ! বর্ষা এল !
শালের বনে টুপ্‌টুপিয়ে,
বাঁশের বনে ঝুপ্-ঝুপিয়ে,
পদ্ম পাতায় খই ফুটিয়ে
বর্ষা এল ।

নদীর দুটী কূল ছাপিয়ে বর্ষা এল ।
তেপান্তরের সজল বায়ে বর্ষা এল ।
মাঠের পরে বনের ধারে
জলাখানির বুকটি জুড়ে,
সারা ভুবন ঘিরে কে আজ
মেঘলা ছায়া এলিয়ে দিল ?
বর্ষা এল ।

ছুট্‌ছে নদী আকুল বেগে, পাগল পারা
গাছগুলো সব দুলে দুলে, হ'ল সারা ;
পড়ার কথা কেন বল,
রাখো তোমার তর্ক গুলো,
আঁধার ঘরে সজল বায়ে
গল্প শোনার দিন যে এল।
বর্ষা এল!

(আজ) ঝিঁঝিঁর গানে ব্যাঙের ডাকে
স্বপন পুরীর ঘুমটী জাগে।
হারাস্ নে'ক এই দিনটী,
ওরে মণি ওরে টুটী
(দেখ) কেয়াবনের ওপারে কে
সজল আঁচল দুলিয়ে গেল ?
বর্ষা এল!

টুপ্‌টুপিয়ে ঝুপ্‌ঝুপিয়ে অলস সুরে,
শোন্—আঁধার রাতে কেমন করে বিষ্টি পড়ে।
(ভাই) বাঁচ্‌লে পরে আসবে অনেক
দুখের সুখের আঁধার আলো—
কে জানেরে আসবে কি না
এমন বাদল—এমন কালো।
আজ ছেলে বেলার বর্ষা এল॥

শ্রীভোলানাথ মিত্র

ছেলেবেলার দুর্ব্বুদ্ধি

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। গাছে গাছে আমগুলো বেশ ডাঁসা হয়ে উঠেছে। পণ্ডিত মশাইয়ের পাঠশালায় আমি আর গদা তখন পাণ্ডা পড়ুয়া। আমার বাবা উকিল। লেখাপড়ায় আমি পাকা, বিশেষত ধারাপাতে। গুরুমশাই ছেলেদের উপদেশ দিতে হইলেই আমাকে দেখিয়ে বল্‌তেন, "ভাল ছেলে কাকে বলে জানিস? এই দেখ্‌ নিমাই!" ছেলেরা তখন সব হাঁ করে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চেয়ে দেখ্‌ত। আমার সঙ্গে তাদের কিছুই প্রভেদ ছিল না তবু কেন যে পণ্ডিত মশাই আমাকেই ভাল ছেলে বল্‌তেন তা তারা বুঝ্‌তে পারতো না। গদা লেখাপড়া ভাল না পারলেও সে পণ্ডিত মশাইয়ের ডানহাত ছিল। পাঠশালা থেকে আরম্ভ করে তাঁর বাড়ীর অনেক কাজে কর্ম্মেই তাকে থাক্‌তে দেখা যেত। গুরুমশাই আমাকে মাঝে মাঝে বল্‌তেন, "দেখিস, গদা বড় হলে সেকালের উতঙ্ক, কি উপমন্যুর মত নাম রেখে যাবে।"

সেদিন সকালে দু'জনে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে ছুটি নিয়ে বোসেদের আম বাগানে ঢুকে পড়া গেল। এবারে প্রত্যেক গাছেই আম হয়েছে। বোস মশাই বাগান পাহারা দেবার জন্যে দু'জন উড়ে মালি রেখেছেন। কতকটা তাদের চড়া আওয়াজে, আর কতকটা তাদের ধনুকের মত বাঁকা বাঁকের বহর দেখে গাঁয়ের ছেলেপিলেরা ভয়ে বাগানের দিকে এগোতো না। আমরাও সভয়ে বাগানে ঢুকে পড়লাম। বাগানের মাঝখানে হোগ্‌লা দিয়ে ছাওয়া চারটে সরু খুঁটির ওপরে একখানা চালা। চারিদিকে দরমার বেড়া। এই ঘরখানিই মালিদের আড্ডা। আমাদের দেখেই একটা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "তু কি রে? কাঁহিকি অসিছু? চলি যা।" গদা তার কোন জবাব না দিয়েই একেবারে মালিদের ঘরের কাছে গিয়ে ভাল মানুষের মত তাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলে, "বাবা বল্‌ছিলেন ও মাসে পুরী যাবেন। তোমরা কেউ পাণ্ডা হয়ে তাঁর সঙ্গে যেতে পার কিনা? তাহলে তার ভাড়া দিতে হবে না।" বিনা পয়সায় দেশে যেতে পারবে শুনে তাদের দুজনেরই সমান আগ্রহ। গদাটা আবার

কতই যেন দরকার এমনি করে পুরীর বিষয় ছাই ভস্ম কত কি জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লো। তারাও কোন বিষয় জানিনা বল্‌লে পাছে সুযোগ ফস্‌কে যায় তাই বিজ্ঞের মত যা তা উত্তর দিতে সুরু করলে। তখন গদা বল্‌লে, "হাঁ, উড়িয়াজি, আমাদের দেশের মত তোমাদের দেশে এত ভূতের উপদ্রব নেই তো?" তাহাদের মধ্যে একজন একথাটা ঠিক বুঝতে পারলেনা। কিন্তু অপরটি তখনি বল্‌লে, "ভূতো? হঁ, পুরীরে ভূতো অছন্তি। সব্ দেশের অছন্তি। তাঁকে সুখেরে রহিছন্তি। ভাই, সে কথা তুণ্ডরে ধরোনা। হে ভগবন্ সঙ্কটরো পার কর।" বলে বাগানের পশ্চিমে পানা-পড়া পুকুর-পাড়ের কেয়া-ঝোপের দিকে তাকিয়ে বার কয়েক পেন্নাম করলে। আমি এতক্ষণ আড়চোখে মালির ঘরের সামনের গাছের ওপরে তাকিয়ে দেখ্‌ছিলাম, কি বড় বড় আমের থলো! তার দু'তিনটে পেলেই যথেষ্ট। আর একবার তাকিয়ে বখন তলা থেকে অন্ধকারে ঠিক্ কোন্ কোন্ ডালে পা দিয়ে গাছে উঠে থলোগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে কতখানি হাত বাড়ালে সেগুলো নাগাল পাওয়া যায় সেটা মনে গেঁথে নিচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় গদার মালিকে এই ভূতের প্রশ্ন শুনে আমার কৌতূহল হল। ভূতের নামে উড়ের মুখের অবস্থা দেখেই আমারও মনের মত্‌লবটা তখনি পাকা হয়ে গেল। এই মালিটার নাম রোঘো—সেটা ভীষণ জোয়ান। তার সঙ্গীর নাম নিধে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম তারা খায় বোসমশাইয়ের বাড়ীতে। আগে রোঘো খেয়ে আসে; তারপর নিধে খেতে যায়। সেখানে নিধের গাঁয়ের দু'একজন লোক থাকায় তাদের সঙ্গে তাসটাস খেলে কোন কোন দিন তার বাগানে ফিরতে একটু বেশি রাত-ও হয়।

এর পর আমরা চলে এলাম। দেখি গদা যেন কেমন গম্ভীর। আমারও মনে তখন নানা মত্‌লব খেল্‌লে। ক্রমে সন্ধ্যে হ'ল। চারিদিক বেশ অন্ধকার। আমি বাবার কাল চাপ্‌কানটায় আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে বোসমশাইয়ের বাগানের বেড়ার একপাশে লুকিয়ে রইলাম। দেখি রোঘো আহারাদি সেরে গান গাইতে গাইতে বাগানে ফিরছে। তার একটু পরেই নিধেও খেতে গেল। আমিও এই সুযোগে দুর্গা বলে বাগানে ঢুকে পড়লাম। একে অন্ধকার, তাতে কালো পোসাক, ধরা-পড়ার সম্ভাবনা

ছিল না। অনেক ঘুরে ফিরে মালির ঘরের কাছে এসে কান পেতে শুনলাম। ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই! ঝাঁপ বন্ধ। অন্ধকার। এত তাড়াতাড়ি কি ব্যাটা ঘুমিয়েছে? তা আর আশ্চর্য্য কি! বেচারী সারাদিন খাটে, তাই তাড়াতাড়ি ঘুমোয়। যাক্।


ঘরে সাড়াশব্দ নাই! ঝাঁপ বন্ধ

আমি ধীরে ধীরে হিসাব মতো ডালে পা দিয়ে ঠিক আমের থলোর দিকে উঠে এলাম। সামনে হাত বাড়াতে প্রথম নম্বর থলোটা মিললো। তারপর অবিলম্বে নিঃশব্দে আটটা আম শুদ্ধ সেটাকে আমার কোঁচড়ে পুরলাম। তারপর দ্বিতীয়টা—তারপর—

হঠাৎ চমকে উঠে দেখি কি, কে একজন পা টিপে টিপে গাছতলায় অন্ধকারে এসে দাঁড়াল। আমি ভয়ে একেবারে দমবন্ধ করে রইলাম। পাছে নিঃশ্বাসের শব্দে ধরা পড়ে যাই। নিধে নয়তো!

এমন সময় পাতার ঘরের চালে শব্দ হল, ঝপ্-ঝর্-র্-র্! তখনি মনে হ'ল ঘরের ভেতর খাটিয়া থেকে কে যেন তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ সব চুপ্। তারপর ঘরের ভেতর দু'একবার দেশলাই ঘসার শব্দ শুনলাম। কিন্তু আলো জ্বল্লোনা। বুঝলাম মালির পো ব্যস্ত হয়ে দেশলাই জ্বালতে প্রবৃত্ত হয়েছে। হয়তো দুর্ভাগ্যক্রমে দেশলাইয়ের বাক্সে একটি কাটি থাকায় তাড়াতাড়িতে সেটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন উপায়! আবার পাতার চালে সেই শব্দ; এবার দ্বিগুন জোরে ঝপ্-ঝর্-র্-র্। মনে হল এক সঙ্গে নুড়ি আর কাঁকর কে যেন মুঠো করে ছুঁড়ছে। এবারে পরিষ্কার বোঝা গেল মালির পো ভূতের ভয়ে যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছে। বাইরে আসতে পারছে না, ভেতরে দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে আর বিড়বিড় করে কি বকছে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আমার গুঁড়ির কাছে ও লোকটা

কে ? এই কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে আমার বাঁ পাটা যে ডালের ওপরে ছিল ডান পাটাও তাতে রেখে পিছন ফিরে নিচের লোকটিকে ভাল করে দেখ্‌তে গেছি, ভূত টুত্‌ নয়তো ! সে ডালটা যে শুক্‌নো তা কেমন করে জান্‌ব। আমার সমস্ত শরীরের ভর সইতে না পেরে একেবারে মড়্‌ মড়্‌ শব্দে ভেঙ্গে পড়লো। সেই সঙ্গে আমিও চিৎপাৎ; পড়ার সময় প্রাণের ভয়ে এমন একটা বিকট আর্ত্তনাদ ছেড়ে ছিলাম যে সেটা মাম্‌দো ভূতের আওয়াজ না হয়ে যায় না। তারপর পড়বি ত পড় ডালশুদ্ধ একেবারে মালির ঘরের চালে। সামান্য খুঁটির ওপর পাতার চালা, আমার ভর সইবে কেন ! সব শুদ্ধ ধসে রোঘোর ঘাড়ে গিয়ে নাব্‌লাম। তখন সেখানে একটা সত্যিই ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে গেল। রোঘোটা ত তলায় চাপা পড়ে প্রাণপণে নিধেকে ডাক্‌তে লাগলো,—"ইরে ভাই, চনচড়ো দৌড়ি আয় ! ভূতো মাড়ি বসিলা।" আর ভূতো ! আমারও তখন প্রাণ যাবার জোগাড় হয়েছে; তারপর কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করার পর ঘরের চাল সমেত আমাকে কোন রকমে ঘাড় থেকে নামিয়ে লাফিয়ে উঠেই চোঁ চোঁ দৌড় দিলে। গাছের তলার লোকটাও এদিকে এই সব অপ্রত্যাশিত কাণ্ড-কারখানা দেখে হঠাৎ ভয়ে এম্‌নি ঘাবড়ে গিয়েছিল যে সেও "বাপ্‌' বলে এক বিষম চীৎকার ছেড়ে অন্ধকারে কোথায় ছটকে পড়লো। আর আমার কথা যদি বল তো তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি। চুলোয় যাক্‌গে ডাঁসা আমের থোলো ! কোন মতে ভালয় ভালয় বাড়ী ফেরা গেল। পাতার চালা আর উড়ের পিঠের গুণে সে যাত্রা হাত পা কিছুই ভাঙ্গেনি।

পরদিন নিয়ম মত পাঠশালায় গিয়ে হাজির দিলাম। পণ্ডিতমশাই বল্‌লেন, "কিরে নিতাই খোঁড়াচ্ছিস্‌ যে ?" তারপর গদার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "হাঁরে গদা, তোর মুখটাও এত ফ্যাকাশে কেন রে ?" আমরা দুজনে দুজনের দিকে একবার সন্দিগ্ধ ভাবে দৃষ্টিপাত করলাম। এক মুহূর্ত্তেই সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাব্‌লাম আমচুরি মত্‌লবটা দুজনে মিলে করলেই হত। গদা স্বপ্নেও ভাবেনি আমিও তার মত মত্‌লবটা জান্‌তে পারবো। তখন ক্লাসে হাসি চেপে রাখা আমাদের ভয়ানক শক্ত হয়ে উঠ্‌লো।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পাঁচুর বৌ

পাঁচুলাল দাস—উলুবেড়ে বাস,—
জমি-জমা আছে, করে তার চাষ।
নাই কোনো দায়,
দিন চলে যায়!
ছেলে-পিলে নাই, আছে এক স্ত্রী—
দুটী মাত্র প্রাণী—চাই কত-কী?

অভাব না থাক্ নাই তিল সুখ,—
কারণ, যে স্ত্রী—তার যা মুখ!
ঝগড়ার চোটে
কাক-চিল ঘোটে
সে বাড়ীর ধারে ঘেঁষিতে না পারে!
মানুষ তো ছার—ভূত-প্রেতও হারে!

শুধু কথা! বাপ্, কিল-চড় ঘুষি,
চ্যালা কাঠ, হাতা, যখন যা-খুশী
পাঁচুকে সটাং
বসায় পটাং—
তাতে পিঠ ভাঙ্গে, নাক যায় ঝুলে—
সে দিকে বৌটা তাকায় না ভুলে!

ঘরে তার যুদ্ধ—ঝগড়া ও ঝাঁটা
নিমেষ বিরাম নাই! মাঠে কেটে মাটী,
এটা-সেটা বুনে,
ক' পহর গুণে
যেটুক্ কাটায়, তার আরাম সেটুক্!
ঘরে ফেরা মনে হলে, ভয়ে কাঁপে বুক!

হেথা-সেথা বন্ধু যা ছিল দুই-চার
পাঁচুকে বলিল,—আঃ, এত সহিবার
প্রয়োজন কি রে?
দুরন্ত স্ত্রীরে
একদিন কষে মারো। সে তো মেয়ে-লোক!
চুলের ঝুঁটিটা ধরে—বৌ ঢিট হোক্!

তুমি না মরদ? গায়ে নাই জোর?
নিজের ঘরে নিজে হয়ে আছ চোর!
লজ্জাও নাই?
আরে দূর ছাই!
জোরে না পারো যদি, নাহি মারো তেড়ে
ধেৎ তেরি,—বনে যাও চলে ঘর ছেড়ে।

পাঁচু অতি কাঁচু-মাচু বলে,—ভাই, হারে,
মেয়ে বটে! ঝাঁজ কি যে! চেনো না তো তারে!
কত বড় দস্যি!
জ্ঞান দীর্ঘ হ্রস্ব
নাই তার! না হলে কি মারে অত রেগে!
আর সে কি মার ভাই, কি প্রবল বেগে!

ভাবে না কো সেই মারে পারি মরে যেতে!
—মলে কি যে হবে তার! এত ওঠে মেতে
যেন ক্ষেপা মহিষ!
থানা কিম্বা পুলিশ
কারে করে নাকো কেয়ার, ভাবে নাও তিলে।
ন'শো ভূত ভাগে ভাই, তার এক কিলে!

বন্ধুরা দুঃখে দুঃখী! ভাবে, এর উপায়
করা চাই। না হলে পাঁচুর প্রাণ যায়!
দিল পরামর্শ;
শুনে মনে হর্ষ
হলো পাঁচুর; সে হর্ষকে মনেতে সে চেপে
ঘরে এলো; এসে দেখে বৌ আছে ক্ষেপে!

বৌয়ের মেজাজ গরম সর্ব্বক্ষণই!
নিত্য মারে, মারবে আজো! ভাবলে, শুনিই!
তার পরে মারা
হবেই তো সারা!
মারের পরে কথা পাঁচু যদি ভুলে যায়,
তাহলে সে কথা বৌয়ের শোনা হবে দায়!



বৌয়ের হাতের কাছে ছিল মস্ত জাঁতা।
নিল হাতে; পাঁচু ভাবে, গেল তার মাথা।
ভয়ে বললে, ওগো,
এর পরে মের বোকো—
আর-পরে গো মেরো, খুশী তোমার যত—
আগে একটি কথা শোনো—ওগো সোনার মত।

তবু বললে পাঁচুর কথা শোনার আগে,—
তোমার চালাকি আর ভালো নাহি লাগে!
কথায় ভটচায্যি!
নাই কোনো কাম্যি—
ষোল আনার ফাঁকি নিয়ে মাঠে থাকো জুড়ে!
আমি হেথা খেটে-খেটে মলেম জ্বলে-পুড়ে!

পাঁচু বলে—সত্যি, আমি নিত্যি তোরে জ্বালাই।
ঘুচোতে চাই যে বৌ আজ সব বালাই।
বলি, সত্যি করে,
প্রত্যয় না করে,—
গঙ্গার তীরে চল্, বলি ;—গঙ্গা দেবী জানিস্।
সেথায় মিথ্যা বলা যায় না, এ কথাতো মানিস্।

যেমন অ-থৈ জল, জলে স্রোতও তেমন খর,
এ পার থেকে ওপার শুধু জলে জলে ভরা।
ঘূর্ণীর চক্কর।
যেন অজগর
ফুঁসছে কি! বাপ! কুকুর বেরাল-ছানা,—
কিম্বা কুটো পড়লে, তোড়ে ভেঙ্গে খানখানা।



ভাবলে বৌ, তা সত্যি, দেবতা গঙ্গা নদী।
বেজায় পাপে নরক, সেথা মিথ্যা বলে যদি।
বল্লে,—বেশ, চল্,
বিলম্বে কি ফল!
একটা কথা বলি খোকা, অমনি শুধু বলা—
ভাদ্র মাস এ ; ভাদ্রে গঙ্গা ভীষণ স্রোতোচ্ছলা!

একটুখানি চর,—সে এক জমির কালিমাত্র
জেগে। জলে ডোবা বাকী বিশ্ব-গাত্র।
চরের পরে এসে
বললে পাঁচু...কেশে,—
তোমার আপদ দূরে যাবে। উপায় ভারি বলি,
অর্থাৎ আমি মলেই তোমার আপদ যাবে চলি!

কিন্তু আত্মহত্যা ? তাই তো সাহস নাহি তারি।
আমার পা হাত বাঁধো,—যাতে নাড়িতে না পারি!
বাঁধা পায়ে-হাতে
চরের সীমানাতে
আমি দাঁড়াই। তুমি দূরে-এ ও-খান থেকে ছুটে
এসে ধাক্কা মারো বেগে—জলে পড়ি লুটে।

জলের তোড়ে পড়লে জেনো, শক্তি থাকবে নাকো
উঠে বাঁচার! দোহাই, কথাটি এই রাখো—
ওঠার ভরসা
বেদম ফরসা!
তখন একা থাকবে তুমি কেমন মজার হালে—
আমি চুবন খেয়ে ম'লে সেথায় সন্ধ্যাকালে!

ভাবলে বৌ, এ মন্দ নয়, উত্তম ফন্দী বটে!
এমনি মলে মরার কথা পাড়েও নাহি রটে।
বললে—বেশ, এ!
বাঁধলো শেষে।
পাঁচু বদ্ধ হস্ত-পদে দাঁড়ায় চরের ধারে।
বৌ গেল সে বহুৎ দূরে…বহু দূরে পারে!

পরক্ষণেই এলো ছুটে বেগে পাঁচুর দিকে।
পাঁচু একটু হঠলো পাশে; অমনি ছোটার ঠিকে
বেসামালে টলে
বৌ পড়লো জলে।
পড়ে তোড়ে চললো ভেসে নেহাৎ নিরুপায়ে।
চ্যাঁচায়,—ওগো, বাঁচাও, রক্ষে কর, পড়ি পায়ে!

পাঁচু বলে,—তাই তো, রক্ষে! আমি যে দড়ি বাঁধা!
বাঁচাই কেমন করে গো? মিছে তোমার কাঁদা!
অর্থাৎ আহা, তাই তো!
কোনো উপায় নাই তো!
তা, তা তোমার মাথা গরম, মেজাজ গরম আরো
জলে ঠাণ্ডা হবে। ডুব দাও, যত খুশী পারো।

সন্ধ্যা আঁধার ছায়ার নামে জলের পরে!
খাবি খেয়ে পাঁচুর বৌ তো চুবন খেয়ে মরে।
ভাসে, ডোবে, ভাসে—
পাঁচু তাকায় ত্রাসে!
ওই যা! কোথায়?…এবার সোজা গেছে
জলের তলে,—
বাঁধন খুলে পাঁচু তখন গৃহের পথে চলে!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অরফিয়াস্

(গ্রীসদেশের উপকথা)

অনেক দিন আগের কথা। আরফিয়াস্ ছিল গ্রীসের যুবরাজ। সে এক দিকে যেমন খুব বড় যোদ্ধা ছিল অন্যদিকে তেমনি খুবই সুন্দর গান গাইতে পারত। তার গুণে মুগ্ধ হয়ে এ্যাপলো তাকে একটা সোণার বাণা উপহার দিল আর পরীর দেশের রাণী এসে নিজ হাতে করে শিখিয়ে দিল কেমন করে সেই বাণা বাজাতে হবে। অরফিয়াস্ যখন বাণা বাজাত, বনের সমস্ত পশুপাখী ত হিংসা ভুলে গিয়ে তার বাজনা শুনতই, তা ছাড়া নদীর স্রোত থেমে যেত, বড় বড় গাছ নুয়ে পড়ত, পাহাড়ের বুক নড়ে উঠত একটা অসীম আনন্দের উচ্ছ্বাসে।

এ রকম যার গুণ তাকে চিনতে লোকের কদিনই বা দেরী হয়। ক'দিনেই অরফিয়াসের খ্যাতি ছড়িয়ে গেল সমস্ত দেশময়। সে দেশের সব চেয়ে সুন্দরী মেয়ে ছিল ইউরিডিস্। সে আরফিয়াস্‌কে বিয়ে করতে চাইল। অরফিয়াস্‌ও খুব আনন্দের সঙ্গে তার প্রস্তাবে রাজী হ'ল।

সব ঠিক ঠাক হয়ে গেল। খুব জাঁকজমকের সঙ্গে তাদের বিয়ে হবে। ঠিক হ'ল বিয়ের রাত্রে অরফিয়াস্ তার বাণা বাজাবে আর ইউরিডিস্ তার অদ্ভুত নৃত্য কৌশলে সকলকে মুগ্ধ করবে! এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হতে পারে! দেশের সমস্ত লোক এসে সমবেত হল তাদের বিবাহ সভায়। সকলে খুব আনন্দের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে এমন সময় বেজে উঠল অরফিয়াসের বাণা, আর দেখা দিল নৃত্যশীলা ইউরিডিস্। সকলেই চুপ—কারও মুখে কথা নাই।

কিন্তু হঠাৎ নিমেষের মধ্যে সকলের আনন্দ উচ্ছ্বাসকে একটা বুক ভাঙ্গা দুঃখের হাহাকারে পরিণত করে বাসি গোলাপের ঝরে পড়া পাঁপড়িটির মতই ইউরিডিস্ মুড়ে পড়ল। কি হ'ল কি হ'ল বলে সকলেই ছুটে গিয়ে দেখল একটা বিষধর সাপ তাকে দংশন করে পালিয়ে যাচ্ছে।

এক মুহূর্ত্তে অরফিয়াসের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা ধূলোয় মিশিয়ে গেল। সে তার বীণার একটা করুণ ঝঙ্কার তুলে চলল স্ত্রীকে সমাধিস্থ করতে।

জীবনে যার কোন সুখ, কোন আশাই নেই, সংসারে তার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র! অরফিয়াসেরও হ'ল ঠিক তাই। স্ত্রীর জন্য দিন রাত তার প্রাণ কাঁদত, জীবনটা তার নিকট একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। পাতালে গিয়ে হয় ইউরিডিস্‌কে উদ্ধার করে আনবে নয়ত নিজেও প্রাণ ত্যাগ করবে—এই মনে করে অরফিয়াস্ বেরিয়ে পড়ল পাতাল পুরীর উদ্দেশ্যে।

অনেক দেশ বন জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করে সে উপস্থিত হল পাতাল পুরীর দরজায়, তার সেই বীণাটি হাতে করে। তার ঝঙ্কারে বিরাট দৈত্যের মত পাতাল পুরীর লোহার দরজা আপনি খুলে গেল। প্রহরীর ভাষা মৌন হয়ে গেল, অঙ্গ শিথিল হয়ে পড়ল। অরফিয়াস্ তাকে অতিক্রম করে চলে গেল—সে কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। এরকম করে ধীরে ধীরে সে একেবারে উপস্থিত হল যেখানে পাতাল পুরের রাজা আর রাণী বসেছিল। সে তাদের কাছে এসে কোন কথা না বলে বীণায় তার জানা সব চেয়ে করুণ সুরটি বাজাতে আরম্ভ করিল। রাজা রাণী একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল—তারা এই রকম সুর আর কখনও শুনেনি। অরফিয়াস্ সেই সুরের ভিতর দিয়ে নীরবে জানাল তার প্রার্থনা। বাদ্য শেষ হলে রাজা ও রাণী দুজনেই পরম প্রীত হয়ে তার প্রার্থনা মঞ্জুর করল—কিন্তু এক সর্ত্তে। যদিও ইউরিডিস্ অরফিয়াসের ঠিক পেছনেই থাকবে তথাপি সে মর্ত্তলোকে না যাওয়া পর্য্যন্ত তার দিকে তাকাতে পারবে না। যদি তাকায় তবে এ জীবনের মত ইউরিডিস্‌কে আবার হারাতে হবে। অরফিয়াস্ স্বীকার হয়ে চলল আবার পৃথিবীর দিকে।

অনেকদূর গিয়েও যখন ইউরিডিসের কোন সাড়াই সে পেল না তখন তার মনে খুব একটা সন্দেহ হল। সে চারিদিকে চেয়ে কোথাও তার কোন রকম চিহ্ন দেখতে পেল না। খুব ভাল করে কান পেতে শুনল কিন্তু নিজের নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই কানে এলোনা। তখন সে শোকে অধীর হয়ে প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে পেছন দিকে চাইল—যা দেখল তাতে তার সমস্ত বুকখানা একেবারে ভেঙ্গে গেল। সে

দেখল, উঃ, বলে ইউরিডিস্ একটি খুব গভীর মর্ম্ম ভেদি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল আর তার সুন্দর দেহখানি ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিশিয়ে গেল। 'ইউরিডিস্' বলে চীৎকার করে সে সেখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। তার এত দিনের সাধনা এক নিমেষের অধৈর্য্যে চুরমার হয়ে গেল। তার ভরা সুখের পেয়ালা মূহুর্ত্তের অবিবেচনায় কাত হয়ে পড়ে গেল। সে আবার পৃথিবীতে ফিরে এলো একা রিক্ত প্রাণ নিয়ে। তার গান থেমে গেল; আর সে আগের মত বাজাতে পারে না। লোকালয় তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। সে বীণাটি হাতে করে পালিয়ে গেল একেবারে গভীর অরণ্যে। গাছ পালা পশু-পাখীই হল এখন তার একমাত্র বন্ধু।

তার এতটুকু সুখও ভাগ্যে ছিলনা। সেখানে আবার এক নূতন বিপদ এলো; আর সেই সঙ্গে তার জীবনের শেষ আলোর শিখাটুকুও নিভে গেল।

কতগুলি পরী এলো সেই বনে বসন্ত উৎসব করতে নানা রকম ফুলের পোষাক পরে। নাচ গানে মেতে আছে এমন সময় হঠাৎ তারা অরফিয়াস্কে দেখতে পেয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলল। অরফিয়াস্ তাদের জানিয়ে দিল যে ইউরিডিসের মৃত্যুর সঙ্গে তার জীবনের সমস্ত উৎসব শেষ হয়ে গেছে। তার কথা শুনে উৎসবরতা পরীগুলির খুব রাগ হল। তারা সকলে রাক্ষুসীর মত অরফিয়াসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর এ্যাপলোর দেওয়া সেই সোণার বীণাটাকে একেবারে চূর্ণ করে দিল।

শ্রীউমাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

মুষ্টি-বীর "পিটার দি গ্রেট"

কাফ্রী যোদ্ধা জ্যাক জনসনের গল্প তোমরা শুনেছ। কিন্তু আর এক কাফ্রী মুষ্টিযোদ্ধা পিটার জ্যাকসনের নাম বোধ হয় তোমরা এখনো শোনো-নি। জনসন পৃথিবীজেতা পালোয়ান ব'লে নাম কেনেন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু জ্যাকসন বিখ্যাত হন তারও ষোলো বৎসর আগে।

শ্বেতাঙ্গরা কাফ্রি যোদ্ধাদের চেপে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। অধিকাংশ সময়েই বড় বড় শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাদের সঙ্গে তাদের লড়বার সুযোগই দেওয়া হয় না। এত অসুবিধা ও অবিচারের ভিতরেও বিল রিচমণ্ড, পিটার জ্যাকসন, জ্যাক জনসন, স্যাম ম্যাক্‌ভিরা, স্যাম ল্যাংফোর্ড ও জো জেনেটের নাম মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

জনসনের পরে আর কোন কাফ্রী যোদ্ধাকে পৃথিবী-জয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'তে দেওয়া হয়-নি—কারণ কালার হাতে ধলার হার সাহেবদের ধাতে বরদাস্ত হয় না। বড় বড় সাহেব যোদ্ধাদের ভিতরে কার্পেনটিয়ারের প্রকৃতি বোধ হয় উদার, তাই মাঝে মাঝে তিনি কাফ্রী যোদ্ধার সঙ্গে লড়তে রাজি হয়েছেন এবং সেই উদারতা দেখাতে গিয়ে তিনিও নিজের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। কারণ প্রথম বয়সে জো জেনেটের কাছে এবং এই সেদিন ব্যাটলিং সিকির কাছে তাঁকে পরাজিত হ'তে হয়েছে। কিন্তু সিকি বেচারা জিতেও নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারে নি। সম্প্রতি সে আমেরিকায় বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে কে বা কারা তাকে গুলি ক'রে মেরে ফেলেছে! যদিও অপরাধী ধরা পড়েনি, তবু আমাদের বিশ্বাস, তার হাতে শ্বেতাঙ্গের পরাজয় না ঘটলে তাকে এমন শোচনীয় ভাবে মারা পড়তে হ'ত না! অবশ্য এ ব্যাপারে কার্পেনটিয়ারের কোন যোগ যে নেই, সেটা একেবারে নিশ্চিত।

এখনকার একজন খুব বড় পালোয়ানের নাম জ্যাক ডেম্প্‌সী। জাতে তিনি আমেরিকান। সেখানে হ্যারি উইল্‌স্‌ নামে আর এক কাফ্রী মহা যোদ্ধা আছেন, তাঁরও সঙ্গে কেউ পাল্লা দিতে পারে না। উইল্‌স্‌ বার বার ডেম্প্‌সীকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রেছেন, কিন্তু ডেম্প্‌সী বার বার এমন-সব ওজর তুলেছেন যে যুদ্ধ আর হয়নি। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, লোকের ব্যঙ্গবিদ্রূপের চোটে ডেম্পসী বাধ্য হয়ে লড়তে রাজি হয়েছেন। জনসন ও জেফ্রিসের পরে সাদায় কালায় এত বড় যুদ্ধের আয়োজন এই প্রথম। আমরা যথা সময়ে সে যুদ্ধের খবর তোমাদের জানব।

এইবারে পিটার জ্যাকসনের গল্প শোনো। যোদ্ধা হিসাবে জ্যাকসনের মত বিখ্যাত কাফ্রী আর একজন মাত্র আছেন, তিনি জনসন। কিন্তু তিনিও মানুষ হিসাবে জ্যাক-

সনের মত এতটা উঁচু দরের নন। উদার চরিত্র, বিনীত স্বভাব ও মহৎ বীরত্বের জন্যে জ্যাকসনের নাম এমন প্রসিদ্ধ যে, শ্বেতাঙ্গ-সমাজেও তিনি "পিটার দি গ্রেট" উপাধি লাভ করেছেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে পিটার জ্যাকসনের জন্ম হয়। তাঁর মুষ্টিযুদ্ধের গুরু হচ্ছেন বিখ্যাত শিক্ষক ল্যারি ফোলি। জেম হল, ইয়ং গ্রিফো ও পৃথিবীজয়ী বাহাদুর যোদ্ধা বব ফিজ সিমন্স প্রভৃতি অমর যোদ্ধারাও তাঁর ছাত্র। ল্যারি ফোলি কিন্তু জ্যাকসনকে তাঁর আর-সব ছাত্রের চেয়ে বেশী পছন্দ করতেন।

মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে জ্যাকসন প্রথমে অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত যোদ্ধাকে একে একে হারিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ইংলণ্ডে গিয়েও সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা জেম স্মিথকে পরাজিত করেন। সেখান থেকে তিনি আমেরিকায় এসে উপস্থিত হন। আমেরিকায় তখন জো ম্যাক্অলিফ নামে এক যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে অনান্য যোদ্ধারা ভয়ে কেঁপে সারা হতেন। জ্যাকসন তাঁকেও হারিয়ে নিজের পসার খুব জমিয়ে তোলেন। এখানে জেমস্ কর্বেটের সঙ্গেও তাঁর এক বিখ্যাত যুদ্ধ হয়। একষট্টি 'রাউণ্ড' বা মণ্ডলের পরেও যখন এই অদ্ভুত লড়াই থামল না, মধ্যস্থ তখন দুজনকেই সমান সম্মান দিলেন। কর্বেট এর এক বৎসর পরেই সলিভানকে হারিয়ে "পৃথিবীজেতা" উপাধি পান, এবং তাঁর মতন সুচতুর যোদ্ধা আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আর দেখা যায়-নি। তিনি "মুষ্টিযুদ্ধের নেপোলিয়ন" ব'লে প্রসিদ্ধ।

এই সময়ে ফ্রাঙ্ক স্লাভিন নামে এক দিগ্বিজয়ী ইংরেজ যোদ্ধা জ্যাকসনকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করলেন। স্লাভিন এক সময়ে জ্যাকসনের ছাত্র ছিলেন—যদিও জ্যাকসনের চেয়ে বয়সে তিনি এক বৎসরের বেশী ছোট ছিলেন না। নিজের বাহুবলে আর সব যোদ্ধাকে হারিয়ে তিনি ইংরেজ সমাজের একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। তাঁর ঘুসির জোর ছিল বড়ই ভয়ানক। কেউ যখন তাঁর সামনে আর দাঁড়াতে পারলে না, স্লাভিন তখন স্থির করলেন, তিনি অনায়াসেই জ্যাকসনকে হারিয়ে দিতে পারবেন। এই সময়ে জ্যাকসন ও স্লাভিন দুজনেই পৃথিবীজয়ী বীর জে, এল সলিভানকে বার বার যুদ্ধে আহ্বান ক'রে ছিলেন, সলিভান কিন্তু "পৃথিবী-জেতা" উপাধি হারাবার ভয়ে

লড়তে রাজি হন নি সুতরাং জ্যাকসন ও স্লাভিন যে কত বড় যোদ্ধা, তা আর বলে না বুঝালেও চলতে পারে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে জ্যাকসনের সঙ্গে স্লাভিনের চিরস্মরণীয় মুষ্টি যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ফলাফল জানবার জন্যে সমগ্র ইংলণ্ডে আগ্রহ ও উত্তেজনার সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল। মণ্ডপের ভিতরে তিল ধারণের ঠাঁই তো ছিলই না, বাইরেও হাজার হাজার দর্শক উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা, স্লাভিনের জয় হোক্! জ্যাক্সনের চামড়া যে কালো, সে জিত্‌লে ইংরেজের মুখ দেখানো যে দায় হয়ে উঠ্‌বে!

দুই যোদ্ধা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন। স্লাভিনের উচ্চতা ছয় ফুট এক ইঞ্চি এবং তাঁর দেহ খুব চওড়া ও শক্তি-ব্যঞ্জক। জ্যাকসনের উচ্চতা ছয় ফুট দুই ইঞ্চি এবং তাঁর দেহের গড়ন কতকটা ছিপছিপে। দেখলে মনে হয়, স্লাভিনই যেন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা!

লড়াই সুরু হ'ল। প্রথমে দুজনেই খুব সন্তর্পনে লড়তে লাগলেন। তারপর পেটের উপরে ঘুসি মেরে জ্যাকসনকে কাবু করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর একটা প্রচণ্ড ঘুসি যে জ্যাকসনের পেটের উপরে গিয়ে পড়েও নি, তাও নয়! স্লাভিন পরে নিজের মুখেই বলেছিলেন যে, অন্য যে-কোন যোদ্ধা সেই এক কিল খেয়েই ঠাণ্ডা হয়ে যেত, জ্যাকসনের অদ্ভুত ক্ষমতা, তাই তাঁর কিছুই হ'ল না।

জ্যাকসন সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে লড়্‌ছিলেন। তাঁর পরে আজ পর্য্যন্ত আমেরিকার সমস্ত যোদ্ধা এই ভঙ্গীতে লড়াই ক'রে থাকেন, কারণ জ্যাকসনের উদ্ভাবিত ঐ ভঙ্গীতে আত্মরক্ষার সুবিধা পাওয়া যায় অত্যন্ত।

ছয় মণ্ডল লড়াইয়ের পরে দেখা গেল, জ্যাকসন তাঁর প্রতিযোগীর চেয়ে সকল দিকেই অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন। স্লাভিনের অধিকাংশ ঘুসি জ্যাকসন আশ্চর্য্য তৎপরতার সঙ্গে এড়িয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু জ্যাকসনের অধিকাংশ ঘুসি পড়ছে গিয়ে যথাস্থানে। স্লাভিনের ডান চোখ ফুলে উঠেছে এবং তাঁর নাক ও মুখ দিয়ে বেগে রক্ত ছুটছে, অথচ একমাত্র নাক ছাড়া জ্যাকসনের দেহ প্রায় অক্ষত আছে।

সপ্তম মণ্ডলে স্লাভিন ক্ষাপ্পা হয়ে প্রতিযোগীর দেহে এমন কতকগুলো ঘুসি বসিয়ে দিলেন যে, জ্যাকসন কিঞ্চিৎ দ'মে গিয়ে খানিক্ষণ আর আক্রমণের চেষ্টা করলেন না।

পরের মণ্ডলেও স্লাভিনের এক ভীষণ কিল খেয়ে জ্যাকসন এক কোণে গিয়ে ঠিক্‌রে পড়লেন! শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের মনে তখন আশার সঞ্চার হ'ল, অনেকে উচ্চনাদে স্লাভিন-কে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

নবম মণ্ডলে জ্যাকসন আবার স্রোতের ধারা বদলে দিলেন। খানিকক্ষণ আত্ম-রক্ষার পরেই ফাঁক পেয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের উপরে তিনি চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে চার-চারটে এমন বিষম কিল বসাইয়ে দিলেন যে, স্লাভিনের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়ল।

দশম মণ্ডলের প্রথমেই স্লাভিনের পেট ও চোয়ালের উপরে জ্যাকসন পরে পরে দুইটি পিলে চম্‌কানো ঘুসি মারলেন। স্লাভিন প'ড়ে গেলেন না বটে, কিন্তু অর্দ্ধ-অজ্ঞানের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঠিক যেন চোখে সর্ষে-ফুল দেখতে লাগলেন! এই সময়েই জ্যাকসনের প্রকৃত মহত্ত্ব ও বীরত্ব প্রকাশ পেল। স্লাভিনের অবস্থা দেখে অন্য কোন শ্বেতাঙ্গ যোদ্ধাও এখন দরদ দেখাতেন না, কারণ এমন সুযোগ ছাড়লে পরে আর জয়লাভের সুবিধা না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু অসহায় স্লাভিনকে দেখে জ্যাকসনের মনে এমন মায়ার সঞ্চার হ'ল যে, 'রেফারি' বা মধ্যস্থের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "এখন আমি কি করব?" মধ্যস্থ বললেন, "লড়ো!" জ্যাকসন বললেন, "তাহ'লে আর উপায় কি?" এই ব'লে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগ্রসর হয়ে, তিনি যতটা সম্ভব আস্তে আস্তে গোটা-কতক ঘুসি মেরে স্লাভিনকে মাটির উপরে শুইয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য জ্যাকসনই যুদ্ধে জয়ী হ'লেন।

শ্বেতাঙ্গ দর্শকরা কৃষ্ণাঙ্গ যোদ্ধার এই মহত্ত্ব দেখে মোহিত হয়ে গেল, তারা সকলেই এক বাক্যে জ্যাকসনের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল এবং সেইদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় সকলেই বীর জ্যাকসনের নামে শ্রদ্ধা ও ভক্তি ভরে মাথা নীচু করে।

যুদ্ধের পরে স্লাভিনের ঘরে ঢুকে জ্যাকসন দেখলেন, তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন।

সাদরে তাঁর করমর্দ্দন ক'রে জ্যাকসন মমতা-ভরা স্বরে বললেন, "ভাই, আজকের মত বিদায়! কি করবে বল. এক যুদ্ধে আমরা দুজনেই তো জয়ী হ'তে পারি না, তবে আমি তোমার শুভ কামনা করি!" কৃষ্ণাঙ্গ জ্যাকসন এই বিখ্যাত যুদ্ধে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছেন, মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মৌচাকের আহ্বান

মৌমাছি ও মৌমাছি ভাই,
মৌমাছি চঞ্চল,
কাজ সারা আজ হ'ল কি তোর,
হ'ল কি তোর বল্?

ফাগুন কবে ফুরিয়ে গেছে.
চৈত্র চলে যায়,
তবুও তোর ছুটো ছুটির
শেষ হ'ল না হায়!

কোন্ গাছের আড়ালে,
পাতার নিরালায়
মৌচাক আজ ডাক দিয়েছে ওই,
আয়, আয়, আয়!

মন-হারানো সারা সকাল,
সারা সকাল-ভোর,
গুঞ্জরণে ক্লান্তি কিছু
এল না কো তোর ?

ফুট্‌ল বেলা, ফুট্‌ল চাঁপা,
ফুট্‌ল ছোট যূঁই,
ফুল থেকে ফুল ঘুরিস্‌ ফিরে
তবুও ত তুই।

কোন বনের গহনে
নদীর কিনারায়,
মৌচাক আজ ডাক দিয়েছে ওই,
আয়, আয়, আয় !

একটানা ওই গুণ্‌গুণানি
সারা দুপুর গো,
ঘুমের পরশ বুলিয়ে চলে
মনের উপর গো ;

সেই সুরে সুর মিলিয়ে বাজে
অরণ্য-মর্ম্মর,
এমন বেলায় মিল্‌ল নাকো
তোমার অবসর !

এই বৃক্ষছায়াতেও
তপ্ত হ'ল বায়
মৌচাক আজ ডাক দিয়েছে তাই,
আয়, আয়, আয়!

ফুল কাননের মাতাল মধুপ,
সারা সন্ধ্যা-ভোর,
আমের বনে এ কি মাতন,
এ কি নাচন তোর!

মৌ লুটে কি পাগল হলি,
ব্যাকুল অলি, ক' ?
সময় যে অনেক হ'ল
এবার ফিরে চ।

এই আলো আঁধারে,
কাটাইতে সে চায়,
মৌচাক আজ ডাক দিয়েছে তাই,
আয়, আয়, আয়!

বেলা যে যায়, বেলা যে যায়,
এল অন্ধকার,
বকুল এবার ফুটবে বনে
কাজ কি কাজে আর?

সারা দিনটা গান গেয়ে কি
মিটল না কো আশ,
গান সারা কি হ'ল—এবার
মিল্‌ল অবকাশ ?

বৈশাখে সে হায়,
আছে অপেক্ষায়
মৌচাক আজ ডাক দিয়েছে গো
আয়, আয়, আয় !

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কপালের লেখা

সেই আদিকালে ছিলেন কেবল বিধাতা পুরুষের সংসারে, তাঁর দুই আইবুড় বোন আর তাঁদের মা। বিধাতা পুরুষের মা রোজ বিধাতা পুরুষকে বলেন মেয়েদের বরের খোঁজ করতে; কিন্তু রোজই বিধাতা পুরুষ খালি একটু হাসেন। একদিন এখন মা বিধাতা পুরুষকে ধরে পড়লেন "দেখ বাবা মেয়ে দুটো যে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে, আর ওদের ঘরে রাখতে পারি না, ওদের দেখলে আমার গলায় জল নাবেনা, লক্ষ্মী বাবা, দুটি বরের খোঁজ কর।" বিধাতা পুরুষ একটু হেসে বল্লেন—"মা কি আর বলব, তুমি তো জানো আমি অদৃষ্ট গুনতে পারি. আমি ওদের কপালে লিখেছি, একটি হবে ডোম রাজার গৃহিণী, আর একটি হবে মরা রাজার মহারাণী। মা তো এই কথা শুনে খুব রেগে গেলেন। তিনি বল্লেন—"তুই কেন আমার মেয়েদের ভাগ্যে এমন লিখেছিলি, তোর বোনদের উপর একটু মায়া নেই ?" বিধাতা পুরুষ বল্লেন "কি করব বল মা, আমার এতে কোন হাত নেই, আমি চোখ বুঁজে বাঁ হাতে লিখি, যার ভাগ্যে যা লেখা হয়।" তখন আর কি হবে মা রাগে মেয়েদের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন।

মেয়েদের বরের খোঁজে যান - যান ; অনেক দূর গেছেন এমন সময় তাঁরা এক খুব বড় বাড়ীর সামনে এসে পড়লেন। বড় মেয়েটি বল্লে "মা, আমার বড্ড জল পিপাসা পেয়েছে।" মা বল্লেন—"এস মা এই বাড়ী থেকে একটু জল চেয়ে নি।" এই বলে বাড়ীর দরোয়ানের কাছ থেকে একটু জল চেয়ে মেয়েটিকে খেতে দিলেন। তারপর দরোয়ানকে শুধলেন—"বল ত গো, এ বাড়ীটি কার ?"

দরোয়ান বল্লে "ডোম রাজার। দেখছোনা সিং দরজায় ধুচুনী টাঙান রয়েছে।"

মা ভাবলেন অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে ? ফিরে ফিরে সেই ডোমের ঘরেই এলুম। তিনি দরোয়ানকে বলে মেয়েদের নিয়ে ডোম রাজার কাছে গেলেন, আর তাঁকে বল্লেন "বাবা আমার বড় মেয়েটিকে তুমি বিয়ে কর, ওর অদৃষ্টে আছে তুমিই ওর সোয়ামী হবে।" ডোম রাজা দেখলেন মেয়েটা বেশ সুন্দরী, তিনি বড় মেয়েটিকে বিয়ে করলেন।



চিত্রা ও তার মা

তারপর বিধাতা পুরুষের মা ছোট মেয়ে "চিত্রা"কে নিয়ে যান ; কত রাজার দেশ পেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে তাঁরা এক রাজ্যে পৌঁছলেন। সিং দরজায় এসে দেখেন কত সৈন্য সামন্ত খোলা তলোয়ার ঘাড়ে করে পাহারা দিচ্ছে কিন্তু তাদের মুখে রা নেই, চোখে পলক নেই। হাত নাড়ে না, পা নাড়ে না সব যেন পাথরের মত থির ! মা মেয়ে বিনা বাধায় ভিতরে গেলেন। সেখানে বাজার হাট সব আছে, লোকজন সব আছে ; কিন্তু তারা কথা বলে না, নড়ে না, চড়ে না। সেখানে যেমন কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে আছে, তারা তেমনিই থাকে। এমন কি

কাক পক্ষী পিঁপড়েটী শুদ্ধ মরা। তারপর তাঁরা দুজনে প্রকাণ্ড রাজবাড়ীর সামনে এলেন। দুয়োরে হাত দিতে দুয়োর আপনি খুলে গেল। ভিতরে গিয়ে দেখেন বড় বড় ঘর দালান, উঠান বড় বড় ঘর মহল। রাজার হাজার হাজার গোলাম বাঁদী সব আছে কিন্তু সব নিঃসাড়। তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে চার তলায় উঠলেন। সেখানে একটা চমৎকার সাজান ঘরে গিয়ে তারা উপস্থিত হলেন, দেখলেন—একটি সোণার পালঙ্কে একটি লোক শুয়ে আছেন। তাঁর পা থেকে মাথা পর্যান্ত সোণা রূপোর কাজ করা চাদরে মোড়া; চাদর তুলে দেখেন একটি সুন্দর লোক শুয়ে—রাজার মত চেহারা, কিন্তু তাঁর পায়ের নখ থেকে মাথার তেলো পর্যান্ত জলুই পোঁতা। বিধাতা পুরুষের মা বেশ বুঝতে পারলেন সেই তাঁর ছোট মেয়ের বর হবে। তিনি চিত্রাকে বল্লেন—"মা, এই তোর সোয়ামী। এর কাছে তুই থাক, আমি চল্লুম।" এই বলে নীচে গিয়ে তিনি ফটক খুল্লেন। তাঁর আদরের ছোট মেয়েটিকে মরা রাজার ঘরে রেখে ছেলের কাছে চলে গেলেন।

তখন চিত্রা আর কি করে, রোজ সমস্ত ক্ষণ বসে বসে মরা রাজার গায়ের জলুই তোলে। এই রকম দু বছর কেটে গেল, তারও প্রায় জলুই তোলা শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় একদিন শুনলে রাস্তা দিয়ে কে "বাঁদী চাই, বাঁদী চাই!" করে হেঁকে চলেছে। চিত্রা ভাবলে—আমি একলা একলা থাকি—একটা বাঁদী কিনলে তবু গল্প সল্প করতে পাব। এই ভেবে সে জানালার কাছে গিয়ে বাঁদীওলাকে ডাকলে। চিত্রা বল্লে—"দেখ আমার টাকাকড়িতো কিছুই নেই। শুধু এই হাতের কাঁকনটি আছে—এইটি নিয়ে যদি বাঁদী দাওতো নিতে পারি। বাঁদীওলা রাজী হল। হাতের কাঁকন নিয়ে বাঁদী দিয়ে সে চলে গেল।

চিত্রা বাঁদীকে বল্লে--"দেখ বাছা, অনেক দিন চান করিনি। তুমি একটু রাজার কাছে বোসো তো, আমি নেয়ে আসি। কিন্তু দেখো যেন রাজার চোখের জলুই গুলো খুলো না—ও আমি নেয়ে এসে খুলবো।"

চিত্রা নাইতে গেল; অনেক দিন পরে গা মাথা ধুয়ে মুছে চান করে তার খুব আরাম বোধ হল আর বড্ড ঘুম পেল। চিত্রা সেই গরম স্নানের ঘরটিতে ঠাণ্ডা শানের উপর শুয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়ল।

এদিকে হয়েছে কি—বাঁদীটা ছিল বড্ড চালাক, সে ভাবলে নিশ্চয় চোখের জলুই খুললে রাজা বেঁচে উঠবে। পাছে রাজা বেঁচে উঠে আমাকেই রাণী করে ফেলে তাই আমায় খুলতে বারণ করেছে। এই ভেবে সে রাজার চোখের জলুই দু'টি খুলে ফেল্লে, অমনি রাজা বেঁচে উঠলেন। রাজার জীবনে রাজ্যের জীবন ছিল—রাজ্য শুদ্ধ সব লোক, হাতী, ঘোড়া পাখ-পাখালী যে যেখানে ছিল সব বেঁচে উঠল। রাজা ভাবলেন সেই বাঁদীই তাঁর জীবন দিয়েছে তিনি বাঁদীকেই রাণী করলেন।

চারিদিকের হৈ হৈ গোলমালে চিত্রার ঘুম ভেঙে গেল, সে ভাবলে একি হল! এত গোলমাল কিসের! মরা রাজা কি বেঁচে উঠল না কি? চিত্রা ছুটতে ছুটতে যে ঘরে রাজা ছিলেন সেই ঘরে এসে উপস্থিত হল, সেখানে এসে দেখে তার সেই হাতের কাঁকন দিয়ে কেনা বাঁদী রাণী হয়ে বসেছে। চিত্রার বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। যে বাঁদী শুধু চোখের জলুই খুলে রাণী হয়েছে সে যখন চিত্রাকে "বাঁদী" বলে ডাকলে তখন চিত্রা থাকতে পারল না— সে চীৎকার করে বলে উঠল

"হাত'কা কঙ্কন দিয়ে কিনিলাম বাঁদী
সে ভি রাণী, হাম্ ভি বাঁদী!"

সকলে তার কথা শুনে পাগল ঠাউরে নিলে, কেউ তার কথার মানে বুঝতে পারলে না, বুঝতে পারলে কেবল বাঁদী রাণী। সে চিত্রাকে চোখে চোখে রাখলে পাছে সব কথা ফাঁক হয়ে যায় কিন্তু চিত্রা যেন কি রকম হয়ে গেল—কথা বলেনা, খায়না, দায় না, কেউ কিছু জিগেস্ করলে তার সেই এক বুলি

"হাত'কা কঙ্কন দিয়ে কিনলাম বাঁদী
সে ভি রাণী—হাম্ ভি বাঁদী!"

তার মনের কষ্ট কে বুঝবে!

এখন চিত্রার দাদা বিধাতাপুরুষ চিত্রাকে কতকগুলি মন্ত্র সিদ্ধ গুড়িয়া পুতুল দেয়েছিলেন। সে রোজ সেই গুড়িয়া পুতুলের পেঁটরাটি মাথায় করে বনের ভিতর নিয়ে যায়, আর পেঁটরাটি খুলে দেয়; অমনি গুড়িয়ারা তার ভিতর থেকে বার হয়ে মানুষের মত কথা কয়; হাত পা নাড়ে, স্বর্গ থেকে সিংহাসন আনে, তার উপর চিত্রাকে

বসিয়ে কেউ চুল বেঁধে দেয়, কেউ চান করিয়ে দেয়, কেউ খাওয়ায়; গান বাজনা করে। তারপর তাদের পেঁটরায় পুরে চিত্রা বাড়ী আসে। এমনিতরো সে রোজ রাতে বনে আসে আর ভোর চারটের সময় রাজ বাড়ীতে চলে যায়।

এক দিন রাজা খুব ভোরে উঠে বাগানে এদিক ওদিক পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন — এমন সময় চিত্রা পেঁটরা মাথায় করে তাঁর সামনে দিয়ে রাজ অন্তঃপুরে চলে গেল। রাজা ভাবলেন কোথায় যায় এই পাগলী বাঁদীটা দেখতে হচ্ছে তো। রাজা অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীকে বল্লেন "দেখ রাণী, আজ আমি অনেক লোক নিমন্ত্রণ করেছি, আজ রাত্রে আমি অন্তঃপুরে যেতে পারব না। রাণী বল্লেন "আচ্ছা"। রাজা রাত্রি বেলা চুপিচুপি বাগানে এসে লুকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে চিত্রা পেঁটরা মাথায় করে বনে [illegible]— রাজাও আস্তে আস্তে তার পিছনে গেলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুতুলদের সব কাণ্ড দেখলেন। ভাবলেন এই বাঁদী নিশ্চয়ই কোন মায়াবী নয় দেবী।

চিত্রা যখন পেঁটরা নিয়ে রাজবাড়ীর বাগানে এসেছে তখন রাজা পিছন থেকে দৌড়ে এসে তার হাত ধরে বল্লেন—"আমি সব দেখেছি—বল তুমি কে—দেবী না মানুষ?" চিত্রা একটু হেসে বল্লে—

"হাত'কা কঙ্কন দিয়ে কিন্‌লাম বাঁদী --
সে ভি রাণী, হাম ভি বাঁদী।"

রাজা বল্লেন—"তোমার এ কথার মানে কি আমায় বুঝিয়ে দাও।" চিত্রা বল্লে— "মহারাজ কি আর বলব? শোন তবে, আমি হচ্ছি বিধাতাপুরুষের বোন। দাদা আমার অদৃষ্টে লিখেছিলেন আমার বিয়ে হবে মরা রাজার ঘরে। মা তাই শুনে দেশে বিদেশে ঘুরে তোমার ঘরেই আমায় রেখে যান। তোমাকে দেখলুম সর্বাঙ্গে জলুই পোঁতা। আমি একলা বসে বসে না খেয়ে না দেয়ে তোমার গায়ের জলুই তুলতে লাগলুম। একদিন প্রায় সব জলুই তোলা শেষ হয়ে এসেছে শুধু তোমার চোখের জলুই দুটি বাকি ছিল—এমন সময় শুনলুম এক বাঁদীওলা "বাঁদী চাই, বাঁদী চাই" করে হেঁকে যাচ্ছে। আমার টাকা কড়ি ছিল না, আমি আমার নিজের হাতের কাঁকন দিয়ে বাঁদী কিনে নিলুম। [illegible] চানের ঘরে

নাইতে গেলুম। কতদিন পরে চান করে ভারি আরাম বোধ হল, আমি ঘরের মেঝেয় অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লুম; তারপর গোলমালে উঠে দেখি আমার বাঁদী তোমার চোখের জলুই খুলে তোমার রাণী হয়ে পড়েছে—আর আমি হয়েছি তার বাঁদী। রাজা সব কথা শুনে ভয়ানক রেগে গেলেন। তিনি মনে এক মৎলব ঠাওরালেন। এক মস্ত বড় গর্ত্ত করে তাড়াতাড়ি রাণীর কাছে এসে বল্লেন 'রাণী শীঘ্র এস, শত্রু এসেছে আমার দেশ জয় করবে। এক পাটাতন করেছি, তার ভিতর চল লুকোবে। নৈলে আমাদের দেখতে পেলেই তারা মেরে ফেলবে।'

এই শুনে রাণী তাড়াতাড়ি গর্ত্তের ভিতর ঢুকলো। অমনি উপর থেকে হুড় হুড় করে মাটি কাঁটা ফেলে রাণীকে পুঁতে ফেলা হল। তারপর চিত্রা মরা রাজার রাণী হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগল।

শ্রীমতী স্বরূপা দেবী

ফায়ার ব্রিগেডের কথা

কলিকাতার পথে ঘাটে তোমরা আজকাল প্রায় দেখিতে পাও ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া লাল রং-এর ফায়ার ব্রিগেডের মোটর গাড়ি বিষম জোরে ছুটিয়া যায়। ফায়ার ব্রিগেড আমাদের দেশের কয়েকটি বড় বড় সহরে আছে। সমস্ত ভারতবর্ষে বোধ হয় মাত্র দশ বারটি শহরে ফায়ার ব্রিগেড আছে। বছর তিরিশ পূর্ব্বে আমাদের দেশে ফায়ার ব্রিগেড ছিল না। তখন কাহারো বাড়ীতে আগুন লাগিলে পাড়া প্রতিবেশীরা বালতি কলসি ইত্যাদি লইয়া বিষম কলরবে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিত। ফায়ার ব্রিগেড বিলাত হইতে আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে। বিলাতের লণ্ডন শহরেই বোধ হয় ফায়ার ব্রিগেডের জন্ম হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে বিলাতে যে ধরণের ফায়ার ব্রিগেড ছিল তাহা অতি অদ্ভুত। ফায়ার

ইন্সিওরেন্স কোম্পানিরা নিজেদের ব্যবসার সুবিধার জন্য একটি একটি ফায়ার ব্রিগেড রাখিত। ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানি কি ছিল তাহা বলিতেছি। মনে কর আমার একটি ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানি আছে এবং তোমার একটি কাপড়ের দোকান আছে। আমি তোমাকে গিয়া বলিলাম "দেখ, তুমি যদি আমায় বছরে ১০০ করিয়া টাকা দাও, তবে কোনো কারণে যদি তোমার দোকান আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যায়, তবে আমি তোমাকে ১০০০৲ টাকা দিব"। যদি আগুন না লাগে তবে ১০০৲ টাকা আমার লাভ—আর যদি আগুনে তোমার সব পুড়িয়া যায়, তবে আমার ৫০০০৲ টাকা তোমাকে দিতে হইবে। এক একটি এই রকম কোম্পানি—যত দোকানের এবং অন্যান্য বাড়ীওয়ালার কাছে টাকা লইত, তাহাদের দোকানে বা বাড়ীতে যাহাতে আগুন না লাগে তাহার জন্য নানা প্রকার পাহারা রাখিত, এবং দরকারের সময় আগুন নিভাই-বার জন্য ফায়ার ব্রিগেডও রাখিত। এই সময় এমনও হইত যে একটি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী সামনে দাঁড়াইয়া আছে—অথচ একটি দোকান বা বাড়ী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। হাজার হাজার টাকা নষ্ট হইল। ইহার মানে এই যে, যে কোম্পানির গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে—সেই কোম্পানির কাছে আগুন লাগা বাড়ীটি ইন্সিওর করে নাই। এই প্রকার কাণ্ড প্রায়ই দেখা যাইত। এখন একটা বাড়ী আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাইতেছে অথচ সামনে ফায়ার ব্রিগেড চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—এই রকম দৃশ্য আমরা কল্পনাও করিতে পারি না।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিল যে বিশেষ বিশেষ কোম্পানির ফায়ার ব্রিগেড দ্বারা শহরের সাধারণ লোকের বিশেষ সুবিধা বা সাহায্য হয় না। তখন সাধারণের খরচে ফায়ার বিগেড রাখিবার কল্পনা প্রথম হইল। ফায়ার ইন্সিওরেন্স কোম্পানির প্রথম ফায়ার ব্রিগেড হয় ১৬৮০ খৃঃ অব্দে।

সহরের ফায়ার ব্রিগেড হইবার পর হইতে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানির লোকেরাও তাহাদের অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা নিজেদের ফায়ার ব্রিগেড উঠাইয়া দিয়া সেই টাকা সাধারণ ফায়ার ব্রিগেডকে দিতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের লাভ বই লোকসান হইল না।

প্রথমে মানুষ-টানা ফায়ার ব্রিগেড ছিল। তাহার পর হইল ঘোড়ায় টানা গাড়ী। ইহাতে আগুন লাগা স্থানে গাড়ী খুব তাড়াতাড়ি যাইতে পারিত। হাত পাম্প হইতে ক্রমে ষ্টীম পাম্পের ব্যবহার আরম্ভ হইল। ষ্টীম পাম্পে খুব তাড়াতাড়ি এবং অনেক উঁচুতে জল ছোঁড়া যাইত, হাত পাম্পে তাহা হইত না, এবং খানিক ক্ষণ করিয়া ক্লান্ত হইলেই লোক বদলাইবার দরকার হইত। ইহার পর ক্রমে ক্রমে ক্যানভাসের গুটান নল, ঘোড়ার পরিবর্ত্তে মোটর ইত্যাদি নানা যন্ত্রের সাহায্যে ফায়ার ব্রিগেডের উন্নতি হইতে লাগিল।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ীর আগুন নিভাইবার জন্য কলের মই এখন হইয়াছে। এই মই নব্বই ফুট উঁচুও হয় যে তাহার উপর হইতে তিন শত চল্লিশ ফুট, অর্থাৎ মনুমেণ্টের দুগুণ উঁচুতে জল চালানা যায়। জল পাম্প করিবার কলের ও নানা প্রকার উন্নতি হইয়াছে।



আধুনিক ফায়ার ব্রিগেড

এখন বড় বড় শহরের সকল ফায়ার ব্রিগেড আড্ডায় ফায়ার ব্রিগেড গাড়ী সকল সময় প্রস্তুত হইয়া থাকে। খবর পৌঁছিবা-মাত্র তীর বেগে গাড়ী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। যখন ঘোড়ায় টানা গাড়ী ছিল, তখন একটি গাড়ীকে সকল সময় ঘোড়া জুতিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখা হইত, যাহাতে আগুন লাগা স্থানে যাইতে অনাবশ্যক বিলম্ব না হয়।

বিলাত এবং আমেরিকার প্রায় সকল শহরে এমন কি অনেক গ্রামেও ফায়ার ব্রিগেড আছে। আগুন নিভাইবার কথা মনে হইলেই আমাদের মনে হয় যে খুব

বেশী জলের দরকার হয়, জল বিনা আগুন নিভান অসম্ভব বলিয়া অনেকের মনে হয়। কিন্তু আজকাল নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা আগুন নিভান হয়। এমন এক প্রকার গ্যাস আবিষ্কার হইয়াছে, যাহা কলের সাহায্যে আগুনের উপর ছড়াইয়া দিলে আগুন খুব তাড়াতাড়ি নিভিয়ে যায়। "অক্সিজেন" বাষ্প ছাড়া আগুন জ্বলিতে পারে না, এই আগুন-নিভান গ্যাস আগুন লাগা স্থানে অক্সিজেনের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দেয়। ইহাতেই আগুন নিভিয়া যায়। পেট্রল এবং অন্যান্য ভীষণদাহ্য তেলে আগুন লাগিলে জলের দ্বারা কোনো উপকার হয় না, তখন এই গ্যাস ব্যবহার ছাড়া অন্য কোনো উপায় আর নাই।



ফায়ার ব্রিগেডের লোক

আজকাল যে কেবল ডাঙাতেই ফায়ার ব্রিগেড আছে, তাহা নয়, জলের উপর নৌকা জাহাজ ইত্যাদির আগুন নিভাইবার জন্য নৌকা ফায়ার ব্রিগেড প্রায় সকল বন্দরে আছে। কোনো জাহাজে বা নৌকায় আগুন লাগার খবর পাইলে এই ফায়ার ব্রিগেড ও নৌকা সেই স্থানে গিয়া নৌকা বা জাহাজের আগুন নিভাইয়া দেয়।

পূর্ব্বে যেমন আগুন লাগার খবর পাঠাইতে হইলে লোকের দরকার হইত এখন আর তাহা হয় না। প্রায় রাস্তার কিছু দূর অন্তর অন্তর একটি করিয়া "ফায়ার বক্স" আছে। এই বাক্স দেখিতে লাল, ডাক বাক্সের মত। নিকটে কোথাও আগুন লাগিলে বাক্সর উপর একটি কাচ আছে, এই কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ---একটি ছোট কাল হ্যাণ্ডেল আছে ইহা ঘুরাইলেই ফায়ার ব্রিগেড আড্ডায় খবর

পৌঁছাইবে কোথায় আগুন লাগিয়াছে। কাচ ভাঙ্গিবার সময় সাবধানে, জামার মধ্যে হাতের কনুই দিয়া ভাঙ্গা উচিত, তাহা না হইলে হাত কাটিয়া যাইতে পারে।

ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করিয়া কাজ করে। আগুন লাগার সময় ইহাদের কাজ দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়।

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

জলার পেত্নী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেওয়ানজীর কথা

দেওয়ানজী মশায় বলতে লাগলেন—অপূর্ব্ব বাবু, আপনি আমার মণিব, আপনি আশ্বাস দিয়েছেন যে আমাদের কোনো ক্ষতি করবেন না। এই আশাতেই আমাদের এই কাহিনী বলছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি কোনো কথা লুকোবো না।

আমরা তিন পুরুষ ধরে আপনাদের এই কালাগ্রামে বাস করছি; আমার ঠাকুরদাদা আপনার পূর্ব্বপুরুষ কালীনারায়ণ চৌধুরীর জমিদারী-সেরেস্তায় কাজ করিতেন। আপনি শুনলে বোধ হয় আশ্চর্য্য হবেন যে, আপনার পূর্ব্বপুরুষ কালীনারায়ণ চৌধুরী ডাকাতি কোরে এই বিশাল জমিদারী করেছিলেন এবং ডাকাতি করতে গিয়েই খুন হন। কালীনারায়ণের মৃত্যুর পর দুর্গানারায়ণ জমিদারী পেলেন কিন্তু তিনি কালীনারায়ণের চেয়েও খারাপ লোক ছিলেন। কালীনারায়ণ ডাকাতি গিয়ে খুন খারাপী করতেন কিন্তু দুর্গানারায়ণ নিজের প্রজাদের খুন করতেন। আমার ঠাকুরদাদা জমিদারকে এই সব কাজ করতে বারণ করতেন বলে তিনি ঠাকুরদার ওপরে ভীষণ চটে যান। শেষকালে জমিদারের কি একটা কাজে বাধা দেওয়ায় জমিদার রেগে তাঁকে চাকরী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর একমাত্র ছেলে আমার বাবাকে ডেকে বলে দিলেন —না খেতে পেয়ে মরবে তবুও জমিদার বাড়ীতে চাকরী নিও না। তা হোলে তোমাদের ভাল হবে না।

আপনাদের এই জমিদারীতে চাকরী কোরে অনেকে বড় লোক হয়েছে বটে কিন্তু আমার ঠাকুরদাদা কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। কারণ অসদুপায়ে তিনি কখনো এক পয়সাও রোজগার করতেন না। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর আমার বাবা কোনো রকমে আমাদের প্রতিপালন করতে লাগলেন কিন্তু আমার অদৃষ্ট মন্দ! কিছুদিন এই ভাবে কাটতে না কাটতে বাবা ও মা দু'জনেই মারা গেলেন।

বাবা মারা যাবার পর আমার আর দুর্দশার সীমা রইল না। ঘরে একটী পয়সা নেই। স্ত্রী ও একটি ছেলেকে নিয়ে যেন অকূল সমুদ্রে পড়লুম। কি করি! এই গ্রামদেশে চাকরীই বা পাই কোথায়? তবুও ভগবান দিন চালিয়ে দিতে লাগলেন। কোনো রকমে এক বেলা খেয়ে দিন কাটতে লাগ্‌ল।

দুঃখে কষ্টে দিন কাটছে এমন সময় একদিন জমিদার বাড়ী থেকে ডাক পড়ল্‌। তখন আপনার ঠাকুরদাদা শিবনারায়ণ জমিদার। আপনি কিছু মনে করবেন না আমি সত্যি কথা বল্‌ব বলেছি—আপনার ঠাকুরদাদার মতন লোক পৃথিবীতে বোধ হয় আর পাওয়া যায় না। কি নৃশংস প্রকৃতি ছিল তাঁর! পৃথিবীতে দয়া মায়া বলে কোনো জিনিষ তিনি জানতেন না। একদিকে তিনি যেমন অত্যাচারী জমিদার ছিলেন অন্য দিকে আবার তেমনি ভীষণ ডাকাত ছিলেন। সেই জমিদারের কাছ থেকে যখন তলব এল তখন ভয়ে আমার আত্মাপুরুষ খাঁচা-ছাড়া হোয়ে গেল।

জমিদার মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করলেন। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর নামে যত কথা শুনেছিলুম আমার তা মিথ্যে বলে মনে হোতে লাগ্‌ল। তিনি বল্লেন আমি শুনলুম তোমার অবস্থা বড় খারাপ। তা তুমি কাল থেকে আমার সেরেস্তায় কাজে লেগে যাও, মাসে পঁচিশ টাকা পাবে। ভালো কোরে কাজ করতে পারলে মাইনে বাড়িয়ে দেব।

আনন্দে জমিদারবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাড়ীতে ফিরে এলুম। মনে হোলো

এতদিনে বুঝি ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। কিন্তু একটু পরেই আমার ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়ে গেল। মরবার সময় তিনি বলে গিয়েছিলেন—না খেতে পেয়ে মরে যাবে তবুও জমীদারের বাড়ীতে চাকরী নিও না। কিন্তু তখন আর ভেবে কি হবে? চাকরী স্বীকার কোরে এসেছি, বিশেষ যে চাকরী তিনি সেধে দিয়েছেন সে চাকরী যদি না নিই তা হোলে জমিদার যে আমার ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন দিয়ে দিবেন। অগত্যা পরদিন থেকে চাকরীতে গিয়ে ভর্ত্তি হলুম। জমিদার প্রথম প্রথম আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে লাগলেন। বছর কয়েকের মধ্যে আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে হোয়ে গেল। তবে এ কথাও আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি যে, আমি যেমন বিশ্বাসের সঙ্গে চাকরী করতুম তেমন আর কেউ করত না।

তখন সেরেস্তায় যতগুলি লোক ছিল তাদের সকলেই প্রায় সাংঘাতিক চরিত্রের। চুরি জুচ্চুরি তো ছিল হাতের পাঁচ, খুন খারাপী করতেও তাদের আটকাতো না। জমিদার মশায় নিজের কাজ বাগাবার জন্যই এই সব ভীষণ চরিত্রের লোক এনে এনে সেরেস্তায় ভর্ত্তি করেছিলেন।

এই রকম কোরে প্রায় বছর দশেক কেটে যাবার পর একদিন জমিদার মশায় আমায় ডেকে বল্লেন—দেখ, সেরেস্তার লোকেরা সমস্ত চোর। তুমি ছাড়া বিশ্বাস করতে পারি এমন লোক নেই। সুলতানপুর থেকে খাজনা আনবে, তাই আমি মনে করচি তোমাকেও ওদের সঙ্গে পাঠাব।

আমি তাঁকে বল্লুম—বেশ আপনি যেখানে পাঠাবেন সেখানেই যাব, এতে আর আমার কি আপত্তি আছে!

তারপরে সুলতানপুরে যাবার তোড়-জোড় চলতে লাগল। একদিন রাত্রে দেখি পঞ্চাশ-ষাটজন যণ্ডা যণ্ডা লোক জমিদার বাড়ীতে এসে হাজির হোলো। শুনলুম তারাও সুলতানপুরে যাবে। খাজনা আনতে হবে তা এত লোকের কিসের দরকার! জমিদার মশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম। তিনি বল্লেন—পথে যদি ডাকাতে টাকা লুটে নেয় সেই জন্যই এই সব লোক সঙ্গে যাবে।

আমি জমিদার মশায়কে ভাল কোরে চিনতুম বলেই তাঁর কথায় আমার বিশ্বাস

হোলো না। তলে তলে খোঁজ নিয়ে টের পেলুম যে সেখানে এক জনের বাড়ীতে ডাকাতি করতে পাঠানো হচ্ছে, সেই জন্য এত তোড়-জোড় চলেছে। এই যে সব লোকজন পাঠানো হচ্ছে এরা ডাকাতের হাত থেকে খাজনা বাঁচাবে না, এরা নিজেরাই ডাকাত। আমার ঠাকুরদাদার কথা মনে পড়ে গেল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে কেন তিনি সে কথা বলেছিলেন সেদিন তা বুঝতে পারলুম। আমি জমিদার মশায়কে গিয়ে সোজা বল্লুম—মশায় আমি চাকরি করতে পারব না, আমায় ছুটি দিতে হবে।

জমিদার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন—কেন পারবে না?

আমি বল্লুম—কালীগ্রাম ছেড়ে কোথাও যেতে আমি পারব না।

জমিদার মশায় একটুখানি চিন্তা কোরে হেসে বল্লেন—তার জন্য তুমি চাকরি ছাড়বে কেন? তোমায় কোথাও যেতে হবে না।

আমি মনে করলুম বোধ হয় আমি বিশ্বাসী লোক বলে আমায় ছাড়লেন না। কিন্তু জমিদারের মতলোব তখন আমি বুঝতে পারি-নি। কিছু দিন এই ভাবে যায়, একদিন জমিদার মশায় আমাকে ডেকে বল্লেন—ওহে তোমার ছেলে কি করছে?

আমি বল্লুম—সে বাড়ীতে বসে আছে, কিছু করে না।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কত বয়স হোলো তার?

আমার ছেলে হেরম্ব তখন সবে মাত্র সতেরো পার হোয়ে আঠারোয় পড়েছে। বল্লুম—আঠারো বৎসর।

জমিদার মশায় বল্লেন—ইদিলপুরের নায়েবের পদটা খালি হয়েছে, মনে করছি হেরম্বকে সেই কাজটা দেব; বিশ্বাসী লোক তো আর পাওয়া যাচ্ছে না। কি বল?

জমিদার মশায়ের কথা শুনে ভারি আহ্লাদ হোলো আমার। বল্লুম—আপনি আমাদের মা বাপ, আপনি যা বলবেন তাই হবে।

তিনি বল্লেন—হাঁ, এখন পনেরো টাকা মাইনে পাবে, তার পরে কাজ কিছুদিন করলে পরে মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। কাল হেরম্বকে নিয়ে এস, বুঝলে!

পরদিনই ইদিলপুরে নায়েবের পদে হেরম্বকে বহাল করা হোলো। ইদিলপুর কালীগ্রাম থেকে বেশী দূর নয়, পাঁচ ছয় মাইল হবে। সেখানে জমিদারের মস্ত

কাছারী বাড়ী, লোক জন ইত্যাদি আছে, ঠিক হোলো হেরম্ব সেখানে থাকবে, সপ্তাহে দু-তিন দিন আসবে।

দিন দুই পরে হেরম্ব চলে গেল। দিন পনেরো পরে হেরম্ব একবার বাড়ীতে এল। কাজে তার খুব উৎসাহ। আমি তাকে জমিদারী সংক্রান্ত অনেক উপদেশ দিলুম। হেরম্ব আবার পরের দিনই ইদিলপুরে চলে গেল। এই রকম কিছুকাল যায়। জমিদার মশায় হেরম্বর কাজে খুব খুশী। তিনি প্রায়ই আমার কাছে তার প্রশংসা করেন। ছেলের প্রশংসা শুনে আমাদের মনে যে কি আনন্দ হয় তা কি বলব। কিন্তু এ সুখ আমার বেশী দিন চলল না। কিছুদিন পরেই কাণাঘুষা শুনতে পেলুম যে, জমিদার মশায় আমাকে লুকিয়ে হেরম্বকে ডাকাতি করতে পাঠাচ্ছেন। কথাটা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম। হায় ভগবান্! আমার একটি মাত্র ছেলে—শেষে কি না ডাকাত হবে? কিন্তু জমিদার মশায়কে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি না, কারণ এ খবর সত্যি কিনা তা ঠিক জানি না! অনেক ভেবে চিন্তে শেষ-কালে আমি সমস্ত ব্যাপারটা আপনার বাবা আমাদের বড় বাবুকে খুলে বল্লুম। বড় বাবু তলায় তলায় খোঁজ নিতে লাগলেন। এরি মধ্যে এক দিন বাপ বেটায় তুমুল ঝগড়া হোয়ে বড় বাবু বাড়ী ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন।

কিছুকাল এই রকমে কাটবার পর একদিন হেরম্ব বাড়ী এল। আমি ও তার মা তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—হ্যাঁরে তুই নাকি ডাকাতি করতে যাস?

হেরম্ব আমাদের মুখে সব কথা শুনে বল্লে—তোমরা কি পাগল হয়েছ? আমি যাব ডাকাতি করতে! এ নিশ্চয় কোনো দুষ্টু লোক আমার নামে মিথ্যে কোরে তোমাদের কাছে বলেছে।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

নদীর মনের কথা

আমাদের গাঁয়ের সামনে দিয়ে একটি ছোট্ট চঞ্চল নদী দিনরাত কুল্‌কুল্‌ করে বয়ে চলে। মাঠের পারে দূরের ঝাপ্‌সা পাহাড় থেকে সে নেমে এসেছে আর কত বন জঙ্গল দেশ বিদেশ পার হয়ে শেষে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। নদীর পাড়ে যখন একলা বসে থাকি, নদী কল্‌কল্‌ করে তার কত গল্প শুনিয়ে আমার সঙ্গে ভাব করে নেয়। আমার মনে হয় না একলা বসে আছি। নদীর গল্প শুনতে শুনতে আর তাকে নানান্‌ কথা শুধোতে শুধোতে মনে হয় যেন কোন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছি।

এমনি নদীর গল্প শুনে আমার কত দিন কেটেছে। আজ তোমাদের কাছে সেই গল্প একটু আধটু শোনাবো।

আমাদের নদী যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেখানে আছে কেবল একটি ছোট্ট ঝরণা— গ্রীষ্মের সময় তার জল শুকিয়ে গিয়ে একটি শীর্ণ ধারায় পাথরের উপর দিয়ে ঝরে পড়ে; আর বর্ষার সময় সেই জল ছাপিয়ে ফেনিয়ে উঠে পাহাড়ের বুকের মধ্যে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি আরম্ভ করে দেয়।

ঝর্ণার ঠিক নীচের জায়গাটি বেশ সমতল। গ্রীষ্মকালে যখন ঝর্ণার জল শুকিয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে তখন দেখতে পাওয়া যায় ঐ জায়গায় অনেকগুলি গর্ত—মনে হয় যেন যন্ত্রে কোঁদা। আর বাস্তবিকই তাই। ঝর্ণা পাহাড় থেকে নামবার সময় যে সব নানা রকমের নুড়ি গড়িয়ে নিয়ে আসে সেই নুড়ি-গুলিই এই গর্ত কাটার যন্ত্র! সেই নুড়িগুলি জলের স্রোতে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে অল্পে অল্পে পাথরের ভিতর এই সব গর্ত তৈরী করে ফেলেছে।

এই গর্ত্তগুলির নাম—"পাহাড়ের ফুটো।" প্রত্যেক ফুটোর মধ্যে একটি কি আরও বেশী কতকগুলি মসৃন নুড়ি দেখতে পাওয়া যায়। তারা পাহাড়কে ফুটো করতে গিয়ে নিজেরাও খয়ে খয়ে মসৃন হয়ে গেছে।

এই ঝর্ণাটি আমাদের নদীর প্রথম অংশ—তার আরম্ভ হয়েছে, কোন এক পাহাড়ের

গা থেকে, শেষ হয়েছে সে কোন সমুদ্রে তা আমার জানা নেই! ঝর্ণা যখন থেকে এ পৃথিবীর বুকে নেমেছে তখন থেকেই কোন জায়গায় থামার কথা সে মনে রাখেনি। সে কেবলই চলেছে পথের সব বাধা বিঘ্ন পার হয়ে তার আপনার চলার পথ করে নিতে নিতে, কেবল মাঝে মাঝে একটা দুটো গভীর খানা বা ডোবার কাছে অল্প খানিক জিরিয়ে, দম নিয়ে, আবার তার অফুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে।

এমনি ভাবে পাহাড়ের পথ শেষ করে ঝর্ণা এসে যখন পৌঁছয় নীচের সমতল জায়গায়, তখন তার নাম দেওয়া হয় নদী। এখানের জমি পাথরে গড়া নয়—এখানে কোথাও মাটি কোথাও বা বালি! নদী এই খানে তার আঁকাবাঁকা রাস্তায় চলা আরম্ভ করে দেয়। উপড়ান গাছ, বড় বড় পাথর—এই সব সামান্য বাধাতেই নদী সোজা পথ ছেড়ে বেঁকা চলতে থাকে। নদীর প্রথম দিকটায় তাকে সরল রেখা ছেড়ে খুব কমই চলতে দেখা যায়; কিন্তু নদী যতই এগিয়ে চলে তার বাঁকও ততই ঘোরালো প্যাঁচালো হয়ে আসে। এমন কি কোন কোন জায়াগায় গোল হয়ে ঘুরে এসে এসে তার নিজের জল প্রায় নিজেরই উপর এসে পড়তে চায়! অনেক নদীর এই আঁকাবাঁকা রাস্তা কেটে মানুষ তার গতিকে সোজা করে দিয়েছে—কিন্তু নদী যে এক কালে আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়েই গিয়েছিল তার চিহ্ন তার দুপাশেই পাওয়া যায় ছোট ছোট খানার কাদা-জল দেখে।

নদীর এই সব বাঁকগুলি যে যেখানে সেখানে যে রকম সে রকম ভাবে ছড়ানো থাকে তা নয়। তারা কবিতার লাইনের মতো পরস্পর এক ছন্দে গাঁথা থাকে। নদী যদি বাইরে থেকে কোন রকম বাধা না পায় তার বাঁকগুলি এই ছন্দকে আশ্চর্য্য রকম মেনে চলে।

এতক্ষণ নদীর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বল্লুম। এইবার তার কাজকর্ম্ম আর বিশেষতঃ তার জলের স্রোত সম্বন্ধে একটু খোঁজ নেওয়া যাক্। কয়েকটি খুব সামান্য পরীক্ষা করলেই এ সম্বন্ধে জানতে পারব।

নদীর গতি যেখানে সরল ভাবে চলেছে, তারই মাঝামাঝি একটি জায়গা বেছে নিলুম। নদীর এপার থেকে ওপারের দিকে যদি বাতাস বইতে থাকে তাহলে খুব

সুবিধে হয়। যে কোন রকম খুব হালকা জিনিস—যেমন কাগজের টুক্‌রো, শুক্‌নো পাতা বা করাতের গুঁড়ো নদীর জলের উপর আড়াআড়ি ভাবে ভাসিয়ে দিতে হবে। এমনি ভাবে নদীর এপার থেকে ওপার অবধি এক সার কাগজের টুক্‌রো যদি স্রোতে ভেসে এগোতে থাকে, দেখা যাবে যে নদীর মাঝখানে কাগজের টুকরোগুলো দুধারের চেয়ে বেশী এগিয়ে যাচ্ছে। এই থেকে বোঝা যায় নদীর স্রোত তার মাঝখানেই সবচেয়ে বেশী।



কিন্তু নদী যে এককালে আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়েই গিয়েছিল তার চিহ্ন তার দু'পাশেই পাওয়া যায়

আর এক রকম উপায়ে আমরা নদীর উপরকার গতির সঙ্গে তলাকার গতির তুলনা করতে পারি। একটি ছোট্ট কালির বড়ি যদি নদীর জলে ফেলে দেওয়া যায়, নদীর উপর থেকে নীচে অবধি জলের মধ্যে একটি কালির রেখা আঁকা হয়ে যাবে, আর এই রেখার গতি হবে স্রোতের দিকে। এমনি করে দেখা যাবে যে নদীর উপরের জল তলার চেয়ে বেশী জোরে চলে।

জলের গড়ানোর সঙ্গে সাধারণ কঠিন জিনিসের গড়ানের তফাৎ এইখানে। যদি ঢালু জায়গা দিয়ে এক টুকরো তক্তা গড়িয়ে আসতো তার সব অংশটাই একরকম ভাবে এবং এক সঙ্গে চলে আসতো; কিন্তু জলের বেলা তার উপরের অংশটা নীচেরটাকে এগিয়ে যায় আর মাঝখানেরটা দুপাশের চেয়ে জোরে চলে।

এইবার, নদীর বাঁকের মুখে তার স্রোত কেমন ভাবে চলে তারই খোঁজ নেওয়া যাক। এই সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে নদীর বাঁকের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। নদীর বাঁকে নদীর দুটো পাড়—একটা Concave ভাঙন কূল; আর একটা Convex চড়ার কূল।

এই ভাঙন কূল সাধারণতঃ খুব উঁচু আর খাড়া আর চড়ার কূল ক্রমশঃ ঢালু ভাবে এসে জলের ভিতর প্রবেশ করে। চড়ার কূলে, নুড়ি বালী এই সব ধরণের জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। যদি চড়ার কূলের গড়ানে দিক এগোতে এগোতে নদীর ওপার পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, দেখা যাবে যে জল ক্রমশঃই বাড়ছে আর ঠিক ওপারের ভাঙন কূলের খাড়া জমীর নীচেই জল সব চেয়ে গভীর। এই নিয়মটা নদীর প্রত্যেক বাঁকেই বজায় থাকে। নদীর এই বাঁকের কাছে স্রোতের গতি ঠিক আগেকার মতো চলেনা। নদীর সাধারণ জায়গায় আমরা দেখেছি তার জল স্রোতের সব চেয়ে বেগ ঠিক মাঝ খানে।

এখানে নদীর নীচেকার জলস্রোত যদি পরীক্ষা করতে হয় খানিকটা চিনির সঙ্গে ম্যাজেণ্টার রং মিশিয়ে alcoholএ ভিজিয়ে একটা তাল পাকিয়ে নিতে হবে। সেই চিনির তাল ভাঙন কূলের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে দেখা যাবে চিনি গলে লাল রং বার হয়ে ধীরে ধীরে জলের স্রোতের সঙ্গে নদীর তলা দিয়ে চড়ার কূলের দিকে এগোতে। থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে উপরের তুলনায় নদীর নীচের জল অনেক আস্তে চলে। এই আড়াআড়ি স্রোতে পড়ে ভাঙন কূলের ভাঙ্গা মাটি আর নদীর জলের নানা জিনিস ধীরে ধীরে চড়ার কূলের দিকে জড় হয়। এমনি ভাবে জড় হতে হতে, চড়া পড়তে পড়তে একদিন হয়ত চড়ার কূল হয়ে যায় ভাঙ্গনকূল, আর ভাঙ্গন কূলে পড়ে চড়া।

নদীর জলকেই তো খুব নরম তরল জিনিস বলেই জানি। সেই জল কি করে পাহাড়ের উপত্যকার শক্ত শক্ত পাথরকে কেটে ফেলে এটা কি খুব আশ্চর্য্য নয়? জলে পাথর চিনির মত গলে যায় না—সুতরাং জলের পক্ষে খুব নরম পাথরকেও খইয়ে ফেলা অসম্ভব—এই জন্যে পাথর খওয়ানোর কাজে নদীকে অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। নদী-গর্ভ দিয়ে নদী জলের স্রোতে হাজার হাজার বালি আর পাথরের টুকরো টেনে নিয়ে যায়। সেই সব বালি আর পাথরের সাহায্যেই নদী পাথর কাটতে আরম্ভ করে; তাদের অবিরাম ঘর্ষনে আস্তে আস্তে পাথর ক্ষয় হতে থাকে। এই কথা শুনে মনে হয় যে এই বালি-পাথরে পরিপূর্ণ নদীর জল সমান্তরাল আর খাড়া ভাবে মাটি-পাথর কেটে চলবে—করাত দিয়ে খাড়া ভাবে কাঠ কাটলে যে রকম হয়। ঠিক তাই-ই হোত যদি শুধু নদীরই উপর এই পাথর খওয়ানো কাজের ভার থাকতো। কিন্তু তা থাকেনা—চারিদিক থেকে তুষার বৃষ্টি, বন্যা—এরা সবাই মাটি পাথর খওয়ানোর কাজে লেগে যায়। তা ছাড়া এই খইয়ে ফেলার কাজ বেশীর ভাগ তুষার বৃষ্টি প্রভৃতি দিয়েই হয়ে থাকে।

নদী গর্ভের বালি, পাথর, এরা যেমন নদীকে গভীর করে চলে, তুষার বৃষ্টি, এরা তেমনি নদীকে চওড়া করে দেয় আর দুধার ঢালু করে আনে। পৃথিবীর যে সব জায়গায় খুব কম বৃষ্টি আর তুষার পাত হয় সে সব জায়গায় নদী দেখলে বোঝা যায় নদীকে তার কাজ করবার জন্যে একলা ছেড়ে দিলে সে কি অদ্ভুত কাজই না করতে পারে। এই সব নদীর নাম canyon *।

* দুধারে খাড়া পাহাড়-ওয়ালা একরকম উপত্যকার নাম canyon। canyonএর নীচের দিকে একটা নদী থাকে। খুব স্রোতস্বিনী নদী পাহাড়কে কেটে canyon এর সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে বৃষ্টি বেশী হয়—এখানে নদীর তীর পাহাড়কে কেটে রাস্তা করলেও নদীর দুপাড় বৃষ্টির জন্য কেবলই ঢালু আর চওড়া হয়ে থাকে। কাজেই এখানের উপত্যকা খুব চওড়া হয়ে থাকে আর পাহাড়ের গা থেকে খাড়া ভাবে না নেমে এসে, ঢালু ভাবে আসে। Colorado প্রভৃতি দেশে বৃষ্টি কম—canyon কেবল সেই সব জায়গাতেই তৈরী হয়। কয়েকটি বিখ্যাত canyon এর নাম—কলর্‍্যাডোর grand canyon; yellow stone নদী; Niagara নদী (প্রপাতের নীচে)।

কিন্তু নদীর কাজ শুধু পাথর ভাঙ্গা নয়। সেই ভাঙ্গা জিনিস অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া—এও তার কাজ। নদীর প্রথম অংশের অর্থাৎ ঝর্ণার পাহাড়ে পথ খুবই ঢালু আর জলের তোড় খুব বেশী। সেখানে বড় বড় পাথরকে জল সহজেই বয়ে নিয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ আমরা যে ছোট ছোট ঝর্ণা দেখতে পাই তারা যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর নড়িয়ে ফেলতে পারে একথা প্রায় বিশ্বাসই করা যায় না। কোন কোন ঝর্ণায় বড় বড় পাথরে চিহ্ন দিয়ে রেখে তাদের অবস্থান মনোযোগ দিয়ে দেখা হয়েছে যে দাগ দেওয়া পাথর সরে যায়! সমতল জমীতে নেমে এলে নদীর আর খুব জোর থাকেনা—তার বেগ কমে যায় তখন সে খুব ছোট খাট জিনিসই সরাতে পারে।

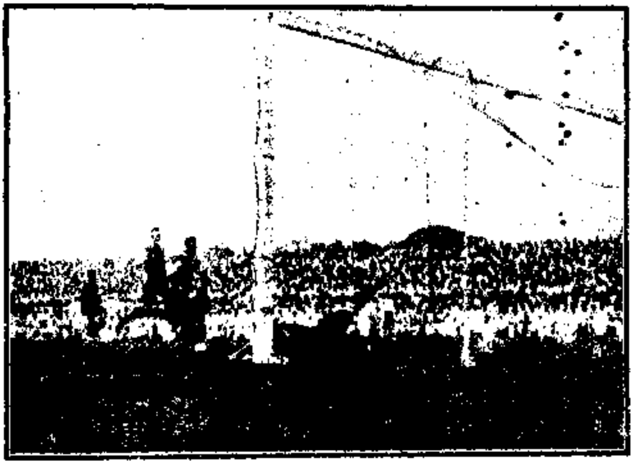
এই ভাবে নদী পাহাড়ের মাটি উপত্যকায় আর উপত্যকার মাটিকে সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ফেলে। শত শত যুগ ধরে সমুদ্রের বুকে মাটি জমা করতে করতে সেখানে সৃষ্টি করে ফেলে পাহাড়, আর পাহাড়ের মাটি খওয়াতে খওয়াতে সেখানে করে ফেলে সমুদ্র! তার সব কাজের মধ্যে বেশ একটি শৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায়। এই শৃঙ্খলা নষ্ট হয় অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির সময়। সে সব দুর্ঘটনা শেষ হয়ে গেলে নদী আবার আপনাকে শৃঙ্খলায় বেঁধে সমান তালে চলতে থাকে।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ফুটবল খেলার খবর

এবারে ফুটবল খেলার খবর এক কথায় শেষ!—শীল্ড খেলার প্রথম রাউণ্ডেই প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী দলের পরাজয়! এর মধ্যে মোহন বাগানের পরাজয় সব চেয়ে শোচনীয়! লীগ খেলায় এবার মোহন বাগানের স্থান খুব নীচে—পঞ্চম স্থান! কিন্তু সবাই আশা কোরেছিল যে শীল্ডের প্রথম রাউণ্ডে Wiltshireকে মোহন বাগান অনায়াসে হারাবে। Wiltshire এমন কিছু ভাল দল নয়—সে জন্যে মোহন বাগানের পরাজয় একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার! সেদিন আমরা খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। খেলা দেখে সবাই যে হতাশ হয়েছেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। সে দিন Wiltshire

মোহন বাগানের চেয়ে ঢের ভাল খেলেছিল, এবং তাদের জয় উপযুক্তই হয়েছে। যে ভাল খেলে জয় লাভ কোরেছে তার বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই বলবার নাই।



লিগে ক্যালকাটা মোহন বাগানের খেলা—মোহনবাগানের এস, দত্ত গোল দিয়েছে

কিন্তু এখন ভাববার বিষয় হয়ে পড়েছে বাঙ্গালী দলের খেলার অবনতি। সে দিন আমাদের এক বন্ধু খেলা দেখে বলেছিলেন যে, বাঙ্গালীর সব কাজেই উন্নতি ও অবনতি বড়ই কাছাকাছি—মধ্যে আর কিছুই নাই। কথাটা ভারী সত্যি! ক্লাবের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর সেই পরিমাণে খেলাও ক্রমেই নেমে আসছে। সকলের এখন কর্ত্তব্য হচ্ছে কি করে বাঙ্গালীদের ফুটবল খেলার উন্নতি করা যায়। এই দিকে যদি সবারই দৃষ্টি না পড়ে তবে মাঠে এক হাজার ক্লাব হলেও কোন উপকার হবে না। বাঙ্গালী ক্লাবের অবনতিটা এবার Europeans v. Indiansএর খেলাতে অনেকটা টের পাওয়া গিয়েছিল। সে খেলায় যদিও আমরা জয় লাভ করেছি, তাহলেও একথা স্বীকার কোরতে হবে ইউরোপীয়ানরা শেষের দিকে আমাদের চেয়ে ঢের ভাল খেলেছিল। নিতান্ত অদৃষ্ট খারাপ বলে তাদের হারতে হয়েছে। মোহন বাগান ও উইল্টশায়ারের খেলা দেখে আমাদের এই কথা গুলো মনে হয়েছে :—

(১) বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের বুট পায় দিয়ে খেলতে হবে। অন্ততঃ বৃষ্টির দিন বুট পায় দিয়ে খেলা চাই।

(২) বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের মধ্যে তেমন যোগাযোগ (combination) নাই। এটা practiceএর অভাব। Wiltshireএর এক wingএর খেলোয়াড় কি সুন্দর ভাবে অন্য wingকে বল দিচ্ছিল, তা মোহন বাগানের খেলোয়াড়দের দেখা উচিৎ। তাঁরা পাশের লোককে বল দিতে দিতেই বিরুদ্ধ দল বল কেড়ে নিচ্ছিল।

(৩) গোলের কাছে বল নিয়ে এসে বাঙ্গালা খেলোয়াড়রা নানা রকম খেলার বাহাদুরী দেখতে গিয়ে গোল দিতে পারে না। খেলার নানা রকম কায়দা দেখানো হয় বটে এবং গ্যালারী থেকে খুব হাত তালি পাওয়াও যায় বটে কিন্তু গোলের বেলায় ঐ যা! ভাল ইউরোপীয়ান টিমের প্রণালী কিন্তু অন্য রকম। গোলের কাছে বল যেই আনুক না কেন সেই গোলের দিকে সুট করে। কাউকে pass করা, কিম্বা একজন ভাল খেলোয়াড়ের জন্য অপেক্ষা করে না।

(৪) আমাদের খেলার মধ্যে একটু স্বার্থপরতার ভাবও আছে। অনেক খেলোয়াড় চেষ্টা করেন যতক্ষণ নিজের পায়ে বল রাখতে পারি। এতে নিজের নাম হবে। কিন্তু সুবিধামত এই বলটী যদি অন্য কোন খেলোয়াড়কে pass করে দেওয়া যায় তবে হয়তো গোল হবার সম্ভাবনা থাকে। এই অভ্যাসটী ত্যাগ না কোরলে কোন দলই জয়লাভ কোরতে পারে না।

অবশ্য বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের অনেক গুণ আছে যা কোন ইউরোপীয়ান দলের নাই। কিন্তু কেবল দোষের কথা এখানে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য, যাতে সকলে মিলে বাঙ্গালীর খেলাকে ক্রমেই উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। সমস্ত ভারতবর্ষে ফুটবল খেলায় বাঙ্গালার নাম—ফুটবল খেলা এখন বাঙ্গালীদের জাতীয় খেলার মত হয়ে পড়েছে। খেলার বিভাগে বাঙ্গালার যা কিছু নাম এই ফুটবল দিয়ে। বাঙ্গালার এই গৌরব যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পড়ে তার চেষ্টা সকলকে কোরতে হবে।

সবজান্তা

খৃষ্ট জন্মবার ৫৪০ বৎসর পূর্ব্বে এথেন্সে সর্ব্ব প্রথম সাধারণ পাঠাগার (Public Library) স্থাপিত হয়।

খাওয়ার অদ্ভুত উপায়—শামুদের জিহ্বার উপরে দাঁত আছে—এক এক জনের একশোর বেশী দাঁত; পেটের মধ্যেও তাদের দাঁত আছে। এক রকম কাঁকড়া আছে তারা পা ও হাঁটু দিয়ে খাবার জিনিষকে একেবারে গুঁড়িয়ে নেয়, তারপর মুখে পুরে দেয়। জেলী মাছ খাবার জিনিষকে সমস্ত শরীরে জড়িয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে।



একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক গণনা কোরে বলেছেন যে ১৭ মিলিয়ন বছর পরে সূর্য্য আর উঠবে না। তা না উঠুক!

রেশম পোকার এক একটা গুটিতে ৫০০ থেকে ১২০০ গজ সুতো থাকে।

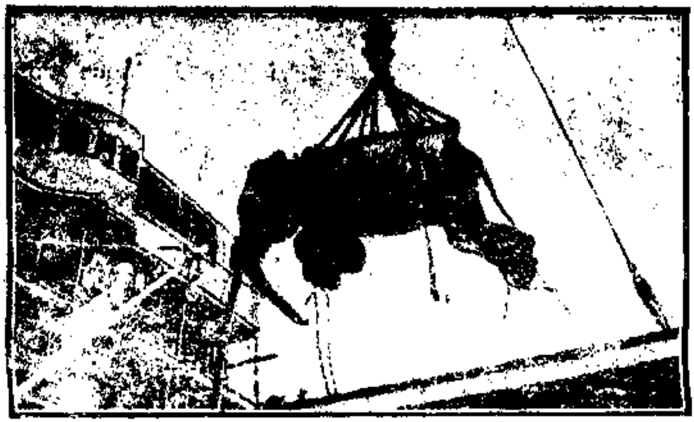
গণ্ডারের চামড়া সাধারণতঃ দুই ইঞ্চি পুরু।

ছবির এই লোকটা নাকি ভারতবর্ষে সবচেয়ে ছোট মানুষ। এই বামন-দেবতা দুই ফিট চার ইঞ্চি উঁচু। বাড়ী পেশোয়ারে।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রাচীর হচ্চে চীনের প্রাচীর। এই প্রাচীর খৃষ্ট জন্মাবার ২০০ বৎসর আগে তৈরী হয়েছিল। লম্বা ১২৮০ মাইল, উঁচু ২০ ফিট ও চওড়া ২৫ ফিট।

চীনের পিকিং গেজেটই সব চেয়ে পুরানো কাগজ। ১৪০০ বছর হল এই কাগজ ছাপা হচ্চে।

গাছের মধ্যে বাঁশের বৃদ্ধি সব চেয়ে বেশী, বর্ষাকালে কচি বাঁশ চব্বিশ ঘণ্টায় নয় ইঞ্চি বাড়ে।



এই হাতীটাকে অনায়াসে জাহাজ থেকে ঝুলিয়ে ডাঙ্গায় নামান হচ্ছে। যেন খেলার জিনিষ।

সমালোচনা

অভিশাপ—শ্রীবিভাষ চন্দ্র রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ।৵০ প্রকাশক বুক ষ্টল, পি ২১ [illegible] রোড, কলিকাতা। অভিশাপ লর্ড লিটনের "দি লাষ্ট ডেজ অব পম্পিয়াই" নামক বিখ্যাত উপন্যাসের অবলম্বনে ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী করে লেখা হয়েছে। এই বইখানিতে প্রাচীন রোমের অদ্ভুত শিল্প, কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্যের পরিচয় ছেলেমেয়েদের উপযোগী বেশ সুন্দর সহজ ও সরল ভাষায় লেখা হয়েছে। কয়েকটি সুন্দর ছবিতে বইটার সৌন্দর্য্য আরও বেড়েছে।

বুদ্ধির প্রশ্ন

১ জোয়েটা কোথায়?
২ প্যাস্তলোতা কে?
৩ এভারেষ্ট কত উঁচু?
৪ কনফিউসিয়াস কে?
৫ ভাস্কো ডা গামা কিসের জন্য বিখ্যাত?
৬ ওমর খৈয়াম কে?
৭ "ঝুনঝুন" কি
৮ কোন দুইটী বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি হাবশ্যজ্বরে মারা গিয়েছিলেন।
৯ শিখ ধর্ম্ম পুস্তকের নাম কি।
১০ পিরামিড কি।
১১ "ওস্তা" পদবীধারী একজন কবির নাম কি?
১২ "শর্ষে ফুল" দেখার মানে কি?

এখানে ১২টা প্রশ্ন দেওয়া গেল। যার উত্তর সব চেয়ে ভাল ও বেশী হবে তাকে চমৎকার বই পুরস্কার দেওয়া হবে। কেবল মাত্র মৌচাকের গ্রাহক গ্রাহিকারাই উত্তর দিতে পারবে। কারো সাহায্য নিয়ে উত্তর দিলে চলবে না।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, [illegible] প্রেস হইতে শ্রী[illegible] চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও [illegible]

মৌচাক

৮ম বর্ষ] ভাদ্র, ১৩৩৪ [পঞ্চম সংখ্যা

খোকাবাবুর মামার বাড়ী গমনে

দুই বছরের খোকাবাবু গেছে মামার বাড়ী,
জামা কাপড় জুতো পরে চড়ে রেলের গাড়ী।
ঠাণ্ডা বাড়ী, ঠাণ্ডা পাড়া, নেইকো সাড়া তার,
খোকন গেছে মামার বাড়ী সাত সমুদ্দুর পার।
লেখা পড়া এখন বাবার পুরো দমেই হয়,
নেইকো বইয়ের পাতা ছেঁড়ার কালি ফেলার ভয়।
ছাতাটা তার কেউ নাড়ে না বকায় নাক মেলা,
বুরুশ নিয়ে কেউ খেলে না জুতো-বুরুশ খেলা।
যখন তখন কাজের তাড়ায় হ'লে বাড়ীর বার,
পথ রোধেনা "যাব" বলে, কেউ কাঁদে না আর।
কমলা নেবু আম কেনবার নেই কোনো ফরমাস,
এক কথাতে বাবার এখন পুরোই অবকাশ।
পিসীমা তার, রান্না ঘরে রাঁধেন আপন মনে,
হয় না তারে চোখ রাখতে ঘরের সকল কোণে।

আল্লুর ঝুড়ির ওপর চড়ে খোকন কোথায় দোলে,
বাট্‌না বাটেন, গলা ধরে পিঠের পরে ঝোলে।
কোথায় খোকন্ খাচ্চে চিনি মুঠোয় ভরে নিয়ে,
তুল্‌ছে বড়া হাঁড়ির ভেতর হাতটা পুরে দিয়ে।
ছোট্ট হলেও ওর মত আর নেইকো পাকা চোর,
পুলিস তারে কয়না কিছু, তাইতো সাহস ওর।
পরীর ছোঁয়া পেয়ে কিরে ঘুমোয় খোকা আজ
চলছে কি তাই নির্ব্বিবাদে সকল দিনের কাজ!
"খোকা কোথায়?" গয়লা এসে শুধায় বারে বারে,
"খোকাবাবু ফঁসানে জান্‌তা" ফাঁসিয়ে গেছে তারে।
বেঁটে খাটো ষণ্ডা হেন দেখেই লাগে ভয়,
খোকার লাগি তার মনটাও স্নেহে কাতর হয়।
পাড়ার খুদে ছেলে মেয়ে সবাই তারে খোঁজে,
খোকা কোথায়! কেউ বা বোঝে কেউবা নাহি বোঝে।
মিথ্যা আশে দোরের পাশে খোঁজে খাটের তলা,
এমন বোকা বন্ধু খোকার যায় নাক আর বলা।
বেড়ালগুলো মনের সুখে দিচ্ছে গোঁফে চাড়া।
উঁচিয়ে লাঠি পিছন পিছন কেউ করে না তাড়া।
ঘুমো'ক তারা যেথায় সেথায় লেজ গুটিয়ে শুয়ে,
খোকন্ করে দস্যি-পনা মামার বাড়ীর ভুঁয়ে।
মামা আছেন, মাসী আছেন, আছেন কত জনা,
ভালবেসে সইবে খোকার সকল দস্যি-পনা।
লিখি পাড়ি আপন মনে, ভাবি সকল বেলা,
কবে বইয়ের ছিঁড়বে পাতা, দোয়াত যাবে ফেলা।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

পাহাড়

আমাদের গাঁয়ের পারে যে তেপান্তর মাঠ, তার ওপারে অনেক দূরে যে পাহাড়টা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ছেলেবেলা থেকে দেখছি একই ভাবে ঘাড়টা হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। আমাদের ঠাকুর্দ্দার ঠাকুর্দ্দা কি তারও আগের অনেক লোক পাহাড়টাকে ঠিক ঐ রকম ভাবেই দেখেছে। আমরা ভাবি পাহাড়টা সৃষ্টি হওয়া অবধি অমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর পৃথিবীর শেষ দিন অবধি থাকবে। কিন্তু পাহাড় বলে অন্য রকম কথা। সে বলে তার জন্মাবার ঢের আগেই ওখানে ছিল প্রকাণ্ড এক সমুদ্র! তার ভিতর ছোট বড় মাছ দিনরাত কিল্‌বিল্‌ করে বেড়াত। সেই সমুদ্রের ভিতর পাহাড়ের জন্ম হল; তারপর কতদিন পরে পাহাড় সমুদ্রকে হটিয়ে দিয়ে তার জায়গা দখল করে নিলে। আবার কোন দিন পাহাড়কে হটিয়ে দিয়ে সমুদ্র তার জায়গা দখল করে নেবে কে বলতে পারে?

সব জিনিসকে উল্টে পাল্টে ফেলা প্রকৃতির কাজ। যে সব জায়গা উঁচু ছিল তারা নীচু হয়ে যাবে, আর নীচু জায়গা কালক্রমে উঁচু পাহাড় হয়ে দাঁড়াবে—এ-ই যেন প্রকৃতির নিয়ম। সমুদ্রের তীরে-ই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় দেখা গেছে সমুদ্রের বেলাভূমি অল্প-অল্পে ক্রমেই উঁচু হয়ে চলেছে। যত দিন যায় ততই তার উচ্চতা বাড়ে। আবার কোন কোন সমুদ্রের তীরে বড় বড় গাছ অল্পে-অল্পে জলের তলায় ডুবে যাচ্ছে দেখে বোঝা যায় সেখানের মাটি দিন দিন নীচু হয়ে যাচ্ছে।

এমন প্রকাণ্ড উঁচু হিমালয় বা আল্পস্‌ পর্ব্বতের উপরেও সামুদ্রিক জীবজন্তুর কঙ্কাল দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই এরাও যে এক কালে সমুদ্রের তলায় ছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই। কবে এই সব আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে তা আমাদের জানবার দরকার নেই—শুধু এই টুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে পৃথিবীর নিজের মধ্যেই এমন সব শক্তি এখনও আছে যাতে করে সে নিজের উপরিভাগকে উঁচু

নীচু করে ফেলতে পারে। বড় বড় মহাদেশ আর মহাসমুদ্র এই দুইএর তুলনা করলেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে কত বড় শক্তি আমাদের পায়ের তলায় অদৃশ্য-ভাবে রয়েছে!

সাধারণতঃ পাহাড়ের জন্ম হয় সমুদ্রের ভিতরেই। তাই ছোট ছোট পাহাড় সমুদ্রের ভিতর থেকে মাথা তুলতে না তুলতেই জল, বৃষ্টি, ঝড়, ঝাপটা ইত্যাদি বাইরের সব শক্তি তাকে ক্ষয় করে নীচু করতে থাকে। পাহাড় গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্ষওয়াবার কাজ আরম্ভ যায় এবং পাহাড় সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠলেও এরা ক্ষয় করা কাজ থেকে ক্ষান্ত হয় না। সব শেষে এদেরই হয় জয়—অনেক অনেক দিন পরে পাহাড় আবার সমুদ্রের মাঝে মিলিয়ে যায়—আর তার জায়গায় রেখে যায় বড় বড় দ্বীপ কিংবা মহাদেশ!

পাহাড়ের মধ্যে থাকে সাধারনতঃ গ্রেনাইট পাথর, চূণাপাথর, বেলেপাথর, স্লেট পাথর ইত্যাদি। গ্রেনাইট পাথর খুব দৃঢ় ভাঙ্‌বার মতো জায়গা তার মধ্যে অল্পই থাকে। ফাটল বা জোড়ের মুখেই কেবল ভাঙবার সুবিধে। এই সব ফাটলের মুখ ছাড়া গ্রেনাইট পাথরের উপর বৃষ্টি শিলাপাত ইত্যাদি প্রকৃতির কোন শক্তি কোন রকম ক্ষওয়ানোর কাজ করতে পারে না। কাজেই সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে কেবল এই ফাটল গুলিকেই প্রকৃতি আক্রমণ করতে পারে।

বেলেপাথর, চুণাপাথর, স্লেট, শেল—এদের মধ্যে সাধারণতঃ স্তর বা থাক থাকে। যত মাটির নীচে যাওয়া যায় এই স্তরগুলির গঠনে অল্পে-অল্পে পরিবর্ত্তন হতে থাকে।

সাধারণতঃ পৃথিবীর ভিতরে যত রকমের স্তর আছে তারা সমতল ভাবে অবস্থান করে। কিন্তু পাহাড় গড়ে ওঠবার সময় অনেক জায়গায় তারা হেলে যায়, কোথাও বা কুঁকড়ে যায় বা ঢেউএর মতো উঁচু-নীচু হয়।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে হঠাৎ জোরে আঘাত পড়লে যে সব পাথর ভেঙে যায় তাদের উপর যদি অনেক দিন ধরে অনবরত আস্তে আস্তে চাপ দেওয়া যায় তাহলে তারা ভাঙেনা, বেঁকে যায়। সুতরাং আমাদের মেনে নিতে হবে যে

বেলে পাথরের স্তর একটা হঠাৎ জোর আঘাতে কুঁকড়ে বা বেঁকে যায় না, বরং অল্পে অল্পে ঠেলা খেতে খেতে অনেক দিন পরে আপনি বেঁকে যায়।

এই বাঁকানোর আর কুঁকড়ানোর কাজ যখন খুব তাড়াতাড়ি হয় তখন পাথর বেঁকে যায় না—ফেটে যায়—আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের জোড় খুলে গিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে তারা নীচে গড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের সময় পাহাড়ের এই রকম ঘটনা দেখা যায়।

বাইরের যে সকল শক্তি পাহাড়কে ধ্বংস করছে তাদের মধ্যে প্রধান তুষার, বৃষ্টি, শিশির, রোদ, নদী, সমুদ্র আর বাতাস।

যে সব জায়গা খুব উঁচু অথবা বিষুব-রেখার অনেকটা উত্তরে বা অনেকটা দক্ষিণে অবস্থিত সেই সব জায়গায়ই তুষারের প্রভাব খুব বেশী। জলকে জমিয়ে বরফ করলে তার আকার অনেকটা বেড়ে যায় এটা প্রমাণ হয়ে গেছে— এই জন্যেই অনেক সময় ঠাণ্ডা জায়গায় শীতের সময় জলের পাইপের ভিতর জল জমে গিয়ে লোহার পাইপকে ফাটিয়ে দেয়। সেই রকম বড় বড় পাথরের ফাটল বা গর্তের মধ্যে শীতকালে যখন জল জমাট বাঁধে সেই জল জমার প্রচণ্ড শক্তিতে অত্যন্ত শক্ত পাথরও ফেটে চৌচীর হয়ে যায়।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সূর্য্যের তাপে সারাদিন পাহাড়ের পাথর ক্রমে ক্রমে তেতে প্রসারিত হয়ে ওঠে আর সূর্য্য ডোববার সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। এই ভাবে অল্পে অল্পে ভীষণ গরম হয়ে উঠেই হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার দরুন, প্রসারণ আর সঙ্কোচনের মধ্যে পড়ে ভীষণ শক্ত গ্রেনাইট পাথরও ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

চলন্ত জল, বরফ বা বাতাস এরা ক্ষওয়ানোর কাজ করে অন্য জিনিসের সাহায্য নিয়ে। এরা পাহাড়ের গা দিয়ে ভাঙ্গা পাথর বালি ঠেলে নিয়ে গিয়ে পাহাড়কে ক্ষওয়ায়।

নদীর চলন্ত জল বড় বড় গিরিবর্ত্ম বা উপত্যকা কেটে পাহাড়কে চিরে দেয়। আর সমুদ্রের জল যখন তীরে আছড়ে পড়ে সে ঢেউএর সঙ্গে পাথরের অসংখ্য টুকরা

এনে তীরবর্ত্তী পাহাড়ের গায়ে ঘা দেয়। এই সব পাথরের আঘাতেই সমুদ্রের তীরের পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গুহা তৈরী হয়ে যায়।

ধূলোর রাস্তা বা বালিয়াড়ির উপর চলন্ত বাতাসের দিকে লক্ষ্য করলে বাতাসের ক্ষয় করবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাতাসের সঙ্গে ধূলো, বালা, পাথরের গুঁড়ো উড়ে সামনে যা জিনিস পায় তাতেই ধাক্কা মারে। এমনও দেখা যায়, সমুদ্রের তীরে যে সব বাড়ী থাকে, তাদের সার্সী বা জানলা ক্রমাগত বালির ঝাপটা খেয়ে খেয়ে খস্‌খসে হয়ে পড়ে। এই বাতাসের কাজ যদিও আর সবার তুলনায় খুবই কম, তবুও অনেক অনেক দিন ধরে বাতাসও পাহাড়ের গায়ে গুহা কেটে ফেলতে পারে!

পাহাড়ের আকৃতি নির্ভর করে যা জিনিস দিয়ে পাহাড় তৈরী তারই উপর। চূণ পাথরের পাহাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢালু জমা দেখা যায়। সেই সব পাহাড়ের নিস্তব্ধতা আর নির্জ্জনতা বোধ হয় কোথাও এমন ভাবে অনুভব করা যায় না। সেখানে নরম মখমলের মতো ঘাসের উপর মানুষের চলার শব্দও মিলিয়ে যায়। উপত্যকা-গুলিও জনশূন্য বলে সে জায়গাকে আরও নির্জ্জন করে তোলে। দূর থেকে দেখলে তার মধ্যে কোন গর্ত্ত বা ফাটলও চোখে পড়ে না—মনে হয় যেন বুক চিতিয়ে প্রকাণ্ড একটা দৈত্য পড়ে রয়েছে। যদিও তার মধ্যে দু'টি একটি ছোট্ট নদী দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তার স্রোতের দিকে চলতে চলতে দেখা যাবে যে হঠাৎ কোন এক পাথরের ফাটল বা গুহার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে মাটির তলা দিয়ে কোথায় চলে গেছে কে জানে।

বেলে পাথরের পাহাড় সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও প্রকাণ্ড বড় পাহাড়ের মতো উঁচু, কোথাও বা ক্ষয়ে গিয়ে সমতল জমীর মত ঢালু।

স্লেট পাহাড় আবার অন্য রকম—তার গায়ের নরম অংশ ক্ষয়ে গেলেই ছুঁচোলো শক্ত পাথর বেরিয়ে পড়ে। দেখলে মনে হয় যেন সঙিন্ উঁচিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

পাহাড়ের আকৃতি তার বয়সের উপরও নির্ভর করে। আল্‌স্ বা হিমালয় পর্ব্বতের মত বড় বড় পাহাড় খুব বেশী দিনের পুরোনো নয়। তাই এখনও তাদের

চূড়ো বরফে ঢাকা মাথা তুলে থাকে। প্রকৃতির ধ্বংসকারী শক্তি তাদের আলাদা আলাদা চূড়ো গভীর উপত্যকা তৈরী করে দিয়েছে কিন্তু এখনও তাদের সব শক্তি সব সৌন্দর্য্য ধ্বংস হয়ে যায় নি। আবার বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন কোন অংশ অনেক অনেক দিনের পুরোনো। তারা প্রকৃতির সঙ্গে অসংখ্য বছর ধরে যুদ্ধ করে এসেছে। এক কালে তারা হয়ত হিমালয়ের চেয়েও উঁচু ছিল—এখন কেবল তাদের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। কোন কোন পাহাড় আবার এত বুড়ো যে তাদের আর পাহাড় বলা চলে না—তারা প্রায় সমান জমী হয়ে এসেছে। কোন কোন জায়গায় তাদের নাম দেওয়া হয় Plateau। পাহাড়ের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি অনেক কথাই আলোচনা করা গেল—কিন্তু একটা কথা এখনও বলা হয়নি। আমাদের শস্য শ্যামলা পৃথিবী যে সোনার ফসলে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে তার প্রধান কারণ পাহাড়। বৃষ্টির সময়, বন্যার সময় যে উর্ব্বর মাটি পাহাড় ধুয়ে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে সেই মাটিতেই আমাদের ফসল জন্মায়—আর সারা বছর সেই ফসল খেয়ে লোকে বেঁচে থাকে। পাহাড় যদি না থাকতো প্রতি বছর বৃষ্টির জলের সঙ্গে এমন উর্ব্বর মাটিও আমরা পেতুমনা – আর এমন সোনার ফসলেও আমাদের ঘর ভরে উঠত না।

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মেঁও

'মেঁও !'

'কে—ও ?' বলে আমি ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে বসলুম। আর কিছু শোনা গেল না !

দূরে অন্ধকারের ভিতর রাত তিনটের ঘণ্টা বাজলো—তিনটে ঝিম আওয়াজ। আমার ঘরের প্রদীপটা একবার হাই তুলে চোখ বুঁজলে।

'মেঁও' !

এবার পায়ের খুব কাছ থেকে আওয়াজ হোলো। আমি ফস্ করে শোপের

ওই পাহাড়ের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে আর কোথাও চলে যাবে। কিন্তু যাবার আগে এমন একটা মূর্ত্তি পাথরে কেটে রেখে যাবে যে যদি কখনও কোন লোক তা দেখে তো বলবে, "হাঁ একজন কারিগর ছিল বটে!"

সে ভাবতে লাগল—কি কাটে পাথরে? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই ছেলে বেলাকার খেলার সাথী, বন-গাঁয়ের কালো বেড়াল আর তার তিনটে ছানাকে! প্রকাণ্ড একটা কালো পাথর বেছে নিয়ে সে কাজ সুরু করলে। অনেক মাস ধরে খেটে কাজ শেষ হোলো।

যন্ত্রপাতি গুটিয়ে রেখে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে সে তৈরী কালো পাথরে কাটা মূর্ত্তিটার দিকে চেয়ে দেখে একটা ছানা তার অন্ধ চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে আছে। কারিগর দেখলে তার চোখের তারা দুটি খোদাই করতে সে ভুলে গেছে। আবার পোঁটলা থেকে যন্ত্র বার করে যেমন একটি বার সেই পাথরের বেড়াল ছানার চোখে বসিয়েছে—অমনি তার মায়ের পাথরের প্রকাণ্ড থাবাটা তার বুকে এসে লাগল। সে পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল।

"তারপর? তারপর?"

"তারপর কি হোল জানিনা!"

* * *

দপ্ করে নীল চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। যখন জেগে উঠলাম তখন সকাল হয়েছে। চোখ মেলে দেখি বাবার টেবিলের উপর একটা প্রকাণ্ড কালো পাথরের বেড়াল—তার আধখানা ভাঙ্গা, ধুলো কাদা মাখা। এটা কোত্থেকে এলো কে জানে, ভাবছি; মা বলছেন শুনলাম—"অত বড় ছেলের কাণ্ড দেখলে। সমস্ত রাত দেয়ালা করেছে—একবার হাসে, একবার কাঁদে!"

শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপূর্ব বন্ধুত্ব

ইন্দিরা আর শোভা পড়ত মেয়ে স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে। তাদের মধ্যে খুবই ভাব। প্রায় প্রত্যেক বছরই শোভা হত প্রথম আর ইন্দিরা হত দ্বিতীয়। তাদের মধ্যে এরকম প্রতিযোগীতা থাকলেও হিংসার লেশ মাত্রও ছিলনা। কেউ কাউকে না দেখে একদিনও থাকতে পারত না। ছুটির দিন ইন্দিরা ঝি পাঠিয়ে শোভাকে নিয়ে আসত তাদের বাড়ীতে। আর যে দিন শোভা রান্না বা এরকম কোন কাজের জন্য আটকে পড়ত, সেদিন সে নিজেই তাদের বাড়া গিয়ে হাজির হত। তাদের প্রাণের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না।

স্কুলে দুজনে একত্র না হলে কারুই টিফিন খাওয়া হত না। শোভার মা একটা কৌটার মধ্যে দুখানা আটার রুটি, কয়েক টুকরা আলু ভাজা আর একটু গুড় দিয়ে শোভাকে টিফিন সাজিয়ে দিতেন। গরীবের মেয়ে সে, তাতেই খুব সন্তুষ্ট ছিল। ইন্দিরার বাবা ছিল বড় উকীল আর জমীদার। রোজ দুপুর বেলা ঝি তার জন্য দুধ সন্দেশ প্রভৃতি অনেক রকম ভাল খাবার নিয়ে স্কুলে যেত। ইন্দিরা যখন অনেক চেষ্টা করেও শোভাকে একটু দুধ বা এক টুকরা সন্দেশও খাওয়াতে পারল না তখন থেকে সেও ঝি আসা বন্ধ করে দিয়ে একটা কৌটায় দুখানা করে রুটি আনতে আরম্ভ করল। মা কারণ জিজ্ঞাসা করলে খুব রাগ করে উত্তর দিল, "সব মেয়ে খায় রুটি আর আমি বুঝি একা খাব সন্দেশ। সে আমি পারব না।"

ম্যাট্রিক পরীক্ষার কিছু দিন পূর্বে একদিন শোভার বাবার ডাক এল পরপার থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে শোভার পরীক্ষা দেবার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল। তার মা আর কোন উপায় না দেখে মেয়ের হাত ধরে দেশে ফিরে যাওয়াই ঠিক করলেন।

শোভার এই আকস্মিক বিপদের সংবাদে স্কুলের সমস্ত টিচার ও মেয়েরা দুঃখীত হলেও সব চেয়ে বেশী ব্যথা পেয়েছিল ইন্দিরা। সেদিন সে আর স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে গেল না, দরোয়ানকে নিয়ে বরাবর চলে এল শোভাদের বাড়ীতে।

শোভা ইন্দিরাকে দেখে কোন কথা বলতে পারল না; শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর দুটিতে গলা ধরে অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। ইন্দিরা বাড়ী ফিরে এল শিশির পড়া ফুলের মত একটা খুব ভারী মন নিয়ে। সে গিয়েছিল শোভাকে তার পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করতে কিন্তু সে সব কোন কথাই হ'ল না।



তারপর দুটিতে গলা ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল

কয়েক দিন পরে ইন্দিরা আবার শোভাদের বাড়ী গেল। বড় দুঃখে পড়ে শোভা ভগবানের উপর সমস্ত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল। সমস্ত দিন সে কেবলই ভাবছিল— ভগবান যদি দয়াময় তবে আমাদের কেন এমন করে সর্ব্বনাশ করলেন। এই সব নানা দুশ্চিন্তায় তার মন সেদিন খুব খারাপ ছিল।

একথা সে কথার পর ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করল, "তুই যদি ফিসের টাকা যোগাড় করতে না পারিস্ তবে বল না আমি দিয়ে দিচ্ছি আর তাতে যদি তোর আপত্তি থাকে তবে ক্লাশের সব মেয়েরা চাঁদা তুলে দিচ্ছি।"

মর্য্যাদা জ্ঞান ছিল শোভার মধ্যে খুব বেশী, তা ছাড়া এক দিনে নানা রকম ভাবনা চিন্তায় সে খুবই খিট-খিটে হয়ে গিয়েছিল। সে রূঢ় ভাষায় উত্তর দিল, "তোমাদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে পরীক্ষা দেবার আগেই যেন আমার মরণ হয়।"

"ছিঃ শোভা, তুই কি বলছিস্—আমি বুঝি তাই বল্লুম।"

"তবে কি—বলছি পরীক্ষা দেবো না, তাতে তোমাদের এই মাথা ব্যথা কেন"

"তুই না দিলে যে ভাই আমার মোটেই ভাল লাগবে না।"

"তুমি বড় লোকের মেয়ে বলে কি তোমার যা ভাল লাগবে তাই আমায় করতে হবে!"

একথাটা ইন্দিরার বুকে শেলের মত বিঁধিল। সে শুধু দাঁড়িয়ে বলল, "আমি সে ভাবে কথাটা বলিনি, ভাই"—তারপর ধীরে ধীরে চলে এল। পথে আসতে আসতে যে মনে করল যেমন করেই হোক শোভাকে বোঝাতে হবে যে ইন্দিরাই পৃথিবীতে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

* * *

নিজের ফিস্ দিয়ে ইন্দিরা শোভার ফিসের টাকাও জমা দিয়ে দিল। টিচাররা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে শোভা দেশ থেকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। খবরটা শুনে সকলই খুব খুসী হল। দিন কয়েক পরে ইন্দিরা রসিদটা নিয়ে একটা চিঠি লিখে শোভার কাছে তাকে পাঠিয়ে দিল। তার উত্তরে শোভা ঘৃণা ভরে রসিদটা ফিরিয়ে দিয়ে লিখল, ' আমি তোমার কাছে এমন কি করেছি যার জন্য তুমি আমায় এ রকম করে বার বার অপমান করছ।"

সব মেয়েরা গেল পরীক্ষা দিতে। সব মেয়েরই আশা ছিল যে 'হলে' আবার শোভার সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হল না দেখে সকলই দুঃখীতা হল।

কি ভেবে ইন্দিরা কিন্তু তার সমস্ত খাতায় শোভার নাম ও নম্বর লিখে দিল। কাউকে কোন কথাই সে জানতেও দিল না।

ফল বেরুলে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখল যে শোভা প্রথম হয়েছে আর ইন্দিরা ফেল করেছে। মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীকে জানাল যে শোভা পরীক্ষাই দিল না তবে প্রথম হল কেমন করে। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়ে পড়ল। ফলে ইন্দিরা দু'বছরের জন্য পড়া বন্ধ করতে বাধ্য হল। শোভা কিন্তু এ ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারল না

* * *

প্রায় ছ'মাস পরে একদিন বাজারের জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে একটা খবরের কাগজে তৈরি ছেড়া ঠোঙ্গার উপর শোভার নজর পড়ল। তাতে "অপূর্ব্ব বন্ধুত্ব"

শীর্ষক একটা স্থানে লেখা ছিল "স্কুলের ছাত্রী ইন্দিরা রায় তার সহপাঠিনী শোভা বসুর পরিবর্ত্তে পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে দুই বছরের জন্য রাসটিকেট হইয়াছে।"

শোভার মুখে কথা সরল না। সে পাথরের মত ঠোঙ্গাটা হাতে করে বসে রইল। তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ জল পড়তে লাগল।

শ্রীউমাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

মাকড়সার কথা।

তোমার ঘরের কোনে মাকড়সা দেখিয়াছ—মাকড়সার জালও দেখিয়াছ! মাকড়সারা তাহাদের জালের কাছে ছোট ছোট মাছি এবং অন্যান্য পোকা মাকড় ধরিয়া খায়। মাকড়সার জালে মশা বা মাছি পড়িলে তাহার আর উদ্ধার নাই। কিন্তু এই মাকড়সার যে আর কত বিদ্যা এবং শক্তি আছে তাহা তোমরা বোধ হয় জান না—শুনিলে হয়ত বিশ্বাসও করিবে না।



মাকড়সা

পোকামাকড় এবং জন্তু-জগতে, এমন কি কতক বিষয়ে মানুষ-জগতেও মাকড়সার মত ধূর্ত্ত, সাহসী এবং চালাক প্রাণী আর দ্বিতীয় নাই। একজন বিখ্যাত

পণ্ডিত বলিয়াছেন যে এমন দিন আসিতে পারে, যখন একমাত্র মাকড়সাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জীব হইবে। তাহার কাছে মানুষ, পশুপক্ষী এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রাণী হার মানিবে! তোমাদের অবশ্য ইহাতে ভয় পাইবার কারণ নাই, সে রকম দিন খুব তাড়াতাড়ি অর্থাৎ দু চার হাজার বছরের মধ্যে আসিবার সম্ভাবনা নাই।

সত্য সত্যই মাকড়সার সমস্ত কার্য্যকলাপ ভাল করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া পারা যায় না। মাকড়সার জাল বোনার অদ্ভুত কৌশল হাজার চেষ্টা করিয়াও মানুষ কোনো দিন শিখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। মাকড়সা এক প্রকার অদৃশ্য সুতার জাল বোনে—এই সুতাকে যদি ২০০০ গুণ মোটা করা যায়, তবে তাহা ঘোড়ার একটি লোমের মত মোটা হইবে! মানুষের মাথার একটি চুলকে ঐ অনুপাতে মোটা করিলে তাহা প্রায় ৬ ইঞ্চি মোটা হইবে।

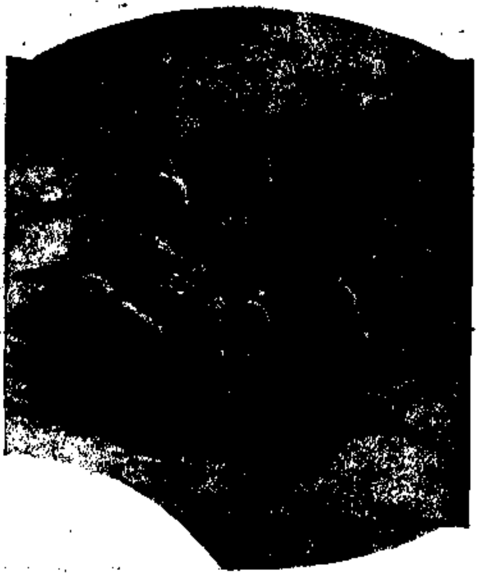

মাকড়সার জালে ইঁদুর

মাকড়সার সুতার জোরও আশ্চর্য্য রকমের। এই প্রকার অদৃশ্য সুতার দ্বারা সে তাহার অপেক্ষা দশ বিশ গুণ জন্তুকে অনায়াসে বন্ধন করিয়া ফেলিতে পারে। এমন করিয়া বাঁধে যে সে আর নড়িতেও পারে না।

জঙ্গলী মাকড়সারা পোকা মাকড় হইতে আরম্ভ করিয়া, বড় বড় ব্যাঙ, জলের মাছ, সাপ এমন কি বড় বড় বাদুড়কেও আক্রমণ করিতে ভয় পায়না। এই সব প্রাণীকে সে তাহার নাগপাশ রূপ জালের মধ্যে ফেলিয়া ধীরে ধীরে হত্যা করিয়া

আহার করে। অনেক সময় মাকড়সা অন্য শীকার না পাইলে ইঁদুরকে তাহার জালে ফেলে। ইঁদুর হয়ত ঘুমাইয়া আছে, মাকড়সা সেই সময়ে তাহার ল্যাজে সুতা বাঁধিয়া দিয়া উপরে গাছের ডালে বা অন্য কোথাও উঠিয়া গেল। সেই স্থান হইতে সে ক্রমশঃ টান দিয়া ইঁদুরকে শূন্যে ঝুলায়। তারপর তার চারিদিকে সুতা জড়াইয়া তাহাকে একেবারে চিরকালের মত বাঁধিয়া ফেলে।

ছবিতে দেখ একটি ইন্দুরকে মাকড়সা কেমন করিয়া ফন্দি করিয়া তাহার জালের দিকে টানিতেছে। ইন্দুরের আর নড়িবার ক্ষমতা নাই। সাপকেও এই প্রকারে মাকড়সা তাহার জালে বন্দী করে। একবার এক জঙ্গলে একজন শীকারী দেখিতে পান একটা গাছের ডালে একটি সাপ অসহায় অবস্থায় ঝুলিতেছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় সাপ শূন্যে ঝুলিতেছে। কাছে গিয়া দেখিলেন যে সাপের মুখ মাকড়সার সুতা দিয়া বাঁধা—তাহার ল্যাজও এই প্রকারে বাঁধা। গাছের ডালে এক স্থানে একটি ছোট মাকড়সা সুতা গুটাইয়া অতি সাবধানে সাপকে তাহার জালের দিকে টানিতেছে।

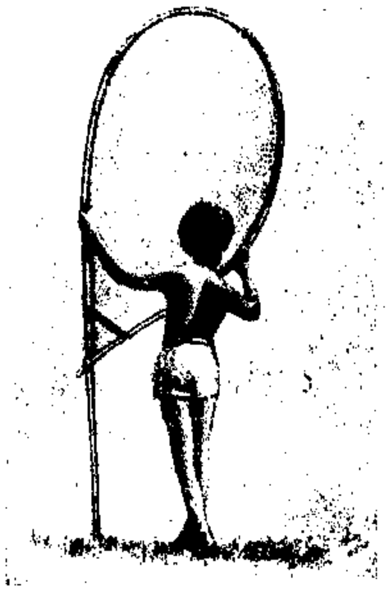


মাকড়সা পাখিকে ধরিয়াছে

আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে এক প্রকার বিকট মাকড়সা আছে। তোমরা যত বড় মাকড়সা সাধারণতঃ দেখ এই বিকট মাকড়সা তার চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বড়। এই সব মাকড়সা তাহার অপেক্ষা বড় বড় পাখীর ঘাড়ে লাফ দিয়া পড়িয়া

তাহাকে হত্যা করে! খুব দ্রুতগামী পাখীও ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পায় না। ভাগ্যিস—আমাদের ঘরের কোনে কোনে এই রকম মাকড়সা নাই। ছবিতে দেখ একটি বিকট মাকড়সা কেমন করিয়া একটি পাখীকে আক্রমন করিয়া তাহাকে হত্যা করিতেছে।

নিউ গায়নার অসভ্য জাতিরা এক রকম জাল পাখী ধরিবার জন্য ব্যবহার করে। বড় টেনিস ব্যাটের মত দেখিতে। এই জাল মাকড়সারা বুনিয়া দেয়।



মাকড়সার জাল

কেবল কাঠিটি বাঁকা করিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে বা ঘরের কোনে টাঙ্গাইয়া রাখিলেই হইল। তারপর দিন দুই পরে দেখা যাইবে তাহাতে খুব শক্ত জাল বোনা হইয়া আছে। বেচারী মাকড়সা নিজের জন্য এই জাল বোনে—আর মানুষ তাহা নিজের কাজে লাগায়। মাকড়সার জালে যে এমন কাজ পাওয়া যায়—তাহা আমরা জানিতাম না। এই জালের মধ্যে ছোট ছোট পাখী পড়িলে তাহারা জাল ছাড়িয়া উড়িয়া যাইতে পারে না। ছবিতে জালটির নমুনা দেখ।

মাকড়সার পাতলা সুতার যেমন জোর, মানুষ যদি সেই রকম দড়ি তৈয়ার করিতে পারে—তবে গুলি সুতার মত সুতাতে হাতি বাঁধা রাখা যাইতে পারে। কেবল মাত্র এই সুতার রহস্যটি মানুষ যদি কোনো রকমে জানিতে পারে—তবে বড় বড় পুল ইত্যাদি টোয়াইন সুতায় বাঁধিয়া নদীর উপর ঝুলাইয়া দেওয়া চলিবে—আর পুলের উপর দিয়া রেলগাড়ী নির্ভয়ে চলিয়া যাইবে।

জাল বুনিবার স্থান নির্ব্বাচন এবং জালবোনা এই দুই কার্য্যে মাকড়সার যে দক্ষতা এবং প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মানুষেরও নাই।

তোমাদের ঘরের কোনে যদি মাকড়সার জাল থাকে—তবে রবিবার দিন দুপুর বেলা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া জালের কাছে বসিয়া যদি মাকড়সার কার্য্যকলাপ দেখ—তবে অবাক হইয়া যাইবে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

জলার পেত্নী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেওয়ানজীর কথা

হেরম্বর কথা শুনে আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। সে আবার সপ্তাহে একবার কোরে বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করলে। কিছুদিন এই রকম যায়। একবার সে প্রায় মাস খানেক বাড়ীতে এল না। আমি সেরেস্তায় খবর নিয়ে জানলুম, যে ইদিলপুর থেকে অনেক দূরে একটা তালুকের নায়েব চুরি কোরে হিসেবে গোঁজামিল দিচ্ছিল সেই জন্য তাকে সেখানে পাঠান হয়েছে। এখনো ইদিলপুরে ফিরতে তার মাসখানেক দেরী হবে। সংবাদটা শুনে আমার ও আমার স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। একমাত্র ছেলে এমন বিশ্বাসী ও কাজের ছেলে হয়েছে শুনলে কোন বাপ-মার প্রাণে না আনন্দ হয়!

এর প্রায় মাস দেড়েক পরে হেরম্ব বাড়ীতে এল। সে বল্লে—আজকাল কাজের জন্য আমাকে তালুকে-তালুকে ঘুরে বেড়াতে হয়। চারিদিকে চুরি হচ্ছে। সমস্ত তদারকের ভার জমিদার আমার ওপরে দিয়েছেন।

আমি তার কথা শুনে খুশী হোয়ে তাকে জমিদারী-সংক্রান্ত কাজের অনেক উপদেশ দিলুম।

সপ্তাহ খানেক থেকে সে আবার ইদিলপুরে ফিরে গেল। যাবার সময় হেরম্ব বলে গেল—দু-চার মাস আমার খবর না পেলে ব্যস্ত হোয়ো না। কারণ আমাকে এখান সেখানে ঘুরতে হচ্ছে, সব সময়ে খবর দিয়ে উঠতে পারিনে।

সেবার প্রায় ছ-মাস হেরম্বর কোনো সংবাদ পেলুম না। প্রথমটা আমরা তত ব্যস্ত হয়-নি; কিন্তু শেষ কালে যখন আট মাস কেটে গেল তখন তার জন্য ভাবনা হোতে লাগ্‌ল। কাছারীতে তার খোঁজ করলুম কিন্তু কেউ বলতে পারলে না। শেষকালে একদিন সাহস কোরে জমিদার মশায়কে জিজ্ঞাসা কোরে ফেল্লুম। তিনি বল্লেন—হেরম্ব গত মাসে চৌদাঘি পরগণাতে ছিল, এ মাসে কোথায় আছে এখনো সংবাদ পাইনি। আচ্ছা খবর এলেই তোমাকে বল্‌ব।

প্রায় বছর খানেক চলে গেল কিন্তু তবুও আমাদের ছেলের কোনো সংবাদই পেলুম না। আমরা শঙ্কিত হোয়ে উঠলুম, নিশ্চয় তার কোনো বিপদ হয়েছে। হয়ত সে আর বেঁচে নেই তাই এতদিন সেরেস্তার কর্ম্মচারীরা আমার কাছে সে কথা লুকোচ্ছে।

আমাদের সেরেস্তায় যে মফস্বলের খাতাপত্র দেখত তারই এ বিষয়ে ঠিক জানবার কথা। আমি তাকে গিয়ে ধরলুম। বল্লুম—ভাই হেরম্বর কি হয়েছে আমাকে বল। আমার স্ত্রী বলেছেন তার সংবাদ না নিয়ে এলে তিনি না খেয়ে মরবেন।

আমার কথা শুনে সেই কর্ম্মচারীটি খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বল্লে—আপনার কাছে কথাটা আর গোপন রাখা ঠিক হবে না। হেরম্ব অনেক দিন হোলো মারা গিয়েছে।

সংবাদটা শুনে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হোলো। কি সর্ব্বনাশ! এ কথাটা আমায় এতদিন বলা হয় নি কেন? কিসে তার মৃত্যু হোলো?

কর্ম্মচারীটি বল্লেন—তার কলেরা হয়েছিল। দু-দিন ভুগে সে মারা গেছে। জমিদার

মশায় আপনাকে বলতে বারণ কোরে দিয়েছেন বলেই বলা হয়-নি। তবে আপনি বড্ড ব্যস্ত হয়েছেন —

—ব্যস্ত হব না! হেরম্ব যে আমাদের একমাত্র ছেলে ছিল —!

কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ী ফিরে এলুম। সংবাদটা শুনে আমার স্ত্রী একেবারে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়লেন! হেরম্বর শোকে আমি এত কাতর হোয়ে পড়লুম যে কাজকর্ম্ম সব ছেড়ে দিলুম।

কিছু দিন বাদে জমিদার মশায় আমাকে ডেকে নিয়ে আবার কাজ কর্ম্ম করতে আদেশ দিলেন। বল্লেন—কাজকর্ম্ম করলে তবুও কিছুক্ষণ ছেলের শোক ভুলে থাকবে।

তিনি বড় বাবু অর্থাৎ আপনার বাবার নাম কোরে বল্লেন—দেখ সে চলে যাওয়ায় আমিও পুত্রশোক পেয়েছি—কিন্তু কি করব—কাজকর্ম্ম নিয়েই আছি।

আবার কাছারীতে যেতে আরম্ভ করলুম। এমনি কোরে প্রায় পাঁচ-ছ বছর কেটে যাওয়ার পর জমিদার মশায় মারা গেলেন।

কর্ত্তা মারা যাওয়ার পর ছোটবাবু জমিদারীর মালিক হলেন। কর্ত্তার অত্যাচারে জমিদারী যেমন নরক হোয়ে উঠেছিল, ছোটবাবুর গুণে সেই জমিদারী তেমনি স্বর্গে পরিণত হোলো।

এই রকমে কিছুদিন যাবার পর ছোটবাবু আমাকে বাড়ীতে ডেকে এনে এইখানেই থাকতে বল্লেন। ছোটবাবু ছিলেন আমাদের দেবতা। তাঁর কথা অমান্য করতে পারলুম না। সেদিন থেকে জমিদার বাড়ীতে—এই ঘরে এসে আমরা স্বামী স্ত্রীতে বাস করতে লাগ্‌লুম।

দিন যায়, দিন কারো জন্যে বসে থাকে না। ছোটবাবুর রাজত্বের আবার শান্তি ফিরে এল। সকলে সুখে থাকতে লাগ্‌ল। আমিও সুখে রইলুম কিন্তু পুত্র শোক! সে তো আর ভুলতে পারা যায় না। বুকের মধ্যে সেই শোকের আগুন পুষে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই রকমে কিছুদিন চলে যাবার পর

একদিন গভীর রাত্রে আমার স্ত্রী ধাক্কা দিয়ে আমায় তুলে দিয়ে বল্লে—দেখ, আমি যেন কার গলার আওয়াজ পেলুম। কে যেন মা বলে দরজা ঠেল্লে। গলার আওয়াজটা ঠিক যেন হেরম্বর।

তাড়াতাড়ি বাতিটা জ্বেলে ফেলা গেল। স্বামী স্ত্রী দুজনে কাণ পেতে রইলুম। যদি আবার শোনা যায়! অনেকক্ষণ কেটে গেল, কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। আমি মনে করলুম হয়ত আমার স্ত্রী স্বপ্ন দেখেছে। বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়া গেল।

তখনো ঘুম আসে-নি। এপাশ ওপাশ করছি। এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেলুম—মা!

চম্‌কে উঠে বসলুম। এ যে তারই স্বর। এ কণ্ঠস্বর কি ভুলতে পারি! সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও উঠে বসলেন। তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখলুম হেরম্ব দাঁড়িয়ে আছে। আমি আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। একি হেরম্ব না আর কেউ! চুপ কোরে দাঁড়িয়ে আছে এমন সময় সে বল্লে—বাবা, আমায় চিনতে পাচ্ছেন না?

আমি তাড়াতাড়ি তার হাতখানা ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলুম। আমার স্ত্রী তো এতদিন পরে ছেলেকে দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করলেন।

হেরম্বর আর সে চেহারা নেই। মাথায় লম্বা রুক্ষ চুল! এক মুখ গোঁফ দাঁড়ি। গায়ে জামা নেই, শত ছিন্ন মলিন ধুতি। সে কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়ে বল্লে—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, ঘরে কিছু আছে?

আমাদের খাবারের অবশিষ্ট ভাত ডাল যা কিছু ছিল সব তাকে দেওয়া হোলো। সে খেতে লাগ্‌ল। তার খাওয়া দেখে মনে হোতে লাগ্‌ল যে, যেন কতদিন তার খাওয়া হয়নি তার ঠিকানা নেই। খেয়ে দেয়ে সে বল্‌তে লাগ্‌ল—তোমরা জান যে আমি মরে গিয়েছি। জমিদার বাবুরা আমার নামে তাই রটিয়েছে কিন্তু আমি মরিনি। কর্তা বাবু পরামর্শ দিয়ে আমাকে ডাকাতি করতে পাঠাতেন। তোমাদের কথা তখন না শুনে বড় লোক হবার আশায় আমিও ডাকাতি করতে যেতুম। শেষ কালে এক

জায়গায় ডাকাতি করতে গিয়ে দুটো তিনটে খুন হোয়ে গেল। আমাদের দলের চার পাঁচ জন লোক সেই ডাকাতিতে ধরা পর্য্যন্ত পড়্‌ল। আমি সেখান থেকে পালিয়ে কর্ত্তা বাবুর কাছে এসে পড়লুম। তিনি আমাকে টাকা দিয়ে পালিয়ে যেতে বল্লেন। শেষকালে আমি পালিয়ে যাওয়ার পর সমস্ত ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন। খুন করার জন্য আমার নামে পুলিশের ওয়ারেণ্ট বেরুল। সেই থেকে আমি পালিয়ে পালিয়ে জীবন ধারণ করছি। যত দিন কর্ত্তা বেঁচে ছিলেন মাঝে মাঝে লুকিয়ে তাঁর কাছে এসে টাকা নিয়ে যেতুম কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সে পথও বন্ধ হয়েছে। এখন আমার দুর্দ্দশা দেখ।

আমরা জিজ্ঞাসা করলুম - কোথায় আছ এখন ?

সে বল্লে—আজ দশ বছর ধরে ঐ জলার মধ্যে একটা ভাঙ্গা ঘরে বাস করছি।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে—খাওয়া দাওয়া চল্‌ছে কি কোরে ?

সে বল্লে—জলায় যে ঐ সন্ন্যাসী আছে সে হচ্ছে কর্ত্তার ভাগ্নে। সে এক বেলা দুটি কোরে খেতে দেয় !

আমরা তাকে বল্লুম—যা হবার হবে তুমি এখানে থাক। তোমার নামে পুলিশের কোনো ওয়ারেণ্ট নেই। যদিই বা থাকে আমরা ছোট বাবুকে দিয়ে তার ব্যবস্থা কোরে তোমায় বাঁচাব।

হেরম্ব বল্লে - না না। ও বড়বাবু ছোটবাবু জমিদার গুষ্টির সব সমান, কারুকে বিশ্বাস নেই। আমি পালাই।

আমরা তাকে অনেক কোরে থাকতে বল্লুম। কিন্তু পুলিশের ভয়ে কিছুতেই সে থাকতে চাইলে না। শেষকালে ঠিক হোলো যে রোজ রাত্রে আমরা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আলো নাড়্‌ব, আমাদের আলো দেখে সেও খানিকটা আগুন কোরে সেটাকে নাড়তে থাকবে। যে দিন আমরা আলো নাড়্‌ব না সেদিন সে বুঝবে যে আমাদের কিছু হয়েছে আর যেদিন তার আগুন দেখতে পাব না সেদিন বুঝতে হবে যে তার কিছু বিপদ হয়েছে।

pfc MCT ^(9 *sfa (sint cm ^|JRI iHt fte« fe 4 *o to'
^WORI f W l t f l 13ftC? ^IPII Cff«ft^ ^fa 1WM HI <Sfa llOTI GMC5 *ftt

w <$to 9« •qprtwa SRS *5o›f ct»i i ^prai g*t c^tc? ?*m* sfcjji i

3W*fs ; •

CW) ' *t*

fc5qfy fSp* 3PP-JJ 4 **&k* C¥tt km pft I HI *ftfo Vtt i

c*icfoi m[r] cfftra ittfo est! «w ^tp^ wffe >w, c5tw c*fcaf5i owhi

কোণে তখনো নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার বানিয়ে রাখচেন। পথে পুলিশের কড়া পাহারা; তার উপর 'আর্ম্মার্ড-কারে' গোরা ফৌজ কুচ-কাওয়াজ করে ফিরছে— আশ্বাসের হাওয়া বইলেও মানুষের ভয়ের অন্ত নেই! কখন্ কি ঘটে, এই ভয়ে সর্ব্বক্ষণই সকলে তটস্থ! কোথায় একটা মানুষ ছুটেছে...যেমন দেখা, অমনি কেন ছুটেছে, তার কোনো সন্ধান না জেনেই সকলে ভয়ে বাড়ীর দোর-তাড়া বন্ধ করে লুকোচ্ছে। কলকাতার পথ দিনে-দুপুরেও প্রায় জনহীন, চারিদিকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ভাব। কলকাতা যেন ফ্ল্যান্ডার্সের মত হয়ে উঠেছে! ঐ সেখানে গুলি বারুদ ছুটেছে, দুটো জখম। আর খপরের কাগজ খুললেই দেখি, শুধু কলকাতা নয়, একধারে মাদারিপুর ঝালাকাটী থেকে সুরু করে ওধারে রাওয়ালপিণ্ডী অবধি রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে...মানুষ রক্তের গন্ধ পেয়ে বাঘের মতই খাপ্পা হয়ে উঠেছে! রসিক লোকে এই সুযোগে মজার মজার গল্প বানিয়ে লোকের আতঙ্ক আরো বাড়িয়ে তুলছে।

আমাদের বাড়ী গলির মধ্যে। পাড়ায় মিটিং করে ভলান্টিয়ার কোর খোলা হয়েছে। ফৌজের দলে কেউ হয়েছেন ফীল্ডমার্শ্যাল, কেউ আডমিরাল, কেউ লেফ্‌টেনাণ্ট, আর আমরা সব প্রাইভেট অর্থাৎ ফৌজদার। মেয়েরা ঠাকুর-ঘর থেকে শাঁখ বার করে দেছেন। কোথাও একটা কিছু ঘটলে শাঁখ বাজবে। শাঁখ বিউগল্ হবে, অর্থাৎ পুরাণের সেই পাঞ্চজন্য! হাসির কথা নয়—এদিকে মহাভারতের নজীর আছে! আর অস্ত্র? ঐ ইট-পাটকেল—লাইসেন্সের দরকার নেই। কর্ত্তাদের বন্দুক আছে। নিত্য লাইসেন্স নিয়ে বন্দুকও সংগ্রহ হচ্ছে, কিন্তু ছোড়ার কায়দা জানা নেই! শেষে দুশমন মারতে ছেলের বুকেই গুলি লাগবে কি! নিজের বুকে লাগাও অসম্ভব নয়! বন্দুক পেয়ে অবধি ভয় যেন আরো বেড়েছে!

কাজেই ছমছমানি সমান রয়ে গেছে। আপিস কামাই হচ্ছে। স্কুলের ছুটি। অতএব বৈঠক বসছে যখন-তখন, আর সে বৈঠকে সকলের ডিউটী হর-ঘড়ি বদলে যাচ্ছে! কিন্তু ঘোরাই সার! মাঝে থেকে ঘটী-বাটী চুরিগুলো বন্ধ হয়েছে। চোরের ছেলে কান্নাকাটী পড়েছে। তাদের রোজগার বন্ধ।

যাদের নাকি আপিস কামাই করা চলে না, মনিব কড়া—তারা সন্ধ্যার সময় ফিরে এমন সব রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ করে, যা শুনলে পেটের ভাত চাল হয়ে যায়! শুধু তাই ? মাথার চুলগুলো অবধি শিউরে কাঁপতে থাকে! চক্রবর্ত্তী মশায় বললেন,—আপিস থেকে বেরিয়ে দেখি, ট্রাম চলছে না, বাস একেবারে বোঝাই, তার উপরে শুনলুম, আজই বড়বাজারে বাসের মধ্যে উঠে এক গুণ্ডা নাকি এক কেরাণী বাবুর পিঠে ছোরা বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে! এ কথার পর বাস নিরাপদ নয় জেনে হাঁটা-পায়ে পাড়ি দিলুম। লালদীঘি থেকে সোজা বহুবাজার পার হয়ে কলেজ ষ্ট্রীট ধরে আসছিলুম,—মেডিকেল কলেজের কাছে ভারী ভিড়, দেখে বুকটা কেঁপে উঠলো! যদি কিছু হয়! পায়ে একটা কড়া উঠেছে বলে ঘোড়তলা জুতো ছেড়ে পরেছিলুম তাল-তলার চটী...দৌড়ুতে অসুবিধা বেশ, ভাবলুম, চটীজোড়া খুলে হাতে তুলি! কিন্তু আরো পাঁচজন লোক তো পথে চলেছে, তারা এ কাণ্ড দেখে হেসে টিটকিরী দেবে, কাজেই ইচ্ছা থাকলেও পায়ের চটীজোড়া হাতে আর ওঠাতে পারলুম না! সে জোড়া পায়েই রয়ে গেল।

গোলদীঘির সামনে এসেছি...হঠাৎ একটা রৈ-রৈ শব্দ! বাস্, প্রাণটা রইলো কি গেল, না বুঝেই চোঁচা ছুট্ দিলুম—গোলদীঘির দক্ষিণ গা বয়ে যে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট গেছে, সেই পথ ধরে সটান্ পূব দিকে! মনে হলো, রাজ্যের গুণ্ডা যেন ছোরাছুরি নিয়ে পিছনে তাড়া করেছে। এই বয়সে সিঁড়ি ভেঙ্গে দু'বার উপর-নীচে করতে হাঁফিয়ে পড়ি, কিন্তু ভগবান পায়ে এমন ডার্বির ঘোড়ার বল দিলেন যে তীরের মত ছুটে ছিলুম! কাঁধের চাদর নিশেনের মত উড়ছিল, পায়ের চটীর একপাটী কোথায় যে উড়ে বেরিয়ে গেল...সেদিকে দৃক্পাত মাত্র না করে ছুটেছি তো ছুটেইছি! প্রাণ থাকলে ঢের চটী মিলবে...দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের কাছে একখানা রিক্স-গাড়ীর ঘাড়ের উপর পড়লুম। জ্ঞান হলো—তাই তো...রিক্সয় একটি বাবু বসে ছিলেন তিনি বললেন,—ব্যাপার কি মশায় ?

দাঁড়িয়ে তাঁকে সব কথা বললুম। শুনে তিনি বললেন,—কোথায় কে ?

ফিরে দেখি, কেউ কোথাও নেই. হাসি পেলো। এমন ভয়ও মানুষে পায়!...

বাবুটি হেসে বললেন,—দাঙ্গা থেমে গেছে। আর্ম্মার্ড কার চলেছে!...আপনারা কি হৈ-চৈ করছেন মিছে!



চোঁচা ছুট দিলুম

আমি বললুম—একটা রৈ-রৈ শব্দ শুনলুম কি না...

বাবুটি বললেন—আর অমনি ছুট দিলেন! আচ্ছা মানুষ তো! তিনি হাসলেন। হেসে বললেন—এই আতঙ্কই হয়েছে কাল! গুণ্ডাও মানুষ। গুণ্ডাদেরও ভয় আছে। পুলিশের হাতে পড়লে জেল।

সে কথা ঠিক...রাস্তার চারিধারে চেয়ে দেখলুম...শান্তভাবে নিশ্চিন্ত মনে পথিকের দল পথ চলেছে—মাঝখান থেকে আমার চটি জোড়া অচল হয়ে গেল!...

রিক্স-চড়া বাবুটি বললেন—এখনি যে রিক্স-চাপা পড়ে মারা যেতেন—

তা যেতুম! লজ্জা হলো। তাঁর দিকে না চেয়ে সোজা উত্তর-মুখে সরে পড়লুম—চটীর বাকী পাটিটা নর্দ্দামার ধারে খুলে রেখে...

গল্প শুনে আমরা হেসে উঠলুম। চক্রবর্ত্তী বললেন—দাঙ্গা নেই,—মিছে ভয় দেখাচ্ছে কতকগুলো বদমায়েসে। এই তো এতটা পথ হেঁটে এলুম...

ঘোষজা বললেন,—তবু সাবধানের বিনাশ নেই!

চক্রবর্ত্তী বললেন—সে কথা ঠিক—তবে কিনা চটীজোড়া গেল—নতুন...নগদ ন' সিকে দাম দিয়ে কিনেছিলুম...

আমরাও বুঝি সব... এত লাফালাফি, এত ঝাঁপাঝাঁপি, এত ভয়...শুধু ঘরের কোণে পড়ে আর রচা গল্প শুনে ..কিছু তো চোখে দেখতে পাচ্ছি না! গুণ্ডার অত্যাচার? সে তো বারো মাসই আছে—এই হিড়িকে তারা একটু মজা পেয়েছে এই যা! আসলে অস্টরম্ভা! পুলিশ, ফৌজ...! এদের কাছে গুণ্ডার গুণ্ডামি চলে কখনো! তাদেরো তো জানের ভয় আছে!

রাত্রি এগারোটায় এক কাণ্ড ঘটলো তার কাছে চক্রবর্ত্তীর ছায়া-গুণ্ডাও হার মানে!

আমাদের গলির একদিকের সীমানা হলো কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীট অপর সীমানায় সার্কুলার রোড। গলির বুকের উপর তিন-চারটে সেওয়ার্ড ডিচ্। পাড়ার ফীল্ড-মার্শালের হুকুম হলো, রাত্রি আটটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্য্যন্ত ভোম্বোল আর আমি লেফটেনান্ট; আমাদের তাঁবে আটজন ভলান্টিয়ার গলি চৌকি দেবে। ফীল্ড-মার্শাল তাঁর তেতলায় ছাদের উপর যে চিলকোঠা, তারি ছাদে বসে দূরবীন্ কষবেন। তাঁর কাছে থাকবে দু'জন এডিকং আর ইলেক্‌ট্রিক টর্চ্চ আর,—একটা শাঁখ। লেফটেনান্ট আমাদের কাছেও ব্যাগের মধ্যে শাঁখ আছে গোলমাল হলেই শঙ্খ বেজে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে থানায় টেলিফোন করা হবে এবং পুলিশ আসার পূর্ব্বক্ষণ অবধি প্রয়োজন হলে গলির দু'ধারের বাড়ী থেকে ঝপাঝপ্ ইষ্টক-বর্ষণ চলবে, স্থির হলো।

ভোম্বোল আর আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম,—কোনো গোলমাল নেই, আর মিছে পথে ঘোরা কেন!

সত্যি, রাত্রে ঘুম না হওয়ার দরুণ চোখ জ্বলছিল। চোখে কে যেন কাঁচা লঙ্কার তুলি বুলিয়ে দেছে!

কিন্তু, ফীল্ডমার্শালের অমন রোখ কি এ কথায় থামে! তাঁর বাড়ী ক'দিন খাওয়াও মন্দ হচ্ছে না—পয়সাওলা লোক, আর মোটর-গাড়ীর জন্যে তাঁর ভয়টা সব-চেয়ে বেশী। ভয়ের চোটে খরচও করছেন খুব—আর সে খরচে আমাদের

লাভ ষোল আনা। গোলমালের সময় তিন-চারদিন ডিমওয়ালা ইয়া তপসী-মাছ যা খাওয়া গেছে, বোধ হয় বাকী সারা জীবনে তেমন তপসীমাছ আর খাবো না।...কিন্তু যাক সে কথা।

মিত্তিরদের পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বেজে গেল। গলির পথে মানুষ চলাচল বন্ধ। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু দত্তদের দোতলার ঘরে কে হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইচে—ব্রহ্মসঙ্গীত। আর তার পাশে নতুন ভাড়াটিয়াদের বাড়ীতে বুঝি পাঁটার কালিয়া রান্না হচ্ছে, তারি মধুর গন্ধ বাতাসে ভরে উঠে আমাদের এমন প্রলুব্ধ করে তুলছিল, এমন সময় বাঁদিককার সেওয়ার্ডের ডিচের মধ্য থেকে সাদা চাপকান জেব-পরা-ফতুয়া আঁটা টাইট পায়জামা পরা, নুর-দাড়ি, আর মাথায় ফেজ আঁটা এক রোগা মূর্ত্তি ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গলিতে এলো তার কোমরে একটা কিরীচ আঁটা...দেখে ভোড়কে গেলুম! ডাকু! বলে ভোম্বোল চাৎকার তুললে। সঙ্গে সঙ্গে শাঁখে ফুঁ পড়লো। আমিও ভয়ে শঙ্খ নিনাদ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে আশ-পাশের বাড়ীতে শঙ্খধ্বনি—যেন ভূমিকম্প হয়েছে, কি, পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলে এক গাদা শেয়াল ডেকে উঠলো! শাঁখের ফুঁর সঙ্গে সঙ্গে যত বাড়ীর ছাদ থেকে ধড়াধ্বড় ইট-পাটকেল পড়তে সুরু হলো। ভোম্বোল আর আমি লাফিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ে পড়লুম—ওদিকে কোথায় একটা গোল উঠলো, চোর-চোর! আর যায় কোথায়? এই লোকটাই! তাকে আচ্ছা করে চেপে ধরলুম। ভোম্বোল তার মাথায় দিলে এক জোর গাঁট্টা আর আমি তার পিঠে সজোরে বসিয়ে দিলুম সবুট একটি লাথি!

কোঁক করে একটি আওয়াজ! সঙ্গে সঙ্গে ফতুয়া-আঁটা মিয়া ভূমি শয্যা নিলেন। চারিদিকে ধড়াধ্বড় জানালা খড়খড়ি বন্ধ হবার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আমরা প্রহার নয়...মারের পর মার চালিয়ে গেলুম, অবশ্য তার ঐ কিরীচটার পানে নজর রেখে,—থামালুম পাছে বার করে! ভলান্টিয়ারের দল? এ তল্লাটে তারা নেই!

লোকটা ককিয়ে কি বলতে যাচ্ছিল...আমরা গর্জ্জন করে উঠলুম—খবরদার! মারের চোটে বেচারা যখন আধমরা হয়ে এসেছে, তখন ভয় হলো,—শেষে কি খুনের দায়ে পুলিশের হাতে পড়বো!

পরে লোকটা যখন কোনো রকম ওজর-আপত্তি করলে না, কিরীচও বার করলে না, মারের পালটা জবাব দিলে না, তখন এমন বেদম মারা ঠিক নয় ভেবে...প্রহার থামালুম। থামাতেই লোকটা কাতরভাবে বলে উঠলো—অহেতুক এই চোরের মার মারলেন মশায়···আপনাদেরি পাড়ায় আমি থাকি।

সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়ে নূর দাড়িটি সে খসিয়ে ফেললে...চেয়ে দেখি, ঠিক, তাইতো, এ যে চেনা-চেনা মুখ!

লোকটি পরিচয় দিলে—তার নাম সুধাংশু নন্দী, ও পাড়ার এমারেল্ড নাট্য-সমিতির সে সেক্রেটারী আর মোশন-মাস্টার ..ডি, এল, রায়ের 'সাজাহান' রিহার্শাল দিয়েছে আজ পাঁচ মাস ধরে। মেয়রকে প্রেসিডেণ্ট করে সঙ্গীত সমাজের স্টেজে প্লে করবে, তার সব আয়োজন ঠিক, কার্ড অবধি ছাপা। ব্যবস্থা প্রায় হয়ে এসেছে, এমন সময় দাঙ্গা বাধলো। সব আয়োজন ভেস্তে গেল—এ্যাকটরদের উৎসাহ লোপ পাবার জো, তার উপর যে-ছোকরা জাহানারা সাজবে, তার বাড়ী বর্দ্ধমানে। সেখান থেকে তার বাপের কড়া চিঠি এসেছে, কালই তাকে ফিরতে হবে, বর্দ্ধমানে। সে গেলে জাহানারা সাজবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কাজেই তারা কোনো দিকে লক্ষ্য না রেখে সিকদারবাগানের বলভদ্র পাইনের ঠাকুর-দালানে পর্দ্দা খাটিয়ে প্লে সুরু করে দেছে। সুধাংশু নন্দী সেজেছে ঔরংজীব...দু' তিনটে সীন প্লে করবামাত্র তার বাড়ী থেকে খপর এসেছে, তার ভাইকে এক গুণ্ডা নাকি তাড়া করে এসেছে বাড়ী-অবধি, তাই সে ড্রপসিন পড়বামাত্র এই গলি দিয়ে ছুটে একবার বাড়ী যাচ্ছে দেখতে, খপর কি। ভাই ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই—শেষে কি...কন্‌সার্টওয়ালাদের বলে এসেছে, সে না ফেরা পর্য্যন্ত কন্‌সার্ট থামাবে না, ড্রপ তোলা হবে না— আর এদিকে এই কাণ্ড.. ...!

ছি, ছি! লজ্জায় আমরা এতটুকু হয়ে গেলুম। বললুম,—মাপ করবেন মশায়, তাছাড়া, এ সময় লোকে কতদিনের সত্যিকার গজানো দাড়ি অবধি কামিয়ে ফেলছে, পাছে ভুল হয়! আর আপনি ঐ নূর দাড়ি লাগিয়ে এত রাত্রে পথে ছুটে চলেছেন। তাও কোমরে হাতিয়ার গুঁজে!

সুধাংশু নন্দী বললে --আরে মশায়, পোষাক খুলতে সময় লাগবে, আরো অনেক দেরী হবে, তাই পাইনদের খিড়কীর দরজা খুলে ছুটেছিলুম। ছোটার কারণ, -- শীগগির হবে। আর এই সেওয়ার্ড ডিচ্ হলো আমার বাড়ী যাওয়ার সর্টেস্ট কাট।

এমন কাজও করে, হায়, হায়, দেখুন দিকি...

লোকটি কি জানি, যদি থানায় গিয়ে নালিশ করে! ভয় হলো। আবার মাপ চাইলুম, বললুম, --আপনার না অবস্থা, চলুন, সঙ্গে যাই অর্থাৎ একা যাবেন না -- চোর না ডাকাত...কে এলো আপনার বাড়ী, দেখিগে চলুন।

সুধাংশু নন্দী লোক মন্দ নয়। হেসে শুধু বললে, -- গেরোর ভোগ! না হলে আমায় কথা বলবার সময় না দিয়েই মার সুরু করলেন!

নন্দীর বাসায় এসে দেখি, গ্রহের ভোগই বটে! তার ভাই হিমাংশু একরাশ বোম্বাই আম সামনে রেখে নিশ্চিন্ত মনে তাই খাচ্ছে। সুধাংশু নন্দী বললে -- তোকে নাকি গুণ্ডায় তাড়া করেছিল?

হিমাংশু যেন আকাশ থেকে পড়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বললে --কে বললে? গুণ্ডায় তাড়া করেছে কি রকম?

সুধাংশু নন্দী বললে,--তবে যে একজন গিয়ে বললে, তোমার ভাইকে গুণ্ডায়...

হিমাংশু বললে --আমওয়ালার সঙ্গে দাম নিয়ে একটু তর্ক হয়েছিল--সে টাকায় বারোটার বেশী দেবে না, আমি বললুম কুড়িটা দিতেই হবে--শেষে আঠারোটায় রফা হতে এক টাকার দিয়ে গেল। এই দ্যাখো না, গোটা দশেক খেয়েছি, এই তার আঁটি আর এই আটটা খেতে বাকি।

আমের দর করার সঙ্গে গুণ্ডার তাড়ার কি যে সম্পর্ক ঠাওরাতে পারলুম না...তবে চক্রবর্ত্তী মশায়ের কথা মনে পড়লো,--কোথায় কি একটা শব্দ শুনে চটী ফেলেই তিনি ছুট দিয়েছিলেন!...এখানেও তেমনি কোনো রসিক লোক হয়তো--

সুধাংশু নন্দী বললে--আচ্ছা গেরোর ভোগ তো!...আমার শীনটাই মাটী হয়ে গেল-- তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম ..পথে যা ঘটেচে, তা আর বলবার নয়।

হিমাংশু নন্দী আমের আঁটি চুষতে চুষতে বললে,--তুমিও যেমন...বলে, চারিধারে

সব ঠাণ্ডা। শুধু হুজুগ চলেচে বৈ তো নয়! যে ক'ব্যাটা গুণ্ডা মজা করে বেড়াচ্ছিল, তারা সব গ্রেপ্তার—আর ছাপোষা লোক, সংসার করবে, না, লড়াই করতে গিয়ে জান দেবে, কি, জেল খাটবে! এ সব আজগুবি কথাও বিশ্বাস কর! হুঁঃ, খবরের কাগজ-ওলাদের এ শুধু একটা রোজগারের ফিকির বৈ তো নয়!..

আমরা নন্দা-ঔরংজীবের কাছে আবার ক্ষমা চাইলুম...এবং তাকে সেই সেওয়ার্ড ভিড়ের মুখে বিদায় দিয়ে ফিল্ড-মার্শাল মশায়ের কাছে গিয়ে সেই রাত্রেই তাঁকে নুটিশ দিলুম, আর না মশায়, এই রাত্রি জাগরণ আর পথে পথে রোঁদ দেওয়া ...যথেষ্ট হয়েছে!...আর একদিন বেশী রাত জাগলে অসুখ হবে!

পরের দিন এই নিয়ে যা হাসিটা চল্লো...সে কথা বুঝতেই পারছো! তবে সুধাংশু নন্দার গায়ের ব্যথা সারতে তিনদিন সময় আর দু শিশি টারপিন তেল লেগেছিল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পোষা জন্তু

ছেলেবেলাতে সকলেরই জীবজন্তু পোষবার সখ থাকে। তবে সকলের রুচি এক রকম নয়। কেউ পাখী পুষতে ভালবাসে, কেউ আবার ছোট ছোট জন্তু পুষতে ভালবাসে। তবে এটা ঠিক যে তোমরা সকলেই "গিনিপিগ" কিম্বা খরগোস পুষতে সব চেয়ে বেশী ভালবাস। এই সুন্দর ছোট ছোট সুদৃশ্য জন্তুগুলো এক মুহূর্ত্তেই তোমাদের মন হরণ করে নেয়। বাস্তবিক তোমরা যদি কোন জীবজন্তু পুষতে চাও, তবে আমরা গিনিপিগ কিম্বা খরগোস পুষতে অনুরোধ করি।

তোমাদের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যদি এদের জোগাড় কোরতে পার তবে ভাল হয়, আর তা না হোলে অবশ্য দোকান থেকে কিনে নিতে হবে। কেনবার সময়

বেশ ভাল পরিষ্কার দেখে কিনবে, যেন রোগা কিম্বা কোন রকম রোগ না থাকে। কিন্তু বাড়ীতে আনবার আগে একটা কাজ তোমাদের করা বিশেষ দরকার। জন্তুদের ঘরটী খুব ভাল হওয়া চাই। ঘর সম্বন্ধে এই কটা কথা তোমাদের জানা দরকার :—(১) ঘরটা যেন বেশ বড় হয়, অর্থাৎ তারা যেন অনায়াসে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে পারে। আর খরগোসের জায়গা গিনিপিগের চেয়ে বেশী দরকার। একে খরগোস বড় জন্তু এবং বেশী চঞ্চল। তোমার ঘরটা যদি ছোট হয় তবে গিনিপিগ পোষাই ভাল। (২) ঘরটা এমন কোরে তৈরী কোরতে হবে যাতে অনায়াসে ও শীগগীর পরিষ্কার করা যায়। (৩) একটা খোলা অথচ পরিষ্কার জায়গায় এই ঘরটা রাখবে। ঘরটা যেন মেজের সঙ্গে লেগে না থাকে ; ঘরের চার কোনায় চারটে পায়া দিয়ে উঁচু ঘর তৈরী কোরবে।

এই বারে খাওয়ার কথা। এই জিনিষটাই সবচেয়ে আবশ্যকীয় ব্যাপার। এই খাবারের উপরেই এই ছোট ছোট জন্তুদের প্রাণ নির্ভর কোরছে। এই খাবারের উপরে তোমরা খুব যত্ন নেবে। অনেক সময় দেখা গেছে বেশী যত্নের চোটে এদের অসুখ হয়ে পড়েছে। খুব ভাল খাবার কিম্বা অতিরিক্ত খাবারে এদের পেটের অসুখ হয়ে পড়ে। তোমরা হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পার, এদের খাবারের পরিমান কি ? অবশ্য পাকাপাকি নিয়ম কিছুই নাই ; তবে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে জন্তুর ওজনের এক অষ্টম অংশ জিনিষ রোজ খেতে দেবে। জন্তুর ওজন যদি এক সের হয় তবে তাকে রোজ দুই ছটাক ওজনের খাবার খেতে দেবে। জন্তুকে মধ্যে মধ্যে ওজন করা দরকার, ছোট বাচ্চা যখন বড় হয়ে ওঠে কিম্বা যখন তারা মোটা হয়ে ওঠে সেই পরিমাণে তাদের খাবারও আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

খরগোসরা সাধারণতঃ দুই রকম খাবার খায়,—এক রকম হচ্ছে শাক-সবজী ও ফলমূল ; আর এক রকম হচ্ছে তৈরী খাবার। প্রথম ধরণের খাবারটা তারা মুক্ত অবস্থায় মাঠে ও বনে যা খেয়ে বেড়াত, আর দ্বিতীয় খাবার, যা আমরা তাদের বন্দী অবস্থায় তৈরী কোরে দেই। প্রথম খাবার হচ্ছে এইগুলো ;—বাঁধা কপি, ফুল কপি, গাজোর, বিচুটী গাছ, পালঙ শাক, আলুর খোসা, নানারকম গাছের পাতা



খরগোশ

ইত্যাদি—কিন্তু সাবধান কোন রকম বিষাক্ত গাছ কিম্বা পাতা যেন খেতে না দেওয়া হয়।

জিনিষগুলো দেখে বুঝতে পারবে যে খরগোস পোষা কত সহজ। তোমাদের বাড়ীতে কুট্‌নো কোটার পর যা পড়ে থাকবে অনায়াসে এদের দিতে পার।

এবারে তৈরী খাবারের কথা—বার্লি, ভূষি, ঘোল, এক সঙ্গে মিশিয়ে বেশ ভাল খাবার কোরে দিতে পার। আর ছোট বাচ্চা খরগোসের জন্য রোজ একটু করে দুধ চাই। খরগোসদের সাধারণতঃ দিন দুবার করে খাওয়াবে। একবার সকালে ও একবার বৈকালে। তাদের ঘরের মধ্যে সব সময় পরিষ্কার জল রাখবে। খরগোস ও গিনিপিগের খাবার এক রকম। তবে গিনিপিগদের দুধ পাউরুটি দিতে পার - তারা এই খেতে খুব ভালবাসে। তোমরা এটা খুব ভাল করে মনে রাখবে যে তাদের সব সময়ে পরিষ্কার ঘর ও পরিষ্কার জল চাই। ঘর পরিষ্কার করাটা হাঙ্গামের ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি এই কাজটা রোজ নিয়মিত ভাবে না করতে পার, তবে তুমি খরগোস কিম্বা গিনিপিগ পোষবার উপযুক্ত নও। ঘর যদি অপরিষ্কার থাকে তবে এটা জেনে রেখ, তোমাদের জন্তুরা কোন দিনই সুখী হবে না।

তোমাদের সুযোগ ও সুবিধামত রোজ তাদের একবার খোলা জায়গায় ছেড়ে দিও। তোমাদের যদি বাড়ার সঙ্গে ছোট বাগান থাকে তবে খুব ভালই হবে। তারা কিছুক্ষণ মুক্তবায়ু ও মুক্ত জায়গায় স্বাধীনতার সুখ একটু ভোগ কোরে নেবে।

খরগোসদের মধ্যে মধ্যে অসুখ হয়—তাদের প্রধান অসুখ হচ্ছে চোখ ফোলা ও চোখ বন্ধ হয়ে গিয়ে ক্রমাগত জল পড়া। সেঁতসেঁতে জায়গায়, ঠাণ্ডা বাড়ীতে থেকে কিম্বা চোখে কোন রকম আঘাত লেগে এই ব্যারাম হয়। camomile tea ও বোরিক এসিড মিলিয়ে তাদের রোজ চোখ ধুইয়ে দেবে, যে পর্য্যন্ত না চোখ পরিষ্কার হয়।

দ্বিতীয় রোগ—গায়ের লোম উঠে যাওয়া। এতে বুঝতে হবে যে, রক্ত খারাপ হয়েছে, কিম্বা গায়ে পোকা হয়েছে। এই রকম অবস্থায় সাধারণতঃ তৈলাক্ত জিনিষ বেশী খেতে দেবে। সূর্য্যমুখী ফুলের বিচি, গাজোর, রসুনের মুখী, তিসি, ইত্যাদি। যদি পোকার জন্যে গায়ের লোম উঠতে আরম্ভ করে তবে যে সব জায়গায় লোম উঠে গিয়েছে সেই সব যায়গায় তিসির তেল মাখিয়ে দেবে, তারপর

জলে সামান্য lysol মিশিয়ে স্নান করিয়ে দেবে। কিন্তু সাবধান খরগোসের চোখে যেন এই লাইসলের জল না লাগে। তারপর বেশ ভাল কোরে সমস্ত গাটা শুকিয়ে নেবে। এই রকম ছোট ছোট পোষা জন্তুর কথা আমরা আরো লিখব।

বুদ্ধির প্রশ্ন

১। বিড়ালের পায়ের আঙ্গুল কয়টি ?

২। কোন প্রতিমূর্ত্তি এত বড় যে তার দুই পায়ের মধ্যে দিয়ে জাহাজ অনায়াসে যেতে পারে ?

৩। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা নদী কোনটা ?

৪। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় হীরা কোনটা ?

৫। চাঁদ অত উজ্জ্বল দেখায় কেন ?

৬। কোন দেশের লোক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ?

৭। মাকড়সার কয়টা পা আছে ?

৮। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ কোনটা ?

৯। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জাহাজ কোনটা ?

১০। কীটপতঙ্গ বাতির শিখার উপর গিয়ে পড়ে কেন !

[গত বারের "বুদ্ধির প্রশ্ন" তোমাদের খুব ভাল লেগেছিল। বিলাতের এখন সব রকম কাগজই এই "বুদ্ধির প্রশ্ন" চলেছে। বুদ্ধির প্রশ্ন এখন খুব আমোদ-জনক জিনিষ হয়েছে। এবারে আমরা দশটী প্রশ্ন দিলাম। তোমরা কিছুক্ষণ নিজে নিজে উত্তর দিতে চেষ্টা করবে। না পারলে, শেষের পাতায় এর উত্তর পাবে]

সাত ভাই চাঁপা*

১ম ভাই—তা হ'লে আড়ি, তোর সঙ্গে আড়ি।

বোন্—তা কি করবো ভাই, আমার কত কাজ পড়ে আছে।

২য় ভাই—ভারি তো কাজ, টেবি কুকুরকে স্নান করানো আর রাজা পুতুলকে দুধ খাওয়ানো।

---

* বোলপুরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী দ্বারা অভিনীত

বোন্—না অন্য কায আছে। যতক্ষণ বলিস্ তোদের সঙ্গে খেলবো।

৩য় ভাই—কাল যে সোমবার এতক্ষণ ধারাপাত স্বুরু হ'য়ে গেছে।

সকলে—তাই তো এতক্ষণ ধারাপাত স্বুরু হয়ে গেছে। আজকেই তোমাকে খেল্‌তে হবে নইলে ছাড়বোনা

বোন—কিন্তু ভাই আমার কত কাজ পড়ে রইলো!

১ম—থাক্ না পড়ে। সন্ধ্যার সময় গিয়ে সবাই মিলে তোমার কাজ শেষ করে' দেবো।

বোন্—তাই তো, আমার কাজ তোরা পারলে তো। তোরা তো ধারাপাত পড়বি মাষ্টার মশাইর কাছে—

২য়—আমি মাষ্টার মশাইর কাছে কথ্‌খনো কান মলা খাইনে।

বোন্—কে কান মলা খাবার কথা বলেছে?

২য়—তুমি তুমি! আমি আর কিছু বুঝিনে, না?

১ম—কিন্তু ভাই, আজকে কি খেলা খেলা যায়?

২য়—পলাশ বনে লুকোচুরি!

৩য়—বুড়ো বট গাছে বাঘা! বাঘা!

২য়—আমতলায় বুড়ি! বুড়ি!

বোন্—ও সব ভাই পুরানো! আজ একটা নতুন খেলা খেল্‌তে হবে!

২য়—এই না ওর খেলার ইচ্ছা ছিলনা। এখন দেখি সকলের আগে—

বোন—আমি বুঝি সেধে খেল্‌তে এসেছি। তবে চল্লাম আমার কত কাজ পড়ে আছে।

১ম—না ভাই রাগ করিস্‌নে; রতন ভারি দুষ্টু! যেমন রাগিয়েছিস্ তেমনি থামা।

২য়—রাগিস্‌নে ভাই, আজ থেকে তোকে দিদি বলে' ডাক্‌বো।

বোন—যেন দিদি বলা ওঁর খুসী রে। আমি তোর চিরদিনই তো দিদি। আজ থেকে ডাক্‌বি কি! আমি তোর কত বড় জানিস্?

১ম—আবার রাগ, লক্ষ্মী ভাই খেলাটা বল।

বোন্—যাও বলবোনা আমার খুসী।

১ম—তাড়াতাড়ি বল কি খেলা। বাড়ী গিয়ে তোকে আমার লাট্টুটা দেবো।

২য়—আমাকে দেবে বল ; আমি বল্‌ছি কি খেলা।

বোন—তোকে দেবেনা, ছাই। আমিই তো আগে বলেছি। চল আজ আমরা সাত ভাই চম্পার খেলা খেলবো।

সকলে—বাঃ বাঃ বেশ হবে—আমরা সবাই চাঁপা সাজবো।

১ম—আর তুমি সাজবে পারুলদিদি।

২য়—চল আমরা সবাই চাঁপা সেজে আসিগে! তুমি সাজবে পারুলদিদি।

বন

চাঁপাগাছ ও ছায়া

ছায়া—ভাই চাঁপা, একটা গল্প বল।

চাঁপাগাছ—না বোন চুপ কর, এখন সন্ধ্যা হোক্ আগে।

ছায়া—প্রত্যেক দিন তুমি ওই কথা বলে ফাঁকি দাও। আমি সন্ধ্যা হ'তে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ি, গল্প আর শোনা হয় না।

চাঁপা—আচ্ছা তবে চুপটি করে শোন্। অনেক দিন আগে এক ছিল—

ছায়া—না, না ও গল্প শুনবোনা। ও জানি জানি, এক ছিল রাজা আর তার দুই রাণী

চাঁপা—আঃ, আগেই গোল করিস্ কেন? চুপ করে শোন না!

ছায়া—শুনছি কিন্তু এর মধ্যে যেন রাজ পুত্তুর আর ডাইনি বুড়ির এনোনা।

চাঁপা—সে ভয় নেই। আজ সাত ভাই চাঁপার গল্প বলবো। সাত রাজপুত্র আর তাদের এক বোন সৎমার ভয়ে সাতটি চাঁপা আর একটি পারুলফুল হয়ে ফুটে ছিল।

ছায়া—তুমি কি করে জান্‌লে?

চাঁপা—আরে, তারা যে আমারই ডালে এসে ফুটে ছিল।

ছায়া—তার পরে কি হ'ল বল?

ভাই বোনের প্রবেশ

১ম—এই যে একটা চাঁপা গাছ।

বোন—দূর! ওটা যে বকুল গাছ!

১ম—তা হোক্ না, এই গাছেই উঠি।

বোন -দূর পাগল, বকুল গাছে কি চাঁপা ফোটে।

২য়—এই যে আমি একটা চাঁপা গাছ পেয়েছি।

সকলে—তাইতো চাঁপা গাছই বটে।

৩য়—উঠে পড়, ফুল হয়ে ফুটে পড়, দেরী কি ?

বোন্—ভাই চাঁপা গাছ, তোমার ডালে আজ আমরা চাঁপা চাঁপা খেলবো।

চাঁপা—চাঁপা খেলবে তা আমার কোনো আপত্তি নেই ! কিন্তু দেখো আমার ডাল গুলি ভেঙ্গো না ভাই, তা হ'লে এই বুড়ো বয়সে নূতন ডাল গজাবে না :

সকলে—সে ভয় নেই।

১ম—আমি সকলের উপরে।

২য়—তোর উপরে আমি ।

৩য়—আমি ওই ডালটায় ।

২য়—বাঃ বাঃ, এইখানে বসে' বেশ দোল খাওয়া যাবে !

১ম—কিন্তু ভাই আমার সাজটা ভাল হয়নি। রতনদার গায়ে জোর বেশি, ও আমার সাজটা কেড়ে নিয়েছে।

বোন—তা হোক্ না ভাই। এই খেলা বইতো নয়! কিন্তু আমার যে লাল শাড়ী হ'ল না।

২য়—তোর আবার লাল শাড়ী কে বল্লে !

বোন্—কে বল্লে কি ? কবির গানে যে আছে "রাঙা বসন পারুলদিদি তুলনা তার নাই"।

১ম—কবি আবার কে ?

বোন—সেই যে কেবলি মেলা গান বাঁধে। সেই যে সেদিন ধানের ক্ষেতে লুকোচুরি খেলার সময় যার গান গেয়েছিলাম "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকো-চুরির খেলা"।

১ম—আরে সে কবি কোথায়! সে তো মহাকাব্য লেখেনি, সে তো পাগলা ! এত বিষয় থাকৃতে ফুলের উপর গান লেখে !

বোন—তুই মহা পণ্ডিত কিনা ভাই, তোর কাছে সে পাগল! আমাদের কাছে সে কবি—ফুলের পাগল! এই দেখ আমার বিষয় কেমন একটা গান লিখেছে—

"কে গো তুমি—আমি বকুল

কে গো তুমি—আমি পারুল"

তোর বিষয় একটাও গান লেখেনি।

১ম—ইস্ আমাকে ঠকাচ্ছ। তোমরা যে দিন সবাই মিলে রাত্তিরে বন ভোজনে গেলে—আমাকে অসুখ বলে নিয়ে গেলে না, সেদিন আমি মেজদির সঙ্গে একটা বসন্ত উৎসব দেখ্তে গিয়েছিলাম। সেখানে শুনলাম কবি আমার নামেও একটা গান বেঁধেছ? শুনবি

"সহসা ডাল পালা তোর উতলায়ে ও চাঁপা ও করবী"

বোন—তোরা তো তার গানই শুনেছিস্, দেখিস্ নি তো তাকে, আমি কবিকে শুদ্ধ দেখেছি!

সকলে—কেমন ভাই দেখ্তে?

বোন—মাথার চুল চাঁদের আলোর মত ধব্ ধব্ করছে!

সকাল—বুড়ো নাকি?

বোন—একটু ও নয়।

১ম—তবে বোধ হয় ইচ্ছা করে চুল শাদা করেছে। বয়স কম হ'লে লোকে বড় কবি বল্বে কেন,

বোন—গায়ের রঙ চাঁপার মতো।

৩য়—এ যে দেখি নতুন তরো মানুষ। বেশ হয়, আমাদের যদি কেউ তার কাছে নিয়ে যায়।

মালীর প্রবেশ

১ম—তুমি কে গো?

মালী—আমি ভুঁই মালা, বনে বনে ফুল তুলি।

২য়—বেশ তো—আমাদেরও তুলে নাও না?

মালী—তোমরা কি ফুল যে তুলবো—এক এক জন অন্তত আড়াই মন ভারি।

সকলে—আমরা যে সাত ভাই চাঁপা সেজেছি আর ওই আমাদের পারুলদিদি!

মালী—চাঁপা সেজেছ চাঁপা চাঁপা খেল—তোমাদের নিয়ে আমার কোনো কাজ হবে না। আমার ফুল তোলার দেরী হচ্ছে।

১ম—আচ্ছা ভাই তুমি ফুল তুলে কি কর?

মালী—ফুল বেচি।

১ম—সেই কবিকে বিক্রি কর বুঝি?

মালী—যে পয়সা দেয় তাকেই বিক্রি করি।

২য়—তা ভাই, এই ফুলটা নিয়ে যাওনা? সেই কবিকে দিয়ো।

মালী—আমার আর কাজ নেই। কোথাকার কবিকে খুঁজে বেড়াই।

১ম—আহা, রাগ করোনা ভাই, শোনো।

২য় বুঝেছি ও রাগ করেছে কেন? কবি ওর নামে কিনা একটাও গান লেখেনি তাই? আচ্ছা আমি কবিকে বলে দেবো ওর নামে একটা গান লিখতে?

মালী—এরা সব পাগল নাকি?

মালীর প্রস্থান

১ম—আচ্ছা ভাই চাঁপা গাছ, আমরা আসবার আগে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

চাঁপা—আমার ছায়ার সঙ্গে?

২য়—আমাদের দেখে চুপ করলে কেন?

চাঁপা—তার নামে গান বললে না, সে কেন কথা কইবে?

১ম—তোমার নামেও তো গান বলিনি, তুমি কথা কইছ কেন?

চাঁপা—আমার গান আমি স্বয়ং কবির কাছ থেকে শিখে নিয়েছি শুনবে?

"নদী আপন বেগে পাগল পারা
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধ ভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি
গভীর চলা গোপন রাখি
আমার চলা নবীন পাতায়
আমার চলা ফলের ধারা।

"নদী চলার বেগে পাগল পারা
পথে পথে বাহির হ'য়ে
আপন হারা;
আমার চলা যায় না বলা
আলোর পানে প্রাণের চলা
আকাশ বোঝে আনন্দ তার
বোঝে নি যার নীরব তারা"

১ম—আচ্ছা ভাই ছায়া, রাগ করো না, তোমার নামেও গান আছে ।

চাঁপা—কবি লিখেছে বেশ ।

১ম—তুমি তো আচ্ছা বেরসিক, কবির গানে আর তার তল্পিদারের গানে প্রভেদ বোঝ না।

চাঁপা—কবি আবার তল্পিদারও জুটিয়েছে নাকি ? কিন্তু সে লোকটার সঙ্গে তোমার দেখা হ'ল কোথায় ?

১ম—এই বনের পথেই তো সে ঘোরে।

চাঁপা—বনের পথে কেন ? পাকা পথ কি তার চোখে পড়ে না ?

২য়—পাকা পথে কি তার চলবার উপায় আছে ? সে যে ইস্কুল পালিয়েছে ? তাই পণ্ডিতমশার ভয়ে সে বনে বনে লুকিয়ে ফেরে ।

চাঁপা—তা যাই হোক্। তল্পিদার আমার মনের কথাটি কি ক'রে বুঝতে পারলে ভাই ? আমার তো ঠিক্ ওই কথাই সারাদিন মনে হয়। আমার ছায়ায় এসে কত পথিক কত রাখাল গা জুড়িয়ে যায়—আর আমি সারাদিন অবাক্ হ'য়ে চেয়েই আছি।

২য়—দিদি, দেখ দেখ কেমন সুন্দর একটা পাখী—ওর নাম কি ?

বোন্—ও যে টুন্‌টুনি পাখী

১ম—দেখ কেমন ফুলে ফুলে মধু খাচ্ছে, আমাদের কাছে একবার আস্‌তে বল না।

বোন—আমাদের কাছে কেন আস্‌বে ?

১ম—আমরাও তো ফুল—ডাকোনা ওকে একবার।

২য়—ও ভাই টুন্‌টুনি।

টুন্‌টুনি—কি ডাকছ কেন ? দেখছ না ব্যস্ত আছি।

১ম—আমাদের কাছে একটি বার এসো না ?

টুন্‌টুনি—হাঁ, তোমাদের কাছে যাই—আর আমার ঘাড় মট্‌কাও।

২য়—না না, তোমাকে ধরবো না।

টুন্‌টুনি—সে হচ্ছে না, খাঁচাটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ দেখি।

২য়—আচ্ছা না আস্‌লে! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—সত্যি কি রাজার টাকা তুমি চুরি করেছিলে?

টুন্‌টুনি—পাগল হয়েছ নাকি? আমি আবার কবে রাজায় টাকা চুরি করলাম! মধু চুরি করি বটে।

১ম—বেশ সব ভুলে গেছ দেখছি। তোমার বইয়ে যে সব লেখা আছে।

টুন্‌টুনি—আচ্ছা পাগলের হাতে পড়া গেছে, আমি আবার কবে বই লিখলাম?

১ম—বাঃ রে, সে বইয়ের নাম যে "টুনটুনি", সে বই তুমি ছাড়া আর কে লিখ্‌বে? সে বইয়ে যে আছে তুমি রাজার টাকা চুরি করেছিলে, না দিদি?

বোন্—সে যে ভাই গল্প।

১ম—বেশ ত, গল্প বুঝি সত্যি হয় না?

টুনটুনি—তোমাদের সঙ্গে গল্প করে সময় নষ্ট করতে পারি না। আমার অনেক কাজ আছে।

১ম—তুমিও আমাদের পারুলদিদির মত হলে দেখছি।

টুনটুনি—আচ্ছা তোমরা খেল, আমরা আসি।

প্রস্থান

১ম—পারুলদিদি, বেলা যে পড়ে এল।

৩য়—দিদি, চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে!

১ম—দেখছিস্ ভাই বকুল গাছটায় কত পাখী এসে বসেছে। কিচির মিচির শব্দে গাছটায় যেন শব্দের রঙমশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে!

২য়—সূর্য্য এতক্ষণে ডুবে গেছে না? ওই যে অশথ গাছের তলায় অন্ধকার কেমন ঘন হ'য়ে এসেছে।

৩য়—চল দিদি, বাড়ী ফিরি, আঁধার হয়ে এল!

বোন্—ফিরছি ভাই, ভয় কি? ওই যে আমাদের এক কোণে চাঁদমামা দেখা দিয়েছে, এখনি জোৎস্না উঠবে।

১ম—দিদি, গা ঢাকা দে। ওই যে কেষ্টা চাকরটা খুঁজতে আসছে। এখনি টেনে নিয়ে যাবে, সব খেলা মাটি হ'য়ে যাবে।

২য়—চুপ চুপ আস্তে। কথা শুনলে এখনি এদিকে আসবে।

১ম—কি বলছে শুনেছ? বলছে, ছোঁড়াগুলো জ্বালালে। ও ভেবেছে আমরা পলাশ বনে লুকোচুরি খেলতে গেছি। ও সেই দিকেই যাচ্ছে। আজ সেখানে লুকোচুরি খেলতে গেলে কি মুস্কিলই না হ'ত।

২য়—যাক কেষ্টা ভেগেছে!

৩য়—কিন্তু জ্যোৎস্না ত উঠলো না। অন্ধকার যে ঘন হ'য়ে এল।

১ম—ও কি, কি যেন একটা ডানা ঝটপট্ ক'রে আমার কাছ দিয়ে উড়ে গেল।

বোন—কিছু না ভাই, একটা পাখী।

৩য়—দিদি বনের মধ্যে ওই কি একটা খস্খস্ করছে?

বোন—ভয় নেই ভাই! বাতাসে পাতা নড়ছে।

১ম—ভাই দিদি, একবার চাঁদমামাকে ডাকোনা, আলো দিক্।

২য়—চাঁদমামা! চাঁদমামা।

চাঁদ—কে গো—কে ডাকে আমাকে?

২য়—আমরা সাত ভাই চাঁপা আর পারুলদিদি!

চাঁদ—কোথায় তোমরা?

১ম—আমাদের কি তুমি দেখতে পাচ্ছনা, চাঁদমামা!

চাঁদ—বাছা, এ কয়দিন রাত জেগে আজ আর তাকাকে পাচ্ছিনা—চোখ ঝিমিয়ে আসছে। কিন্তু আমাকে ডাকছ কেন?

১ম—আমরা বনে খেলতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি। বাড়ীর পথ দেখিয়ে দাও না।

চাঁদ—আমার কি আর পৃথিবীর পথ ঘাট মনে আছে! কতকাল হ'ল পৃথিবী ছেড়ে এসেছি—সেখানকার কথা আর আমার মনেই হয় না।

২য়—তবে একটু আলো দাওনা!

চাঁদ—দাঁড়াও বাছারা—আর একটু সবুর কর—তবে আলো দেবো।

৩য়—কিন্তু দেরী করলে যে মা আমাদের জন্য ভাবতে সুরু করবে। আজ একটু আগেই আলো দাও না।

চাঁদ—তা কি হয়—একটু সবুর কর!

রাখালের প্রবেশ

বোন্—কে চলেছ তুমি বনের পথে বাঁশী বাজিয়ে?

রাখাল—আমি নবীন রাখাল—তোমরা কে?

১ম—আমরা সাত ভাই চম্পা আর—

বোন—না, না আমরা গুরুপল্লীর ছেলেমেয়ে –

রাখাল—তোমরা এ বনে কেন?

১ম—ভাই, খেলতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের বাড়াতে নিয়ে চল না।

রাখাল—যদি নিয়ে যাইতো কি দেবে?

১ম—আমার লাট্টুটা।

বোন—আরে সেটা যে আমাকে দেবে বলে ছিলে?

২য়—আচ্ছা, আমার কলের পুতুলটা দেবো।

রাখাল—ঠিক দেবে তিন সত্যি?

সকলে– হাঁ, হাঁ, হাঁ,

রাখাল—আচ্ছা তবে আমার পিছন পিছন এসো।

৩য়—দিদি তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ। আমার হাত ধর না।

২য়—এমন খেলা ভাই আর খেলবো না।

১ম—ভয় নেই ভাই, এইতো এসে পড়েছি।

২য়—ওই দেখ অশথ গাছের মাথার উপর চাঁদমামা আলো ছড়াতে শুরু করেছে।

বোন্—রাখাল এবার তোমার বাঁশী বাজিয়ে একটা গান ধর না।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

ভুলে যেওনা

বিদ্যাসাগর—লোকমান্য তিলক—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ মাস বাঙ্গালী জীবনের একটি স্মরণীয় মাস। তিন জন মহাপুরুষের মৃত্যুদিন বলে এই সময় তাঁদের পবিত্র পুণ্যস্মৃতিকে সকলে স্মরণ করা উচিত। তাঁদের এই মহৎ জীবন অন্ধকারে দীপশাখার মত আমাদের সব সময় সৎপথে চালিত করছে। তাঁদের পবিত্র জীবন তোমাদের সকলের আদর্শ হওয়া উচিৎ। ভবিষ্যতে তোমরা উন্নতির পথে যখন চলতে আরম্ভ করবে এখন এঁরাই তোমাদের হবেন পথ প্রদর্শক। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লোকমান্য তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মাসের তিন দিনে পরলোক গত হন। তাঁদের এই মৃত্যুতিথিতে তোমাদের সকলের চেষ্টা করা উচিত, কেমন কোরে তোমরা সকলে তাঁদের আদর্শকে নিজের আদর্শ কোরে নিতে পার। তাঁদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, তেজ, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, তোমাদের জীবনের প্রধান আদর্শ হওয়া উচিত। তাঁরা দেশের সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি সাধনের জন্যে যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেই জন্যে আমরা যে শত শতবার তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এই মৃত্যুদিন আমাদের সকলের মনে ও প্রাণে অনুভব করা উচিত। বিদ্যাসাগর আমাদের বাঙলা ভাষার জন্যে, শিক্ষার জন্যে, সমাজ সংস্কারের জন্যে, দরিদ্রদের জন্যে যে পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। আজ দেশের চারিদিকে যে উন্নতির সাড়া পড়েছে, তা এই মহাপুরুষদের জীবন ব্যাপী সাধনার ফল। লোকমান্য তিলক ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের স্বাধীনতা ও স্বরাজের জন্যে যে কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছেন তা যে কোন দেশে বিরল। তাঁদের অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য্য, দেশপ্রিয়তা কোন দিন দুঃখে, কষ্টে, অপমানে মলিন হয় নাই। চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে, বিপদের মধ্যে, এমন কি মৃত্যুর মধ্যেও তাঁরা স্বাধীনতার পতাকাকে সব সময় খাড়া রাখতে পেরে ছিলেন। তাঁরা যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তা এখনও শেষ হয় নাই; তাঁদের দেখান পথ ধরে সেই কাজ শেষ করাই হচ্ছে তাঁদের পুণ্য স্মৃতিকে সবচেয়ে বড় সম্মান দেখানো। দেশের নানা রকম বিপদে তাঁদের জীবনই আমাদের প্রধান আদর্শ হয়ে থাকবে এবং তাঁদের জীবনই আমাদের সব সময়ে একমাত্র সম্বল হবে।

সবজান্তা

নিউ ইয়র্কে এক রকম যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যাতে ঝড় ও বৃষ্টি হবার কিছুক্ষণ আগে ঘণ্টা বাজতে থাকে। সহর থেকে ২০০ মাইল দূরে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হলেই এই ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করে এবং সহরবাসীদের সাবধান করে দেয়।

ব্রিটিস গায়নার Kaieteur Falls পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু জলপ্রপাত। নায়াগ্রাজল প্রপাতের চেয়ে এটা পাঁচগুণ উঁচু।

আমেরিকার সভাপতি কুলিজ সে দিন তাঁর জন্মদিনের যে কার্ড পাঠিয়েছিলেন তা ছয় ফিট লম্বা ও চার ফিট চওড়া। এর চেয়ে বড় কার্ড এপর্য্যন্ত তৈরী হয় নাই।

আকাশে যত তারা আছে তার মধ্যে dog star সবচেয়ে উজ্জ্বল। খুব উজ্জ্বল হলেও এই সব তারা অন্যান্য তারার চেয়ে পৃথিবীর থেকে বেশী দূরে। dog starএর আলো পৃথিবীতে পৌঁছুতে সাড়ে আট বছর নেয় এবং আলোর গতি সেকেণ্ডে ১৮৬৩০০ মাইল। dog starএর পর হচ্ছে Canopus। এই তারা পৃথিবী থেকে এত দূরে যে এর আলো আসতে ৪৬৫ বৎসর লেগে যায়।

হাউই সাহেব অনেক বৎসরের পরিশ্রমের পর পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট রেল ও রেলগাড়ী তৈরী করতে পেরেছেন। এটী খেলার রেল নয়। এতে রীতিমত টিকিট কিনে যাত্রীদের চড়তে হয়। এই রেল লাইন ১৫ ইঞ্চি চওড়া ও সাড়ে আট মাইল লম্বা। গাড়ীগুলি তিন ফিট, চার ইঞ্চি চওড়া ও পাঁচ ফিট উঁচু এবং এঞ্জিনগুলি ৫ ফিট উঁচু। এতে সর্ব্বশুদ্ধ ২৫০ জন যাত্রী চড়তে পারে। যোধপুরের মহারাজার প্রাসাদের মধ্যে নাকি এই রকম একটা ছোট রেল আছে।

গ্রামোফোন কোম্পানী সেদিন অনেক কষ্ট করে কোকিলের সুর রেকর্ডে তুলতে পেরেছেন। গভীর বনের মধ্যে যেখানে শতশত কোকিলের বাস, সেখানে তাদের গান লীপিবদ্ধ করবার যন্ত্র নিয়ে গিয়ে এক সুর ধরা হয়েছে। এর জন্যে তাঁদের ১০,০০০ পাউণ্ড খরচ হয়েছে।



এখানে যে ছবিটা ছাপা হোল, তার মধ্যে যে লম্বা মেয়েটী দেখছ, সে লণ্ডনের সমস্ত স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা মেয়ে। তার বয়স মাত্র ১২ বৎসর। সে লম্বায় ৬য় ফিট ২ ইঞ্চি।

সেদিন ফ্রান্সে ছোট ছোট ছেলেদের সাইক্ল রেস হয়েছিল। তার মধ্যে একটী ছয় বছরের ছেলে ১০৩ মাইল ১৩ ঘণ্টায় যেতে পেরে ছিল।

নূতন ধাঁধা

১। হাতে আছে হাতে নাই
হাত বাড়ালে পেতে নাই।

২। তাকে দেখি নাই বলে ঘর থেকে বেরিয়েছি, কিন্তু যেই সে এলো, এমনি দৌড়ে ঘরে এলাম। বলতো সে কে?

প্রশ্নের উত্তর

[এবারে আমরা ঠিক উত্তর খুব বেশী পেয়েছি। এত বেশী পেয়েছি যে সকলের নাম ছাপা আমাদের পক্ষে আরম্ভ তোল। আশা করি গ্রাহক গ্রাহিকারা ক্ষমা কোরবেন। সকলকে প্রাইজ দেওয়া অসম্ভব—সেই জন্যে যাঁদের উত্তর ঠিক হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আমরা একটা লটারী করি। এই লটারীতে শ্রীমাধুরীলতা দাশগুপ্ত (ফরিদগঞ্জ), প্রাইজ পেয়েছেন। তাকে বই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।]

১। বৃটিশ বেলুচিস্থানের রাজধানী।

২। বিখ্যাত রুষদেশীয় নর্ত্তকী।

৩। ২৯০০২ ফিট।

৪। চীন দেশের ধর্ম্মগুরু।

৫। সর্ব্ব প্রথমে জলপথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কার করেন।

৬। বিখ্যাত পারস্য কবি।

৭। একরকম বায়ু ভারতমহাসাগর থেকে ওঠে।

৮। কবি রজনীকান্ত সেন ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৯। গ্রন্থ সাহেব।

১০। মিশরের প্রাচীন রাজাদের কবর।

১১। কৃত্তিবাস ওঝা।

১২। হঠাৎ কোন রকম আঘাত পেয়ে হতবুদ্ধি হওয়া।

এবারের বুদ্ধির প্রশ্নের উত্তর

১। ১৮টা

২। রোডসের কোলোকাস মূর্ত্তি

৩। এমাজন নদী

৪। কুলিনান, ১৯০৫ সালে আফ্রিকায় পাওয়া যায়

৫। সূর্য্যের প্রতিফলিত রশ্মির জন্য

৬। চীন

৭। আট

৮। গ্রীনল্যাণ্ড

৯। ম্যাজেস্টিক, ৫৬৫৫১ টন,

১০। দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয় ও চোখের চারদিকে ঘোলা দেখে

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত



খোকার পড়া

মৌচাক

৮ম বর্ষ] আশ্বিন, ১৩৩৪ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

চল্‌ব আমি হাল্‌কা চালে

চল্‌ব আমি হাল্‌কা চালে
পল্‌কা খেয়ায় হাওয়ার তালে,
কুসুম যেমন গন্ধ ঢালে
তরল সরল ছন্দে রে।
যেমন চলার ছন্দ লুটে
চন্দ্র ভোরে সূর্য্য উঠে,
সন্ধ্যা সকাল সমীর ছুটে
যেমন সে আনন্দে রে॥

নাই বা হলেম মস্ত ভারী
নাই হ'ল ঘর লাখ দুয়ারী
[illegible] ঘোড়া দশটা গাড়ী
[illegible]

ভারিক্কি কি! উঠতে গেলে
স্কন্ধে ক'রে তুলবে ঠেলে
মূর্ত্তি দেখেই ছুটবে ছেলে,
চাইনে সে ভার, নমস্কার॥

যে ভার বয়ে রাখাল ছেলে
মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,
হাতের বেণু দেয় সে ফেলে
একটু যদি ভার ঠেকে।
ব'সে মাটীর সিংহাসনে
মাঠের সপ্ত রাজ্য দোলে
দুন্দুভি তার বাজছে জোরে
[illegible]

এরোপ্লেন ! ঐ যোধ গোঙানো
ঢাউস যেন আকাশ-দানো
বিরাট বিপুল ভয় দেখানো
চাইনে হ'তে চাইনে ভাই।
হাল্‌কা পাখার পাল তুলে সে
মরাল ওড়ে আকাশ ঘেঁসে
পদ্ম যেন চল্‌ছে ভেসে,
অম্‌নি পাখায় উড়তে চাই ॥

চাঁদের দেশের চর্‌কা বুড়ী
কাট্‌ছে সুতো যাচ্ছে উড়ি,
তেম্‌নি উদাস গগন জুড়ি
চল্‌ব উড়ে হাল্‌কা বায়।
বুদ্বুদ-জল-বিম্ব যেমন
হাওয়ায় উড়ায় রাঙায় কিরণ,
স্বপন-পরীর যেমন উড়ন
তেম্‌নি এ প্রাণ উড়তে চায় ॥

মস্ত জাহাজ ব্যস্ত ভারি
সিন্ধু-ডাকাত জাল-পসারী
মীনের ভীতি ধ্বংসচারী
চাইনে ভাই ঐ জল-শকুন।
ছন্দ দোদুল্‌ আমার তরী
—আমার তরী সলিল-পরী—
নাচবে ঢেউএর নূপুর পরি,
উজান-পানে টান্‌ব গুণ ॥

আন্‌ব কাগজ আন্‌ব কেয়া
গড়্‌ব আমার ঠুন্‌কো খেয়া,
অশথ পাতার ভেঁপুর দেয়া
বাজবে ঘন, হাঁক্‌ব জোর—
চাঁদ সদাগর আসছে ওরে
রক্ত মাণিক বোঝাই করে,
সপ্ত ডিঙা ফিরছে ঘরে
ফির্‌ছে বেউলো লখিন্দোর ॥

সাবমেরিনের মারণ-নীতি
ভরা ডুবি কর্‌ছে নিতি,
কুমীর হ'তেও ভীষণ রীতি
ডুব দিয়ে সব খাচ্ছে জল !
আমি হব পান-কউড়ি
সঙ্গে সাথী মীন-গৌরী
ফিরব ঘু'রে জল-দেউড়ি
দেখব জলের শীতল তল ॥

ভাবছ বুঝি, বাঃ কি মজা,
রেলের গাড়ীর লাইন সোজা
লক্ষ লোকের বইছে বোঝা
ঝড়ীর সনে দিচ্ছে রেস্‌ !
আমার ভরসা চরণ-নেয়ে,
মাঠের বাউল চল্‌ব ধেয়ে
পথের সকল ছেলে মেয়ে
চিন্‌বে আমায় জান্‌বে দেশ ॥

আবার পথে ফির্‌ব যবে
সবাই ঘিরে কুশল কবে,
সুদূর আমার নিকট হবে
সকল সে ঘর ইষ্টিশান!
বন্দর মোর সকল ঘাটে
গহন বনে ধানের মাঠে,
আমার সহজ ছন্দ-নাটে
বদ্ধ সারা সৃষ্টিখান॥

আমার রাখাল আমর চাষী
সবাই বলে—ভালবাসি!
বিদায় কালে বলি, "আসি!"
"যাই" এখানে বল্‌তে নাই!
আমার আলাপ জলে স্থলে
সহজ চলায় চোখের জলে,
লতা ছিঁড়ে কুসুম দ'লে
হয় যে আমায় চল্‌তে ভাই॥

নজ্‌রুল ইস্‌লাম

তিস্তার তীরে

(গল্প)

সে অনেক বৎসর আগের কথা। পদ্মার পুল তো হয়নি, তিস্তা-নদীরও তখন পুল হয়নি। দেবীগঞ্জ তখন এখনকার চেয়েও বেশ বড় ষ্টেট্। নরেনের দাদামশাই সেই ষ্টেটের ম্যানেজার। পিতৃহীন নরেন মাতামহের স্নেহের পুতুল, নয়নের মণি। প্রতি বছর শারদীয়া-পূজার সময় দাদামশাইয়ের সঙ্গে গরুরগাড়ী, পাল্কী, নৌকা, ষ্টীমার, রেলগাড়ি, ঘোড়ারগাড়ি, নানা রকম যান-বাহনে চড়ে নদ-নদী কানন-কান্তার পার হয়ে দেবীগঞ্জ থেকে হুগলী জেলার গ্রামে মামার বাড়ীতে পূজো দেখতে আস্‌ত। দাদামশাইয়ের সঙ্গে নরেন 'টুরে' যেত, দাদামশাইয়ের সঙ্গে পাখী-শীকারে বেরুত!

—পূজোর ছুটীতে ইস্কুল কাছারী সব বন্ধ। নরেনের দাদামশাই দেবীগঞ্জে 'ম্যানেজারবাবু' নামে বিখ্যাত। ডাক্তারবাবু, ওভারসিয়ারবাবু ও ম্যানেজারবাবু তিন জনে মিলে ছুটীতে পাখী শীকার করবার জন্যে তিস্তার তীরে যাত্রা করলেন। চাকর, বামুন, কুলী, চাপরাসী তাঁবু সঙ্গে গেল। নরেন দাদামশাইয়ের সঙ্গে রইল।

তিস্তার তীরে তাঁবু পড়ল। দু'বেলা বোটে চড়ে বন্দুক নিয়ে সকলে মিলে পাখী শীকারে বেরুনো হত! প্রকাণ্ড নদীর বুকের ভেতরে মাঝে মাঝে গেরুয়া রংয়ের চরা পড়েছে; সেই চরায় চখা-চখিরা দল বেঁধে চরে বেড়ায়। প্রায় একহাত উঁচু পাখী। খুব গাঢ় গেরিমাটী রংয়ের গায়ের বর্ণ! ছোট ছোট চোখ দুটি স্বচ্ছ ঘন কালো, ভীতি ভাব-পূর্ণ। গায়ের পালক উজ্জ্বল চক্‌চকে। এদের গলার ডাক খুব উচ্চ ও করুণ।

বিকেল বেলা বোটে করে তিস্তার বিস্তীর্ণ জলরাশির মাঝখানে এসে একটা ছোট চরায় প্রায় আট দশটা চখা-চখি দেখতে পাওয়া গেল। সে চরে বুনো-হাঁসও বোধ হয় গোটা দুই-তিন ছিল।

তার আগের দিন একটা কাদাখোঁচা পাখী ছাড়া আর কিছু শীকার হয়নি! ওভারসিয়ার বাবু একটা ঘুঘুকে লক্ষ্য করে গুলতি মেরেছিলেন—পড়েছিল একটা কাদা-খোঁচা! ... ..সকালবেলা অনেক চেষ্টার পর একটা বড় হাঁস মারা হয়েছিল।

এখন জলের ভিতরে ছোট চরায় অতগুলো পাখীর বৈঠক দেখে আনন্দে ও লোভে সকলের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল! বোট্‌খানা আরও এগিয়ে নিয়ে গেলে পাছে ওরা ভয় পেয়ে উড়ে যায়, সেই জন্য বোট দূরে রেখে সেই খান থেকেই সকলে বন্দুক ধরে 'টিপ্' করতে লাগলেন। ম্যানেজারবাবু, ডাক্তারবাবু, ও ওভারসিয়ারবাবু তিনজনের তিনটি বন্দুক এক সঙ্গে অগ্নি-উদ্গিরণ করে গর্জ্জে উঠবার জন্য প্রস্তুত হল। নরেন আগ্রহ আশঙ্কা-স্পন্দিত-বক্ষে, সেই দিকে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন—ওআন্—টু—থ্রী—

এক সঙ্গে তিনটে বন্দুক গর্জ্জে উঠ্‌ল। তিস্তার দিগন্ত-বিস্তৃত বুকের চারি দিকের দিক্-চক্রবালে সেই গর্জ্জন ভীষণ শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়ে মনে হল যেন একদল সৈন্য এক সঙ্গে তাদের অনেক বন্দুকের গুলি ছুঁড়েছে! প্রকাণ্ড নদীর অথই বুকের ভিতরে বন্দুকের আওয়াজ—সে যেন তার স্বাভাবিক শব্দের চেয়ে আরও

চতুর্গুণ ভীষণ শোনায়, এবং সেই আওয়াজ দিগ্‌বিদিকে আকাশে আহত হ'য়ে আরও অনেকগুলি প্রতিধ্বনি তুলে শূন্য ও জল কাঁপিয়ে দেয়।

বন্দুকের মুখে ধোঁয়ার রেখা মিলাতে-না-মিলাতেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত পাখীর দলটি, কাতর আর্ত-চিৎকারে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আকাশের পানে উড়ল।

সকলে আগ্রহ ব্যাকুল মুখে উৎসুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখল চরের উপরে দুটো পাখী রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে! একটা ধব্‌ধবে শাদা হাঁস,—এই হাঁস পদ্মানদী ও তিস্তানদীর চরে খুব দেখতে পাওয়া যায়, এরা আকাশে অন্য পাখীদের মত উড়ে বেড়ায়! এদের মাংস সাধারণ হাঁসের মাংসের চেয়ে অনেক মিষ্টি। আর একটি পড়েছে রাঙা চখা। হাঁসটা বালুচরের উপরে নিঃশব্দ স্থির হয়ে একটা ডানা গুটিয়ে ও একটা ডানা মেলে পড়ে রয়েছে—বোধ হয় বন্দুকের গুলিটা একেবারে তার বুকে বিঁধে এক মুহূর্তেই তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে! কিন্তু চখাটা তখনও রক্তাক্ত ডানা দুটো বিস্তৃত করে উপুড় হয়ে ঝটপট্‌ করে বালির উপরে লুটোচ্ছে—

নরেন আগ্রহ পূর্ণ স্বরে বলে উঠল—দাদামশাই! চখাটা এখনও মরেনি! ওটাকে ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলে বোধ হয় ভাল হয়ে যাবে, আমি ওকে পুষ্‌ব—

ওভারসিয়ারবাবু বন্দুক ফেলে দু'হাত উঁচু করে আনন্দিতস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লেন—হিপ্‌—হিপ্‌—হুররে—দু'রকমের দু'টো পড়েছে—চমৎকার—

ম্যানেজারবাবু বল্‌লেন—তবু তিনটে বন্দুকের একটা গুলি ফস্কেছে! বোট্‌ দ্রুতগতিতে চরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে দেখা গেল একটা ছোট আকারের চখা আকাশের উপরে উঁচু থেকে পাক্‌ খেতে খেতে কম্পিত করুণ চীৎকারে নীচের দিকে নেমে আসছে.....তার সেই ডাকটি যে কী কাতর তা না শুনলে কেউ বুঝতে পারবে না।

রক্তাক্ত চখাটা যেখানে পড়ে ঝটপট্‌ করছিল তার তিন চার হাত উঁচুতে ছোট চখাটা কাতর করুণ চীৎকারে নদীর বুক কাঁপিয়ে, গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল!......আহত চখাটা আরও একটুক্ষণ ঝট্‌পট্‌ করে ক্রমে আস্তে আস্তে নিশ্চল হয়ে এল! তখন উড়ন্ত চখাটা আরও কাতর চিৎকারে আকাশের বুক

চিয়ে,—নীচের দিকে নেমে এসে মৃত চখাটার উপরে ঝপ্ করে পড়ে গিয়ে ডানা ঝট্পট্ করতে করতে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল। .....

বোটশুদ্ধ সকলেই বিস্মিত স্তব্ধ মুখে নির্ব্বাক্ হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। নরেন হঠাৎ দাদামশাইয়ের গা ঠেলে ব্যাকুলস্বরে বলে উঠ্‌ল—দাদু! ও পাখীটা অমন করে চেঁচাচ্ছে কেন?......বলনা,—ও দাদু—বলনা?—ওর কী হয়েছে?—

'বাহে' মাঝি বংশী দাঁত বের করে হেসে বল্‌লে—"ত্যাহেন্ কি কড়্‌তা! উডা উয়াড়্ মাইরা-ছাওয়া পগী অচে! উ গুল্যান্ বিটা-ছাওয়া পগীর পাচ্ছুক না ছাড়ে! এক ডারে মাড়ি দিলে ভিন্‌ডা উত্তিই মড়ে!"

বোট এসে চরে ঠেক্‌ল। সকলে চরে নামলেন। এতগুলি মানুষ দেখেও জীবন্ত পাখীটা উড়ে পালালনা। মরা-পাখীটার রক্তাক্ত ডানায় গলায় বুকে, ঠোঁটের ঠোকর দিতে দিতে করুণ-কান্নার মত শব্দ করতে লাগল।

এই সকরুণ দৃশ্য দেখে শীকারীদের উৎসাহ নিভে গিয়ে একটা দারুণ বেদনা ও বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। ম্যানেজারবাবু হঠাৎ চোখের উপরে হাত ঢাকা দিয়ে বললেন—আমি আর ঐ দৃশ্য দেখতে পারছিনে। তোমরা যা হয় একটা কর!

ওভারসিয়ার্‌বাবু এগিয়ে গিয়ে পাখীটাকে তাড়া দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। যে পাখীটার মৃতদেহ পড়েছিল সেটা পুরুষ পাখী—চখা! অন্য যে পাখীটা চীৎকার করে তার কাছে উড়ছিল—সেটা যে ওরই জোড়ের চখী—স্পষ্ট বোঝা গেল।

মরা পাখী দুটো নিয়ে সবাই যখন বোটে ফিরে আসছেন তাঁদের মাথার উপরে অল্প উঁচুতে সেই চখীটা ঘুরপাক্ খেতে-খেতে করুণ চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ করে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে আসতে লাগল। নরেন আবার ব্যথিতস্বরে বলে উঠ্‌ল—ও পাখীটা এখান থেকে যাচ্ছে না কেন দাদু? ওর গায়ে কি গুলি লেগেছে?...ওর ডাকটা যেন কান্নার মত শোনাচ্ছে, নয়?—

ওভারসিয়ারবাবু ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে ব'ললেন—ডাক্তারবাবু! ওটাকে দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে দিলেই তো হয় ভাল।—

ডাক্তারবাবু সম্মতি দিলেন।

ওভারসিয়ারবাবু বোটের উপরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়লেন। বকের কাতর চীৎকার অর্দ্ধপথে আটকে গিয়ে চখীটা ঝপ্ করে জলে পড়ে গেল। সেখানকার জলটুকু টাট্‌কা-রক্তে রাঙা হয়ে ঘুলিয়ে উঠ্‌ল!

নরেন খুব ছোট বেলা থেকে দাদাবাবুর সঙ্গে বহুবার পাখী শীকারে এসেছে একটু আগে চরের উপরে এক সঙ্গে হাঁস ও চখা বন্দুকের গুলিতে পড়ায় সে শীকারের সাফল্যে হর্ষে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল! কিন্তু কি-জানি- কেন এই চখীটার কাতর কান্না তার প্রাণটাকে ব্যথিত ও ব্যাকুল করে তুলেছিল! এখন সে গুলি খেয়ে জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নরেনের বড় বড় চোখ দুটি ছাপিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল পড়তে লাগল!

ডাক্তারবাবু বললেন—ও কিরে নরু? কাঁদছিস্ কেন?—আর ও একটা পাখী কেমন বেশী পাওয়া গেল, কোথায় আমোদ করবি—তা নয় কান্না!! ... ...এ-এ-এ — তবে আর তোকে পাখী শীকারে সঙ্গে আনা হবে না! মেয়ে মানুষের মত কান্না কি রে?... তুই না পুরুষ মানুষ?

ম্যানেজারবাবু তাড়াতাড়ি নাতিকে কোলে নিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে ভুলাবার জন্য সান্ত্বনার স্বরে বলতে লাগলেন—ভালই তো হল নরু! আমাদের তিনটে গুলির একটা ফস্‌কে গেছ্‌ল, সেটা পাওয়া গেল! ছিঃ, কাঁদলে আর তোমাকে নিয়ে আসবোনা!

নরু তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে-মুছতে বল্‌লে—কৈ? আমি কাঁদিনি তো?

দাদামশাই বললেন—ঐ দেখ—সূয্যি ঠাকুর ডুবে যাচ্ছেন—তিস্তার জল কেমন আবীরগোলার মত রাঙা হয়ে উঠেছে—

নরু সেই দিকে তাকাতেই মনে পড়ে গেল—গুলি-খাওয়া চখীটাকে জলের ভিতর থেকে মাঝি যখন তুলে আনলে, সেখানকার জলটুকু অমনি রাঙা হয়ে উঠেছিল! নরুর মনে হ'ল যেন হাজার হাজার চখা-চখীর রক্তে তিস্তার পশ্চিম দিকের জলরাশি লাল হয়ে উঠেছে।

রাত্রিবেলা তাঁবুতে দাদামশায়ের ক্যাম্প খাটে তাঁর বুকের কাছ ঘেঁসে শুয়ে নরেন আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা দাদু, চখীটা আর সব পাখীগুলোর সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেল না কেন? ওটা ভারী আহাম্মক ছিল, নয়?

—তুই বুঝি এখনও চখার কথা ভুলতে পারিস্‌নি ? ..

—বলোনা দাদু, উড়ে গেলনা কেন ?

কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য ম্যানেজারবাবু বললেন—আচ্ছা আগে আমার কথার জবাব দে, তারপর বলব। চখা-চখির ভাল নাম কি বল্‌ দিকিন ?

—কী জানি ! তুমি বলো না ?

—চক্রবাক্‌ চক্রবাকী। যখন বড় হয়ে সংস্কৃত কাব্য পড়বি, তখন ওদের গল্প জানতে পারবি। এখন ঘুমো।

—ঘুম আসছে না। তুমি এখনি ওদের গল্প আমায় বলো না দাদু ?...আচ্ছা ঐ যে নদীর দিক্‌ থেকে চখার ডাক শোনা যাচ্ছে—ওরা এত রাত্রে ঘুমোয়নি... কেন চেঁচাচ্ছে দাদু ?

—ওরা জোড়া বেঁধে বেড়ায়। রাত্রির অন্ধকারে নদীর চরে জোড়্‌-ভাঙা হয়ে পথ হারিয়ে গেল্‌সে অম্‌নি করে ডেকে-ডেকে একজন আর এক জনকে খোঁজে ! আমার ঘুম আসছে, এইবার তুই চুপ্‌ কর্‌।

খানিক বাদে চাপরাশী এসে খবর দিল—পাশের তাঁবুতে ডাক্তারবাবুর কলেরার মত হয়েছে ! ম্যানেজারবাবু তাড়াতাড়ি উঠে গেলেন। এসিয়াটিক্‌ কলেরা ! রাত্রি ভোর হতে না হতে নাড়ী ছেড়ে গেল !...সহরে চাপরাশী ছুট্‌ল। ..ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর বয়স বেশী নয়। কয়েক বৎসর্‌ মাত্র বিয়ে হয়েছে ! এই বছরে তাদের একটি খোকা হয়েছে !

স্ত্রী এসে যখন পৌঁছুলেন তখন সবই শেষ হয়ে গিয়েছে ! মৃত স্বামীর বুকের উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে স্ত্রী আর্ত্তস্বরে কেঁদে উঠলেন—ওগো, – আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও—

নরেনের সামনে চখীর আহাম্মুখির অর্থটা হঠাৎ যেন স্বচ্ছ সুস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। তার করুণ চীৎকারের মধ্যে এই কয়টি কথাই যে লুকানো ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল।

বিবর্ণ মুখে ঘর্ম্মাক্ত দেহে থর-থর্‌ করে কাঁপতে-কাঁপতে নরু দাদামহাশয়ের কোলের ভিতরে অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌ল।

শ্রী[illegible] দত্ত

এরিয়ন

(গ্রীস্‌দেশের উপকথা)

তোমরা গায়কশ্রেষ্ঠ অরফিয়াসের গল্প শুনেছ। গ্রীসে এরিয়ন্‌ বলে আরো একজন খুব ভাল গায়ক ছিলেন। তাঁর গানের ঝঙ্কারে বনের পশু আকাশের পাখী সাড়া দিত। দেশে তার সব চেয়ে বড় বন্ধু ছিল রাজা। তাই সে বেশীর ভাগ সময়ই থাকত রাজবাড়ীতে। এরিয়নের চিরদিনের ইচ্ছা যে সে বিদেশে আপন কৃতিত্ব দেখিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে।

কিছু দিন পরে সে শুনতে পেল যে সিসিলিতে একটা খুব বড় গানের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলের আপত্তি সত্বেও সে সেখানে চলে গেল— বীণাটি হাতে করে—বিদেশীর সম্মান লুটে আনতে। সমস্ত বিভিন্ন দেশের গায়ক-বাদকেরা সেখানে মিলিত হয়েছিল। কিন্তু সকলেই নত শিরে হার মেনে গেল এরিয়নের গানের সুর আর তারা বীণার ঝঙ্কারের কাছে।

সে সেখানে পাওয়া অফুরন্ত ধনরত্ন নিয়ে একটা জাহাজ ভাড়া কোরে দেশে রওনা হল। পাছে বিদেশী জাহাজের নাবিকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এই ভয়ে সে তার নিজের দেশের লোকের জাহাজ নিয়ে ছিল, কিন্তু টাকার লোভে মিত্রও শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

তারা প্রথমে তার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করল। কয়েক দিন পরে তাদের জাহাজ যখন স্বদেশের নিকটবর্ত্তী হয়েছে তখন সেই নাবিকগুলি ভদ্রতার খোলস্‌ দূরে ফেলে দিয়ে তরোয়াল খুলে দাঁড়াল এরিয়নকে বধ করবার জন্যে। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেল, বুক দুরদুর্‌ করতে লাগল। সে খুব মিনতি করে বল্লেন, 'ভাই তোমরা আমার বীনাটি ছাড়া আর সব কিছু নিয়ে যাও, শুধু আমায় বাঁচতে দেও।"

বাস্তবিক তখন তার নিজের জীবন অপেক্ষা জন্মভূমির জন্যে প্রাণ কাঁদছিল অনেক বেশী।

নাবিকরা তাকে ব্যঙ্গ করে বলে উঠল, "দেখ আমরা তোমার ধন-রত্ন, সমস্ত দেশে

নিয়ে যাব—শুধু তোমাকে ছাড়া। তুমি তরোয়ালের আঘাতে কিম্বা সমুদ্রের জলে যেখানে ইচ্ছা মরতে পার।"

এরিয়ন জীবনের আর কোন আশা না দেখে তাদের আর একটা শেষ অনুরোধ জানাল—"দেখ মরবার আগে দয়া করে আমায় আমার সব চেয়ে ভাল পোষাকটা পরে সব চেয়ে ভাল গানটা গাইতে দেও।"

নাবিকরা তখন তাদের উপস্থিত লাভের আশায় উৎফুল্ল ছিল, তাই অনুমতি দিল।

এরিয়ন তার জীবনের শেষ সন্ধ্যায় সন্ধ্যা-সূর্য্যেরই মত রাঙ্গা টুকটুকে একটি বহুমূল্য পোষাক পরে একটি খুব সুন্দর মুকুট মাথায় দিয়ে বসল বীণাটি হাতে করে জাহাজের একেবারে সামনে। ঢেউ গুলি গর্জ্জন করে তাকে জানিয়ে দিল তার পরপারের ডাক।

বীণা বেজে উঠল। আকাশে উড়তে উড়তে পাখীগুলি স্থির হয়ে দাঁড়াল গান শুনে। মাছগুলি ভেসে উঠল। ক্ষণকালের জন্য রক্তপিপাসু নাবিকরা মানুষের মত হল। মনে হয় যেন সূর্য্যদেবও অস্ত যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল গানের সুরে। আলো রেখার সঙ্গে সঙ্গে গানের সুর থেমে গেল। একবার স্বদেশের দিকে চেয়ে বীণাটি হাতে করে এরিয়ন ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের অতল গহ্বরে। চেতনা ফিরে এলে নাবিকেরা দেখল গানের সুর থেমে গেছে, গায়কের আসন শূন্য। ঢেউগুলি জাহাজের উপর আছড়ে পড়ছে একটা হাহাকারের করুণ বাণী নিয়ে।

নাবিকরা তাদের লুণ্ঠিত রত্নরাজি মহা উল্লাসে বয়ে নিয়ে এল স্বদেশে।

* * *

জাহাজ নোঙ্গর করা মাত্রই রাজবাড়ী থেকে তাদের ডাক এল। তারা বুঝতে পারল না—এর কারণ কি ? এরিয়ন তো তাদের সামনেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তবে—ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গেল।

রাজা বিচারাসনে বসে তাদের নিকট এরিয়নের খবর জিজ্ঞাসা করল। তারা সাহসের সঙ্গে উত্তর করল, "আমরা তাকে সসম্মানে ধনরত্ন সহ সমুদ্রের [illegible] পারে ঝাঁপি[illegible] পৌঁছে দিয়ে এসেছি।" [illegible] পর্দার [illegible] থেকে

তাদের সামনে এসে দাঁড়াল সেই লাল টুকটুকে পোষাক পরা এরিয়ন। নাবিকদের মুখের কথা মুখেই মিলিয়ে গেল।

রাজা বলল, "তোমাদের চেয়ে জলের মাছও অনেক উন্নত। তাদেরও প্রাণ আছে। সমুদ্রের সমস্ত ডলফিন মাছ এর গানে মুগ্ধ হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন একে পিঠে করে পার করে দেয়। স্থল পথেও তোমাদের চেয়ে আগে এসেছে। তোমরা একে যা দণ্ড দিতে চেয়েছিলে তার চেয়ে অনেক কঠিন দণ্ড এখন তোমাদের ভাগ্যে আছে।"

এরিয়ন নাবিকদের জন্যে দুঃখীত হয়ে রাজাকে বলল বন্ধু এদের ক্ষমা কর।

রাজা ধীর ভাবে উত্তর দিল, না বন্ধু, তুমি গায়ক—তোমার কাছে ক্ষমা আছে। কিন্তু আমি রাজা - আমার ক্ষমার অবকাশ কোথায়।

শ্রীউমাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত

পাখীর বাসা

তোমাদের যদি আমি জিজ্ঞাসা করি, পাখীরা বাসা বাঁধে কেন বল ত? তোমরা উত্তর দেবে, আমরা যেমন শীত গ্রীষ্ম, ঝড় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাড়ী তৈরী করি পাখীরাও তেমনি নিরাপদে থাকবার জন্য বাসা বাঁধে। অবশ্য তোমাদের কথা যে ভুল তা নয়। প্রকৃতির এই সব উপদ্রব হতে আত্মরক্ষা করবার জন্যে পাখীরা বাসা বাঁধে বটে, কিন্তু এই বাসা বাঁধবার তাদের আর একটি সব চেয়ে দরকার আছে, সেটি তাদের, ছানাদের বাঁচান। তোমার ছোট ভাই যখন হল তখন দেখেছ ত বেচারী কি অসহায়। সে না পারে হাঁটতে, না পারে কথা বল্‌তে। বেচারী চোখে ভাল করে দেখতে ও পায় না। দাঁত নেই, খেতেও পারে না। তখন তোমার মা যদি দিন রাত তাকে যত্ন না করতেন, খিদে পেলে দুধ না খাওয়াতেন, সব সময়ে তাকে কোলে নিয়ে স্নেহে চোখে না রাখতেন তাহলে [illegible] কি একদিনই বা [illegible]। সেই

কম অন্যান্য প্রাণীদের ছানারা যখন ছোট থাকে তখন তাদের খুব যত্ন করা দরকার। তাদের প্রকৃতির সব রকম উৎপাত থেকে রক্ষা করা চাই। এমন কি শত্রুদের হাত থেকেও তাদের বাঁচান দরকার। তোমরা জান কুকুর বেড়াল ও অন্যান্য অনেক জন্তুদের পুরুষগুলি সুযোগ পেলেই তাদের বাচ্ছা খেয়ে ফেলে। এই জন্য তাদের মা কত কৌশল করে ও সতর্কতার সঙ্গে ছানাদের তাদের হাত থেকে রক্ষা করে। পাখীদের মধ্যে এ দোষ না থাকলেও অন্য শত্রুর হাত থেকে ত ছানাদের বাঁচান চাই? সে জন্যে তারা বাসা তৈরী করে। ভগবান বাসা তৈরী করার এমন একটি স্বাভাবিক নৈপুণ্য সকল জন্তুকেই দিয়েছেন যা দেখে আমরা অবাক হই। জন্তুরা তাদের ছানাদের থাকার জন্যে এমন যত্ন ও নিপুনতার সঙ্গে বাসা বাঁধে যে, যার তুলনায় তাদের নিজেদের থাকার জন্যে তারা যে বাসা করে তা কিছুই নয়।

পাখীদের মধ্যে ও আমরা এই স্বাভাবিক গুণটির পরিচয় পাই। খড়কুটো এবং বাসা তৈরী করবার অন্যান্য উপকরণগুলি তারা একটি একটি ঠোঁটে করে নিয়ে আসে এবং অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে বাসা বাঁধে।

চারিদিকের অবস্থা বুঝে এক এক দল পাখী এক একটি বিশেষ বিশেষ স্থানে বাসা বাঁধে। তোমরা দেখেছ পায়রা বা চড়াই পাখীরা সব দেশেই হয় ঘরের দেওয়ালের গর্ত্তে না হয় খড়ের চালে বাসা বাঁধে। পাখীরা সাধারণতঃ হয় মাটির গর্ত্তে, না হয় পাহাড়ের ফুটোয়, না হয় দেয়ালের ঘুলঘুলিতে, অথবা গাছের কোটরে বাসা তৈরী করে।

আমি একবার পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি নদীর উঁচু পাড়ের গায়ে গর্ত্তে হাজার হাজার শালিখ পাখীর বাসা দেখেছিলাম। পাখীরা এক দল যখন ছানাদের জন্যে খাবার আনতে উড়ে যাচ্ছে তখন খাবার নিয়ে অন্য দল আবার বাসায় উড়ে আসছে। এমনি সারাদিনই তাদের যাওয়া আসা আর কিচির মিচির চলছে, তাদের ব্যস্ততার আর সীমা নেই। অত হাজার হাজার গর্ত্তের মধ্যে প্রত্যেক পাখীই তার নিজের গর্ত্তটি বেশ চেনে। কেউ ভুল করে অন্য কারুর বাসায় ঢুকে পড়ে না। তাদের নির্জ্জন নদীর চরের এই ঘরকন্না দেখতে বেশ লাগে।

যাই হোক সাধারণতঃ পাখীরা আলাদা আলাদা বাসা বাঁধে। আবার একজোটে

মাথায় যেখানে তিন চারটি ডাল আমাদের হাতের আঙ্গুলের মত তিন চারদিকে বার হয়ে গেছে পাখীরা ঠিক তার মাঝ খানে বাসা বাঁধে। তা হলে বাসাটি ঠিক ডালগুলির মাঝখানে থাকে, ঝড়ে পড়ে যাবার ভয় থাকেনা। তোমরা ছবিতে এই রকম



আফ্রিকার পাখীর বাসা



টুনটুনির বাসা

একটি বাসা দেখছ; বাসাটির আকার ঠিক যেন একটি ঝুড়ির মত। তলাটি বেশ পুরু ও গোল এবং উপরের দিকে গর্ত্ত করা। খড়, শুক্‌নো ঘাস এবং নরম নরম কাট্‌ কুটো, ও তুলো দিয়ে বাসাটি তৈরী। ইহার মধ্যে কয়েকটি ডিম ও রয়েছে। মা-পাখীটি তা দিয়ে দিয়ে যখন এই ডিমগুলি ফোটাবে তখন তার মধ্যে থেকে ছোট ছোট ছানা বার হয়ে চিঁ চিঁ করতে থাকবে।

তোমরা অনেকেই বাবুই পাখীর বাসা নিশ্চয়ই দেখেছ। বাসাগুলি দূর থেকে ঠিক যেন ছোট ছোট কলসীর মত ঝুলতে দেখায়। গাছের আগায় এত সরু ডালে বাবুই পাখীর বাসাগুলি থাকে যে হনুমান, সাপ, চিল, কাটবেড়ালীরা ও অন্য সব

ডালে যেতে সাহস করেনা। মা-পাখীটি আবার ছানাগুলি যাতে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকতে পারে সে জন্য বাসার মুখ নীচু দিকে রাখে; আকাশ দিয়ে না উড়ে এলে তার মধ্যে ঢোকার আর উপায় নেই। সুতরাং দেখ, বাবুইয়ের বাসায় কোন শত্রুরই ভয় নেই। এই বাসার তৈরী করার রকমটাও আবার দেখ। এই ভাবে যে বাসা শূন্যে ঝুলতে থাকে তাকে আড়াআড়ি ভাবে খড় দিয়ে তৈরী করলে সেটা ভেঙ্গে



বাবুই পাখীর বাসা



ঝুড়ির মত বাসা

যাবার সম্ভাবনা। সেই জন্য বাবুই তার বাসা খড় দিয়ে লম্বা লম্বী ভাবে বোনে। এই বাসার ভেতরে কয়েকটা কুঠরী থাকে। তাদের মধ্যে বড়টি এবং সব চেয়ে ভালোটিই ছানাদের জন্যে। মা পাখীটি সেইটিতে বসে দিনরাতই ডিমে তা দিতে থাকে। আর একটি কুঠরী পুরুষ পাখীটির। সে তার সঙ্গিনীটির সুখ-সুবিধার দিকে সব সময়ই চোখ রাখে। এবং যখন বেচারী একান্ত মনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডিমে তা দিতে থাকে তখন পুরুষ পাখীটি গান গেয়ে তার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে।

আমাদের দেশে টুনটুনী জাতীয় আর এক রকমের পাখী আছে। তারা তুলোর গাছ থেকে তুলো এনে ঠোট আর পা দিয়ে তা থেকে সুতো কেটে সেই সুতোয় গাছের প্যাতায় ঠোট দিয়ে সেলাই করে তার মধ্যে ছানাদের এমন করে লুকিয়ে রাখে যে, শত্রুরা সেটাকে বাসা বলে কিছুতেই ধরতে পারেনা। তোমরা ছবিতে এমনি

একটি বাসা দেখতে পাচ্ছ। বাসাটি কি চমৎকার। আবার ছোট ছোট দুটি ছানা মুখ বার করে আছে।

আমরা যেমন সমাজের মধ্যে বাস করি, নিজদের সুখ-সুবিধা ছাড়া সমাজের অন্য লোকেরাও সুখে থাকুক আমরা তার জন্যে যেমন চেষ্টা করি এবং বিবাহ বা অন্য কোন উৎসবে আমরা সকলে যেমন একত্র এসে মিলি, পাখীদের মধ্যে সে সব কিছু দেখা যায় না। তারা এক একটি পরিবারে বাস করে এবং স্বার্থপরের মত নিজেদের ছানাদেরই মানুষ করে। অন্যদের দিকে তারা তাকায় না। কিন্তু আফ্রিকা দেশের দক্ষিণে নিম্নতম প্রদেশে এক দল চড়াই জাতীয় পাখীর মধ্যে এই সামাজিক ভাবটি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। তারা সকলে মিলে গাছের গুঁড়ির চারদিকে খড় দিয়ে একটা মস্ত বড় ছাতা তৈরী করে এবং তার তলায় সমস্ত পাখীর দলটি বাসা বেঁধে সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করে। এরা সকলে মিলেমিশে থাকে বলে এদের গণতান্ত্রিক পাখী বলা যেতে পারে। এখানে এই রকম একদল পাখীর বাসার ছবি দেওয়া গেল। আমাদের দেশে কিন্তু এদের বংশ দেখতে পাওয়া যায় না।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

সাঁতারের খবর

তোমরা বোধ হয় সকলেই ইংলিশ চ্যানেলের নাম শুনেছ? ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের মাঝখানে যে সমুদ্রটুকু আছে তারি নাম ইংলিশ চ্যানেল। যারা আজকাল নামজাদা সাঁতারওয়ালা,—তাদের ফ্যাসান্ হচ্ছে এই চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হওয়া। কয়েক বৎসর থেকে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতি বৎসরই কোন না কোন দেশের লোক এই চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হন। সাধারণতঃ আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসেই এই প্রতিযোগিতা হয়। আজ পর্যান্ত মোটে এগার জন এই সাঁতারে কৃতকার্য্য হয়েছেন

গত আগষ্ট মাসে লণ্ডন সহরের একজন ইনসিওরেন্স কেরাণী—মিঃ এইচ, ঈ; টিমি চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হয়েছেন। তার এই চ্যানেল পার হ'তে ১৪ ঘণ্টা ২৯ মিনিট সময় লেগেছে। মিঃ টিমির বয়স মাত্র বাইশ। ইনি লম্বায় ৬ ফুট ২ ইঞ্চি। ইনি লণ্ডন সুইমিং ক্লাবের ক্যাপটেন। যারা সব চেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে চ্যানেল পার হয়েছেন—ইনি তাঁদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছেন।

ফ্রান্সের জর্জ্জ মিচেলই এখন পর্য্যন্ত সবচেয়ে কম সময়ে চ্যানেল পার হ'য়েছেন। তাঁর মাত্র ১১ ঘণ্টা ৬ মিনিট লেগেছিল।

মেয়েদের মধ্যে মিস্ গার্টু্ড ইডার্‌লে্ প্রথমে চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার ছিল। ইনি নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। তাঁর সময় লেগেছিল—১৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট। সকাল ৭টার সময় ক্যালের কাছে কেপ গ্রীসনে (Cape Grisnez) থেকে সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন ও রাত্রি ৯টা ৩৯ মিনিটের সময় কিংস-টাউনে পৌছান। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য তীরে ভয়ানক ভীড় হয়েছিল। ডোভারে লর্ড মেয়র ও তাঁহার পত্নী তাঁকে অভ্যর্থনা করে সম্মান দেখান। চ্যানেল সাঁতরাবার ১২ ঘণ্টা পরেই তিনি আবার আর একটা সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দেন। চ্যানেল সাঁতরাবার সময় তিনি দুবার সামান্য কিছু খেয়েছিলেন। তিনি এত জোরে সাঁতরিয়ে ছিলেন যে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে নৌকাতে যাঁরা যাচ্ছিলেন তাঁরা অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া শেষের দিন সমুদ্রও বড় চঞ্চল হয়েছিল। এই আঠার বছরের মেয়েটীর পক্ষে এ বড় রকম বাহাদুরীর কাজ নয়।

যিনি সব প্রথমে চ্যানেল পার হন তাঁর নামটিতে তোমাদের জানা দরকার। তার নাম হচ্ছে ক্যাপটেন ওয়েব। ১৮৮৫ খৃঃ আগষ্ট মাসে (২৪শে ও ২৫শে) তিনি ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট এই সাহসের কাজটী করেন। যদিও তার সময় কিছু বেশী লেগেছে তবু তিনি প্রথমে সকলের ভয় ভেঙ্গে দিয়েছেন; এই জন্য তার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি ছাড়া আর যে কয়জন চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হয়েছেন তাদের নাম—কোন দেশের লোক ও কত সময় লেগেছে তার একটা তালিকা দিলাম।

নাম	দেশ	সময়	বৎসর
টি, ডব্লিউ বার্জ্জেস্	—	২২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট	১৯১১
এইচ, স্যালিভ্যান	আমেরিকা	২৭ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট	১৯২৩
এস্, টিরাবোশী	ইটালী	১৬ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট	১৯২৩
চার্লস্ টথ	আমেরিকা	১৬ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট	১৯২৩
এন, এল, ডারহ্যাম	ইংলণ্ড	১৩ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট	১৯২৬
ভিয়ার কোটর	জার্ম্মানী		১৯২৬
মিসেস্ করসন	আমেরিকা		১৯২৬

মিঃ এন, এল, ডারহ্যাম ইংরেজদের মধ্যে প্রথম চ্যানেল সাঁতরিয়ে পার হন। এবং খুব অল্প সময়ে পার হন। তোমাদের মধ্যে যারা সাঁতার জান, একবার চেষ্টা করবে নাকি ?

শ্রীবিমলেন্দু সরকার

কল্পির শেষ

প্রথম দৃশ্য

(স্কুলঘর—পিছনদিকে Boundaryর পাঁচিল দেখা যাইতেছে)

ঝান্টু—উঃ, বাতাসটা যেন গা-ময় ছুঁচ ফোটাতে আরম্ভ করেছে, দেখ্‌ছিস্ ?

পট্‌লা—কোথায় বাতাস রে ? সেই থেকে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি, একটু বাতাস পেলে তো বেঁচে যাই।

ঝান্টু—আর বেশী পেয়ে কাজ নেই, ভাই। এই যা পাচ্ছি, একেবারে চাল-চামড়ার ভিতর দিয়া পাচ্ছ! উঃ গা যেন জ্বলে গেল—বাপ্‌রে! (চীৎকার)

মাষ্টার মহাশয় (চটকা ভাঙ্গিয়া)—পড়্ না হাব্লা, ঘুমুচ্ছিস্ না কি ?

হাবলা—"জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরবেলা অসহ্য গুমট্ হইয়া থাকে। একবিন্দু বাতাস বহে না। গাছের পাতাগুলি স্থির হইয়া যায়। এই সময়ে বাহিরে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলিয়া সকল স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে।"—আচ্ছা মাস্টারমশায়, আমাদের এ ছাই ইস্কুল এখনও বন্ধ হচ্ছে না কেন ?

মাষ্টার—তোরাই জানিস্ আর তোদের হেডমাষ্টার জানে।

ছেলেরা—বলেনতো মাস্টারমশায় আমরা পালাই—আপনি খালি বলে দেখুন একবার।

মাষ্টার—হ্যাঁ তোরা পালা, আর আমার সুখের চাকরিটি-ও খসে পড়ুক।

ঝানু—তবে থাক, আজ আর পড়েও কাজ নেই। আমরা চুপচাপ বসে থাকি।

মাষ্টার—তাই থাক। আর দেখ্, এদিকে লোক-টোক এলে আমায় ঠেলে জাগিয়ে দিস্, বুঝলি ?

পটলা (হঠাৎ উল্লাসের সুরে)—ওরে ঝানু, দেখ্ দেখ্ কি মজা—ঐ পাঁচিলের পর কতকগুলো কাক বসেছে, ঠিক যেন পাতপেতে নেমন্তন্ন খেতে বসে গেছে, না ?

ঝানু ও অন্যান্য বালক—তাই তো, কেন বল্ তো ?

মাষ্টার (অল্প জাগিয়া)—তাই না কি রে ? তবে আজ সন্ধ্যের দিকে ঝড় কি বৃষ্টি কিছু একটা হবেই নিশ্চয়।

পটলা—কেমন করে বুঝলেন ?

মাষ্টার—তা-ও জানিস্‌নে ? জন্তু-জানোয়ার ওরা যে ইচ্ছে করলেই জল-ঝড় আনাতে পারে। ঐ যে কাকগুলো ওখানে বসে জটলা করছে, এতক্ষণ ইন্দ্রদেবের কানে ওদের ডাক পৌঁছে গেছে, এই সন্ধ্যের মধ্যেই জল কি ঝড় পাঠিয়ে দিলেন বলে। আগে মুনিঋষিদেরও এমনি-ই শক্তি ছিল। তখন তাঁরা-ও ইচ্ছে করলেই জল-ঝড় আনাতে পারতেন—আর এখন ঘোর কলি—সে দিনও গেছে, সে মানুষও গেছে। নৈলে কি আমরা বামুন হয়ে জন্মেছি—কোথায় বনে জঙ্গলে তপস্যা করে দিন কাটাবো না ইস্কুলমাষ্টারি করতে এলুম ?

ঝানু—তা যাই হোক মাষ্টারমশাই, এটা যা বল্লেন, ভারি মজার জিনিস। আজ সন্ধ্যেবেলা দেখতে হচ্ছে কেমন জল ঝড় হয় ! (বাহিরে ছুটির ঘণ্টাধ্বনি)

ছেলেরা—বাঁচা গেল !

মাষ্টার—আঃ বাঁচলুম। (প্রস্থান)

(ইস্কুলের Boundaryর পাঁচিলের উপর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে একদল কাকএর প্রবেশ)

প্রথম কাক—আমার ডিম ফুটো থেকে সবে দুটো কচি বাচ্ছা বেরিয়েছে, তারা গরমে যেন আইঢাই করছে।

২য় কাক—পুকুরের ঠাণ্ডা জল তেতে আগুন হয়ে রয়েছে! তেষ্টায় বুক যখন টা টা করে, একটু জল মুখে দি, মনে হয় যেন বুকের জ্বালা আরো বেড়ে গেল !

তৃতীয় কাক—নাঃ, আর সহ্য হয় না।

চতুর্থ কাক—বৃষ্টি চাই, ঝড় চাই। এক ঝাপ্‌টায় এই গুমট্‌ হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া চাই—নৈলে চলবেনা !

প্রথম কাক—নৈলে পৃথিবী শুদ্ধ সবাই শুকিয়ে মরবে।

দ্বিতীয় কাক—নাও ভাই তবে সুরু কর—

গান

তেষ্টায় বুক করে টা টা।
রোদ্দুর যেন কাঠ-ফাটা।
জল খুঁজে সারা-পথ বৃথা শুধু হাঁটা।
শোন শোন দেবরাজ—
বর্ষণ দাও আজ।
ঝরে পড়ে গাছ থেকে পাতা
ঝাঁ ঝাঁ রোদে তেতে ওঠে মাথা।
চাষা-ভুষো কালিঝুলি গালি পাড়ে যা-তা।
রাখো রাখো মান রাখো
জল ঝড়ে ডাকো ডাকো
সুরু কর সুরু কর বৃষ্টির পালা—
ঝোড়ো মেঘে আনো ডেকে ঘুচে যাক জ্বালা ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য—সন্ধ্যা

(ঝান্টু, পাটলা ও হাবলা পড়িবার ঘর, অল্প দূরে সেজদা)

ঝান্টু—মাষ্টারটা তো আচ্ছা মিথ্যে কইতে পারে।

পটলা—কেমন আমাদের বোকা বুঝিয়ে দিলে দেখলি ?

হাবলা—মাষ্টারমশায়ের কথাটা শুনে তবু একটু আশ্বাস হয়েছিল। ভেবেছিলুম সন্ধ্যেবেলা একটু নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচব।

পটলা—আরে ঝড় বৃষ্টি তো দূরের কথা—এক টুকরো মেঘ পর্যন্ত আকাশে খুঁজে পাবার যো নেই !

ঝান্টু—গরমটা যেন চারদিক দিয়ে ঠেসে আসছে। আর তো টেঁকা যায় না !

হাবলা—দূর, আর পড়তে ভাল লাগছে না।

পটলা—ইচ্ছে করছে মাষ্টারমশাকে খুব একচোট শুনিয়ে দি। এমন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দরকারটা কি ছিল ? ছেলেমানুষ পেয়ে যা-তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

হাবলা—মাষ্টারমশা' এদিকে নিজেই বলেন, মিথ্যে-কথা বলা মহাপাপ—কেন, নিজের বেলা সে কথা মনে থাকেনা ?

সেজদা—ওরে কি বক্ বক্ করছিস্ ওখানে ? লেখাপড়া কি ভুলে গেলি না কি ?

ঝান্টু—এই তাতে মাথার ঘীলুগুলো পর্যন্ত ঘুলিয়ে যায়—তা লেখাপড়া !

সেজদা বকিস্‌নে পড়্ ! হ্যাঁরে, হাত-পাখাটা গেল কোথা, দেখ দিকি ?

ঝান্টু—হাত-পাখা ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

সেজদা—ঝড় কখন হল রে, স্বপ্ন দেখছিস্ না কি ?

ঝান্টু—ঝড় নিশ্চয়ই হয়েছে ; মাষ্টারমশা'র বাক্য বেদ-বাক্য !

সেজদা—হঠাৎ মাষ্টারে এত ভক্তি ?

ঝান্টু—মাষ্টারমশাই বলেছেন আজ সন্ধ্যেবেলা ঝড় হবে। এ যে মিথ্যে হবে তা অবিশ্বাস করতে পারব না।

হাবলা—সত্যি সেজদা, মাষ্টারমশা' বল্লেন, তবু কই হল না তো।

সেজদা—তোদের মাষ্টার বুঝি আজকাল খুড়ি পাততে শিখছে রে ?

হাবলা না তা কেন ? ইস্কুলের পাঁচিলে কতকগুলো কাক জমেছিল। তাই দেখে বলে দিলেন, ঝড় বৃষ্টি একেবারে নির্ঘাৎ !

সেজদা—ওঃ এই ! কিন্তু বৃষ্টি তো আজ হবেই। তবে সন্ধ্যেবেলা নয়, একটু রাত করে—ঐ শুনছিস্ না ব্যাঙ্ ডাকছে ?

ঝান্টু—এই গরমে ব্যাঙ্গুলো জল ছেড়ে বেরুল কি করে ?

সেজদা—প্রাণের দায়ে ! এই গরম আর কিছুদিন চল্‌লে যে সব ঝল্‌সে মরে যাবে।

ঝান্টু—তা খামকা ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর করে চেঁচালেই বুঝি গরম দূর হয় ?

সেজদা—তোরা শুনছিস্ ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর, আসলে ওরা ইন্দ্রদেবের কাছে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করছে।

পটলা—আরে, মাস্টারমশাও তো কাকদের বেলা তাই-ই বলেছিলেন। কই ইন্দ্রদেব তো ফিরেও চাইলেন না।

সেজদা—আহা, ইন্দ্রদেব যে ব্যাঙ্দের ভারি ভালবাসেন। ওদের কথা কোন মতেই ঠেলতে পারবেন না। দেখ্ না বৃষ্টি এল বলে !

ঝান্টু—যাই, বাইরে গিয়ে একটু ব্যাঙ্দের প্রার্থনা শুনিগে। তবু প্রাণটা একটু জুড়োবে। (একে একে সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(অন্ধকার—পুকুর-পাড়)

ভেকপতি—ওহে গাঙ্পাল, এরা কি একেবারে ডুব মারলে নাকি ?

গাঙ্পাল—আজ্ঞে না, টিফিন করতে গেছে, একটু জিরিয়ে নিঃশ্বাস নিয়ে তবে তো আসবে—সেই তখন থেকে গান গেয়ে গেয়ে বেচারাদের মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে কিনা !

ভেকপতি—আচ্ছা গাঙপাল, আমরা তো বুড়ো হয়েছি, কই আমাদের তো এখনও গান গাইতে গাইতে টিফিন করবার দরকার হয় না। মাঝে মাঝে একটু করে ঐ ঘাসের ডগা চিবিয়ে নিলেই হয়ে যায়।

গাঙপাল—ওরা ছেলে-মানুষ, তার উপর আজকালকার ছেলে—

ভেকপতি—আরে ছেলেমানুষ কি আমরাও ছিলুম না—গান গেয়ে সারারাত আনন্দে কাটিয়ে দিয়েছি, এক ফোঁটা জলও মুখে দিই নি। আজকালকার ছেলেগুলো সত্যি—একেবারে আশ্চর্য্য!—এ রকম যে দেখবো কখনও ভাবিনি।

গাঙ্‌পাল—কালে কালে ব্রহ্মাণ্ডেও পরিবর্ত্তন আসে, তা আমরা তো ব্যাঙ্!

ভেকপতি—না হে, আমি দেখছি এ যেন একটা সর্ব্বনেশে কাল এসেছে। গান গাইতে অরুচি—এ আমাদের সাতপুরুষ আগে পর্য্যন্ত কেউ কখনো শোনেনি!

গাঙ্‌পাল—আহা, অরুচি কোথায়, গাইতে গাইতে একটু টিফিন করতে গেছে বই তো নয়—এই এল বলে।

ভেকপতি—নাঃ ওদের আমার এ সব ব্যবহার ভাল বোধ হচ্ছে না। সকলে ধরে পড়ল, বড় খিদে পেয়েছে বলে—দেখলুম আর গাইতে পারছে না; মনে একটু দয়া হল—তাই ছেড়ে দিলুম। এখন দেখছি ছেড়ে না দিলেই ভাল হত।

গাঙ্‌পাল—তবে কি ওদের খেতে না দিয়ে মেরে ফেলবার সংকল্প করছেন নাকি?

ভেকপতি—না ন্য গাঙ্‌পাল, তুমি বোঝো না—ওদের এখন থেকে প্রশ্রয় দিলে শেষে কাউকেই বাগ মানানো যাবে না। আমার মামা সেদিন কি বল্লেন জানো? বল্লেন—আজকালকার ছেলেদের মুখে শোনা যাচ্ছে—ওরা নাকি মানুষ হতে চায়! ওরা মানুষের মতো লেখাপড়া করবে, মানুষের মতো কল বানিয়ে আকাশে উড়বে, দুবচ্ছরের রাস্তা দু মিনিটে হাঁটবে এই সব ব্যাপার। এ সব শুনলে কি আর আমরা বুড়োরা স্থির থাকতে পারি?

(ব্যাঙের দলের প্রবেশ)

ভেকপতি—নে গান্ ধর্। সারা রাত গাইতে হবে চীৎকার করে; এখন পেট ভরে খেয়ে এসেছিস, অমন ফিন্‌ফিনে গলায় গাইলে চলবে না। চেঁচিয়ে ইন্দ্র-দেবের ঘুম পর্য্যন্ত ছুটিয়ে দিতে হবে, বুঝলি?

১ম ব্যাঙ্—আচ্ছা সর্দ্দার, এত কষ্ট করে না খেয়ে না ঘুমিয়ে গান গেয়ে আমাদের লাভটা কি তা আজ বুঝিয়ে দাও।

ভেকপতি—লাভের খোঁজ করছিস্ ছোঁড়া —সৃষ্টি যে রোদে পুড়ে ছারখার হতে বসেছে, সেটা কি দুচোখ থাকতে দেখতে পাস্না ?

২য় ব্যাঙ্—সৃষ্টি গেল তো আমাদের কি ? আমরা থাকলেই হল।

৩য় ব্যাঙ্—আমাদের পুকুরে যথেষ্ট জল আছে—তবে মিছিমিছি চেঁচিয়ে মরি কেন ?

ভেকপতি—চুপ কর্ জ্যাঠা ? ফের যদি এমন কথা শুনি তো আস্ত রাখব না। নে, নে, আর এক মিনিট দেরী নয় সুর ধর্—

গান

দাও দাও দেবরাজ জল দাও জল দাও ;
বর্ষণ কর সুরু, নড়ন না এক পা-ও ;
রোদ্দুর তুলে নাও, দেরী আর সয় না—
আকাশেতে মেঘ ছাও, ফাঁক যেন রয় না ;
কালো মেঘ আলো ঘরে বিদ্যুৎ চমকাও—
জল দাও জল দাও।

ঢালো ঢালো জলধারা ধরণীতে ঝম্ ঝম্ ;
ঘন মেঘ-গর্জ্জনে করে তোলো গম্ গম্ ;
হানো বাজ দুর্দ্দম মনে ভয় জাগিয়ে—
কালো মেঘে হরদম্ বিশ্বটা কাঁপিয়ে ;
বর্ষার উৎসবে ধরা করো জম্ জম্—
জলধারে ঝম্ ঝম্।

হরষে, মাতিয়ে প্রাণ বরষার গান গাও ;
কণ্ঠ ভরিয়ে সবে কালো মেঘে ডাক দাও ;
ধারা জলে গা ভেজাও মনেরই আনন্দে—
প্রাণ খুলে নেয়ে নাও ভোর হতে সন্ধ্যে ;
যত খুসী দিবানিশি জলে জলে ঝাঁপ খাও...
জল দাও দেবরাজ—
অবিরল জল দাও ॥

চতুর্থ দৃশ্য

(সব .ল—হাবলাকে টানিতে টানিতে দাদামহাশয়ের প্রবেশ)

দাদামশাই—কি বল্লি তুই —বনে গিয়ে তপস্যা করবি ? পারবি থাকতে সেখানে ?

হাবলা (প্রসন্ন মুখে)—কেন পারব না ? রাক্সা-খোপা আমায় ধরে না নিয়ে এলে একবার দেখিয়ে দিতুম তপস্যা কাকে বলে।

দাদামশাই—আচ্ছা রোস্, তোকে আমি কোন বনে পাঠাই দেখ্।

(ঝান্নু ও পটলা পিছন দিক দিয়া প্রবেশ)

পটলা —হ্যাঁ ভাই সে বেশ হবে, গাছের ছাওয়ায় ছাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো, ফল-মূল কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাওয়া, আর সকালে সন্ধ্যায় ছাই মেখে ধ্যান করা—

দাদামশাই—ওরে বাসরে ! এদের'ও মুখে যে ঐ কথা ! আচ্ছা ছোঁয়াচে রোগে ধরেছে তো ? এই ঝান্নু কোথা যাচ্ছিস ?

ঝান্নু—গঙ্গা নাইতে। আর এখানকার ইস্কুল ভাল লাগছে না !

দাদামশাই—এখানকার ইস্কুল ভাল লাগছে না তো কোথাকার ইস্কুল ভাল লাগছে রে ?

পটলা —এখানকার মাষ্টারেরা হরদম মিথ্যে কথা বলে, আর যা-তা শেখায়—আমাদের বরং একটা তপোবন, আর কোন মুনিঋষিকে যদি গুরু করে দিতে পারো তা হলে আমরা তার কাছে বিদ্যাচর্চ্চা করতে পারি।

দাদামশাই—তারই বন্দোবস্ত করছি,। এই বাঞ্ছা— (বাঞ্ছার প্রবেশ)

বাঞ্ছা—আজ্ঞে !

দাদামশাই—সেজবাবুকে ডেকে আন্। (সেজদা'র প্রবেশ)

দাদামশাই—ওহে ভায়া, এঁদের তপোবনে যাবার বড় সখ হয়েছে আমার ঐ কাঠঘরটা খুলে তার ভিতর এঁদের দিন দুয়েকের নির্ব্বাসন দিয়ে তপোবন শিক্ষা সুরু করে দাও দেখি হে।

সেজদা—কাঠঘর ? সে যে বড় অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে হয়ে রয়েছে।

দাদামশাই—আরে তাই জন্যেই তো বলছি। অন্ধকার না হলে কি আর তপস্যার স্ফূর্ত্তি হয় ? আর দেখ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এঁদের তপোবনের মায়া কাটে কেউ এক বিন্দু জলও যেন ওদিকে দিয়ে না যায়। (সেজদা ও ছেলেদের প্রস্থান)

(বৃদ্ধ গোঁসাইমহাশয়ের প্রবেশ)

দাদামশাই—ও হে গোঁসাই, আজকালকার এই ছেলেগুলো কি হয়েছে বল দেখি ? তোমার ঘরে তো ভাই ছেলেপিলের বালাই নেই, এ সব হাঙ্গামা পোয়াতেও হয় না।

গোঁসাই—কেন কেন ব্যাপার কি ?

দাদামশাই—বড় ভয়ানক ব্যাপার—আমরা যে বয়সে একেবারে up-to-date হয়ে উঠেছিলুম এখনকার এই ছেলেগুলোর বয়েস তার দ্বিগুণ হতে চল্লো—এখন বলে কি না লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বনে গিয়ে তপস্যা করবে !

গোঁসাই—আচ্ছা ভাই, আমরা তো কখনো লেখা-পড়া ছেড়ে দেবার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারিনি ; আর এরা কি তাই কাজে করতে চল্লো ?

দাদামশাই (নিঃশ্বাস ছাড়িয়া)—হায় রে ! আমাদের সে আমোল আমাদের বয়সের সঙ্গেই গেছে ! মনে আছে, লেখাপড়া শেখার কি উৎসাহটাই ছিল ? আর এখনকার ছেলেদের ঝোঁক কি না বন-জঙ্গলে তপস্যার উপর ! ভাবলেও গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে ! এই সব ছেকরাদের উপর যখন পৃথিবী চালানোর ভার পড়বে—তখন স্কন্ধরা কি সে ভার সইতে পারবেন ভাবছ ? (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(ভেকপতি ও গাঙ্‌পাল)

ভেকপতি—আচ্ছা গাঙ্‌পাল, এ রকম আশ্চর্য্য কাণ্ড তো জীবনে কখনো দেখিনি। সারাটা রাতের খাওয়া কি একেবারেই বৃথা যাবে ; এক বিন্দুও বৃষ্টি পাবো না ?

গাঙ্‌পাল—ইন্দ্রদেবের এ অন্যায়।

ভেকপতি—অন্যায় বলে অন্যায়, ভীষণ অন্যায়—আদিকাল থেকে যে নিয়ম চিরকাল চলে আসছে আজ ইন্দ্রদেব তা ভঙ্গ করেন কোন সাহসে ? ছেলেছোকরাই বা সব গেল কোথা ?

গাঙ্‌পাল —আজ্ঞে তারা সারারাত গান গেয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই পুকুর তলায় একটু ঘুমুতে গেছে।

ভেকপতি —এই কি ঘুমোবার সময় হল—জাগিয়ে দাও তাদের, কেউ এখন ঘুমোতে পাবে না। (গাঙ্‌পালের প্রস্থান)

(একদল কাক-এর প্রবেশ—কাক দেখিয়া ভেকপতি ভয়ে পলায়নোদ্যত)

কাকেরা—ভয় নেই, ভয় নেই ব্যাঙমশাই, আমরা ব্যাঙ খাওয়া ত্যাগ করেছি—ব্যাঙ আমাদের মুখে বিস্বাদ লাগছে।

ভেকপতি—তাহলে কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন?

১ম কাক—আপনার বোধ হয় জানতে বাকী নেই কাল সারারাত আপনারা ইন্দ্রদেবের কাছে জলের জন্য প্রার্থনা করেছেন কিন্তু এখনও এক ফোঁটা বর্ষণ হয় নি।

ভেকপতি —হাঁ তা জানতে পারছি বটে।

১ম কাক—কালকে আমাদেরও একটা ঠিক ঐ রকমেই দুর্ঘটনা হয়ে গেছে।

ভেকপতি—শুনি শুনি কি রকম?

১ম কাক—শুনুন তবে। এই অসহ্য গরম দেখে কাল আমরা আপনাদেরই মতো ইন্দ্রদেবের কাছে বৃষ্টির জন্যে আবেদন করেছিলুম। এত কাল কোন দিন ত আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নি এ কথা আপনারাও তো জানেন, কিন্তু কাল ইন্দ্রদেব আমাদের প্রত্যাখ্যান করছেন। কিন্তু কেন যে করেছেন তা বুঝে উঠতে পারছি না।

ভেকপতি—ও, তাহলে সর্ব্বত্রই এই রকম কাণ্ড ঘটছে?

(ময়ূরের প্রবেশ)

ময়ূর—এই যে আপনারা এইখানে। আচ্ছা ব্যাঙ্‌মশাই, কাল সারা রাত তো আপনারা গান গেয়েছেন শুনতে পেলুম—কিন্তু বৃষ্টি কোথা? দেখুন, আমিও কাল সারা-টা বিকেল প্যাখম তুলে মেঘ বৃষ্টিকে ডাক দিয়েছি—নেচে নেচে আমার কোমর ব্যথা হয়ে গেল, তবু এক টুকরো ও মেঘ এল না। এ কি কাণ্ড মশাই?

কাক—দেখলেন ব্যাঙ মশাই, চারিদিকেই এই ব্যাপার।

(এক দল পিঁপড়ের প্রবেশ)

ভেকপতি—আসুন, আসুন, আপনাদের মুখ যে বড় শুকনো দেখি ?

১ম পিঁপড়ে—দুঃখের কথা আর বলবেন না। এমন যে কাণ্ড ঘটবে—এ জানলে কি আর এ কার্য্যে এগতুম ? হায় হায়, পিঁপড়ে বংশে এ কলঙ্ক আর মোছবার নয় ! ব্যাপারটা অতি সাধারণ, কিন্তু তার ফল যা দাঁড়িয়েছে ভাবলে গা পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে ! শুনুন বলি। প্রখর রোদের তাপে সৃষ্টি লয় হয় দেখে কাল আমরা বৃষ্টি আনিয়ে সৃষ্টি রক্ষা করবার অভিপ্রায়ে দল বেঁধে বেরিয়েছিলুম স্বর্গের দিকে—আপনারাও বোধ হয় সন্ধ্যা বেলা অনেকেই দেখতে পেয়েছিলেন।

ময়ূর—আমি নিজ চক্ষে দেখিনি বটে—কিন্তু মানুষদের একটি ছোট্ট খোকা পড়ছিল শুনছিলুম—"পিপিড়ার ডানা ওঠে মরিবার তরে।"

২য় পিঁপড়ে—কি আশ্চর্য্য আপনি কি স্বকর্ণে শুনেছেন না কি ?

ময়ূর—একেবারে নিজের কাণ দিয়ে।

২য় পিঁপড়ে—কই এর আগে তো এমন ছড়া মানুষের ঘরে কখনো শুনিনি। এতদিন শুনেছি "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" "উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার"

৩য় পিঁপড়ে—আজকাল গণকঠাকুরেরা কবিতা লিখতে আরম্ভ করছেন বোধ হয়। পিঁপড়ের ভবিষ্যৎ মৃত্যুর খবর ছড়া গেঁথে সবাইকে শোনাচ্ছেন !

কাক—কথায় কথায় আসল কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে—তারপর কি হল শুনি।

১ম পিঁপড়ে—শুনুন তারপর। আমরা স্বর্গপুরীতে দলবল নিয়ে পৌঁছলুম—কিন্তু যেই ভিতরে ঢুকতে যাবো স্বর্গ প্রহরী ঝন্‌ঝন্ করে সোণার ফটক বন্ধ করে দিলে। এরকম আশ্চর্য্য কাণ্ড যা গল্পেও কখনো শুনিনি—তা কাল চোখ দিয়ে দেখলুম।

ভেকপতি—এত আস্পর্দ্ধা হয়েছে প্রহরীর ? প্রতিকারের ব্যবস্থা সুরু করা যাক্—আর কেন ?

১ম পিঁপড়ে—শুধু এর প্রতিকার নয়—প্রতিকার করবার আরো ঢের জিনিস আছে। আমাদের ইন্দ্রদেবের সঙ্গে যখন দেখা হল না আমরা ধীরে ধীরে ফিরলুম পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর কাছাকাছি পৌঁছে আমাদের ছেলে ছোকরার দলে ভারি

এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। মানুষদের ঘরে ঘরে নানা রকম আলো দেখে ছেলেরা যেন তার মোহে ক্ষেপে উঠল। আমরা যারা বয়সে একটু ভারি ছিলুম বল্লুম—"ওরে, এখনও চোখ বুঁজে অন্য দিকে ফিরে চল্—ও আলোর মোহ ভয়ানক মোহ!" কিন্তু তারা কেউ শুনলে না—পবন বেগে সবাই আলোর দিকে ছুট দিলে। কেউ তাদের রাখতে পারলে না। তারপর, সেই আলোর মধ্যে সব ক'টি পিঁপড়ে পুড়ে মরে গেল, একটিও ফিরে আসতে পারে নি! আমাদের ঘরে এখন যথেষ্ট ছোট ছেলেপিলে আছে—তাদেরও সবার মনে যদি এমন পুড়ে মরবার সখ চাপে, তাহলে তো কদিনের মধ্যে পিঁপড়ের বংশই পাবে লোপ। (চাতকের প্রবেশ)

চাতক—দেখুন ভদ্রমহোদয়রা, আপনারা বেঁচে থাকতে আমরা যে স্ফটিক জলের অভাবে মারা যাবো—এর চেয়ে আত্মহত্যা করে মরা ভালো।

ব্যাঙ্—আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; সব বৃথা হয়েছে।

পিঁপড়ে—এ সবই ইন্দ্রদেবের কারসাজি।

চাতক—হায় হায়, ফটিক জল ফটিক জল, করতে করতে বাচ্ছাগুলোর যখন চোখ উল্টে গেল তখনই আমি বুঝেছি, একটা না একটা কাণ্ড ঘটেছেই। এইবার আমাদেরও প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে কে জানে? এত গোলমাল অথচ যার জন্যে এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি তার আসল কারণটা কি আপনারা কেউ বার করতে পারছেন না?

ময়ূর—আমার তো মনে হয় এই গরমে দেবতারা সব ঘর দোর বন্ধ করে ঘুম দিচ্ছেন—পশুপক্ষীর ডাক বোধ হয় আর কাণে পৌঁচ্ছেনা!

ভেকপতি—কিংবা আর একটা কাণ্ডও ঘটতে পারে—দুর্ব্বাসা মুনি হয়ত কারো উপর চটে-মটে সারা পৃথিবীর উপরেই অভিশাপ দিয়ে বসে আছেন—তাঁর ক্রোধ শান্ত না হলে তো আর বৃষ্টি দেবার যো নেই!

পিঁপড়ে—না না, আমার মনে হয় স্বর্গ পুরীতে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধু টুদ্ধু একটা কিছু লেগেছে। তাই আমরা যখন স্বর্গের দরজায় পৌঁছলুম আমাদের শত্রু সৈন্য ভেবেই প্রহরী তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিলে!

কাক—আমার মনে হয় এ ঐ পাজি মানুষগুলোর কাজ। ওদের জ্বালায় আজকাল

কিছুই নেই। ডাঙার মানুষ, আজকাল কি এক কল বানিয়ে আকাশে উড়ছে, আমাদের প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত। হয় তো ব্যাটারা আকাশে কি এক আশ্চর্য্য জাল টাঙিয়ে দিয়েছে, ইন্দ্রদেবের বৃষ্টি এসে আর এখানে পৌঁচচ্ছেনা—সব জড় হচ্ছে ওদের নিজেদের চৌবাচ্ছায়। বলা যায় না ত।

২য় কাক—তাহলে এটা বেশ দেখা যাচ্ছে যে কাল থেকে জীব-জন্তু সকলের ঘরেই কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। এবং কাকদের মুখে ব্যাঙের মাংস বিস্বাদ হয়ে উঠেছে।

ভেকপতি—ব্যাঙেরাও সারারাত বৃষ্টি চেয়ে চেয়ে কিছুই পায়নি। এবং ব্যাঙের ছেলে ছোকরাদের গান গাইতে অরুচি দেখা যাচ্ছে।

ময়ূর—ময়ূরদের নাচতে নাচতে গা ব্যাথা হয়ে গেলেও একবিন্দু মেঘ আসেনা।

২য় পিঁপড়ে—পিঁপড়েদের সামনে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

৩য় পিঁপড়ে—এবং ছেলে-ছোকরাদের আগুনে পোড়াবার সখ দেখা দিয়েছে।

২য় কাক—এবং মানুষদের ছেলেরা নতুন ধরনের ছড়া আবৃত্তি করছেন।

পিঁপড়ে—স্বর্গে যুদ্ধই বেধে থাকুক কি মানুষরা মায়াজালই টাঙিয়ে থাকুক, মোটের উপড় একটা কিছু করতেই হবে।

ভেকপতি—আমি বলি, আপনারা এক কাজ করুন। আপনারা যারা উড়তে পারেন একবার বিষ্ণুলোকে গিয়ে গড়ুরদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন—দেখুন তিনি যদি কিছু করতে পারেন।

পিঁপড়ে—এ মৎলবটা মন্দ না। এ ছাড়া এখন তো দেখ্‌ছি কোন উপায়ই নেই।

ভেকপতি—তবে বেরিয়ে পড়ুন আপনারা—প্রকাণ্ড দল নিয়ে হাজির হন আপনারা গড়ুর-দেবের কাছে—দেখুন কি হয়!

কাক—চলুন তবে আয়োজন সুরু করা যাক্। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(সেজদা, ঝানু, পটলা ও হাবলার প্রবেশ।)

সেজদা—আয় আয়, তাড়াতাড়ি আয়। দাদামশা এখন ঘুমচ্ছে। এই এবেলাই

ছুটোছুটি করে নে। দাদামশা জাগবার আগেই আবার তোদের ক্যাশঘরে ঢুকতে হবে।

হাব্‌লা—কেন সেজদা, ক্যাশ ঘরে তো মন্দ লাগছেনা। মনে হচ্ছে প্রহ্লাদকে যেমন হিরণ্যকশিপু শাস্তি দিয়েছিলেন, আমাদেরও তেম্‌নিই শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

পটলা—হ্যাঁ সেজদা, এই গরমে সকলেরই কি বড় কষ্ট হচ্ছে ?

সেজদা – তা আর হচ্ছে না ?

পটলা—কষ্ট হচ্ছে—তবুও মানুষ কেন কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করে না ?

সেজদা—কেমন করে করবে ?

পটলা – কেন বৃষ্টি আনিবে ?

সেজদা – কাক, ব্যাঙ্‌ ওরাই এত ডেকে বৃষ্টি আনাতে পারলে না, তা মানুষ আনবে

ঝানু—কাক ব্যাঙ এরা কখ্‌খোনো এক মনে বৃষ্টি চায়নি।

পটলা—আর তুমি কি ভাবো, যা কাক-ব্যাঙ পারে না মানুষেও তা পারবে না ?

হাবলা—আচ্ছা আমরা একমনে ইন্দ্রদেবের কাছে বৃষ্টি চাই, দেখি কি হয়।

বালকেরা (হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিয়া অবশেষে গান)

আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দিব মেনে।
আয় বৃষ্টি ছেপে
ধান দিব মেপে।

আয় বৃষ্টি ঝেঁকে
আকাশ খানা ঢেকে।

(গাহিতে গাহিতে মাঠের দিকে প্রস্থান)

(ভেকপতির প্রবেশ)

ভেকপতি—হুঁ, ঐ দিকটায় একটু যেন মেঘ দেখা দিয়েছে—গড়ুড়দেবের কাছে এরা গিয়ে কাজ হল দেখছি। হয়ত পাখীর দল এতক্ষণ গড়ুর-দেবকে সন্তুষ্ট করে ইন্দ্ররাজকে ঠাণ্ডা করে মেঘ সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী মুখো ফিরছেন। (গাঙ্‌পালের প্রবেশ)—তোমাকে এই খানিক আগে খুঁজছিলুম গাঙ্‌পাল—কোথায় গিয়েছিলে বল তো ?

গাঙ্‌পাল – এদিক পানে আসছিলুম, পথে আমাদের বক ধার্ম্মিকের সঙ্গে দেখা হল – তাই আলাপ করছিলুম।

ভেকপতি—বক ধার্ম্মিক কি বিষ্ণুলোকে যান্ নি ?

গাঙ্‌পাল—না, তিনি কেমন করে যাবেন ? বয়েস হয়েছে অনেক, তার উপর পা হয়েছে খোঁড়া—খানিক পথ গিয়ে আর পারেন নি, ফিরে এসেছেন ।

ভেকপতি—কখন এঁরা ফিরবেন কিছু শুনলে ?

গাঙ্‌পাল—না, তা তো কিছুই শুনলুম না। তবে বক ধার্ম্মিক যে খবরটি দিলেন, সেটিও বড় সুখের নয় ।

ভেকপতি—আঃ, কি আবার খবর নিয়ে এলে হে, একে তো মন খারাপ।

গাঙ্‌পাল—তবে না হয় না-ই বল্লেম ।

ভেকপতি—না হে, না বল। আমি কি বলতে মানা করছি না কি ?

গাঙ্‌পাল—ঘটনা হচ্ছে এই যে আমরা যত বড় দলটা গড়ুরদেবের কাছে পাঠাবো মনে করেছিলুম—তত বড় দল হয়ে ওঠেনি । কারণ দলের মধ্যে ছোকরারা একেবারেই নেই।

ভেকপতি—কেন কে তাদের বাদ দিলে ?

গাঙ্‌পাল—না না বাদ তো কেউ দেয়নি, তারা নিজেরাই কেউ দলে যোগ দিলেনা।

ভেকপতি—ঈস্, ছেলেদের যে বড় বাড় হয়েছে দেখছি। এর কি কোন প্রতিকার হল না, গাঙ্‌পাল ?

গাঙ্‌পাল—আজ্ঞে কি করে হবে—ছেলের দল, সে একেবারে অগাধ। তাদের ক্যাপালে কি রক্ষে আছে ? তারা বল্লে—"ইন্দ্রদেব যখন অপমানই করছেন, তখন গড়ুরই হোক আর যেই হোক, কারো কাছে যেচে যাবার দরকার নেই।"

ভেকপতি—ওঃ ছেলেগুলোর বড় মান-অপমানের জ্ঞান হয়েছে দেখছি। জানো গাঙ্‌পাল, আজ দুপুরে মামার বাড়ী গিয়েছিলুম. সেখানে শুনে এলুম, সবার ঘরেই ঐ ছেলের দল যা তা কাণ্ড বাধাচ্ছে—তারা বলে কি না আজকালকার দিনে মানুষের মতো বিদ্যেবুদ্ধির চর্চ্চা না করলে টিকে থাকবার যো নেই, বুদ্ধিটুকুও লোপ পাবার যো হল। হ্যাঁ হে আমাদের ছেলেরা সেই তখন থেকে কোথায় গেছে বলতে পারো ?

গাঙ্‌পাল—তারা গেছে শ্যাওড়াতলায়, শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করতে

ভেকপতি—কিসের পরামর্শ ?

গাঙ্পাল — ওরা একটা পাঠশালা খুলবে কি না তাই।

ভেকপতি – ঐ রে, এদের-ও ঐ ভূতে পেয়েছে নাকি? এতক্ষণ বলোনি আমায় গাঙ্পাল? কোথায় গেছে বল্লে? এখান থেকে কতদূর?

গাঙ্পাল—ওঃ সে অনেক দূর।

ভেকপতি—আসুক ফিরে ব্যাটারা, পাঠশালার শ্রাদ্ধ করছি আজ, রোসো না পাজিনাচ্ছারেরা পাঠশালায় পড়বে, টেরা বুরিয়ে বাবু সাজবে, কিছু বাকী রাখবে না।

গাঙ্পাল—মাথা ঠাণ্ডা করুন, মাথা ঠাণ্ডা করুন সর্দ্দার—ঐ দেখুন বৃষ্টি এলো।

ভেকপতি—(আনন্দে)—তাই তো হে গাঙ্পাল – ঐ যে ঝাপ্সা হয়ে আসছে ওদিকের মাঠ! নিশ্চয় গড়ুরদেব এতক্ষণ বিষ্ণুকে পিঠে নিয়ে অসুরদের যুদ্ধ শান্ত করে দিয়েছেন।

গাঙ্পাল — মানুষরা দেখে ভয়ে মায়াজাল গুটিয়ে নিয়েছে এতক্ষণ।

(ঝাঁদু, পটলা ও হাবলার প্রবেশ)

গান

আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দিব মেনে।
আয় বৃষ্টি ছেপে
ধান দিব মেপে।

আয় বৃষ্টি ঝেঁকে
আকাশ খানা ঢেকে।

(গাহিতে গাহিতে বাড়ীর দিকে প্রস্থান)

ভেকপতি – কি আশ্চর্য্য! মানুষের এই ছেলেগুলোই কি বৃষ্টি ডেকে আনলে না কি? এর আগে তো এ রকম ছড়া মানুষের ঘরে কখনো শুনিনি, এ যে রীতিমত বৃষ্টির মন্ত্র দেখছি।

গাঙ্পাল—আমাদের পাখার দলেরও তো কোন চিহ্ন দেখছি না, তাহলেও না হয় বুঝতুম তারা-ই বৃষ্টিটা এগিয়ে এনেছে!

ভেকপতি—গাঙ্পাল এ বৃষ্টিতে আমার আনন্দ হচ্ছে না – হায়, হায়, ব্যাঙ-কাক-ময়ূর—এদের কাজ কিনা ইন্দ্রদেব মানুষের হাতে তুলে দিলেন? যত সব হল ঐ

ছেলে ছোকরাদের জন্যে। ধর্ম্মে কর্ম্মে মন নেই, দিনরাত যত অনাচার—এতে কি ইন্দ্রদেব তুষ্ট থাকেন? অবশেষে মানুষের দেওয়া জলে স্নান করতে হল!

(কাক, ময়ূর, পিঁপড়ে ইত্যাদি দলবলের প্রবেশ)

ভেকপতি—আসুন, আসুন—এ বৃষ্টিটা আপনারাই তাহলে এনেছেন?

কাক—মোটেই নয়। আমরা উল্টো ভাবছিলুম, আপনারা ব্যাঙরাই এ বৃষ্টি এনেছেন বুঝি।

ভেকপতি—কেন, কেন, কি হল?

কাক—গড়ুরদেব অনেক সাধাসাধির পর এক মিনিটের বেশী আমাদের সঙ্গে কথা কননি।

ভেকপতি—অর্থাৎ?

কাক—গড়ুরদেব বল্লেন, তিনি যে ঐ এক মিনিট দেখা দিয়েছেন, তাও নেহাৎই দয়া করে। এর পর চার লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসরের মধ্যে কোন পশুপক্ষী যেন কোন দেবতার সঙ্গেই জীবন্তে সাক্ষাৎ করতে না যায়—দেখা মিলবে না।

ভেকপতি—মানে?

কাক—মানে আর কি—গড়ুরদেব আমাদের জানিয়ে দিলেন, গত কাল থেকে পশু-পক্ষীর জগতে কলিযুগের আরম্ভ হয়েছে—শেষ হবে চারলক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর পরে!

গাভপাল—তাহলে স্বর্গে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধা, মানুষের মায়াজাল বিস্তার, করা আর দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপ, এগুলো সবই মিথ্যে?

কাক—সব।

ভেকপতি—তাই বুঝি এত কাণ্ড করেও যে বৃষ্টি আমরা আনতে পারলুম না, মানুষের তিনটে খোকা ডাক দিতে না দিতেই ঝাঁ করে এসে গেল?

কাক—নিজের চক্ষেই তো দেখেছেন? এর পর আর অবিশ্বাস কোথা?

পিঁপড়ে—চলুন তবে আমরা গিয়ে মানুষদের পাঠশালা, ঘর বাড়ী, কল কব্জা দখল করতে-করতে কলিযুগকে বরণ করে নি গে!

কাক—আর মানুষদের পাঠিয়ে দেওয়া যাক বনে জঙ্গলে, গাছে আগাছায়, কি বলেন?

ভেকপতি—চলুন। (প্রস্থান)

(ঝান্টু, পটলা ও হাবলার প্রবেশ)

ঝান্টু—উঃ, অনেক কষ্টে ক্যাশঘরের আলমারি থেকে পুরোনো পাঁজিটা পেয়েছি।

পটলা—কি লিখেছে—দেখ্ দেখ।

ঝান্টু—এই যে এই খানে লিখেছে আর ২২২৬৮ বৎসর পরে অর্থাৎ চার লক্ষ ছ হাজার নশো বাহাত্তর সালে কলিযুগের শেষ বৎসর! ভুস্তোর এটা কি সাল তাই-ই তো মনে নেই।

পটলা—আহা, এ সময় আবার সাল কে মনে রাখতে গেছে। বরং খৃষ্টাব্দ বলো তো বলে দিতে পারি!

ঝান্টু—আরে দূর—খৃষ্টাব্দ নিয়ে খৃষ্টানের কারবার করে, এ পবিত্র পাঁজির হিসেবের মধ্যে খৃষ্টাব্দ ঢোকালে কত বড় পাপ তা জানিস্?

হাব্লা—আচ্ছা, তোমরা থামো দেখি, আমি হিসেব করে বার করছি। (হিসাবে রত),

পটলা—ততক্ষণে দেখতো কোন মাসের কোন তারিখে কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ আরম্ভ হবে লিখছে?

ঝান্টু—সেটা তো লিখছে না—সেটা দেবতারাই ঠিক করে দেবেন বোধ হয়।

হাবলা—আমার হিসেবের উপর যদিও আমার নিজেরই খুব বেশী বিশ্বাস নেই, তবুও বলতে পারি এইটেই চারলক্ষ ছ হাজার নশো বাহাত্তর সাল। আচ্ছা, দাদামশায়রা এটাও খোঁজ রাখেন না যে কলিযুগে কেটে গেল কি সত্যযুগ লেখাপড়ার যুগ কেটে গেল কি তপস্যার কাল এলো? আর মিছি মিছি আমরা পাই শাস্তি?

ঝান্টু—আরে ওঁদের কি আর আমাদের পুরোনো জ্যোতিষদের কথায় বিশ্বাস আছে? ওঁদেরই জন্যে তো আজকাল পাঁজি লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। এমন মূল্যবান পাঁজিটা কোথায় পড়ে ছিল স্বচক্ষে দেখলি তো?

পটলা—আরে আজ ডাকতে না ডাকতেই যখন বৃষ্টি এসে গেছে, এ সত্যযুগ না হয়ে যায় না!

হাবলা—চল্ এই পাঁজিশুদ্ধু নিয়ে দাদামশায়ের দরবারে হাজির হওয়া যাক্।

ঝান্টু—চল্ চল্ চারিদিকে খবর রটাইগে, কলিকাল আর নেই! (প্রস্থান)

(ছাতা মাথায় বাবু ও খবরের কাগজওয়ালার দুই দিক দিয়া প্রবেশ)

বাবু—ও হে আজকের "ঘোর কলি" কাগজটা দেখি?

কাগজওয়ালা - আজ্ঞে সে কাগজ ফেল মেরেছে, আর বার হবে না।

বাবু—সে কি হে, দিব্যি বাজারে চলছিল তো, হঠাৎ ফেল মারলো কি করে?

কাগজওয়ালা—আজ্ঞে দৈবের কথা কি বলা যায়? 'আদিযুগ' কাগজ আছে নেবেন? নতুন কাগজ?

বাবু—দুত্তোর "আদি যুগ"! "ঘোর কলিতে" আমার লেখাটা বার হবার কথা ছিল। পুরানো জ্যোতিষদের গালাগালি দিয়ে অমন লেখাটা—(প্রস্থান)

কাগজওয়ালা—আ—দি—যু—গ

খবরের কাগজ—ক—লি—কা—টা!

যবনিকা

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

হুডিনীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা

হুডিনীর নাম তোমরা অনেকেই শোন নি। কিন্তু ইউরোপে ও আমেরিকায় সকলেই তাঁর নাম জানে। তার মত যাদুকর এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মায় নাই। তোমরা তো নানা রকম ম্যাজিকের খেলা দেখেছ এবং দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়েছ। কিন্তু হুডিনী যে সমস্ত অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কাজ করেছেন তা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা হুডিনীর এই সব অদ্ভুত ব্যাপার দেখে তাঁকে নানা ভাবে পরীক্ষা করেছেন যদি হুডিনীর চালাকীগুলো ধরে ফেলতে পারেন। কিন্তু তাদের চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হয়েছে।

গত বৎসর হুডিনীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর এই সকল অমানুষিক ব্যাপারের কোন কারণ তিনি কাউকে বলে যান নি। সেই জন্যে তাঁর সমস্ত জীবনটা সকলের কাছে অজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা এখন বলছেন যে তাঁর এই ম্যাজিক বিদ্যার সঙ্গে ভৌতিক বিদ্যার যোগ ছিল। তা না-হলে এই সকল কাণ্ড কোন জ্যান্ত মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। আমরা এখানে হুডিনীর কতকগুলো অদ্ভুত ব্যাপারের খবর দেব।



হুডিনীকে চেয়ারের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে কিন্তু অনায়াসে দড়ী খুলে তিনি বেরিয়ে আসছেন

হুডিনী একবার হল্যাণ্ডে খেলা দেখাতে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শক্ত ও ভাল চুবড়ী হল্যাণ্ডে তৈরী হয়। হুডিনীকে জব্দ করবার জন্যে হল্যাণ্ডের সব চুবড়ীওয়ালা তাঁকে দাঁড় করিয়ে তাঁর চারদিকে খুব শক্ত চুবড়া তৈরী করে দিল। এ রকম শক্ত চুবড়ী তারা জীবনে তৈরী করে নি। কিন্তু আশ্চর্য্য! হুডিনী অনায়াসে এই বন্ধ চুবড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর তারা ফের তাঁকে একটা কাগজের ঠোঙ্গার মধ্যে পুরে ফেলল, কিন্তু কাগজ না ছিঁড়ে অনায়াসে হুডিনী বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ক্যালিফোর্ণিয়ায় তাঁকে ছয় ফিট মাটির নিচে একবার পুঁতে ফেলা হয়েছিল। তিনি অতি সহজেই মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন। একবার তাঁর চারদিকে

জল জমিয়ে বরফ করে তাঁকে বরফের মধ্যে জমিয়ে ফেলা হয়েছিল, কিছুক্ষণ পরে বরফের এক টুকরো না ভেঙে তিনি বেরিয়ে এলেন! একবার তাঁকে হাতে পায়ে হাত কড়া দিয়ে শীত কালে বরফের নদীর ঠাণ্ডা জলে ব্রীজের উপর থেকে ফেলে দেওয়া হ'ল— সেই জল এতো ঠাণ্ডা যে একটু থাকলেই সমস্ত শরীর অবশ হয়ে যায়। কিন্তু এই জলের মধ্যে পড়েও হুডিনী হাত ও পা কড়া থেকে অনায়াসে খুলে তীরে উঠে এলেন। আর একবার একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে কাঁটা মেরে বেশ ভাল করে বন্ধ করে তাঁকে নিউ ইয়র্কের একটা নদীতে ফেলে দেওয়া হ'ল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তিনি নদী ও বাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন। সাইবিরিয়াতে যে গাড়ী করে কয়েদীদের নিয়ে যাওয়া হয়, সেই গাড়ীর মধ্যে তাঁকে একবার বন্ধ করা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরে রাখা গেল না।



অদ্ভুত যাদুকর হুডিনী

ব্রিস্টল সহরে তিনি এক অদ্ভুত খেলা দেখান, সেটা আমরা এখানে বলছি; ব্রিস্টল সহরে ভাল ষ্টীলট্রাঙ্ক তৈরীর জন্যে বিখ্যাত। সেখানকার বাক্সওয়ালারা হুডিনীর জন্যে খুব একটা শক্ত বাক্স তৈরী করে ছিল। বাক্সটা এক ইঞ্চী পুরু ষ্টীল দিয়ে তৈরী। তারপর চারদিকে শক্ত লোহার

পাত ও কাঁটা। বাতাস ঢুকবার জন্যে কেবল দুটো ছিদ্র ছিল। এমন মজবুত বাক্স তারা আর কখনও তৈরী করেনি।

থিয়েটারে স্টেজের উপর হুডিনীকে এই বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে বন্ধ করা হ'ল। বাক্স বন্ধ করে চার দিকে কাঁটা ও তার দিয়ে জড়ান হল। এবং খুব মোটা দড়ি দিয়ে তিন জন লোক বাক্সটা বেঁধে দিল।

৯৫ সেকেণ্ডের পর ঘর্ম্মাক্ত অবস্থায় ও শত ছিন্ন শার্ট গায়ে হুডিনী সমস্ত লোকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাক্স ও দড়ি যেমন অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় আছে।

জলার পেত্নী

যতীন বাবুর শেষ কথা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেওয়ানজী ও তাঁর স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন। অপূর্ব্ব তাঁদের সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তিনি বল্লেন - হেরম্বর কোনো অনিষ্ট হবে না। যাতে সে নিরাপদে বাড়ীতে এসে তার বাপ মায়ের কাছে থাকতে পারে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন বল্লেন।

দেওয়ানজীর কথা শুনতে শুনতে যে কতক্ষণ কেটে গিয়েছে আমরা তা বুঝতেই পারি নি। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি যে, জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে আলো দেখা যাচ্ছে। সকাল হয়ে যেতেই আমরা দেওয়ানজীর ঘর থেকে উঠে অপূর্ব্ববাবুর ঘরে এলুম। আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেছিলুম। অপূর্ব্ববাবুকে বললুম— আজ রাত্রে আমায় জলার মধ্যে কাটাতে হবে। হয়-তো দু-তিন দিন এখানে ফিরতে পারব না। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

অপূর্ব্ববাবু জিজ্ঞাসা করলেন হঠাৎ আজকেই আপনার জলার মধ্যে কি দরকার পড়ল ?

আমি বল্লুম— হেরম্বর সঙ্গে দেখা করতে।

অপূর্ব্ববাবু আমার কথা শুনে গুম্ হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ সেই ভাবে কাটবার পর বল্লেন—দেখুন যতীনবাবু, আমি আপনাকে নিজের ভাইয়ের মতন দেখি। আপনাকে একটা কথা বল্‌ব ?

—বলুন।

অপূর্ব্ববাবু বল্লেন—দেখুন হেরম্বর অনিষ্ট হয় এমন কোন কাজ করবেন না। সে বেচারা প্রাণের ভয়ে জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার ওপরে আমি তার বাপমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আছি যে তার কোন অনিষ্ট হয় এমন কাজ করব না।

আমি বল্লুম—দেখুন অপূর্ব্ববাবু আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে জলার ঐ রহস্য ভেদ করা। শুধু তাই নয়, আমাদের বিশ্বাস যে ঐখানে আপনার বিরুদ্ধে মস্ত একটা ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠ্‌ছে। আমরা যদি এ রহস্য ভেদ করতে পারি তা হলে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে যে লিপ্ত থাকবে সেই বিপদে পড়্‌বে।

অপূর্ব্ববাবু বল্লেন—তবুও আমি যখন হেরম্বর বাপমাকে আশ্বাস দিয়েছি তখন আমার প্রাণ যাক্—আপনাদের ও রহস্য ভেদ করে দরকার নেই।

আমি অপূর্ব্ববাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লুম—এরি মধ্যে অত বিচলিত হবেন না। আগে রহস্য ভেদই হোক্। আমার বিশ্বাস যে হেরম্ব এই রহস্যের মধ্যে তেমন ভাবে লিপ্ত নেই। এবং আমার আরও বিশ্বাস কি জানেন ?

অপূর্ব্ববাবু বল্লেন—কি বলুন তো ?

—আমার বিশ্বাস যে আপনার ঠাকুরদাদা হেরম্বকে দূরে রাখবার জন্য একটা মিথ্যে কথা বলে ভয় দেখিয়ে এত দিন তাকে এই কষ্ট দিচ্ছেন।

অপূর্ব্ববাবু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—এ রকম বিশ্বাস আপনার কেন হল বলুন তো ?

আমি বল্লুম—এ রকম বিশ্বাস কেন হল সে কথা পরে বল্‌ব। এখন আপনাকে গুটি কতক কথা বলি শুনুন। আপনি আজই কলকাতায় জীবানন্দবাবুকে একখানা তার কোরে দিন যে এখুনি যেন তিনি কালাগ্রামে চলে আসেন। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে যতদিন আমি না আসি ততদিন বাড়ী থেকে কোথাও যাবেন না।

অপূর্ব্ববাবু বল্লেন—কিন্তু কাল সন্ধ্যায় সময় সদাশিববাবুর বাড়ীতে যে আমায় যেতেই হবে।

আমি বল্লুম—যদি নিতান্ত যাবার প্রয়োজন হয় তা হোলে সঙ্গে রিভলভার নেবেন।

আমার কথা শুনে অপূর্ব্ব বোধ হয় একটু ভয় পেলেন! তিনি বলে উঠলেন—দেখুন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন চতুর্দ্দিকে বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে। যদি—

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্লুম—না সে রকম বিপদ কিছু নয়—তবুও কথায় বলে যে সাবধানের মার নেই,—তাই বল্‌ছিলুম।

অপূর্ব্ববাবু আর কিছু বল্লেন না। আমিও যাত্রার বন্দোবস্ত করতে লাগলুম।

তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা একটার মধ্যেই আমার ব্যাগ নিয়ে অপূর্ব্ববাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দুপুর বেলা পাছে কেউ দেখতে পায় সেই ভয়ে জলার ধার দিয়ে অনেক দূর অবধি এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসে বেশ করে দাড়ি গোঁফ পরে নিয়ে জলার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। তারপর ঘুরে ঘুরে আমার সেই গুহার মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলুম। গুহার মধ্যে বসে একটি মোমবাতি জ্বালিয়েই কিন্তু দেখতে পেলুম যে আমার বিছানার একটু দূরেই একটা আধখানা পোড়া মোমবাতি পড়ে রয়েছে। মোমবাতিটা দেখেই কিন্তু আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠ্‌ল। ভয়ে নয়—সন্দেহে! আমার মনে হতে লাগ্‌ল তবে কি এখানে কেউ এসেছিল? অপূর্ব্ববাবুর বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে তারা কি আমার পেছনে লোক লাগিয়েছে নাকি!

বাতিটা তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলুম। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে যে রকম দেশী মোমবাতি তৈরি হয় এটা সে রকমের নয়। এটা বিলিতী মোমবাতী। আমার মনের সন্দেহ তখুনি চলে গেল। বুঝতে পারলুম যে, সেখানে আমি আগে যে দুই রাত্রি কাটিয়ে ছিলুম তখনই বোধ হয় ঐ আধপোড়া বাতিটা রেখে গিয়েছিলুম। যাক্! বাঁচা গেল, আমার পেছনে কোনো লোক লাগেনি তা হলে।

আমি ঠিক করেছিলুম সেই রাত্রেই হেরম্বর ভাঙা ঘরে গিয়ে তাকে ধরব আর সে এই বিষয় কিছু জানে কি না তাই বার করব। কিন্তু তখনো রাত্রি হোতে অনেক দেরী। কি করি! জলার মধ্যে ঘুরে বেড়ালে পাছে কারুর চক্ষে পড়ে যাই এই ভয়ে বাঁকি সময়টা শুয়ে কাটানো যাক্ মনে কোরে চাদরে গা ঢেকে দেওয়া গেল।

কাল সারারাত্রি জাগরণ গিয়েছে। সকালে যা ঘুমিয়ে ছিলুম তা অতি সামান্য। তাই মনে করলুম যে একটুখানি ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। কিন্তু ঘুম এল না। মনের মধ্যে যে একটু সন্দেহ ঢুকেছিল সেইটে খালি খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগ্‌ল। ডিটেকটিভের মন সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ; শুয়ে-শুয়ে আর ভাল লাগ্‌ল না। আমার গুহার ভিতরের দিকে আর একটা ঘর ছিল। সে ঘরে কিছু আছে কিনা দেখবার জন্য উঠ্‌লুম। বাতিটা নিয়ে সেই অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘরে ঢুকলুম।

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করবার পরে কোণের দিকে যেন একটা কি দেখা গেল। বাতি নিয়ে তাড়াতাড়ি সেদিকে গিয়ে দেখি যে একটা চৌকো লোহার বাক্স রয়েছে। এ বাক্স কোথা থেকে এল! সেবার তো এ বাক্স দেখিনি! এতক্ষণে আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হোলো। নিশ্চয় এই ঘরে অন্য লোক এসেছে। এবং বাক্স যখন রয়েছে তখন এখনো সে এইখানেই বাস করছে।

বাক্সটা খোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম কিন্তু কি শক্ত সে বাক্স! কিছুতেই তা খোলা কিংবা ভাঙা গেল না। আমি ফিরে এসে আমার বিছানায় এসে বসলুম। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে রিভলভারটা বের কোরো গুলি ভরে বসে রইলুম।

আমার স্থির বিশ্বাস ছিল, এই বাক্স যে লোকের সে সন্ধ্যার সময় এখানে ফিরে আস্‌বেই। বসে-বসে ঠিক কোরে ফেল্লুম আজই এই পাহাড়ের গুহার মধ্যে যা হয় একটা হোয়ে যাবে। সে যদি মরে তা হোলে অপূর্ব্ববাবুদের রহস্য প্রকাশ হবে। আর আমি যদি মরি তা হোলে সে কথা কেউ জানতেও হয়ত পারবে না। আমার দেহ টেনে নিয়ে গিয়ে ঐ চোরা-বালিতে ফেলে দিলেই কোথায় তলিয়ে যাবে তার ঠিকানাও নেই। কিন্তু যাক্! ও সব কথা ভাববার আর সময়ই নেই। যা হবার তাই হবে স্থির কোরে আমি রিভলভার হাতে নিয়ে বসে রইলুম।

বসে আছি তো বসেই আছি। কতক্ষণ সেই ভাবে কেটে গেল তার ঠিকানা নেই। ক্রমে সন্ধ্যে হোয়ে এল। আমি কান পেতে আছি যে পায়ের শব্দ পেলেই প্রস্তুত হোয়ে থাক্‌ব। কিছুক্ষণ পরে যেন কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলুম। যেন কে ধীরে-ধীরে গুহার দিকে এগিয়ে আসছে। পদশব্দ এগিয়ে আসতে-আসতে

গুহার কাছে এসেই থেমে গেল। আর কোনো শব্দ নেই। আমি রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে উঠলুম। এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা ঘণ্টা বলে মনে হোতে লাগল। এ রকমে প্রায় পাঁচ মিনিট কেটে যাওয়ার পর বাইরে থেকে কে চেঁচিয়ে বল্লে —ওহে যতীন, বন্দুক-টন্দুক ছোড়ো না। আমি জীবানন্দ।

এঁ্যা! জীবানন্দবাবু এখানে! বিস্ময়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল! এও কি সম্ভব! আমি বল্লুম - ভেতরে আসুন কিছু ভয় নেই।

হাসতে-হাসতে জীবানন্দবাবু ভেতরে ঢুকলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম —আমি যে এখানে আছি কি কোরে জানলেন?

জীবানন্দবাবু একটু রাংতা বের কোরে বল্লেন — এই যে, এই রাংতাটুকু তোমার পরিচয় দিয়ে দিয়েছে। আমি জানি তোমার চকোলেট খাওয়া রোগ আছে। গুহার মুখে এই রাংতা দেখেই বুঝতে পারলুম যে এই পাড়াগাঁয়ে জঙ্গলের মধ্যে চকোলেট খেতে পারে কে? তার ওপরে তুমি আমায় এই গুহার কথা এর আগে লিখেছ। এতেও কি বুঝতে দেরী হবে যে তুমি এখানে আছ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম —আপনি কত দিন এখানে আছেন?

জীবানন্দবাবু বল্লেন —পনেরো দিন।

আমি আশ্চর্য্য হোয়ে বল্লুম —পনেরো দিন এখানে আছেন অথচ আমায় জানান-নি?

তিনি হাসতে-হাসতে বল্লেন—এখানে এসে কি বসে আছি হে। এই পনেরো দিন দিনে-রাতে বিশ্রাম করতে পাইনি। আজ রাতে একটু ঘুমোব, তুমি এসে ভালই করেছ।

আমি তাঁকে হেরম্বর সমস্ত কথা বলে বল্লুম—আজ রাতে ঘুমোনো হবে না। আজ যে তার কাছে যেতে হবে।

জীবানন্দবাবু বল্লেন —তুমি যা বল্লে সে সবই আমার কাছে পুরোণো খবর। আমি রোজ রাত্রে আজকাল হেরম্বর কাছে অন্ততঃ দু-ঘণ্টা কাটাই। আরও অনেক খবর আছে —এখন একটু চা তৈরি কর দিকিন্।

জীবানন্দবাবুর সঙ্গে স্টোভ ইত্যাদি সবই ছিল। আমি স্টোভ জ্বালিয়ে চা'র জল চড়িয়ে দিলুম।

ক্রমশঃ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

ভেল্‌কির হুম্‌কি

১

সবাই বলে গুলে-সর্দ্দার পিশাচ-সিদ্ধ। সে ইচ্ছা করলেই যেখানে খুসি যেতে পারে, যে-কোন পশু-পক্ষীর আকার ধরতে পারে, বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে পারে!

গুলে-সর্দ্দারের নামে বর্দ্ধমান জেলার ছেলে-বুড়ো-মেয়ে ভয়ে থরথরি কম্পমান! তার মত সাহসী ও নিষ্ঠুর ডাকাতের নাম আর কখনো শোনা যায় নি!

সে যে কত লোকের যথাসর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল, কত মানুষের প্রাণ বধ ক'রেছিল, কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তার আর কোন হিসাব নেই।

জ্যান্ত বা মৃত—যে অবস্থাতেই হোক্, তাকে ধরতে পারলে সরকার অনেক টাকা বখ্‌সিস দেবেন ব'লে প্রচার করলেন বটে, কিন্তু আজ দশ বৎসরের ভিতরে কেউ তার মাথার একগাছা চুল পর্য্যন্ত ছুঁতে পারলে না! আমার মনেও সন্দেহ হ'ল, তবেই কি সত্যই সে ভুতুড়ে মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানে?

তারপর, তার অত্যাচারে আমরা সকলেই যখন দিশেহারা হয়ে উঠেছি, তখন হঠাৎ একদিন শোনা গেল, গুলে-সর্দ্দার ধরা পড়েছে!

২

মথুরা মণ্ডল ছিল এ অঞ্চলের খুব বড় এক মহাজন। ডাকাতের দল নিয়ে গুলে-সর্দ্দার এক অমাবস্যা রাত্রে তার বাড়ী আক্রমণ করলে। ঢেঁকি দিয়ে বাড়ীর সদর দরজা ভেঙে ডাকাতরা ভিতরে ঢুকেই দেখ্‌লে, উঠানের উপরে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, স্বয়ং মথুরা মণ্ডল! পর মুহূর্ত্তেই সে বন্দুক ছুঁড়লে এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন ডাকাত আহত হয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে গুলে-সর্দ্দার বাঘের মত মথুরার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মথুরা দ্বিতীয় বার বন্দুক ছোঁড়বার আগেই গুলে তার ধারালো রাম-দা চালালে। বেচারা মথুরার মাথা তখনি উড়ে গেল!

মথুরা মারা পড়ল বটে, কিন্তু তার ভাগ্‌নে ছিল উঠানের পাশের একখানা ঘরে। সেইখান থেকে সে জান্‌লা দিয়ে ক্রমাগত বন্দুক ছুঁড়তে লাগল। বেগতিক দেখে

ডাকাতের দল ভয়ে সেখান থেকে চম্পট দিলে। কিন্তু পালাবার সময়েই গুলে-সর্দ্দার অন্ধকারে পাঁচিলের উপরে এমন ভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল যে, তখনি অজ্ঞান হয়ে গেল। সেই সুযোগে তাকে বন্দী করা হ'ল।

৩

সেখানকার থানার ইন্‌স্পেক্টর ছিলুম আমি। গাঁয়ের লোকেরা গুলে-সর্দ্দারকে আমার কাছে ধ'রে নিয়ে এল।



গুলে-সর্দ্দার

লোকটার চেহারা কি ভয়ানক!—মাথায় একগাছা চুল নেই, চোখ দুটো ভাঁটার মত গোল,—জবাফুলের মত লাল, নাক থাঁদা, গোঁফ বিড়ালের মত, হাতে, কাঁধে আর বুকে লোহার মত শক্ত মাংস-পেশী। লম্বায় সে প্রায় সাড়ে ছ'ফুট উঁচু এবং তার গায়ের রং আবলুস কাঠের মত কুচ্‌কুচে কালো। তার গায়ে আর কাপড়ে রক্ত মাখা থাকাতে তাকে আরো ভয়ানক দেখাচ্ছিল।

যদিও তার হাত-পা বাঁধা, তবু তাকে দেখে আমার কেমন ভয় করতে লাগল। পাহারাওয়ালাদের হুকুম দিলুম, তারা যেন সর্দ্দারের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে।

গুলে দাঁত বার ক'রে হেসে বললে, "যতই ঘিরে থাকো আর হাত-পা বাঁধো বাবা, আমাকে কেউ ধ'রে রাখতে পারবে না!"

এমন সময়ে পুলিসের বড় সাহেব খবর পেয়ে তাকে দেখতে এলেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকে দেখে সাহেব বললেন, "সর্দ্দার, আর তুমি আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না!"

গুলে ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাস্য ক'রে বললে, "আরে রেখে দাও সায়েব, তোমাদের বাহাদুরি! আমাকে ধ'রে রাখে কে, আমি পাখী হয়ে উড়ে পালাব।"

সাহেব বললেন, "ননসেন্স! ... ... এই পাহারাওলা, আসামীকো গারদ মে লে যাও!"

গুলে আবার অট্টহাস্য ক'রে দুই হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, "এই ব'লে রাখলুম সায়েব, আমি তোমাদের ঠিক কলা দেখাব।"

৪

বিচারে গুলে-সর্দ্দারের ফাঁসির হুকুম হ'ল। ফাঁসির কথা শুনে সে আদালতের মাঝখানেই কোমরে হাত দিয়ে নাচতে নাচতে হেঁড়ে-গলায় গান ধ'রে দিলে। জজ-সাহেব তো অবাক! আমি ভেবেছিলুম, তার এই মুখসাবাসি আর বেশীদিন থাকবে না। কিন্তু ফাঁসির দিন যতই ঘনিয়ে আসতে লাগল তার হাসি-ঠাট্টা যেন ততই বেড়ে উঠল। রোজই সে বলত, "আমার সখ হয়েচে ব'লেই দিন কয়েক জেলখানার ভেতরে ব'সে জিরিয়ে নিচ্চি! কিন্তু ফাঁসির দিন কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না!"

জেলের প্রহরীরা সকলেই তার এই সব কথা বিশ্বাস করত। তারা আমাকে বললে, "হুজুর ও ব্যাটা যাদুকর! ও নিশ্চয়ই আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালাবে। আমরা কি করব বলুন, ও যদি রাত্তির বেলায় মশা-মাছি হয়ে উড়ে যায়, কে ওকে দেখতে পাবে?" বলতে লজ্জা হয়, কিন্তু আমারও মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগল!

গুলে সর্দ্দারের ফাঁসির ঠিক আগের দিনে আমি পুলিসের বড় সাহেবের কাছে গিয়ে, আমার মনের সন্দেহের কথা খুলে বললুম। সাহেব প্রথমটা হেসেই আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললেন, "ও-সব বাজে কথা নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার সময় নেই।"

আমি বললুম, "সায়েব, আমাদের দেশে কিন্তু ভোজবাজীতে মানুষ উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যায়।"

—"এমন ব্যাপার তুমি নিজে কখনো দেখেচ ?"

—"না।"

—"তবে ?"

—"কিন্তু অনেক ঘটনার কথা শুনেচি। গুলেসর্দ্দার যে রোজ এক কথাই বলচে আর ফাঁসির হুকুম পেয়েও এতটা মনের খুসিতে আছে, এর কারণ কি ?"

সাহেব খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করলেন। তারপর দোমনার মতন বললেন, "দেখ যদিও আমি এ-সব আজগুবি ব্যাপারে বিশ্বাস করি না, তবু সাবধানের মার নেই। কাল সকালে তো সর্দ্দারের ফাঁসি হবে ? আচ্ছা আজ রাতে তার ঘরের সামনে আমরা দুজনেও পাহারা দেব ?"

৫

গুলে-সর্দ্দার যে ঘরে বন্দী ছিল, তার দরজার সামনে সাহেব আর আমি দু'খানা চেয়ারের উপরে ব'সে আছি। আমাদের আশেপাশে আরো দুজন প্রহরী। মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি, ঘরের ভিতরে ব'সে গুলে-সর্দ্দার প্রাণের ফুর্ত্তিতে তুড়ি দিয়ে গান গাইছে !

রাত ক্রমে গভীর হয়ে উঠল।......এখন গানের বদলে গুলের ভীষণ নাসা গর্জ্জন শুনতে পাচ্ছি ! কাল সকালে তার ফাঁসি, আর আজ সে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছে ! আমার মনটা সন্দেহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল ! ... ... কিন্তু ঢং ঢং ক'রে তিনটে বাজল, তবু তো অস্বাভাবিক কিছুই ঘটল না। সাহেব কৌতুক-হাস্য ক'রে বললেন, "বাবু, দেখ্‌চ তো, একালে ভোজবাজি আর চলে না !"

আমি আর কিছু বললুম না। নিজের কুসংস্কারে নিজেরই লজ্জা করতে লাগল।

... ...

প্রায় যখন ভোর হয়ে এসেছে, তখন সাহেব আর আমি দুজনেই একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ প্রহরীদের চীৎকারে চমকে মাথা তুলে দেখি, কয়েদখানার দেয়ালের ঘুলঘুলির নীচেই একটা ভয়ঙ্কর কালো বিড়াল দাঁড়িয়ে আছে ! আমরা সকলেই তার দিকে ছুটে গেলুম ! – কেউ লাঠি, কেউ বন্দুকের কুঁদো ও কেউ লাথি তুলে তাকে বারবার মারবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সেই আশ্চর্য্য বিড়ালটা আমাদের সকলকেই এড়িয়ে, উঠানের দিকে চোঁচা দৌড় মারলে !

—"Look out !"—বলেই পুলিস-সাহেব তাঁর রিভলভার তুলে ঘোড়া টিপলেন, গুলিটা বিড়ালের পিছনের একটা পায়ে গিয়ে লাগল, সে আর্ত্তনাদ ক'রে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আরো দুই-এক পা এগিয়ে স্থির হয়ে প'ড়ে রইল ! আমরা ছুটে কয়েদখানার ঘুলঘুলির কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম গুলে-সর্দ্দার ঘরের মেঝের উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে যন্ত্রনাপূর্ণ স্বরে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গালাগালি দিচ্ছে !

আমি আপস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, "আসামী ঘরের ভেতরেই আছে !"

সাহেব রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "থাক্‌বে না তো যাবে কোথায় ! ও সব কুসংস্কার আমি মানি না —যদিও প্রথমটায় আমারো সন্দেহ হয়েছিল।"

৬

গল্পটা এইখানেই শেষ করা যাক্ —বাকি আছে খালি আর দুটো কথা।

আজ সকালে যথাসময়ে গুলে সর্দ্দারকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তাকে ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাবার সময়ে দেখা গেল, তার একখানা পা হঠাৎ ভেঙে গেছে, সে অত্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে !*

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

পান্থ পাদপ

পৃথিবীতে যে কত রকম আশ্চর্য্য জিনিষ আছে, তা আমরা ধারনা করতে পারি না। পান্থ-পাদপ নামে এক রকম গাছের নাম কি তোমরা কেউ শুনেছ ? এ রকম দেখতে সুন্দর গাছ খুব কমই দেখা যায়। গাছটা অনেকটা তাল গাছ ও কলা গাছের মত দেখতে। ছবিতে দেখ পাতাগুলো প্রায় কলা গাছের পাতার মত। বাস্তবিক এই গাছের সুন্দর চেহারা দেখলে সকলকেই মোহিত হতে হয়। কিন্তু খালি চেহারায় নয়, এই গাছ মানুষের বড়ই উপকারী। পথিক যখন চারিদিকে ঘুরতে ঘুরতে কোথায়ও এক ফোঁটা জল দেখতে পায় না, তেষ্টায় যখন সে চারিদিক অন্ধকার দেখে তখন এই পান্থ-পাদপই পথিকের প্রান বাঁচিয়ে দেয়।

* সত্য-ঘটনা—কিন্তু স্থান ও গল্পে কথিত লোকগুলির নাম প্রভৃতি কিছু বদলে দিলুম

পান্থ-পাদকের গুঁড়িটা ফাঁপা। এই গুঁড়িটা কোন রকমে ফুটো করতে পারলেই সুন্দর ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায়। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক এই গাছের কাছে এসে ঠাণ্ডা জল



পান কোরে নিজের প্রাণ বাঁচায় ও ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। ছবিতে দেখ গাছের পাতাগুলি দুই দিকে কি সুন্দর ভাবে সাজান—ঠিক যেন ময়ূরের পেখম।

এই গাছ আফ্রিকার কাছে ম্যাডাগাস্কার দ্বীপে খুব দেখা যায়। তারা এই

সবজান্তা

Dragon Fly সামনে দিকে যেরূপ বেগে দৌড়তে পারে পিছন দিকেও ঠিক সেই বেগে দৌড়তে পারে।

এখানে যে ছবি ছাপা হোল সে হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মোটা ছেলে; তার বয়স এখন মাত্র এগার বৎসর।

কিউবাতে এক রকম গাছ আছে ভূমিকম্প হলেই যার রং বদলে যায়।

আমেরিকার কিডার নদীর উপর পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় বাঁশের সেতু আছে। এই সেতুটা ৮৯০ ফিট লম্বা।

অষ্ট্রিচ পাখীর খাওয়ার কোন বাদ বিচার নাই। তারা ভাল ছেলের মত যা পায় তাই খায়। লণ্ডন চিড়িয়াখানার একটা অষ্ট্রিচ চার ইঞ্চি কাঁটা খেয়ে মারা গেছে। এই পাখীটা তিনটে দস্তানা, ফটো তুলবার ফিলম, তিনটে রুমাল, চারটে হাপ-পেনী, দুটো কাঁদি, একটা চাবি, দস্তানা বাঁধবার সুতো, চার ইঞ্চি লম্বা একটা কাট, চার ইঞ্চি পেনসিল, চিরুণী ভাঙা, একটা নেকলেস, একটা গলাস বোতাম, স্ক্র, পাথরের টুকরো, ছোট ছোট তার খেয়েছিল



পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে মোটা ছেলে

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যা বই আছে তা পাশাপাশি ভাবে রাখলে ৫০ মাইল হয়।

প্রতিদিন সূর্য্য পৃথিবীকে যে উত্তাপ দেয় তাতে পাঁচ হাজার ফিট পুরু বরফের কেককে অনায়াসে গলিয়ে ফেলতে পারে।

এখানে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ছোট ক্যামেরার ছবি ছাপা গেল। এই ক্যামেরাটা দেখতে ঠিক একটা দেশাইএর বাক্সের মত।



সব চেয়ে ছোট ক্যামেরা

হাতীর শুঁড়ে ৪০,০০০ হাজার মাংসপেশী আছে এবং মানুষের শরীরের মাংসপেশীর সংখ্যা মাত্র ৫২৭।

একটা খুব বড় ম্যাজিক লণ্ঠন তৈরী হচ্ছে। দেখতে খুব বড় কামানের মত হবে। এই লণ্ঠনের সাহায্যে আকাশে মেঘের উপর বিজ্ঞাপন ও ছবি ফেলা হবে। পাঁচ মাইল দূরে মেঘের উপর রাত্রে পরিষ্কার ছবি পড়বে এবং অনেক মাইল দূরের লোকেরাও অনায়াসে ছবি দেখতে পাবে।

বুদ্ধির প্রশ্ন

১। প্রয়াগে কয়টী নদী এক সঙ্গে মিশেছে ও তাদের নাম কি ?

২। কোন জায়গায় সব চেয়ে বেশী বৃষ্টি হয়।

৩। উত্তর মেরুতে এক দিন কত সময় ?

৪। হোমিওপ্যাথীর আবিষ্কারক কে ?

৫। সব চেয়ে হালকা জিনিষ কি ?

৬। তাজ মহল কি ?

৭। কোন জানোয়ার ব্রহ্মার কাছে সুবিচার পায় নি ?

৮। কোন মুনির জলে ডুবে মরার ভয় ছিল না ?

[উত্তর কার্ত্তিকের সংখ্যায় বের হবে।]



প্রিয় মৌচাকের পাঠকপাঠিকা—

কয়েক মাস তোমাদের কোন চিঠি লিখিতে পারিনি। আশা করি সে জন্যে কিছু মনে করবে না। এই মাসের মৌচাক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূজোর ছুটি আরম্ভ হোল। পূজোর ছুটি যে কত আনন্দের ও কত আমোদের সেটা তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী অনুভব করতে পার। বাস্তবিক ছেলেবেলার আমোদের কথা মনে হলে আমাদের এই বয়সেও কত আনন্দ অনুভব করি। আশা করি এই পূজোর ছুটিটা তোমাদের সকলের খুব আনন্দে কাটবে। তোমরা অনেকেই দেশ বিদেশে বেড়াতে যাবে আর কেউ বা নিজের পাড়াগাঁয়ে ফিরে গিয়ে পূজোর আনন্দে যোগদান করবে। তোমাদের সকলের সময় যেন সুখে কাটে ও কোন দুঃখের ছায়া না আসে এই আমার প্রার্থনা। আশ্বিনের মৌচাক তোমাদের হাতে যাওয়ার সাত দিন পরেই কার্ত্তিকের কাগজ তোমরা পাবে। এই কার্ত্তিকের কাগজই হবে মৌচাকের পূজোর সংখ্যা। এই পুজোর সংখ্যার মৌচাকের মধু তোমাদের খুব মিষ্টি লাগবে তা আমি জোর করে বলতে পারি। এই সংখ্যায় হেমেন্দ্রবাবুর আর একখানা উপন্যাস আরম্ভ হবে। তা ছাড়া সুন্দর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ চমৎকার ছবি তো আছেই। দুই একটা নতুন পুরস্কারের কথাও তোমরা দেখতে পাবে। আজ এইখানেই শেষ। ইতি

মৌচাক সম্পাদক

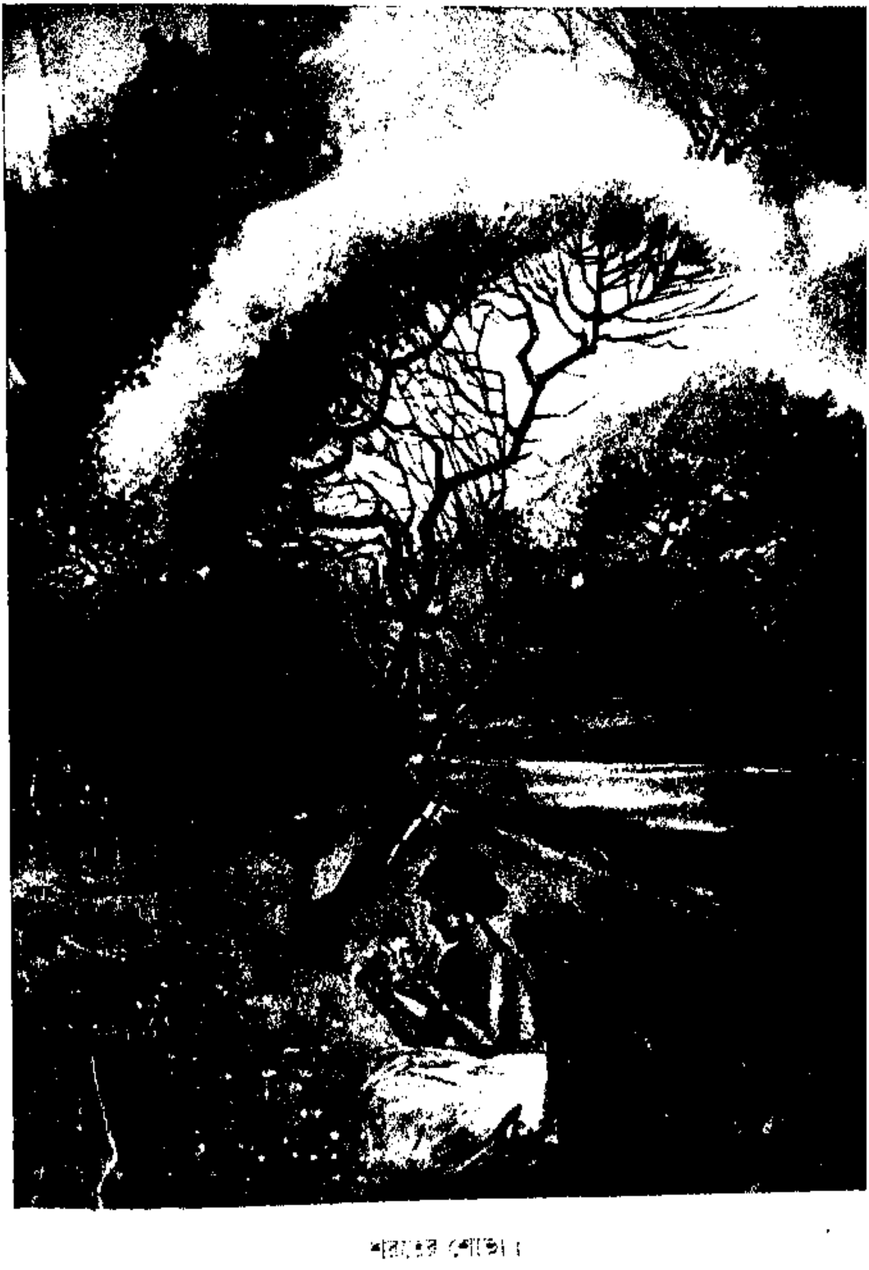
ধাঁধার উত্তর

১। হাতের কনুই ২। বৃষ্টি।

নিম্নলিখিত গ্রাহকগ্রাহিকাগণ ভাদ্র মাসের ধাঁধার জবাব দিয়েছেন :—

তরুণকান্তি ঘোষ (বাগবাজার), কুমারী মীরা দত্ত (গার্লো হিলস্), শ্রীসুধাময়ী বসু (কলিকাতা), ইন্দুভূষণ দে (গাইবাঁধা), সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), বীরেন্দ্রকুমার পাল (কটক), শ্রীনীহারমালা দেবী (খুলনা), শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (পুরুলিয়া), সুশীলকুমার লাহিড়ী (কলিকাতা), সুধীরচন্দ্র বসু (মধুপুর), শ্রীকমলা ঘোষ (কলিকাতা), বিমলচন্দ্র সেন (দিল্লী), বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় (কানপুর), শ্রীপূর্ণিমারাণী ও প্রভাতকুমার হালদার (মজঃফরনগর), শ্রীহেনা মিত্র (জব্বলপুর), শ্রীস্নেহলতাবালা রায় (শ্রীহট্ট), শ্রীইন্দিরা দেবী (কলিকাতা), রবীন্দ্রনাথ লাহিড়ী (কলিকাতা), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (মজঃফরপুর) শ্রীঊর্ম্মিলা সেন (মজঃফরপুর), অমরেশ, সমরেন্দ্র, সুরজিৎ, সমরজিৎ, পরেশ, নেপু, খোকা ও খোকন (ডিব্রুগড়), সত্যব্রত, নলিনী, অরবিন্দ ও বিজন (শিলচর), রাজেন্দ্রকুমার ইসলাম (পটুয়াখালি), শ্রীরাণী দেবী ও মুকুল চক্রবর্ত্তী (সিরাজগঞ্জ), দীপ্তি সরকার (বসিরহাট), শ্রীশেফালিকা, নির্ম্মল, বিমল, স্বর্ণলেখা, সুনীল, ইন্দুলেখা ও নিখিল দত্ত (কলিকাতা), গুপিনাথ কুণ্ডু (পাবনা), শ্রীনীলিমা গাঙ্গুলী (চুঁচুড়া), শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), সুনীলকুমার বসু (কলিকাতা), পরিমলরঞ্জন গুপ্ত (কুমারখালি), শ্রীঅনিমা দেবী (সাধুহাটী) জগৎজীবন লাহিড়ী (শ্রীরামপুর), রবীন্দ্রনাথ মিত্র (আরা), কুমারী মায়া দেবী (শ্রীহট্ট), প্রিয়নাথ দে, সত্যরঞ্জন পাল (কাছাড়), মনুপ্রতাপ ও দেবপ্রতাপ মল্লিক (হাজারিবাগ) শঙ্করপ্রসাদ শিকদার (বাঁকুড়া), নির্ম্মলকান্তি সান্যাল (কলিকাতা), জিতেন্দ্রনাথ বসু (হাওড়া), শ্রীমিলনমালা ঘোষ (কলিকাতা), বিমলকুমার ও অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা), দীপ্তি ও ভবানী (বর্দ্ধমান), প্রশান্তকুমার রায় (কলিকাতা), সুধাংশু ও প্রভাংশু চক্রবর্ত্তী (পাটনা), শ্রীরাণী দেবী (কলিকাতা)।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত



শরতের শোভা।

মৌচাক

২য় বর্ষ] কার্ত্তিক ১৩২৮ [৭ম সংখ্যা

আমাদের ইস্কুল

আমাদের ইস্কুল দিকভুল গ্রাম,
একতোলা পাকা বাড়ী কোটি কোটি দাম ;
সামনেই খেলবার ফুটবল মাঠ,
পিছনেতে এক বিল সান বাঁধা ঘাট ;
জামগাছ মাঝে মাঝে করে ঝেঁপ ঝেঁপ,
কত বোস কত ঘোষ মজবুত ঠেক ;
এক পাশে খোঁড়া খেত শাক সব্জির,
কোদালে কোপালে জোর হয় কব্জির !
ইয়া ইয়া লাউ ঝুলা করে লক্ লক্ !
কচি শশা দেখে জিভ্ করে সক্ সক্ !
প্যারালাল বার পোঁতা আর এক দিক,
হয় শেখা কুস্তি ও জিমনাস্টিক।

নড়্ নড়ে পায়া ভাঙ্গা বেঞ্চিগুলো,
তার পরে পুরু তিন ইঞ্চি ধূলো ;
টেবিল চেয়ার টুল্ নিলামে কেনা,
সাঙ্কাত কোন যুগে করিয়া দেনা !
  বারনিস্-চটা জরা-জীর্ণ আকে
ছেলেদের উৎপাতে আর না টাঁকে !
ছুরি দে' কেটেচে কেউ, ঢেলেচে কালী,
কেউ কোসে মাস্টারে পেড়েচে গালি ;
বোর্ড যেন কাঠে আল্কাৎরা মাখা,
পার ছেঁড়া মাদুরের ঝুলচে পাখা ;
খড়খড়ি পাকি ভাঙ্গা, বেকল ঘড়ি
কে কিনেচে দিয়ে তারে নগদ কড়ি !

তিন আলমারি ঠাসা লাইব্রেরি রুম,
কেরাণীটা বোসে সেথা কোসে মারে ঘুম ;
ম্যাপ খড়ি সুতো দড়ি দোয়াত কলম
ছুরি কাঁচি নিব পিন হাজারো রকম
আছে সেথা ; ছেলেরাও আছে হাত-সাফ ,
তেরি মেরি কেরাণী সে রেগে ছায় লাফ ।
দোর খোলা পড়ে আছে আরেকটা ঘর,
মাদুর বিছানা তাতে তক্তার পর ;
অবসর কালে সেথা শিক্ষক গণ
বিশ্রাম হেতু দ্রুত করেন গমন ;
তামুক টানেন কেহ, কেহ সিগারেট,
চা পান করেন কেহ মাথা কোরে হেঁট।

কালীকিঙ্কর সেন হেডমাস্টার,
ছেলেদের বলে—পড়্; নিজে ফাঁকিদার;
কথায় কথায় তার কেবল ফাইন,
আমরা স্বাধীন ছেলে মানিনা আইন;
এসে বিটি কালো মোটা ট্যারা ট্যারা চোখ,
কাঁচা পাকা দাড়ি মুখে ভারী ছোট লোক;
একটি পণ্ডিত যেন সদা শিব,
সাতে পাঁচে থাকেন না—বড্ড গরীব;
গোঁফ ঝোলা টাক-ওলা তিনকড়ি রায়,
পাটির খুব জোর অঙ্ক করায়;
ইতিহাস—শিক্ষক নাম স্মরজিৎ
বঙ্গের শিরোমণি জাতিতে নাপিত!

আমাদের ইসকুল বড় সুন্দর,
ভালোচারি বেশী ভাগ কম মন্দর;
এ জগতে কোথা পাবে সবটা নিখুঁত?
দ্যাখোনা কি কালো মেঘে খ্যালে বিদ্যুৎ?
হেথা থেকে কত ছেলে জলপানি পায়,
শিল্ড কাপ জিতে আনে ম্যাচ্ খেলে প্রায়;
কী রকম ইউনিটি সব ছেলেদের,
চালাকি করেন যিনি পান তিনি টের!
টেস্টে আটক রাখে এই বড় দোষ,
নইলে সে বারে পাস্ হোতো সন্তোষ;
প্রোমোশনে কড়াকড়ি—প্রশ্ন কঠিন,
ছুটি কম—পড়া বেশী—বিশ্রী রুটিন।

মোদের দলের চাঁই—পালের গোদা
ভারী সে তোখোড় ছেলে ফাজিল—ভোঁদা!
কত ফন্দিই তার মাথায় ঘোরে,
পারেনাক কেউ তারে গায়ের জোরে,
মাস্টারে ভয় করে, ছেলেরা মানে,
ভাল ভাল ছবি আঁকে গানও জানে;
এত ইনটেলিজেণ্ট করে না পড়া,
নিয়ে আছে বল্ খেলা কুস্তি লড়া!
কোশ্চেন লিক্ হয়ে গেলেই ফেঁসে,
হেড মাস্টার ধরে তারেই এসে;
ভয় নাই; বলে—স্যার আমারি একাজ,
মারুন সাতশো বেত সপাসপ্ আজ!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়



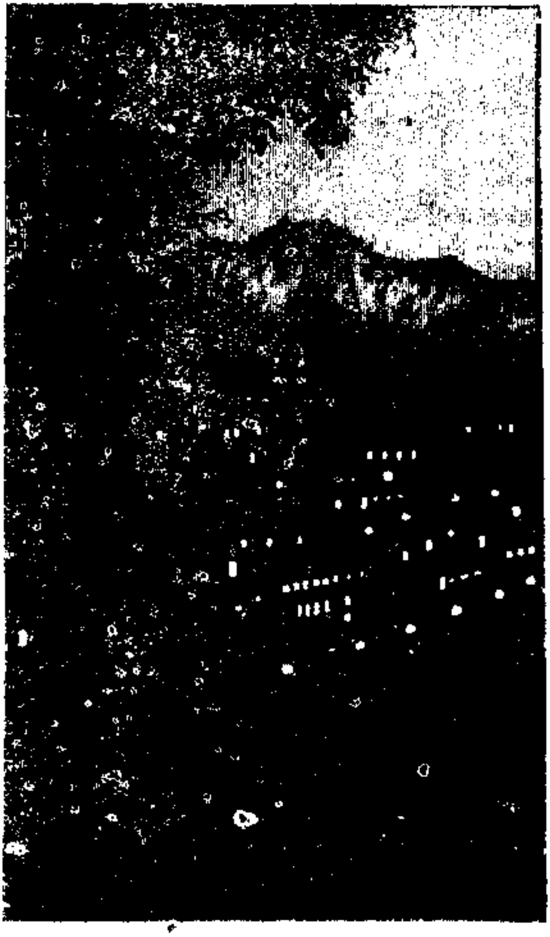


[এই লেখার সব ছবি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন এঁকেছেন]

সেবার গরমে দার্জ্জিলিং গিয়েছিলাম। তিন দিন ছিলাম। তার মধ্যে প্রায় সমস্ত দার্জ্জিলিং সহরটা পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি।

বিকালে সাড়ে পাঁচটায় দার্জ্জিলিং মেলে উঠলাম। পথের দুই পাশের শোভা দেখতে দেখতে চলেছি। রাত্রে যখন গাড়ী সাড়া পুলের উপর দিয়ে যেতে লাগল, তখন পদ্মার শোভা আমার ভাল লেগেছিল। সকাল ছয়টায় শিলিগুড়িতে গাড়ী থামিল। সেখানে গাড়ী বদল করতে হয়। এই শিলিগুড়ি থেকেই শীত আরম্ভ। পাহাড়ে ট্রেনের একখানা এঞ্জিন পাঁচ ছয়খানা গাড়ী টানে। গাড়ীগুলো খুব ছোট। দুই দিকে দুই খানা বেঞ্চি। একখানা গাড়ীতে ছ'জন করে লোক বসতে পারে। আমাদের কামরা রিজার্ভ ছিল বলে, সেখানে কেউ উঠেনি। গাড়ী প্রথমে শুকনা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়ে, শেষে একটু একটু করে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলে। কত উঁচু নীচু রাস্তা। গাড়ী যখন খুব উঁচুতে উঠে, তখন নীচের দিকে চাইলে মনে হয়, এই বুঝি পড়ে গেল। হিমালয়কে দূর থেকে দেখতে ভারি চমৎকার। পাহাড় ...

মেঘ - কুই মিশে আছে ; আর সেইটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে। গাছগুলো সব আমাদের সাধারণ গাছের মত নয়—অনেকগুলো নূতন রকমের। পাহাড়ের উপর থেকে নীচের বাড়ীগুলো ঠিক পুতুলের খেলা ঘরের মত দেখায়।



রাত্রে দার্জিলিং সহর

প্রায় সাড়ে আটটায় তিনধরিয়াতে গাড়ী এসে থামল। সেখানে তিন চারি পয়সার বাদাম ভাজা কিনে খাওয়া গেল। তিনধরিয়া ২০০০ ফুট উঁচুতে। বেলা দশটায় গাড়ী খার্সাংয়ে এসে থামল। সেখান থেকে খাবার কিনে খাওয়া হল। তারপর টুংয়ে ৫ মিনিট ও সোনাডাতে ৫ মিনিট থামল। এইবার গাড়ী ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে কুয়াসা-ভরা ষ্টেশন ঘুমে থামল। তারপর একেবারে বেলা একটায় দার্জিলিংয়ে এসে পৌছল। আমাদের থাকবার কথা

হয়েছিল ধর্ম্মশালায়। বাবার একজন বন্ধু দার্জ্জিলিং যাচ্ছিলেন। সেখানে তাঁর বাড়ী আছে। তিনি বল্লেন, আমার বাড়ী চলুন। ষ্টেশন থেকে তাঁর বাড়ী খুব কাছে। তিনি সকলকেই তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। বাড়ীখানার নাম "এভিলিয়ন"— ব্যাগুষ্টেড রোডের উপর। খুব সুন্দর বাড়ী। নীচে একজন সাহেবরা ভাড়া আছেন। আমরা উপরে রইলাম। ভেবেছিলাম সেদিন আর বেড়াতে যেতে পারব না, কিন্তু চারটের সময় চা খেয়ে বেড়াতে বেরলুম। দিন ছ-সাত মাইল করে বেড়াতুম। রাস্তার দুইধারে পাহাড়ের গায়ে নানা রকম পাতা জন্মায়;—ফার্ন, মস্, আইভি ইত্যাদি।

দার্জ্জিলিংয়ে 'ম্যাল' বলে একটা জায়গা আছে। জায়গাটা সমতল। তার চারিদিক দিয়ে রাস্তা বেরিয়েছে। ম্যালে অনেক দোকান আছে,—ছবির দোকান, পোষাকের দোকান, ইত্যাদি। ম্যালে একটা জায়গায় একটা কাঁচের ঘর আছে, ঘরটায় নানা রকম রংয়ের ফুল আছে। সেই সমস্ত ফুলের বিচী ঐখানে বিক্রী হয়। ম্যালের ভিতর ভিক্টোরিয়া গার্ডেন নামে বেশ বড় একটা সুন্দর পার্ক আছে।

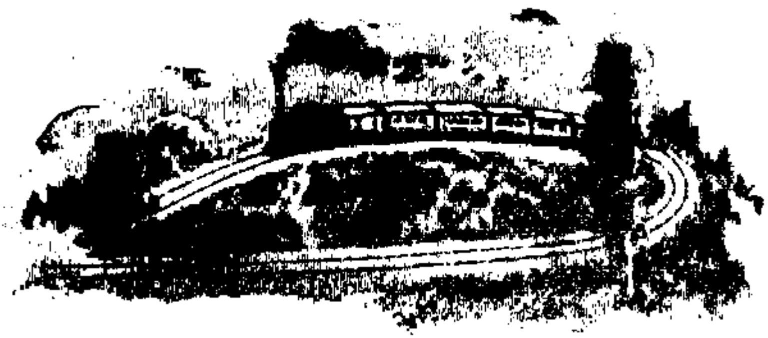
এই সময়ে দার্জ্জিলিংয়ে ঠিক পৌষ মাসের শীত। ঘরের মধ্যে মেঘ ঢুকে যায়। চারিদিকে কুয়াসায় ঢাকা। এই রদ্দুর হাসচে, দেখতে দেখতে কুয়াসায় অন্ধকার হয়ে গেল।

দার্জ্জিলিংয়ের পথগুলো বড় উঁচু নীচু। সে ত হবেই, পাহাড়ের উপর সহর, কেমন করে আর সমতল হবে? পথে নামবার সময় গড় গড় করে নেমে আসা যায়, কিন্তু উঠবার সময় ঠিক যেন ঠেলে ঠেলে উঠতে হয়।

দার্জ্জিলিংয়ের দৃশ্য বড় চমৎকার। চারিদিকে কাল পাহাড়ের মধ্যে বাড়ী। রাত্রি বেলা কুয়াসায় তারা দেখা যায় না বটে কিন্তু বাড়ী বাড়ী ও উঁচু নীচু রাস্তার ধারে যখন ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে ওঠে তখন মনে হয় কালো কাপড়ের উপর চুমকি জ্বলছে। তখন বড় চমৎকার দেখতে হয়। দার্জ্জিলিংয়ে সব মেয়ে কুলী। কেবল হাসে।

দার্জ্জিলিংয়ে একটা বোটেনিকেল গার্ডেন আছে। তার চারিদিক দিয়ে কত যে এঁকে বেঁকে রাস্তা নেমে গেছে, তা বলা যায় না। আর রং-বেরংএর ফুল ও পাতা আছে। যেমন ফুলগুলোর রং, তেমনি পাতাগুলোর গড়ন। গাছে গাছে কত সুন্দর

ছোট ছোট পাখী। আমাদের সঙ্গে একটা নেপালী ছেলে ছিল, তার কাজ ছিল আমাদের বাজারের মোট বওয়া। সে আমাদের সঙ্গে বোটেনিকেল গার্ডেনে গেছল। একটা গাছ থেকে সে একটা পাহাড়ী পাখীর ছানা ধরে এনে তার গলাটা ছিঁড়ে ফেল্লে। পরে পালকগুলো ছিঁড়ে তাকে ফেলে দিলে। আমাদের সঙ্গে একটী ছোট মেয়ে ছিল, সে তাই দেখে কেঁদে ফেল্লে। কেবল বলতে লাগল, অমন সুন্দর পাখীটা মেরে ফেল্লে।

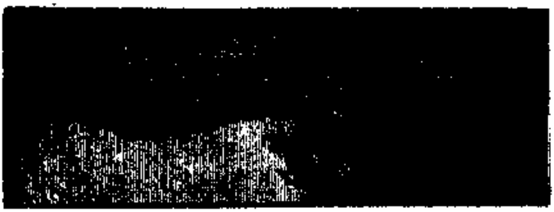


দার্জ্জিলিং এর রেল গাড়ী

ভিক্টোরিয়া ফলস্ নামে একটা ঝরনা আছে। তার উপর একটা পুল আছে। ঝরণাটী বড় চমৎকার। ঠিক যেন তুলার বস্তা পড়ে যাচ্ছে।

স্যানিটেরিয়াম বলে একটা হোটেল আছে এবং সেইখানে টেনিস খেলবার একটা সমতল জায়গা আছে। রোজ সেখানে খেলা হয়। আমরা একদিন সেইখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। দার্জ্জিলিংয়ে বাঙ্গালী বাসিন্দা খুব কম। সেখানে বাস করে,—নেপালি, তিব্বতি, ভুটিয়া, সিকিমী, লেপ্‌চা, ইত্যাদি। সেখানকার বাড়ীগুলো কাঠের, ও পাথরের। ইঁটের বাড়ী খুব অল্প। দার্জ্জিলিংয়ে একটা মোটরে চলবার রাস্তা আছে। সেটা বরাবর দার্জ্জিলিং ছাড়িয়ে লেবং সহরে গেছে। আমরা একদিন সেখানে মোটরে করে গিয়েছিলাম। খুব মস্ত একটা সমতল মাঠ। মাঝে মাঝে সেখানে ঘোড়দৌড় খেলা হয়। তখন সেখানে ফুটবল খেলা হচ্ছিল।

দার্জ্জিলিংয়ে একটা মন্দির আছে। ঠাকুরের নাম দুর্জ্জয়লিঙ্গ; যে পাহাড়ের উপর মন্দির, তার নাম "অবজারভেটারি হিল।" দার্জ্জিলিং একটা পীঠস্থান। মন্দির মানে পাশে চারটে বাঁশ, আর নানা রকম দড়ি থেকে মন্তর লেখা কাগজ ঝুলছে। ঠাকুর হচ্ছেন একটী পাথর। দু'টী পুরুত আছে। নেপালি হিন্দু, টিবেটিয়ান বৌদ্ধ। আমরা সকলে যেমন হরিনাম জপ করি, তারা তেমনি জপ করে—ওঁং মণি পদ্মে হুঁ, অর্থাৎ বুদ্ধদেবকে নমস্কার। মন্দির অনেক উঁচুতে, সেখান থেকে নেমেই লাট সাহেবের বাড়ী পড়ে। লাট সাহেবের বাড়ীর পিছনে বার্চ্চ হিল, একটা উঁচু জায়গা। দার্জ্জিলিংয়ে ফি রবিবার হাট বসে। কপি, কড়াইশুটী, মিহি ঝাঁটা, ইয়াক্ মাখন অনেক বিক্রী হয়। দার্জ্জিলিংয়ে যারা দোকান করে তারা সমস্ত জিনিস পরিস্কার ভাবে সাজিয়ে রাখে। দার্জ্জিলিংয়ে লেপচা ভুটিয়া ইত্যাদি মেয়েরা কেউ চুল খুলে আসে না। ছোট ছোট মেয়ে থেকে বুড়া পর্য্যন্ত বিনুণী করে আসে। অনেক লেপচা মেয়েদের মেমের মত রং কিন্তু নাক খাঁদা। দার্জ্জিলিংয়ে মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেরা একটা করে ঘোড়া নিয়ে বেড়ায়। ছোট ছেলে মেয়ে হাঁটতে না পারলে সেই ঘোড়া চড়ে আর যার ঘোড়া সে লাগাম ধরে নিয়ে চলে। আমি এক দিন চড়েছিলুম। প্রথমটা ভয় করে, তারপর ভয় ভেঙে যায়। খুব মজা। আমরা স্যানাটেড়িয়ম রোড, অকল্যাণ্ড রোড, কমার্শিয়াল রোড, মাউণ্ট প্লেজেণ্ট রোড ও জলাপাহাড় রোডে প্রায় বেড়াতাম। বলতে গেলে দার্জ্জিলিং বেশ ভাল জায়গা।



কুমারী আশা পালিত

সোনার পাহাড়

(কুমারের কথা)

প্রথম পরিচ্ছেদ — বেকার জীবনের বিড়ম্বনা



অনেক দিন চুপ ক'রে ব'সে আছি, — আর ভালো লাগে না!

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে চা খাওয়া আর একঘেয়ে খবরের কাগজ পড়া, তারপর স্নান আহার নিদ্রা, বৈকালে কোঁচা ঝুলিয়ে দু-চার পা বেড়িয়ে আসা, সন্ধ্যায় দু-চার জনে মিলে তাস-দাবা-পাশা খেলা আর পরনিন্দা করা, তারপর আবার আহার এবং আবার নিদ্রা! এমনি প্রত্যহ!

আরে ছিঃ, এর নাম কি জীবন ?

রোজ মনে পড়ে সেই খাসিয়া পাহাড়ের নির্জ্জন বৌদ্ধ মন্দিরকে, সেই মঙ্গল-গ্রহের বামন মানুষদের, সেই ময়নামতীর মায়াকাননের দানব জীবগুলোকে!* সেই সব আশ্চর্য্য অজ্ঞাত দেশে গিয়ে নিত্য-নূতন আবিষ্কার, নিত্য-নূতন বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ, নিত্য-নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, — তার মধ্যে কষ্ট ছিল ঢের, দুশ্চিন্তা ছিল যথেষ্ট, মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল পদে পদে, — কিন্তু তবু আমার মন সেই বিচিত্র জীবনকেই আবার

* গেল তিন বৎসরে "মৌচাকে" 'যখের-ধন', 'মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন' ও 'ময়নামতীর মায়াকানন' নামে তিনখানি উপন্যাসে কুমার ও বিমল প্রভৃতির পূর্ব্ব-কাহিনী প্রকাশিত হয়ে গেছে।

ফিরে চাইছে! মানুষ যে জ্যান্ত জীব, জড় পাথরের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে বেঁচে ম'রে থেকে লাভ নেই—কোন লাভ নেই!

আমাদের মত একবার যারা বৃহৎ বিশ্বকে স্বচক্ষে দেখেছে, চঞ্চল জীবনের অপূর্ব্ব সুধা পান করেছে, আর কি তারা হাত-পা গুটিয়ে ব'সে ব'সে নিরীহ গোবেচারীর মত দিনের পর দিন গুণ্‌তে পারে?

মঙ্গলগ্রহ ও দানব-জীবদের দেশ থেকে ফিরে এসে আমাদের যশ ও সম্মান বড় কম হয় নি। আমাদেরই মুখে আমাদের গল্প শোনবার জন্যে য়ুরোপ-আমেরিকা পর্য্যন্ত বারবার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছে,—দেশ-বিদেশের কাগজে আমাদের ছবি আর আশ্চর্য্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে,—আমাদের অভ্যর্থনার জন্যে বড় বড় সভার অনুষ্ঠান হয়েছে!

এ-সবই আনন্দ ও গর্ব্বের কথা। কিন্তু এই আনন্দ ও গর্ব্ব সম্বল ক'রে বাকি জীবনটা অলসের মতন কাটিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই; দূর-দূরান্তরের মায়া আবার আমাকে অজানার ভিতরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে!

আমার মতন লোকের অবস্থাই যখন এই রকম, তখন বিমলের মনের অবস্থাটা যে কি-রকম হয়ে উঠেছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি! বিমল ঠিক পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ছট্‌ফট্‌ করছে!

একদিন সে আমাকে বললে, "কুমার! চল আমরা বেরিয়ে পড়ি!"

—"কোথায়?"

—"যেদিকে দু-চোখ যায়!"

—"তাতে লাভ?"

—"লাভ-লোকসান খতিয়ে আমি কোন কাজ করি না। তবে একবার পথে বেরিয়ে পড়তে পারলে জীবনে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্যের সঞ্চার হ'তে পারে! হয়তো নতুন কোন বিপদে পড়ব—হয়তো তার জের মিটতে কিছুকাল লাগবে!"

—"অমন অন্ধের মত আমি কোন বিপদে পড়তে রাজি নই!"

—"ঐ তো, ঐ জন্যেই তো তোমার সঙ্গে আমার মত মেলে না। তুমি বৈচিত্র্য চাও—অথচ বিপদকে ভয় কর? কাপুরুষ!"

ঘর ঝাঁট দিতে দিতে রামহরি আমাদের কথা শুনছিল। সে হঠাৎ বিমলের

কাছে এসে বললে, "খোকাবাবু, আবার তোমার মাথায় ঘূর্ণি চেগেচে বুঝি! এত কষ্ট পেয়েও হুঁস হ'ল না?"

বিমল হেসে বললে, "কষ্টই যে আমি ভালোবাসি! আর যে বাবুর মত ব'সে থাকতে পারচি না রামহরি!"

রামহরি রাগ ক'রে বলতে বলতে চ'লে গেল, "খোকাবাবুর বিয়ে না দিলে আর চলে না দেখচি! বৌয়ের আঁচলে বাঁধা পড়লে তবে ঠিট্ হবে!"

এই ভাবে দিন যাচ্ছে।

এমন সময়ে বিপদ একদিন নিজেই আমাদের দ্বারে এসে দেখা দিলে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সোনার পাহাড়

সকালবেলা। বিমলের বৈঠকখানায় ব'সে চা পান করচি, এমন সময়ে রাস্তা থেকে কে বললে, "বাড়ীতে কে আছেন?"

জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিমল জিজ্ঞাসা করলে, "কে মশাই? কাকে চান?"

—"এটা কি বিমলবাবুর বাড়ী?"

—"হ্যাঁ। ও-নাম আমারি।"

—"আপনিই বিমলবাবু? আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরি দরকার আছে।"

—"ভেতরে আসুন।" আগন্তুক ঘরের ভিতরে এসে ঢুকলেন।

লোকটির বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিস হবে, মাথার সামনের দিকটায় টাক প'ড়ে গেছে, চোখ দুটি ছোট ও তীক্ষ্ণ, দাড়ী-গোঁফ কামানো, দেহখানি বেশ লম্বা-চওড়া, রং কালো।

বিমল একবার তার আপাদমস্তকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, "আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার আছে?"

—"সে অনেক কথা বিমলবাবু, বলতে সময় লাগবে"—ব'লে একখানা চেয়ারে ব'সে তিনি গলার চাদরখানি খুলে রাখলেন।

বিমল বললে, "আপনি কোথা থেকে আসচেন?"

—"আপাতত কলকাতা থেকেই। কিন্তু এর আগে আমি সিংহলে ছিলুম। আমার নাম শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি।"

—"কি-ক'রে চিনলেন ?"

—"পৃথিবীতে এখন আপনাদের নাম জানে না এমন লোক কে আছে ? আমি খবরের কাগজে আপনাদের গল্প পড়েচি। ডাইনসর, ডিপ্লোডোকাস, বাপরে, সে সব কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে !"

বিমল হেসে বললে, "সে সব কথা তো পুরাণো হয়ে গেচে চন্দ্রবাবু !"

"কিন্তু আমার কাছে পুরাণো হয়নি, আপনাদের গল্প আমি যত বারই পড়ি, নতুন ব'লে মনে হয়।... ...শুনেচি আপনার গায়ে নাকি ভয়ানক জোর, সে কথা কি সত্যি মশাই ? কিন্তু আপনাকে দেখলে তো তা মনে হয় না !"

চন্দ্রবাবুর কথার ধরণ-ধারণ দেখে বিমল হো-হো ক'রে হেসে উঠল। তারপর বললে, "আমার গায়ে যে জোর আছে, সে প্রমাণ আপনাকে কেমন ক'রে দি বলুন দেখি ? তাহ'লে আপনার সঙ্গে এখনি মারামারি করতে হয় !"

চন্দ্রবাবু বললেন, "বাপরে, তাহ'লে আমার প্রমাণ চাই না ! আচ্ছা, আপনার সঙ্গে মঙ্গলগ্রহে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা এখন কোথায় ?"

—"এই কলকাতাতেই আছেন। একজন আপনার সামনেই রয়েচেন !"

—"তাই নাকি ? আর আমি এখনো টের পাইনি ?"—তাড়াতাড়ি আমার দিকে ফিরে চন্দ্রবাবু বললেন, 'নমস্কার মশাই, নমস্কার ! হাঁা, তাইতো বটে ! আপনার ছবিও যে আমি কাগজে দেখেচি ! আপনিই তো কুমারবাবু ?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁা।

—"আমার পরম সৌভাগ্য যে এমন চট্ ক'রে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ! মঙ্গল-গ্রহের ফের্তা মানুষ—বাপরে ! এই কচি বয়স, এই বয়সেই এত কাণ্ড করেচেন ? বাপরে !"

বিমল বললে, "কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার আছে বলছিলেন না ?"

—"দরকার আছে বৈকি," বাপরে, দরকার ব'লে দরকার—ভয়ানক দরকার।

ব'লেই চন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আসন থেকে উঠে জান্‌লার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর উঁকি মেরে রাস্তার এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলেন।

আমরা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। চন্দ্রবাবুর ভাবভঙ্গি রীতিমত রহস্যজনক।

চন্দ্রবাবু ফিরে এসে আবার চেয়ারের উপরে ব'সে একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "নাঃ, আজ কেউ আর আমাদের পিছু নেয় নি!"

বিমল কৌতূহল-ভরে বললে, "কে আপনার পিছু নেয়?"

—"যমদূত মশাই, যমদূত! সেই সিংহল থেকে আমার পিছু নিয়েচে। সিংহলে থাকতেই এক ব্যাটা তো বন্দুক ছুঁড়ে আমার দফা এক রকম রফা ক'রেই দিয়েছিল! কোন গতিকে মাথাটা বাঁচল বটে, কিন্তু একটা কাণের আধখানা গেল উড়ে। এই দেখুন না, কাণকাটা হয়ে আছি!"

সত্য বটে! চন্দ্রবাবুর ডান কাণের আধখানা নেই!

—"বাপরে, কি রক্তটাই যে প'ড়ে ছিল! কাণকাটার পর পাছে মাথা কাটা যায়, সেই ভয়ে সিংহল থেকে পালিয়ে এলুম। কিন্তু এখানেও যমদূতেরা আমাকে ছাড়ে নি। বোধ হয় না মেরে ছাড়বে না।"

বিমল বললে, "চন্দ্রবাবু, আপনার কথা তো কিছুই আমি বুঝতে পারচি না।"

চন্দ্রবাবু বললেন, "বিশ্বাস ক'রে যখন আপনাদের কাছে এসেচি, তখন সব কথাই খুলে বলব। কলকাতায় আমার কেউ আত্মীয় নেই। কারুর সঙ্গে পরামর্শ করবারও উপায় নেই। খবরের কাগজে আপনাদের কথা প'ড়ে বুঝেচি, এখন আপনারাই কেবল আমাকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু তার আগে আপনাদের দুজনকেই একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।"

—"কি প্রতিজ্ঞা?"

—"আমার কথায় রাজি হোন আর নাই হোন, আমি যা বলব তা আর কারুর কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না।"

—"আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করচি।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চন্দ্রবাবু বললেন, "আমার পিছনে কেন লোক লেগেচে জানেন ?"

—"বলুন।"

—"আমার কাছে সোনার পাহাড়ের ঠিকানা আছে। খালি সোণা নয়, সেখানে মণিমুক্তোও যে কত আছে তার হিসাব নেই। সে-গুপ্তধন যে পাবে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে সে প্রভুত্ব করতে পারবে! আমি সেই গুপ্তধনের ঠিকানা জানি।...... আপনারা যদি আমার সাহায্য করেন, তাহ'লে তার আধাআধি বখরা আপনাদের দিতে রাজি আছি।"

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

খোস্-খেয়াল

আমি যদি হতুম রাজা আজব শহর কলকাতার
ছাউনি দিতুম বর্ষাকালে গড়ের মাঠে গোলপাতার!
আমি যদি হতুম রাজা শিবপুরে কি হাবড়ায়
তাড়িয়ে দিতুম মাড়োয়ারীদের ক'সে দু'চার থাবড়ায়!
আমি যদি হতুম রাজা বালি কিম্বা বেলুড়ে
খেতাব পেতো ফুটবলেতে শ্রেষ্ঠ যারা খেলুড়ে!
আমি যদি হতুম রাজা বাণ্ডেলে বা হুগলীর
মাছ খায়না যারা তাদের ঝোল খাওয়াতেম গুগ্লির!
আমি যদি হতুম রাজা ফরিদপুর কি ঢাকার
'রবার টায়ার' করিয়ে দিতুম গরুর গাড়ীর চাকার!

আমি যদি হতুম রাজা দিনাজপুর কি রাজসাহীর
আসতো ফিরে সায়েস্তাখাঁর সস্তা বাজার বাদশাহীর !
আমি যদি হতুম রাজা সারা বাংলার মুল্লুকে
পাঠিয়ে দিতুম কাউন্সিলে সব বাঁদর গাধা উল্লুকে !
আমি যদি হতুম রাজা উড়িষ্যা বা বেহারে
জেলে দিতুম সেই ছেলেকে খেলতে গিয়ে যে হারে !
আমি যদি হতুম রাজা সিদ্ধার্থের বুদ্ধ গয়ার
হত'না এই কলিকালে অধর্ম্মে সব যুদ্ধ জয় আর !
আমি যদি হতুম রাজা বিন্ধ্যাচলের কিম্বা কাশীর
মুর্গী যারা খায়না তাদের হুকুম দিতুম লম্বা ফাঁসির !
আমি যদি হতুম রাজা নন্দ গোপের বৃন্দাবনে
কাণ কেটে সব ছেড়ে দিতুম পরের যারা নিন্দা শোনে !
আমি যদি হতুম রাজা দিল্লী কিম্বা আগ্রাতে
বন্ধ হ'তো খোট্টাগুলোর নাল-বাঁধানো নাগ্‌রাতে !
আমি যদি হতুম রাজা গুজ্‌রাটে কি পাঞ্জাবে
হুকুম দিতুম চাইলে দেনা পাওনাদারের প্রাণ যাবে !
আমি যদি হতুম রাজা আমেদাবাদ নাগপুরে
অলিগলিতে বেড়াতো আজ অহিংস সব বাঘ ঘুরে !
আমি যদি হতুম রাজা মাদ্রাজে কি বোম্বায়ে
চিড়িয়াখানায় রেখে দিতুম যাদের বেশী লোম গায়ে !
আমি যদি হতুম রাজা চিতোর গড়ে রাজপুতানায়
তিরিশ কোটী ভারতবাসী তাহ'লে কি আজ জুতা খায় !
আমি যদি হতুম রাজা সিঙ্গাপুর কি রেঙ্গুনে
বিয়ে পাগলা বুড়োর গলে বেঁধে রাখতুম চেন্ বুনে !

আমি যদি হতুম রাজা স্যাং্‌থায় কি চায়নায়
ইাঁকিয়ে দিতুম তাদের যারা মুখ দেখেনা আয়নায়
আমি যদি হতুম রাজা হং্‌কং্‌এ বা জাপানে
নির্বাসিত হ'তো যারা অনভ্যস্ত চা পানে !



আমি যদি হতুম রাজা ক্যানেডা কি মার্কিনে
মরতো যারা করতো খরচ চীনে মাটির জার কিনে !
আমি যদি হতুম রাজা জুলুমুলুকে আফি্‌কার
সাদা রং চুনে চুবিয়ে নিতুম রংটা কালো কাফ্রি যার।
আমি যদি হতুম রাজা মিশর কিম্বা মরক্কোর
দেখিয়ে দিতুম জ্ঞান-পাপীদের জীবদ্দশায় নরক ঘোর।
আমি যদি হতুম রাজা তুর্কী আরব বোগদাদে
ডাণ্ডা খেতো পাণ্ডা যারা জগন্নাথের ভোগ রাঁধে !

আমি যদি হতুম রাজা পারস্তে কি আফ্‌গানে
উড়িয়ে দিতুম গোঁফ দাড়ি সব সেফ্‌টি খুরের সাফ্‌ টানে !
আমি যদি হতুম রাজা রুষ দেশ ওই ইউরোপে
কর্পোরেশন কর্ম্মী যারা ঘুস খেতে সব শিউরোবে !
আমি যদি হতুম রাজা জার্ম্মানী কি ফরাসীর
দেখ্‌তে সোডার বোতলগুলো থাকতো শুধু ভরা ক্ষীর !
আমি যদি হতুম রাজা হল্যাণ্ডে বা বেলজিয়মে
হ'তোনা আর থাকতে কাকেও হোস্টেলেতে জেল্‌ নিয়মে !
আমি যদি হতুম রাজা স্পেনএ কিম্বা পোর্ত্তুগালে
থামিয়ে দিতুম বক্তৃতা সব চড় কসিয়ে জোর দুগালে !
আমি যদি হতুম রাজা অষ্ট্রীয়া বা ইটালীর
লেমনেডের চাইতে হ'তো কলের জলের মিঠা নীর !
আমি যদি হতুম রাজা নরওয়ে কি সুইডেনে
এক হ'তো সব বামুন কায়েত তেলি তাম্লি গুঁই বেণে !
আমি যদি হতুম রাজা কামস্কাট্‌কা হনোলুলুর
বন্ধ হ'তো শব্দ যত বিয়ের রাতে ঘন উলুর !
আমি যদি হতুম রাজা আর্ক্‌টিকে বা সাউথ্‌ পোলে
আট্‌কাতোনা একজামিনে পাশ করাটা স্কাউট্‌ হ'লে।
আমি যদি হতুম রাজা গোরার দেশ ঐ ব্রিটেনে
পাঠিয়ে দিতুম রিফর্ম কিছু ইণ্ডিয়াকে ফিট্রেনে !

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বড় কে ?

১

তোমরা বোধ হয় সকলেই ছত্রপতি শিবাজীর নাম শুনিয়াছ। তিনি সামান্য অবস্থা হইতে শেষে ভারতবর্ষের দক্ষিণে মস্ত-বড় হিন্দুরাজ্য গড়িয়াছিলেন। গোটা ভারতবর্ষই তখন মুসলমান-বাদশার এলাকায়। শিবাজী মুসলমান বাদশার প্রজা হইয়াও নিজের বাহু ও বুদ্ধিবলে হিন্দুদের জন্য স্বরাজ আনিতে পারিয়াছিলেন। তাই আজ আড়াই শো বছর হইতে চলিল, হিন্দুরা তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই—এখনও তাঁহার নাম গান করিতেছে—তাই এখনও চারিদিকে "শিবাজী উৎসবের" আয়োজন হয়।

শিবাজীর বাপ শাহ্‌জী চাকুরী করিতেন বিজাপুরের রাজসরকারে। শিবাজী থাকিতেন পুনায়—দেশে মায়ের কাছে। তিনি যেমন গোঁয়ার-গোবিন্দ, তেমনি সাহসী—কাহাকেও মানিতেন না, কাহারও চোখ-রাঙ্গানীর তোয়াক্কা রাখিতেন না; লোক জুটাইয়া, দল পাকাইয়া লুঠপাট করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমেই শিবাজীর সাহস বাড়িয়া উঠিল। তিনি আজ এ-কেল্লা, কাল সে-কেল্লা দখল করিয়া নিজের এলাকা বাড়াইয়া লইতে লাগিলেন। বাদশা আলমগীর—যিনি প্রায় গোটা ভারতেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—তাঁকেও ভ্রূক্ষেপ নাই। শিবাজী মাঝে মাঝে তাঁর সীমানায় গিয়াও হানা দিতে কসুর করেন না!

শিবাজী এদেশ সেদেশ জয় করিলেন। তাঁর ধনদৌলৎ, সেনা-সামন্ত সবই হইল। তিনি সিংহাসনে বসিলেন—খুব ধূমধাম করিয়া তাঁর অভিষেক হইল। চারিদিকে হৈ হৈ। সকলেই বুঝিল, শিবাজী আর মুসলমান-রাজ্যের প্রজা নয়—একজন স্বাধীন হিন্দু-রাজা। তাঁর রাজ্যে ওড়ে স্বাধীনতার নিশান—পৎ পৎ করিয়া।

অভিষেক-ব্যাপারে শিবাজীর অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছিল—কম বেশি পঞ্চাশ

লাখা। তোষাখানা প্রায় খালি হইয়া গিয়াছিল। শিবাজী তাই সদলবলে বাহির হইয়া পড়িলেন—নূতন রাজ্য জয় করিতে। মাদ্রাজের কর্ণাটকের ওপর আগে তাঁর



শিবাজী

নজর পড়িল—দেশটি ধনধান্যে ভরা একেবারে সোনার দেশ। শিবাজীর দুর্দান্ত মাউলী সৈন্যকে লোকে যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করিত—তারা না পারে এমন

কাজই নাই। সুতরাং কর্ণাটক জয় করিতে শিবাজীকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। ফিরিবার মুখে তাঁর সৈন্যেরা বেলভাড়ি গ্রামে ঢুকিল - গ্রামটি বেলগাঁও-এর পনের ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে। এইখানে শিবাজীর লোকেরা রসদ সংগ্রহ করিয়া লইল।

বেলভাড়িতে একটা কেল্লা ছিল। সে কেল্লার মালিক একজন স্ত্রীলোক— সাবিত্রী বাঈ। শিবাজীর লোকজনকে তাঁর এলাকার উপর দিয়া, বলদের পিঠে রসদ বোঝাই করিয়া যাইতে দেখিয়া, সাবিত্রী বাঈ চটিয়া গেলেন। তাঁরই রাজ্যের উপর দিয়া বিনা হুকুমে বুক ফুলাইয়া যাওয়া! তিনি হুকুম দিলেন—"লুঠে নাও ওদের রসদ----যত পারো।"

শিবাজীর কানে যখন গেল যে তুচ্ছ বেলভাড়ির মত যায়গার একটা পাটেলনী (মালিক) কিনা তাঁর দুর্দান্ত সেনা-সামন্তের রসদ লুটিয়া লইয়াছে, তিনি ত মহাখাপ্পা। "কি এত বড় আস্পর্দ্ধা একটা স্ত্রীলোকের! জান না আমি কে? কত রাজা-বাদশা আমাকে ডরায়! সামান্য একটা মাটির কেল্লা নিয়ে এত বড়াই। রোসো, করছি তোমাকে জব্দ! —রঘুনাথ, যেমন কোরে পার, লুটিয়ে দাও কেল্লাটা মাটির ওপর।"

"যো হুকুম" বলিয়া দাদজী রঘুনাথ সেনা-সামন্ত লইয়া 'হর হর মহাদেব' রবে আকাশ-বাতাশ কাঁপাইয়া বেলভাড়ির কেল্লা দখল করিতে ছুটিলেন। রঘুনাথ ভাবিয়াছিলেন, যাইলেন আর কেল্লা ফতে করিবেন। শেষে দেখিলেন, কেল্লার কাছে এগোয় কার সাধ্য! সাবিত্রী বাঈ একাই একশো। কেল্লার মধ্যে তিনি ছোটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, আর ক্রমাগত সেনা-সামন্তকে উৎসাহিত করিতেছেন। তাদের পণ— জান্ কবুল, তবু দেশের শত্রু মারাঠাদের কাছে মাথা নোয়াইবে না।

দাদজী তিন-চারবার আক্রমণ করিতে গিয়া নিজের অনেক লোকজন ক্ষতি করিলেন। বুঝিলেন, কেল্লা দখল সহজে হইবার নহে। তিনি কেল্লা ঘেরাও করিয়া রহিলেন। ঠিক করিলেন, একটি প্রাণীকেও বাহিরে আসিয়া রসদ লইয়া ফের কেল্লায় ফিরিয়া যাইতে দিবেন না। কেল্লার ভিতর আর কত রসদ আছে? দু'দশ দিন পরে ত ফুরাইবে; তখন?

দিনের পর দিন যাইতেছে। একমাস হইতে চলিল, তবুও শিবাজীর অত সেনা-

সামন্ত বেলভাডির সামান্য কেল্লাটা দখল করিতে পারিল না। চারিদিকের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—ছি ছি এমন স্বন্দ শিবাজা আর কারো কাছে হয় নাই। যে লোক এত রাজ্য জয় করিয়াছে, সে কিনা একটা সামান্য প্যাটেলনীকে সায়েস্তা করিতে পারে না? ধিক শিবাজীর বীরত্বে!

২

এদিকে সাবিত্রী বাঈ দেখিলেন শত্রুর নড়িবার নামগন্ধ নাই। গুলি-গোলা-বারুদ ফুরাইয়া আসিতেছে; তার উপর কেল্লার মধ্যে যে রসদ সংগ্রহ করা ছিল, তাহাও প্রায় শেষ। লোকজন কি খাইয়া বাঁচিবে? ঠিক হইল, পেটের দায়ে মরা অপেক্ষা শত্রু বধ করিয়া মরায় পুণ্য আছে।

সেদিন ভোরে পাখী ডাকার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী বাঈ সদলবলে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। লোকজনকে উৎসাহিত উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি তাঁর গায়ের সমস্ত দামী দামী গহনা পর্য্যন্ত তাদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। তাঁর সৈন্যেরা দলে ভারি না হইলেও আজ মরিয়া। ঘোড়ায় করিয়া সাবিত্রী বাঈ চীৎকার করিতেছেন—"মার্ মার্, নয় মর," আর তলোয়ার ঘুরাইয়া শত্রু বধ করিতেছেন। কিন্তু তিনি আর তাঁর পাঁচ সাত শো সৈন্য কি করিবে? মারাঠারা দলে ভারি, একটা মরিলে তখনি আর একজন আসিয়া সেখানে দাঁড়ায়। কিন্তু সাবিত্রী বাঈয়ের যাহারা মরিতেছে, তাঁহাদের স্থান আর পূর্ণ হইতেছে না। মারাঠারাও আজ প্রাণপণে যুঝিতেছে। একজন স্ত্রীলোকের কাছে লড়ায়ে হারিলে, তাহারা লোকের কাছে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবে?

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। সাবিত্রী বাঈয়ের সারা অঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে। সপ্তরথীতে যেমন অভিমন্যুকে ঘিরিয়াছিল, মারাঠারাও তেমনি তাঁহাকে ঘেরাও করিয়াছে। তবুও সাবিত্রীর বীরত্ব দেখে কে? তিনি প্রাণপণে লড়িতেছেন। হঠাৎ কে তাঁর ঘোড়াটাকে খোঁড়া করিয়া দিল—ঘোড়াটা মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহাতেও সাবিত্রী বাঈয়ের ভ্রূক্ষেপ নাই—তিনি মাটির উপর দাঁড়াইয়াই বন্ বন্ শব্দে তলোয়ার ঘুরাইতে লাগিলেন। কিন্তু এমন করিয়া আর কতক্ষণ চলে? হঠাৎ একজন শত্রু

কচ্ করিয়া তাঁর ডান হাতটা কাটিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে তিনি মারাঠাদের হাতে বন্দী হইলেন। শত্রুর তখন আনন্দ দেখে কে? সাবিত্রীকে কোটে পাইয়া, সাখুজী গাইকোয়াড় নামে শিবাজীর একটা লোক মনের সুখে তাঁহাকে গালিগালাজ ও অপমানের চূড়ান্ত করিয়া, গায়ের জ্বালা মিটাইল। মারাঠাদের পতাকা 'ভাগ্‌ওয়া জেন্দা' বেলভাডির কেল্লার উপর সদর্পে উড়িতে লাগিল।

সাবিত্রী বাঈকে কয়েদ করিয়া কোলাপুরে শিবাজী মহারাজের কাছে হাজির করা হইল। সাবিত্রী বাঈ শিবাজীর সুনামে কলঙ্ক আনিয়াছে। মারাঠা-পক্ষের কত সেনাসামন্ত নষ্ট করিয়াছে। সকলেই ভাবিল, শিবাজী এইবার তাঁহাকে বাগে পাইয়া হয় ফাঁসি লটকাইবেন, নয় শূলে চড়াইবেন। কিন্তু শিবাজী মহারাজ ছিলেন অন্য ধরণের মানুষ। তিনি নিজেও গুণী, গুণের কদরও জানিতেন। সাবিত্রী বাঈয়ের বীরত্ব তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, স্ত্রীলোকের উপর তিনি কখনও অবিচার অত্যাচার করেন নাই—অসহায় নিরস্ত্র লোকের উপর ত নহেই।

শিবাজী সিংহাসনে; সুমুখে দাঁড়াইয়া শৃঙ্খল-পরা বীর রমণী—সাবিত্রী বাঈ, মুখ নীচু করিয়া। শিবাজী তখনই তাঁর শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু সাবিত্রীর যেন জ্ঞান নাই। আজ তিনি শুধু পরাজিত ন'ন,—শিবাজীর এক সামান্য সৈনিক বেলভাডির কেল্লার কর্ত্রীকে অপমান করিয়াছে, ওঃ!

শিবাজী ডাকিলেন, "মা!"

এই শত্রুর পুরীতে, অপমান যেখানে চারিদিকে, সেখানে সাবিত্রী বাঈকে 'মা' বলিয়া কে সম্বোধন করিল? সাবিত্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। শিবাজী বলিলেন,—"নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরে যাও মা! ভবিষ্যতের ভার তোমার এই ছেলের উপর দিয়ে তোমার বেলভাডির কেল্লায় ফিরে যাও।"

হাজার গোলাগুলিতে যাহা হয় নাই, শিবাজীর সামান্য মুখের কথায় তাহাই হইল। 'মা' বলিয়া ডাকিয়া শিবাজী আজ বেলভাডির বীরনারীর হৃদয় জয় করিয়া লইলেন।

শিবাজী ডাকিলেন—"সাখুজী!" সাখুজী হাসিমুখে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল,

ভাবিল মহারাজ তাহাকে না-জানি কি পুরস্কারই দেন। শিবাজী বলিলেন,—"সাখুজী গায়কোয়াড়, তুমি শুধু গোঁয়ার নও, তুমি কাপুরুষ! নারীর গায়ে তুমি হাত তোল, এত বড় তোমার স্পর্দ্ধা! বেলভাড়ির কিল্লাদার-পত্নীকে অপমান ক'রে তুমি আমার মায়ের অপমান করেছ।"

শিবাজী হাঁকিলেন—"কে আছিস, ? নিয়ে যা এই কুকুরটাকে কারাগারে!"

কারাগারের অন্ধকারে বসিয়া সাখুজী গায়কোয়াড় প্রথম বুঝিল নারীজাতির সম্মান রাখিতে না জানিলে বীরপুরুষ হওয়া যায় না; প্রথম বুঝিল সে কি অন্যায় কাজ করিয়াছে; প্রথম বুঝিল সে কত হীন, আর শিবাজী কত মহৎ।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৌচাক

(গল্প)

তোমাদের এই 'মৌচাক' নামটা শুনলেই আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে এখনও, এই মৌচাকের পাল্লায় পড়েছিলাম পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর আগে। সে কথা কি সহজে ভোলা যায়। এতকাল পরে সেই করুণ কাহিনীটা তোমাদের কাছে বলি।

আমার বয়স এখন এই বারো তেরো বছর। আমার দাদা সে সময় একটা নাম মাত্র সহরের ফৌজদারী আদালতে সেরেস্তাদারী কাজ করতেন; আমি সেখানকার মাইনর স্কুলে পড়তাম; তখনও সেখানে এণ্ট্রান্স স্কুল বসে নাই।

আমাদের বাসাই ছিল সহরের একটু বাইরে। সেখানে থাকতেন আমার দাদা আর বৌ-দিদি, আর থাকতাম আমি। আমাদের একটা চাকর ছিল; তার নাম শিবে। সে জেতে ছিল গয়লা। তোমরা হয়ত গল্প শুনেছ যে গয়লার ছেলে চল্লিশ বছর বয়সেও সাবালক হয়না—তারা ভারি বোকা। আমাদের শিবনাথ বা শিবেকে কেউ সে কথা বলতে পারত না; সে বোধ হয় বারো বছর বয়সের সময়ই সাবালক হয়েছিল।



"আমরা এনেছি কাশের গুচ্ছ"



মা

(আলোক চিত্র হইতে)

আমাদের বাড়ীতে যখন সে এল, তখন তার বয়স একুশ কি বাইশ বছর। এই বয়সেই সে বাহান্ন বছরের ঝাঁজ দেখাত। তার অসাধ্য কাজ ছিল না।

শিবে কিন্তু আমাদের চব্বিশ ঘন্টার চাকর ছিলনা; দাদা তাকে তাঁর আদালতের পিয়ন নিযুক্ত করে ছিলেন। সেখানে সে সাত টাকা মাইনে পেত, আর সকাল বিকেল রাত্রিতে আমাদের বাড়ীতে কাজ করত; তার বদলে খেতে পেতো, আর বৌ দিদি মধ্যে মধ্যে কাপড় গামছাও দিতেন। আমাদের যে ঝি ছিল, সে বল্‌ত শিবের মত চোর আর দ্বিতীয় নেই। শিবে এ কথার ষোল-আনা প্রতিবাদ করত না। সে বল্‌ত চুরী ত করিই কিন্তু ও বাড়ীর নেমকহারামি শিবনাথ করে না; তেমন ছেলেই আমি নই। তোমাদের বাড়ী থাকি, খাই-দাই, বৌ-ঠাকরুণ কত আদর করেন। তোমাদের হাটবাজারের একটা আধলাও কোন দিন নিই নাই; ধর্ম্ম ত আছে।"

বৌদিদি বলেন "তা হোলে কোথায় চুরী করিস?"

শিবে বলে "কেন, আফিসে যারা মামলা করতে আসে তাদের ফাঁকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে রোজই দু-আনা চার আনা পাই। যে দিন তা না জোটে সেদিন আফিসের কাগজ কলম পেন্সিল নিয়ে দোকানে দিয়ে পয়সা নেই।"

বৌদিদি বলেন "তারা যদি ধরতে পারে ত তোকে জেলে দেবে।"

শিবে হেসে বলে "ও সব জিনিসের কি দরদ আছে, না হিসেব আছে। আবার তা যদি বল বৌ-ঠাকরুণ, তা হলে মেজেস্টর সাহেব থেকে আরম্ভ করে এই শিবে পর্য্যন্ত সবাইকে জেলে যেতে হয়; সবাই আফিসের কাগজ কলম ঘরে নিয়ে যায়। আর যারা মামলা করতে আসে, তাদের কাছে, এক সাহেব ছাড়া সকলেই ঘুস নেয়, আমাদের বাবুও বাদ যান না। ওতে দোষ নেই বৌ-ঠাকরুণ।"

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করেন "আচ্ছা শিবে, তুই মাসে কত উপরি রোজগার করিস্?"

শিবে বলে "যেমন তেমন করে হোক ঝি ঠাকুরুণ, দিন গেলে আট গণ্ডা পয়সা হবেই, কোন কোন দিন এক টাকা পাঁচ সিকেও হয়।"

এ হেন শিবে যে সাবালক, এ কথা সকলেরই স্বীকার করতে হবে। যাক সে কথা থাকুক, মৌচাকের কথাই বলি, কেমন!

আমরা যেখানে থাকতাম, সেখান থেকে আমাদের বাড়ী বেশী দূর নয়—রেলে আধ ঘণ্টার পথ। দেশে আমাদের জমি জমা ছিল, এখনও আছে। সেই সব আর বাড়ী ঘর দোর সবই বাবুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মা একটী বিশ্বাসী চাকর নিয়ে বাড়ীতেই থাকতেন। দাদা সেই জন্য মাসে দুই তিন শনিবারে বাড়ী যেতেন, আবার রবিবার বিকেলে বা কখন কখন সোমবার প্রাতঃকালে ফিরে আসতেন। তখন বাসার সম্পূর্ণ ভার শিবের উপর থাকত, কারণ আমিও ছেলে মানুষ, বৌদিদিও না হয় আমার চাইতে সাত আট বছরের বড়। সুতরাং দাদা যখন বাড়ী যেতেন, শিবে তখন আমাদের অভিভাবক হয়ে বসত। সে যে কি খবরদারী! শিবে দণ্ডে দশবার আমাদের উপর মুরুব্বিগিরী করত; সে সময় সে বাসা ছেড়ে কোথাও যেত না, বোধ হয় ভাল করে ঘুমত না, মধ্যে মধ্যে উঠে এসে বলত 'ছোটবাবু, একটু জেগে ঘুমিয়ো।

এই রকম এক রবিবারে দুই প্রহরের খাওয়া দাওয়ার পর আমি বাইরের ঘরের বারান্দায় বসে আছি—শিবের হুকুম বাড়ী থেকে কোথাও বেরুতে পারব না। সেই সময় শিবে এসে বল্ল "দেখ ছোটবাবু, আজ তোমাদের এমন জিনিস খাওয়াব, যা তোমরা কখনও খাও নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কি জিনিস শিবে? কিনবার পয়সা দেবে কে?"

শিবে হেসে বল্ল "পয়সা লাগবেনা, অমনিই পাওয়া যাবে।"

আমি বল্লাম" কি জিনিস শুনি না।"

শিবে বল্ল "রাস্তার ও পাশে ঐ যে জঙ্গল দেখছ, ওরি মধ্যে একটা কুল গাছে এই বড় একটা মৌচাক হয়েছে; আজ সেই চাক ভাঙ্গব। তার যে মধু ছোটবাবু, তেমন তোমার রসগোল্লার রসও নয়।"

আমি তার আগে কোন দিন মৌচাক দেখি নাই, মধুরও আস্বাদন পাই নি। আমি বল্লাম "কি করে ভাঙ্গবে?"

শিবে বল্ল "মৌমাছিগুলো ভারি পাজী। এমন কামড়ায় যে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে ওঠে, আর তার জ্বালায় অস্থির হতে হয়।"

আমি বল্লাম "তা হোলে মৌচাক ভেঙ্গে কাজ নেই শিবে।"

শিবে বল্‌ল "না, না, আমাকে কামড়াতে পারবে না; আমি কম্বলে গা ঢেকে যাব, চোখ দুটো শুধু খোলা থাক্‌বে। আজ না ভাঙ্গলে দুই একদিনের মধ্যেই মৌমাছি গুলো সব মধু নিয়ে উড়ে চলে যাবে।"

আমার ত তখন ও সব জানা ছিল না। আমি বল্‌লাম "তা হলে চল্‌, আমিও তোর সঙ্গে যাই।"



শিবে বল্‌ল "না ছোটবাবু, সেগুলো, মাছিগুলো ভারি পাজি, তারা তেড়ে কামড়াতে আসে। তুমি এখানেই বসে থাক। আমি যাব, আর চাক ভেঙ্গে নিয়ে আসব।"

আমি বল্‌লাম "দেখিস্‌ তোকে যেন কামড়ায় না।"

শিবে তখন একখানি কম্বল দিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকে ছোট একখানা লাঠি নিয়ে রাস্তা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। আমি মনে করলাম, রাস্তার উপর গিয়ে দেখিনা, শিবে কেমন করে মৌচাক ভাঙ্গে। আমি রাস্তার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। দুই তিন মিনিট কোন সাড়া শব্দ নেই। আমি ত আর সে জঙ্গলের মধ্যে কোন দিন যাই নাই, কুল গাছ কোথায় আছে, তাও জানতাম না। আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

হঠাৎ 'ওরে বাবারে, মারে' ব'লে চীৎকার করতে করতে শিবে জঙ্গল থেকে ছুটে

বেরিয়ে এল, আর তার পাছে পাছে এল উড়ে এক দল মাছি! শিবে চীৎকার করতে করতে রাস্তা দিয়ে দৌড়িতে লাগল, মাছিগুলোও তার সঙ্গ ছাড়ে না। সে তখন আর কোন উপায় না দেখে, আমাদের বাড়ীর পাশেই যে পুকুর ছিল তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। পালিয়ে যে বাড়ীর মধ্যে বৌ-দিদিকে খবর দেব, তাও আমি পারলাম না, ভয়ে আমার পা দুটো অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে মাছি গুলো তখন আর শিবাকে না পেয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে আসতে লাগল। আমি ছিলাম তখনও রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। কয়েকটা মাছি এসে আমাকে আক্রমণ করল। সে যে কি দংশন! আমি তখন শিবের মত 'বাবা রে, গেলাম রে' বলে ছুটে বাসার দিকে গেলাম। বৌ-দিদি, কি হয়েছে বুঝতে না পেরে একেবারে রাস্তার উপর এসে আমাকে কোলের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। তিনিও দুটো তিনটে দংশন লাভ করলেন, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি না করে আমাকে নিয়ে বাড়ীতে এলেন। আমি তখনও চীৎকার করছি।

ঝি অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছিল ; আমার চীৎকার শুনে উঠে এসে যখন শুনল যে আমাকে মৌমাছিতে কামড়েছে, বৌ-দিদি আমাকে রক্ষা করতে নিয়ে দুই তিনটার কামড় খেয়েছেন, তখন রেগে বল্‌ল "এ সে শিবে হতভাগার কাজ। সেটা গেল কোথায় ?"

আমার তখন কথা বল্‌বার শক্তি ছিলনা বল্‌লেই হয়। আমি অতি কষ্টে বল্‌লাম "সে চেঁচাতে চেঁচাতে পুকুরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে।"

ঝি বল্‌ল "মরুকগে হতভাগা জলে ডুবে। তোমাদের যন্ত্রণা এখনই কম করে দিচ্ছি।" এই বলে দাদার ঘরের বারান্দার পাশে যে মালসায় তামাকের গুল থাকত, সেইখানে গিয়ে কতকগুলো গুল এনে আমার দংশনের স্থান গুলোতে ঘষে দিতে লাগ্‌ল ; বৌ-দিদিকেও তাই করতে বল্‌ল। বৌ-দিদি বল্‌লেন "আমার বেশী যন্ত্রণা হয় নি ঝি। তুমি যাও, দেখে এসো শিবের কি হোলো। তাকে বাড়ী নিয়ে এসে আগে তোমার ঐ ওষুধ দেও। ঠাকুরপোর গায়ে আমি গুল ঘসছি।"

আমি বল্‌লাম "বৌ-দিদি, তোমাকেও যে কামড়েছে।"

বৌ-দিদি বল্‌লেন "বেশী কামড়ায় নি, আমার যন্ত্রণা বোধ হচ্চে না।"

আমার যন্ত্রণা কিন্তু ঐ গুলের কৃপায় তখন একটু কম হয়েছিল। আমি শুয়ে পড়ছিলাম ; উঠে বসে বল্‌লাম "বৌ-দিদি, দেখি তোমার কোথায় কামড়েছে। এ ওষুদ বড় ভাল। তোমার কামড়ানোর জায়গায় লাগিয়ে দিই।"

বৌ-দিদি এত যন্ত্রণার মধ্যেও হেসে বল্‌লেন "ভয় নেই ভাই, মাছির কামড়ে তোমার বৌ-দিদি মরবে না।"

আমি বল্‌লাম "হুঃ, আমি কি তাই বল্‌ছি।"

এই সময় ঝি শিবকে নিয়ে বাসায় এল। তার সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠেছে, সে কাঁপছিল। বৌ-দিদি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একখানি কাপড় এনে দিলেন। শিব তার ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল্‌ল। তখন ঝি আর বৌ-দিদি মিলে তার সর্ব্বাঙ্গে গুল ঘষতে লাগ্‌লেন। তার যন্ত্রণা কিন্তু সহজে গেল না, সারা রাত সে যন্ত্রণায় ছটফট করে ছিল।

আর বৌ- দিদি ঔষধ ব্যবহার করলেন না, কিছুই না। আমাদের যন্ত্রণা দেখে তিনি নিজের যন্ত্রণা ভুলে গেলেন। আজ তিনি স্বর্গে; কিন্তু এখনও তাঁর সেই অনেক কাল আগের কথা মনে হলে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করি। এমন একটা নয়, বৌ-দিদির স্নেহের কত ঘটনা মনে হয়, আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি।

সেই যে বহুদিন আগে মৌমাছির দংশন যন্ত্রণায় কাতর হয়েছিলাম সে স্মৃতি এখনও মুছে যায় নাই। তাই মৌচাকের নাম শুন্‌লেই ভয় হয়। এতকাল পরে আবার মৌচাকে খোঁচা দিলাম, দেখি অদৃষ্টে কি হয়। কিন্তু সে দয়াময়ী বৌ-দিদি যে নেই, এখন মৌচাকের বিভ্রাটে পড়লে সে শীতল-স্পর্শ, সে সঞ্জীবনী সুধা কোথায় পাব!

শ্রীজলধর সেন

জনার্দ্দন সাহা বি, এ

(গল্প)

গ্রীষ্মের বন্ধের পর সেদিন প্রথম স্কুল খুলিয়াছে ; বেলা দেড়টায় ছুটি হইয়া গেল। ছেলের দল হৈ-হৈ শব্দে মহা-কলরব তুলিয়া পথে বাহির হইল।

স্কুলের একটু দূরে একটা খোলা মাঠ…মাঠের এক কোণে একটা জামগাছ। সেই জাম গাছের পাশে সেকণ্ড ক্লাশের ক'জন ছাত্র আসিয়া ভিড় করিয়া বসিল। নিতাইয়ের কাছে ছিল একটা ফুটবল, —কানাই ব্লাডারটা টানিয়া প্রকাণ্ড ফুঁয়ে তাকে পাম্প করিতেছিল, —নিতাই উঠিয়া গোটাকয়েক কঞ্চি কুড়াইয়া গোল-পোষ্ট পুঁতিতে গেল। লক্ষ্মীকান্ত আধ-শোয়া ভাবে বসিয়া ছোট ছোট কটা নুড়ি কুড়াইয়া অদূরে কচুর ঝোপটার মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছিল। দুপুরের অলস বেলা…স্কুল দীর্ঘ কাল বন্ধ ছিল। এতদিনের কর্ম্মহীনতা! চট্ করিয়া এ দলটি কাজের ডাকে প্রস্তুত হইতে পারে নাই—তার উপর বহুকাল পরে পুরানো সঙ্গীদলের জটলা, বাড়ী ফিরিতে কাহারো মন সরিতে ছিল না, তাই এই ফুটবল খেলার উদ্যোগ। বেণী বলিল,—কিন্তু কথাটা সত্যি ভাই, ম্যাথাম্যাটিক্সের নতুন মাষ্টার আসচে…বরদাবাবু স্কুল ছেড়ে যাচ্ছেন…

হরিশ বলিল,—ধেৎ! বাজে কথা! ছুটীর বহু আগেও তাই শুনেছিলুম…বরদা বাবু খুব তো গেলেন…

বেণী কহিল, নারে, এবার সত্যিসত্যিই বাঘ আসচে!

ব্লাডারে ফুঁ দিয়া কানাই হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, —তার মুখ-চোখ রাঙা টক্‌টক্ করিতেছিল। টিউবের মুখটা টিপিয়া ধরিয়া সে কহিল,—পাগো! পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেয় নতুন মাষ্টার আসবে? তোমরাও যেমন! হেডমাষ্টার পাকা ব্যবসাদার…

বেণী বলিল,—বিশ্বাস হচ্ছে না? এই ভাখো কালকের ফরোয়ার্ড ..কথাটা বলিয়া সে রবিবারের ফরোয়ার্ডখানায় ছাপা 'বিজ্ঞাপন'-কলমটা সকলের সামনে ধরিয়া দিল; সকলে সন্ধানী দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে,—ইংরাজীতে বিজ্ঞাপন ছাপা,—

Wanted a teacher for a high-class Calcutta School. Graduate preferred. Must be strong in mathematics. Knowledge

in health-exercises required. Must be a good disciplinarian. Pay Rs 40-per month, Apply by letter, or personally between 4 and 6 P. M. to M. N. R. c/o Box no. 333.

হরিশ কহিল,—কি করে বুঝলে আমাদের স্কুলের জন্যে ? বক্স নম্বর ৩৩৩ লিখচে…

হাসিয়া বেণী কহিল—M. N. R. কথাটার মানে কি…?

কানাই কহিল,—মহিমানাথ রায় ? আমাদের হেডমাষ্টার…?

বেণী কহিল,—তাছাড়া ক্লাশে ওঁর আধ ঘণ্টা করে পড়ানো, আর আধ ঘণ্টা খালি স্পোর্টা, অলিম্পিক গেমস্, আর ড্রিল, জিউজিৎসুর গল্প…এ বিজ্ঞাপনেও health-exercise-এর কথা ! Sir M. N R. ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না…

হরিশ কহিল,—অথচ নিজে তো ঐ লিকলিক সিং…সাবু খেয়ে আছেন… কইমাছও সহ্য হয় না ! উনি হলেন অলিম্পিক গেমসের চ্যাম্পিয় !

সকলে কহিল—যা বলেচো ! কিন্তু বেচারা বরদা বাবু…ভারী ভদ্দর লোক, কাকেও একটি দিন চোখ রাঙাননি !…হোম্-টাস্ক ? হয়নি স্যার। —আচ্ছা, পরের দিন ফাঁকি দিয়োনা আর ; এবারে মাপ…এমন gentleman মোদ্দা আর পাবো না ভাই !

বেণী কহিল,—তাইতো হেডমাষ্টারের সঙ্গে বনছিল না…strong hand চাই ওঁর…শাসন করতে ! তাছাড়া এবার ম্যাট্রিকে ম্যাথাম্যাটিক্সে স্কুল থেকে দশজন ফেল—সে খপর তোমরা রাখো ? মিত্তিরদের হরেন ইংলিশে কি-রকম ওস্তাদ…দাঁড়িয়ে ফ্লড রিলিফ মিটিংয়ে পনেরো মিনিট ইংরিজিতে বক্তৃতা দিয়ে ফেললে—সে-ও অঙ্কয় ফেল।

কানাই কহিল,—তা ভাই, জিয়োমেট্রির ডিডাক্‌সনগুলো কি-রকম শক্ত ছিল, বলো তো…তার উপর অত বড় সিম্পিলিফিকেশন ! সিম্পলি ডিস্‌গাষ্টিং (বেজায় বিরক্তিকর ব্যাপার) ।

হরিশ কহিল—তা ভাই, হরেন মিত্তিরের জন্যে আমাদের এ প্রায়শ্চিত্ত কেন ? একটা বেত-হাতে মাষ্টার আনা…আমরা এক রকম স্বচ্ছন্দ মনে ক্লাশ করছি…

কানাই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলাই এতক্ষণ চুপ করিয়া আলোচনা শুনিতেছিল ; সে এবার কথা কহিল। বলাই বলিল—ঐ ঈশানের বাপ একখানা চিঠি

দিয়েছে হেডমাষ্টারকে —তাঁর বাড়ীর ক'টি ছেলে স্কুলে পড়ে না? তিনি লিখেচেন,—হোমটাস্ক এত কম দেন কেন? ছেলেদের জ্বালায় বাড়ীতে বাস করা যে দায়... হোমটাস্ক বেশী দিলে তাই নিয়ে তবু তারা কতক ব্যস্ত থাকে!

কানাই বলিল—বেশ তো, তাদের ধরে ব্যাকরণ মুখস্থ করাও না, বাপু...তি, তস্, অন্তি, সি থস্ থ...ব্যাকরণের সমুদ্রে চুবিয়ে দিলে আর ট্যাকোঁ করার উপায় থাকবে না তো! এমন ব্যাকরণ থাকতে এক্স, ইনটু ওয়াইয়ের ঘাড়ে চাপা কেন! এতে যে ঠিক বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে!...

কানাই ব্ল্যাডার পাম্প হইয়া গিয়াছিল। বলের ফিতাটা টাইট্ করিয়া বাঁধিয়া উঠিয়া সে সজোরে সেই বলে এক কিক্ লাগাইল। বলটা গিয়া নিতাই যেখানে ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া কঞ্চি পুঁতিতেছিল, একেবারে সেইখানে, নিতাইয়ের ঘাড়ের উপর!...আচম্‌কা বল্ আসিয়া ঘাড়ে পড়ায় নিতাই বিরক্ত হইল, খিঁচাইয়া বলিল—কি, য্যাঃ, তোর সব ছেলেমানষী—এমন লেগেছে, সত্যি...যা...

বেণী কহিল,—অনেকগুলো দরখাস্ত এসেচে...ভবতোষবাবু বলছিল...

ভবতোষ বাবু হেড্ ক্লার্ক!

বেণী কহিল,—তার মধ্যে জনার্দ্দন সাহা বিএঃ...এবার বি-এতে ম্যাথামাটিক্স অনার্সে ফাষ্ট! তাঁরি চান্স বোধ হয় সব-চেয়ে বেশী।

হরিশ কহিল,—একটা মজার প্ল্যান্ আমার মাথায় আসচে...

সকলে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—কি? কি?

হরিশ কহিল,—আমি এই জনার্দ্দন সাহা বি-এ সেজে হেডমাষ্টারের সঙ্গে দেখা করবো...সকলে বিস্ময়ে তার পানে চাহিল, কহিল, বলো কি...ধরা পড়বে যে...

হাসিয়া হরিশ কহিল,—কক্‌খনো না!—আমাদের বাড়ীর পাশে থাকে নরেন দত্ত...নাট্যমন্দিরের ড্রেসার। তার কাছ থেকে এমন সেজে আসব! এই নাক এমন ভারী হয়ে উঠবে—খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ,—হাতে নস্যির শিশি...সে যা বানিয়ে দেবে...। সকলে কহিল—অমনি আর কি!...ধরা পড়ে যাবে না?

হরিশ কহিল—বাজী...দশ টাকা...এমন সাজবো যে তোমরাও চিনতে পারবে না।

বেণী কহিল,—খোঁচা গোঁচা দাড়ি-গোঁফ কেন ?

হরিশ কহিল,—ম্যাথম্যাটিক্স যার ভালো লাগে, সে কখনো ফিটফাট থাকে না, দাড়ি-গোঁফ কামাবার কথা তার মনেও থাকে না! শুধু টু এক্স থ্রী এক্স, এক্স-ওয়াই, আর জিয়োমেট্রির প্রব্লেম ভাবচে দিন-রাত! হাতে খড়ির দাগ, জামায় নস্যির কসানি, পানের পিচ্...স্কেয়ার-রোর মত মূর্ত্তি দাঁড়ায়! নয় ?

সকলে হাসিয়া বলিল -কথাটা মিথ্যা নয়। ঐ যে মাখনবাবু, সাধুবাবু...হবে গিয়ে হেয়ার স্কুলের ত্রিপুরাচরণ সোম্...টাপ্ কানে অবধি খড়ি মাখা!

বেণী হাসিয়া কহিল —তুমি কি আজই জনার্দ্দন সাহা সাজচ ?...

হরিশ কহিল—আজই...শুভস্য শীঘ্রং কথা আছে না ?

বলাই কহিল —মাথা খেলে দেখচি! ধরা পড়ে রাষ্টিকেট হবে, তারি ব্যবস্থা করচো...

হরিশ কহিল, —বলেচি তো, ভাই, দশ টাকা বাজী হারবো যদি ধরা পড়ি...

হরিশ বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বাকী দল 'হিপ্, হিপ্ হুররে' বলিয়া জাম-তলায় বই, খাতা, জুতা রাখিয়া মালকোছা আঁটিয়া বল লইয়া মাঠে নামিল।

২

বেলা প্রায় চারিটা বাজে। মাঠে ফুটবলের খেলাটুকু বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, নিতাই বল্ লইয়া গোলে শুট করার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় ছাতা হাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া খেলার ফীল্ডে ধাঁ করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া ব্যাক্ কানাইলালকে ধরিয়া ফেলিলেন! তখন সে এক ভারী সঙ্গীন মুহূর্ত্ত! কানাই বিষম বিরক্ত হইয়া তাঁকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—এ কি চালাকি পেয়েছেন মশাই ? ফীল্ডের মধ্যে ঢুকে ভারী ইয়ে হচ্ছে...না! সরে যান্।

আর সরে যান! ভদ্রলোক আচম্কা ঐ ধাক্কা খাইয়া মাঠের উপর ডিগবাজী খাইয়া পড়িয়া গেলেন। নিতাইও ভড়কাইয়া বলে এমন শুট মারিল যে বলটা গোলের দিকে না গিয়া বাঁকা পথে সেই জামগাছের তলায় গিয়া টিপ্ করিয়া পড়িল। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যে উঠিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া কহিলেন, -ভারী বদ্ ছেলে তো তোমরা বাপু, তোমাদের ম্যাথম্যাটিক্সের টীচারকে কুমড়ো গড়ান গড়িয়ে দাও!

ম্যাথাম্যাটিক্সের টীচার! বল ফেলিয়া সকলে তাঁকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাইতো, আপনি...? আরে, হরিশ চাটুয্যে! ইস্, আচ্ছা চেহারা খাড়া করিয়াছে তো! মোটে চেনা যায় না! ভারী-ভারী মুখ, গালের কাছটা গাবু হইয়াছে, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ,, মাথায় খানিকটা তেলা টাক...থ্রী চীয়ার্স ফর হরিশ, থুড়ি, জনার্দ্দন সাহা! বাঃ

কানাই কহিল— কি করে এ চেহারা বানালি ভাই?



হরিশ কহিল—ওপর-ঠোঁটে খানিকটা ব্লটিং কাগজ ঠেসে রেখেচি, তাতে ঠোঁট দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সে জন্য মুখের কথাও বদলে গেছে, হেডমাষ্টার ধরতে পারবে না,—আর গাল বয়ে মাথা অবধি পাৎলা রবারের একটা মুখোস পরেচি.—তাতেই খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ, টাকও সেই মুখোসের সঙ্গে সাঁটা ..জুতো জোড়া ভাই, আমাদের সরকার মশায়ের পান-কাপড় আর পিরাণটাও তাঁর। এতে চিনতে পারবে?

বলাই বলিল—আমরাই চিনতে পারচি না, তা হেডমাষ্টার মশায় চিনবেন! কারো সাধ্যি নেই যে তোমায় হরিশ চাটুয্যে বলে...

হরিশ হাসিয়া কহিল—হরিশ চাটুয্যে তো নই আমি, আমি শ্রীজনার্দ্দন সাহা। তবে ভয় হচ্ছে একটা বিষয়ে—যদি বড় বড় অঙ্ক কষতে দিয়ে এগ্‌জামিন করে?... আমার আবার measure গুলো মনে থাকে না,... ক' ড্রামে আউন্স হয় রে?

বেণী কহিল—16 drams make one ounce.

বলাই কহিল—ও তো হলো Avoirdupois weight। আচ্ছা, আর কিসে এক আউন্স হয়, বলো তো...?

কানাই কহিল—আবার কিসে আউন্স হবে!

বলাই কহিল—বাঃ, Troy weight মনে নেই? 20 penny-weights make one ounce। তা ছাড়া Apothecaries weight আছে—8 fluid drachms make one fluid ounce.

হরিশ একটু উদ্বিগ্নভাবে কহিল,—একটি আউন্স নিয়েই এত গোল, এক টন কোয়েশ্চন করলেই তো অজ্ঞান হয়ে যাবো। তার উপর জিয়োমেট্রির প্রবলেম আছে...

বেণী আশ্বাস দিয়া কহিল—ভয় নেই রে, মাস্টারকে মাস্টার হয়ে এগ্‌জামিন করবে না...কাকে কাকের মাংস খায় কখনো?...তা ছাড়া কোয়েশ্চন করলে বলবি, মাসে চল্লিশ টাকা তো মাইনে মশায়, এত কোয়েশ্চন ও মাইনেয় চলে না!...

সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হরিশ এই হাসির মধ্যে তালি-দেওয়া ছাতাটা খুলিয়া মাথায় দিল এবং ধীর-মন্দ গতিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া স্কুলের দিকে চলিল।

৩

হেডমাষ্টারের ঘরে হেডমাষ্টার মহাশয় চা পান করিতেছেন—সামনে হিসাবের খাতা খোলা—মালী আসিয়া খবর দিল, অঙ্কের নূতন মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন।

অচিরে শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন সাহা বি, এ-বেশী হরিশচন্দ্র আসিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল এবং হেডমাষ্টারকে প্রণাম করিল। হেড মাষ্টার মহাশয় বলিলেন—বসুন।

হরিশ সামনের দেওয়ালের কোণে ছাতা রাখিয়া চেয়ারে বসিল।

—আপনার নাম?

—শ্রীজনার্দ্দন সাহা, বি-এ।

হেডমাষ্টার কহিলেন—আপনি বৰ্দ্ধমান থেকে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন না?

বৰ্দ্ধমান! হরিশ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব সামলাইয়া লইয়া সে কহিল,—কলকাতায় এসেছিলুম একটু কাজে, তাই দেখা করে যাই ভেবে ..

হেডমাষ্টার কহিলেন—ভালোই করেচেন! আপনার Qualificationsএর কথা দরখাস্তেই লেখা আছে, না! বলিয়া একটা চিঠির তাড়া টানিয়া লইয়া ঘাঁটিতে-ঘাঁটিতে একখানা চিঠি হাতে তুলিয়া কহিলেন—এই যে, সাত নম্বরের দরখাস্ত। ম্যাথো-ম্যাটিক্সে ফার্ষ্ট,—স্যাণ্ডোর শিস্টেম্ পালন করে থাকেন...কিন্তু আর কখনো মাষ্টারী করেচেন কি না তাতো লেখেন নি! কি জানেন, জনার্দ্দনবাবু, আপনি সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েচেন বদমায়েস ছেলেদের চালিয়ে নিতে পারবেন কি?

হরিশ কহিল—তা পারবো সে এমন শক্ত কাজ নয়। মানে, ছেলেদের আমি ভারী ভালোবাসি—বদমায়েসি করুক তবু তাদের চালানো অসম্ভব হবে না। পাটিগণিত অঙ্ক ...বুঝলেন কি না সাংঘাতিক! মাথায় পড়লে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হেডমাষ্টার কহিলেন—কিন্তু প্রাইভেট স্কুল...মারধোরে ছেলেদের আটকে রাখা যাবে না—গার্জ্জেনরাও সব যা হয়েছেন আজ-কাল! এমন লোক চাই যিনি বেশ বন্ধুর মত ছেলেদের সঙ্গে মিশবেন! শাসন নয়, স্নেহেও ছেলেদের বশ করতে হবে।

হরিশ বলিল,—সে কথা আর বলতে, মশায়! আমি তাদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে নামবো...তাছাড়া হকি, ক্রিকেট...আর অঙ্ক এমন করে তুলবো যে আতঙ্ক হবে না কারো অঙ্ক কষতে দিলে। মৌচাক জানেন তো? ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্র... মৌচাকের মতই তারা ম্যাথাম্যাটিক্সকে মধুময় দেখবে...

হেডমাষ্টার কহিলেন—তারপর ড্রিল, হেল্‌থ একসারসাইজ...আগের টীচার মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা পেতেন—পাঁচ টাকা এবার বাড়িয়ে দিচ্চি ওই হেল্‌থ্ একসারসাইজের জন্য...চারটের পর রোজ একঘণ্টা করে ড্রিল, হেল্‌থ্-একসারসাইজ,—শনিবারে, দুটো থেকে তিনটে...আপনি কি কি সিষ্টেম্ জানেন?

হরিশ কহিল,—তা আমার সব জানা আছে—তা ছাড়া, টেনিস, সাঁতার, এসবও আমার জানা আছে ভালোরকম! আর ম্যাথাম্যাটিক্স...টডাণ্টার, বার্ণার্ড স্মিথ, গৌরীশঙ্কর, হল্ এণ্ড ষ্টীভেন্স—এ সব আমার মুখস্থ...রেডিয়াস কাকে বলে, জিজ্ঞাসা করুন। আউন্স? তিন রকমে আউন্সের ওজন পাওয়া যায়...জানেন?

হরিশের কথায় বাধা দিয়া হেডমাষ্টার কহিলেন—থাক, এখনো আমি কোনো

মীমাংসা করি নি— আরো দু-চারজন দেখা করবেন, বলেচেন কিনা, সকলের সঙ্গে কথা কয়ে যা হয়, জানাবো...আপনি হলেন জনার্দ্দনবাবু...কেমন ?

হরিশ কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, শ্রীজনার্দ্দন সাহা, বি, এ ; graduate preferred.

হেডমাষ্টার কহিলেন—তা, হলে আসুন এখন...

—হ্যাঁ, উঠি ! বলিয়া হরিশ গাত্রোত্থান করিল এবং দেওয়ালের কোণ হইতে তালি দেওয়া ছাতাটা সংগ্রহ করিয়া সে বিদায় লইল। বিদায় লইয়া সোজা সে ময়দানে আসিয়া জুটিল। সেখানে জুটিতেই সকলে চীৎকার তুলিল, হিপ হিপ হুররে—থ্রী চীয়ার্স ফর মিষ্টার জনার্দ্দন সাহা, বি-এ graduate preferred !

৪

পরের দিন টিফিনের ছুটী হইলে হেড ক্লার্ক ভবতোষবাবুকে প্রশ্ন করিয়া ছেলেরা শুনিল, —মাষ্টার ঠিক হইয়া গিয়াছে...। হরিশ সাগ্রহে কহিল কে ? জনার্দ্দন সাহা বি-এ ?

হেড ক্লার্ক মুখটা একটু বিষণ্ণ করিয়া কহিলেন সে আর হলো কৈ ! আমারই মাসতুতো ভাই হয়। আমার কথাতেই দরখাস্ত দিয়েছিল ...

বেণী কহিল—কেন, তিনি বি এতে ম্যাথাম্যাটিক্সে ফার্ষ্ট...তিনি appoint হলেন না কেন ?

ভবতোষবাবু কহিলেন,—হেডমাষ্টার বললেন, কেমন যেন নোংরা ভূতের মতন... খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, বাজে কথা কয়...ছেলেমানুষের মত চালচলন...আমি তো শুনে অবাক ! জনার্দ্দন ইয়া ষণ্ডা, পাকা এথলেট...আর সাজ-পোষাক ভালো, ফিটফাট ছোকরা। তা শুনলুম, কাল এসে সে নাকি দেখা করেছিল হেডমাষ্টারের সঙ্গে ! হতভাগা ! আমায় না জানিয়ে কেন যে দেখা করতে এলো ! পাশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভাবলুম, এখানে মাষ্টারি করতে করতে এম-এটা দেবে, তা আর হলো না !

হরিশের মনে আঘাত লাগিল। ম্যাথাম্যাটিক্সের মাষ্টার যে ষণ্ডা হইতে পারে, আর ফিটফাট হওয়া যে তাঁর পক্ষে অসম্ভবও নয়, এ কথাটা সে মনে করে নাই ! ভবতোষবাবু লোকটি ভালো,...তাঁর মাসতুতো ভাই...বেচারার চাকরিটা তার জন্যই ফসকাইয়া গেল ! তাই তো...

বেণী কহিল—কে টীচার appoint হলো ?

ভবতোষ বাবু কহিলেন—কে একজন অদ্বৈতচরণ সাঁতরা বি, এ...মোহনবাগানে নাকি খেলতো,...বক্সিং জানা আছে...

ছেলের দল একসঙ্গে কহিল—শেষে কে সাঁৎরা...যেৎ তেরি !...অদ্বৈতচরণ...! আমরা তাকে বয়কট করবো...

হরিশ কোন কথা কহিল না। সে গুম্ হইয়া রহিল।...তারপর ছেলের দল অফিস-কামরা হইতে চলিয়া আসিবার সময় দেখে, দলে হরিশ নাই ! কোথায় গেল সে ?...

হরিশ কিন্তু ক্লাশেও যায় নাই। সে সোজা চলিয়া গেছে হেডমাষ্টার মহাশয়ের ঘরে। গিয়া সজল চোখে হাত জোড় করিয়া সে হেডমাষ্টারকে কহিল, —স্যার, আমায় মাপ করুন ..আমি মস্ত অপরাধ করেচি। চশমার মধ্য হইতে দুই চোখের দৃষ্টি হরিশের মুখে নিক্ষেপ করিয়া হেডমাষ্টার কহিলেন কি অপরাধ ? কাকেও মেরেচো ?

কাতর কণ্ঠে হরিশ কহিল —না স্যার, তার চেয়ে বেশী অপরাধ...জনার্দ্দন সাহা বি-এ আপনার সঙ্গে দেখা করেননি কখনো ..

হেডমাষ্টার অবাক ! হরিশ কহিল—আমিই জনার্দ্দন সাহা বি-এ সেজে আপনার কাছে এসেছিলুম, কাল...

হেডমাষ্টার যেন আকাশ হইতে পড়িলেন ! রাগে তাঁর সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল ! দুই চোখে সে রাগ বেশ ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, —তুমি... ?

হরিশ কহিল—হ্যাঁ স্যর ! একটু মজা করবো ভেবেছিলুম।

হেডমাষ্টার গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—মজা ! এত-বড় বেয়াদব ছেলে তুমি, টীচারের সঙ্গে তামাসা করতে আসো ! তোমাকে রাষ্টিকেট্ করা উচিত ..হেডমাষ্টার চুপ করিলেন, হরিশও চুপ। তার বুকের মধ্যে কে যেন মুগুর মারিতেছিল !...

হেডমাষ্টার কহিলেন, —রাষ্টিকেটই করতুম...কিন্তু তুমি নিজে থেকে দোষ স্বীকার করে যে মাপ চাইতে এসেচো, এতে বুঝলুম, তোমার শোধরাবার আশা আছে ! কিন্তু তোমার এই তামাসার ফলে কি হয়েছে, জানো ? জনার্দ্দনবাবুর সম্বন্ধে এমন বদ্ ধারণা আমার মনে জন্মাতে পারতো না ..তাঁকে যে চিঠি লিখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে খুশী

হতে পারিনি, কাজেই তাঁকে নেওয়া হলো না। ..ভদ্রলোক আমায় কি মিথ্যাবাদীই ঠাওরালেন! ছি...

হরিশের গাল বহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। সে হেডমাষ্টারের পায়ের কাছে পড়িয়া কহিল,—আমায় মাপ করুন স্যার—আর কখনো আমি, এমন কাজ করবো না ..

হেডমাষ্টার কহিলেন—বেশ যাও। এবার থেকে বুঝে চলো...এমন বেয়াদবি আর কখনো যেন না হয়...

—না স্যার, আর কখনো হবে না...বলিয়া নিজে হইতেই সে নিজের কাণ মলিল এবং বাহিরে আসিল। সে যে আর কোন সাজা পাইল না, ইহাতেই বর্ত্তাইয়া গেল। বড় গলা করিয়া সে বাজী রাখিয়াছিল...বন্ধুদের কাছেও খুব বাঁচিয়া গিয়াছে! উঃ! কিন্তু জনার্দ্দন সাহা! বেচারা জনার্দ্দন সাহা! হেডমাষ্টারের চিঠি পড়িয়া মনে কতখানি ব্যথা পাইবেন! তার উপায়...? সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বারান্দার এক কোণে ঘেঁষিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বেণী আসিয়া ধাক্কা দিল, – কিরে হরিশ, তোর হলো কি? কানাই আসিয়া কহিল—স্যার, জনার্দ্দন-সাহা-স্যার, ক্লাশ বসছে যে, আসুন আপনি, অঙ্ক বুঝিয়ে দেবেন ..হরিশ তেমনি গুম হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিনদিন পরে ভবতোষবাবু যখন কহিলেন,—জনার্দ্দন আসছে হে, ম্যাথামাটিক্সের টীচার হয়ে...সাঁতরা জবাব দিয়েছেন, যে তিনি টাউন স্কুলে একটা টীচারী পেয়েছেন; মাইনেও বেশী। হেডমাষ্টার সে চিঠি পেয়ে আমায় বললেন, টেলিগ্রাম করে দিন জনার্দ্দন বাবুকে,—তাঁকেই appoint করা হলো বলে। তিনি যেন এই সামনের সোমবারে এসে join করেন। এই ছাখো টেলিগ্রাম—

হরিশ হুমড়ি খাইয়া ভবতোষবাবুর টেবিলের উপর লেখা টেলিগ্রামখানা পড়িল। লেখা আছে—Appointed—Start at once—Bhabatosh Biswas.

হরিশের কি আরাম যে হইল! বলাই কহিল—তুই জনার্দ্দনে ডুয়েল না বাধে যেন শেষে! সাবধান হরিশ! আর হরিশ! মনের আনন্দে হরিশ তখন তিন লাফে অফিস-ঘর ছাড়িয়া তার ক্লাশে আসিয়া বসিয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খোকার ধোঁকা

রাজাবাবুর বড় ছেলে, বয়েস তাঁহার কুড়ি,
বিকেল-বেলা ছাদে উঠে ওড়াচ্ছিলেন ঘুড়ি ;
কেমন-কোরে রাণী-মায়ের লাগলো গিয়ে নজর—
মাথায় যেন পড়লো ভেঙে আকাশ থেকে বজর !
চেঁচিয়ে উঠে কহেন তিনি—"ওমা, একি, একি,
ভর-সন্ধ্যের ছাদে কেন একলা খোকায় দেখি !
ওরে, ওরে, যা, ছুটে যা—কোথায় আছিস্ কে রে,
ঐ দেখ্ না খোকন্ আমার একলা ছাদে ফেরে।
কি যে হবে জানিনে কো হায় হায়, হায়,
দেখ্ দেখ্ দেখ্—বাছা বুঝি টপ্‌কে পড়ে যায়।"

যেমন শোনা আসে ছুটে যত চাকর-দাসী
মেসো পিশে হাঁপিয়ে আসেন, সঙ্গে পিশি-মাসী ;
দেউড়ি থেকে ধায় দরোয়ান, বাগান ছেড়ে মালী,
নায়েব-মশাই দৌড়ে ছোটেন, ফেলে কলম-কালি ;—
এক-ছুটেতে সবাই হাজির এসে ছাদের মাথায়
রাজা-বাবুর বড়-খোকা ঘুড়ি ওড়ায় যেথায়।
খোকা ! খোকা ! সবাই হাঁকে ওরে খোকন-বাছা !
একলা ছাদে উঠেছে আছে পেরিয়ে এত বাধা ;
হঠাৎ যদি কিছু হতো—বাট, বাট, ষাট !
আজকে গেল বাছার আমার কত ফাঁড়ার কাট।

এই-না বোলে সবাই ডাকে এসো খোকন্-মণি,
এসো, যাত্ব খাবে এসো মাখন, ছানা, ননী।
মায়ের নিধি, বাপের তুলাল এসো মায়ের কোলে,
আমরা দেখি খোকা কেমন মায়ের কোলে দোলে !

একটু হেসে, খোকা-বাবু, বয়েস যাঁহার কুড়ি,
তর তরিয়ে নেমে এলেন ভেঙে লাটাই-ঘুড়ি ;
বিছানাতে পড়লো শুয়ে, মাথায় দিয়ে বালিশ,
এ পাশ ও পাশ তুপাশ ফিরে ভেঙে নিলে আলিস।
তার-পরেতে কয়না কথা ফ্যাল্ ফেলিয়ে চায়
যতই ডাকো দেয় না সাড়া—এ কি হলো হায় !

দাদামশাই শুধায় তারে—"কি হয়েছে ভাই ?"
তুই হাতেতে তালি দিয়ে বলে সে "তাই তাই !"
ঠাকুরদাদা ভ্যাবাচ্যাকা, ডাকেন ঠাকুরমাকে ;
হাত-ছানি দে' বলে খোকা, যেমন দেখে তাঁকে—
"চাঁদা মামা, চাঁদা মামা, আও, আও, আও,
চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ দিয়ে যাও।"
এই না বোলে ঝুমঝুমি যে বাজায় ঝুম্ ঝুম
চুষে আঙুল মুখে পুরে পা ছোড়ে হুম্ হুম্।
মা যেই আসে কাছে, তাঁহার ধরে চুলের মুঠি,
বাপের দাড়ি ধোরে বাছা হেসে কুটি কুটি।
গোদা-গোদা হাতে-তুখানা এধার ওধার ঘোরে,
বলে "মাগো, লাড়ু কোথায় ? নিয়ে গেল চোরে ?"
মা ছুটে যান তাড়াতাড়ি আনেন তুধের বাটি ;
খোকা বলে "ঝিনুক কোথায় ? কোথায় ঝুমি কাঠি ?'

এমনিতর বায়না ধোরে খোকা কেঁদে পুন,
ব্যাপার দেখে রাণী-মায়ের মুখটি ভয়ে চুণ!
সবাই অবাক—এ কি হলো? এমন কেন খোকা?
ওরে বুঝি ধরলো ভূতে, তাই লাগে এ ধোঁকা!
তাই বুঝি ওর অমনতর আবোল-তাবোল ভাষা
ফ্যাল্-ফেলিয়ে চাওয়া অমন, ক্ষণেক কাঁদা-হাসা!
এই শুনে তো মা-জননী আছড়ে পড়ে ভূঁয়ে;
খিল্‌খিলিয়ে হাসে খোকা বিছানাতে শুয়ে।
কেউ ছুটে যায় ডাকতে বদ্যি; কেউ বা আনে রোজা,
পুজো নিয়ে কেউ-বা ছোটে কালিঘাটে সোজা।
এলেন বদ্যি, এলেন রোজা এলো চরণামৃত,
তাগা, তাবিজ, আর মাদুলি, কবিরাজী ঘৃত।
কিন্তু কিছু হলোনাকো রইলো খোকা খোকাই,
তাই না দেখে সবাই কেমন বনে গেল বোকাই।

খোকাবাবুর প্রাণের সাঙাৎ নামটি কালীচরণ,
অসুখ শুনে, দেখতে এলো খোকার কেমন ধরণ।
কাণে-কাণে খোকা তাহার কী যে দিল বোলে,
তাই না শুনে কালীচরণ পড়লো হেসে ঢোলে।
সবাই বলে—"কি হলো রে, কি হলো রে, বল্!"
কালী বলে—"বন্ধু-আমার, নামের করে ছল্।
খোকা-নামে ডাকো সবাই তাই করেছে আড়ি
তাই সেজেছেন খোকন্ উনি—বিশ-বছরের ধাড়ি!
ভূত নয়কো, প্রেত নয়কো, নয় যোগিনী-বোগ,
খোকন্-নামটি ঘুচিয়ে দিলে, ঘুচবে বালাই রোগ।"

এই না শুনে রাজামশাই হুকুম করেন জাহির—
"খবরদার ও খোকা নামটা কেউ কোয়ো না বাহির।
আজ থেকে যে ডাকবে ওরে খোকন কিম্বা খোকা,
রোজ সকালে খেতে হবে দশটা কোরে পোকা।"
হুকুম শুনে খুসি খোকা, পেড়ে দাদার ঘুঁটি
বন্ধু কালীর হাতটা ধোরে পালায় নীচে ছুটি।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

হাতী রম্‌জান

আমাদের মণ্টু মাষ্টার সেদিন বক্সিং দেখ্‌তে গিয়েছিল। পরদিন রবিবার, স্কুল ছুটী, তার উপর বাড়ির বড়রাও কেউ ছিল না। কাজেই মণ্টুবাবু, তার দুই ভাই, আর বন্ধু কালু, এই কজন মিলে দুপুর বেলায় বাইরের বারান্দায় বেশ জমিয়ে গল্প আরম্ভ করলে।

মণ্টু খুব হাত পা নেড়ে বক্সিংএর বর্ণনা করছিলো। লালু আর গণেশ দুজনেই তার ছোট, কাজেই তারা দাদার সব কথা হাঁ করে গিল্‌ছিল, যদিই বা সে কিছু নেহাৎ অবিশ্বাস করার মত বলে, ত তাতেও তাদের কিছু বল্‌বার উপায় নেই। শুধু এক কালু মাঝে মাঝে "ধ-যাঃ, বাজে বকিস্ নি" ইত্যাদি বলে নিজের মান বজায় রাখছিলো।

মণ্টু বল্লে—"যাই বলিস্, বক্সিং জিনিষটা একটা সায়েন্সের মত সায়েন্স; ঠিক ওজন মাফিক এক ঘুসী চোয়ালের নীচে বসালে খুব বড় জোয়ানকেও চিৎপটাং—যাকে বলে নক্ আউট্ করে ফেলা যায়।"

লালু ভয়ে ভয়ে বল্‌লো "দাদা, বক্সিং করতে কি খুব গায়ের জোর দরকার?"

"না, তেমন কিছু নেই। ওটা কি জানিস্, ঠিক যেন কুস্তীর প্যাঁচের মত, জোরের চেয়ে কায়দার দরকার বেশী।"

গণেশ বল্লে -আচ্ছা দাদা, যদি একটা কুস্তীগির পালোয়ান আর একটা বক্সিংয়ের ওস্তাদে লড়াই হয় তো কে জেতে?"

মণ্টু কুস্তীগিরের নামে নাক সিঁট্‌কিয়ে বল্লে "দূর গাধা! কুস্তীগিরের আবার লড়াই, তারো আবার কথা! ঐ যে কাল ব্যাট্‌লিং প্যাট্ বক্সিং কল্লে, সে ইচ্ছে করলে এক মিনিটে তোর কাল্লু কিঙ্কর গামা সব কটাকে ঘায়েল করে দিতে পারে।"

কালু ছেলে বেলায় কিঙ্কর সিংকে দেখেছিল, তার কাছে এ কথাটা নেহাৎ বাজে ঠেকাতে সে তক্ষুনি বলে উঠল—"ভাগ্ ভাগ্, রেখেদে তোর ব্যাটলিং প্যাট্। কিঙ্কর এক রদ্দায় তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে গঙ্গা পার করে দিতে পারতো।"

মণ্টু মহা ক্ষেপে বল্লে -"মেলা বকিস্ নি, যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন? ঢের ঢের কুস্তীগির দেখেছি, যত ভুঁদো মোটা মেড়ার দল! বক্সিং লড়্‌নেওয়ালার সামনে দাঁড়ায় এমন কুস্তীগির জন্মায় নি।' বিলেতে কে কুস্তী দেখেরে? আর এক এক টা বক্সিং লড়িয়ে প্রতি ম্যাচে দশ বিশ হাজার পাউণ্ড পায়।"

বাড়ীর দরোয়ানদের বুড়ো জমাদার, রামগিদ্ধড় সিং (সে মণ্টুর ঠাকুরদাদার আমলের লোক) এতক্ষণ কাছে বসে ঝিমাচ্ছিল। কুস্তী, বক্সিং, লড়াই এই সব শুনে সে হঠাৎ কাণ খাড়া করে উঠে বল্লে—"এ, মণ্টুদাদা, বোক সিং কোন দেশের পালোয়ান আছে?" বুড়ো ত ইংরেজী জানে না, কাজেই সে ভেবেছে বক্সিং বুঝি বা বোক সিং গোছের একটা নাম।

দারোয়ানজীর কথা শুনে মণ্টুর দল ত প্রথমে অবাক হয়ে হাঁ করে খানিক তাকাল, তারপর ব্যাপারটা বুঝে চারজনে খুব হাসল। একটু সাম্‌লে নিয়ে মণ্টু বুড়োকে বক্সিংটা কি জিনিষ তা বুঝিয়ে দিলে।

সব শোনবার পর দারোয়ানজি বল্লো—"ও, বোক্সিং গোরাদের ঘুসা লড়াকে বোলে। হামি তো ভাব্‌লো যে সেটা শাজাদি কি জবরদস্ত পালোয়ান হোবে। গামাকে মারে, কিঙ্করকে পিটে দেয়—হেঃ, হেঃ, হেঃ"—দারোয়ানজি খুব এক চোট হেসে নিলে।

বুড়োর হাসিতে মণ্টু চটে বল্লে—"এতে হাস্‌বার কি আছে? একটা ছুরী লড়াইয়ে গোরা অমন দশ পনরটা কুস্তীগির পালোয়ানকে মেরে ফ্লাট করে দিতে পারে। তুমি তার জান কি?"

দারোয়ানজি গম্ভীর ভাবে বল্ল "হামি আর কি জানে! হামি তো আজ পচা-শ বর্ষ কলকাতায় রয়েছি আর তার আগে পন্দ্রা বর্ষ পল্টন মে কাম করেছি; হামি তো অনেক দেখ্‌লো, অনেক শুনলো।" এই বলে খানিক চুপ করে, বুড়ো হঠাৎ মণ্টুর দিকে ফিরে বল্ল. "একদিকে কিঙ্কর সিং অন্য দিকে—বন্দুক সঙ্গীন বাদে—এক পল্টন গোরা দাঁড় করিয়ে দাও। কিঙ্কর এক এক রদ্দায় দশ. বিশটাকে জখম করে, পল্টনকে পল্টন দু ঘণ্টায় সাফ্ করে দেবে! আরে কিঙ্কর ত মরে গেলো, গোলাম, আলিয়া. ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে, সব ত মরে গেলো, এখন বোক্সিং এল লড়াই করতে, হাঃ!"

মণ্টু বেশ তিলকে তাল করে বাড়িয়ে বল্‌তে পারত, কিন্তু দারোয়ানজির একা কিঙ্কর এক পল্টন গোরা সাফ্ করার বহর দেখে সে বেজায় দমে গেল। তাই দেখে গণেশ মহাখুসী হয়ে দারোয়ানজিকে জিগেস কল্লে—"জমাদার ভেট্‌কুয়ার কে ছিল?"

"আরে ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ের নাম শুনোনি? আড্‌ঢাই (আড়াই) প্যাঁচ ভেটকুয়ার—তার দু প্যাঁচ ছিল হাত পা সব লাগিয়ে, আর আধা প্যাঁচ ছিল হাত লাগান বাদে। এই আড্‌ঢাই প্যাঁচে সে দুনিয়া ফতে করেছিল। শুনবে তার কথা?"

"হাঁ, হাঁ, শুনবো" সবাই বলে উঠ্‌লো। দারোয়ানজি তখন গোঁফে তা দিয়ে সোজা হয়ে বসে বল্‌তে লাগ্‌লো।

বলমবটেরের লওয়াব (নবাব) ছিল একটা ভারী বড়ো লওয়াব। তার ছিল বড়ো বড়ো হাথি, হাজার হাজার ঘোড়া, সিপাহি. পল্টন তোপা তমঞ্চা, আরো কতো কি। আর ছিল তার এক পালোয়ান, হাথি রমজান। সেটা দেখ্‌তে ছিল একটা হাথির মতো আর তার গায়ে জোর ছিল দুটো হাথির সমান। তার সঙ্গে কুস্তীতে কেউ পেরে উঠ্‌ত না। জয়পুর ঢোলপুর, মুলতান লাহৌর, সব দেশের পালোয়ান তার কাছে লড়তে এসেছিল। রমজান লড়তে নেমে এদিকে লাফিয়ে, ওদিকে কুঁদে দুই হুম্‌কি মেরে, তিন পাঁয়তারা কসে, ঠিক বাঘের মতো গর্জিয়ে, অন্য

পালোয়ানটার ঘাড়ে পড়ত আর দুই হাথির শুঁড়ের মতো লম্বা হাতে জড়িয়ে তাকে কাবু করে এক আছাড়ে চিৎ করে ফেল্‌তো। আছাড়ের চোটে কতো পালোয়ানের হাথ গোড় ভেঙ্গে চুরে যেতো।

শেষে ভয়ে কেউ তার সঙ্গে লড়্‌তে চাইত না। না লড়্‌তে পেয়ে রমজান ঠিক বুনো বাঘের মতো হয়ে গেলো। সে আজ এর বাড়ীর দেয়াল ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, কাল আর কারুর গাড়ি ঘোড়া উল্‌টে দেয়, এই মত করে সহরে বড়া অত্যাচার লাগিয়ে দিলো। শেষে যখন সহরের লোক সব মিলে লওয়াবের কাছে লালিশ (নালিশ) কর্‌লো, তো তখন লওয়াব হুকম্ দিলে রমজানকে মোটা মোটা শিক্‌লি দিয়ে বেঁধে রাখতে। সকাল বিকাল সেই শিকলি ধরে চারটে হাথি, হাথি রম্‌জানকে টহ্‌লাতে নিয়ে যেতো।

অনেক দিন গেলো, সত্তপুরের রাজার গদ্দি হোলো। সে খুব ধুম, কত তামাসা, নাচ গান, খেল ঠেট্‌র, কত্তো কিচ্ছু হোলো। কত দেশের রাজা উজির লওয়াব ওমরাহ্ এল সে সব দেখ্‌তে। আর সেই সময় এল সেই বলম্‌বটেরের লওয়াব। লওয়াব ত যা দেখে তাতেই বলে "বেশ, বেশ, তবে হামার রাজত্বে এ সব অন্তো রকম আছে।" কি রকম আছে জিগেস্ কল্লে সে কিচ্ছু বোলেনা শুধু হাসে। সব শেষের দিন হোলো দঙ্গল।

—লালু বল্লে "দঙ্গল আবার কি!"

দারোয়ানজি বল্লে "দঙ্গল মানে কুস্তীর ভারী লড়াই, অনেক লোক লড়ে, যে জিতে যায় সে এক বড়া টাকা আর শাল দোশালা অনেক কিছু পায়।"

—মণ্টু বল্লে "ওঃ বুঝেছি। টুর্‌নামেণ্ট।"

দারোয়ানজি বল্লে "তা হোবে"—বলে বল্‌তে লাগলো—"রাজার বড় পালোয়ান ভুট্টা সিং আর তার দুই সাগিদ (চেলা) ত অনেক খেল অনেক কুস্তী দেখালো। রাজা খুসী হয়ে তাদের বখসীস্ করে, লওয়াব কে বল্লে "লওয়াব সাহাব, কুস্তী কেমন হোলো?" লওয়াব বল্লে "বেশ. বেশ, তবে হামার দেশে এ সব অন্তো রকম হয়।"

রাজা অবাক হয়ে বল্লো "সে কি হুজুর, কুস্তীর আবার অন্তো রকম কি হোবে?" লওয়ার তাস্কিজ, বল্লে না, শুধু হাস্‌লো।

রাজা চটে বল্লে "লওয়াব সাহেবের দেশে সবই নতুন, সেখানের কুস্তীও আজব গোছের কিছু হোবে।"

লওয়াব বল্লে "বিশ্বাস না হয় আপনার পালোয়ানদের পাঠিয়ে দেবেন, তাদের নতুন রকম কুস্তী শিখ্লিয়ে (শিখিয়ে) দেবো।"

রাজা বল্লে "হাঁ ? তবে আলবাত্ আমার পালোয়ান সব সেখানে যাবে। আপনি তাদের শিখ্লাবার বন্দোবস্ত করুন।"

লওয়াব বল্লে "বেশ বেশ। তাই হোবে।" বলে একটু হাস্লো।

তারপর কিছু দিন গেলো। রাজার হুকমে পালোয়ানরা দিন দশ দশ হাজার ডন বৈঠক, দৌড়, কুস্তী, চালাতে লাগ্লো। শেষে যখন তারা বল্লে "হুজুর, অন্নদাতা সব তৈয়ার" তখন রাজা তাদের লোক লস্কর সমেত পাঠিয়ে দিলে বলমবটের সহরে। সেখানে লওয়াব ত তাদের খুব খাতির করে থাকার খাওয়ার দেখার, সব বন্দোবস্ত করে দিলে। দু চার পাঁচ দিন যাবার পর রাজার বড় পালোয়ান ভুটা সিং একদিন মস্ত পাগড়ী বেঁধে লওয়াবের দরবারে গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে "হুজুর সরকার, এবার হুকম্ হোক আমাদের কুস্তীর লড়াইয়ের।"

লওয়ার বল্লে "বেশ, বেশ, কাল হোবে।"

তার পরদিন বিকালে লওয়াবের দরবারের সামনে কুস্তীর জায়গা ঠিক হোলো। হাথি রমজানের লড়াই দেখ্তে মুল্লুক শুদ্ধু লোক জড় হোলো। চারিদিকে সোরগোল, চারিদিকে ঠেলাঠেলি, সবাই সাম্নে এগোবার চেষ্টা করছে, এমন সময় কাড়া নাকাড়া শিঙ্গা বেজে উঠ্লো। সিপাহি সোয়ার চারিদিকে ছুট্ল। দেখ্তে দেখ্তে লওয়াব সাহাবের সওয়ারি এসে পড়্ল। চারিদিকের লোক ঝুঁকে কুর্ণিস করে একবার চেঁচিয়ে বন্দেগী জানালো, তার পর সব চুপ।

লওয়াব এসে কুস্তীর আখড়ার ধারে সিংহাসনে বস্লো। খিদমতগার, খাওয়াস্, চামর সর্দার সব চারিদিকে ছুটাছুটি করে তার আরামের বন্দোবস্ত করলে। লওয়াব একটু জিরিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বল্লে—"সত্তুপুরের পালোয়ানরা কোথায় ?"

"হুজুর খোদাবন্দ" বলে লম্বা সেলাম ঠুকে ভুটা সিং এসে দাঁড়ালো।

"তোমরা আমার সহর দেখ্‌ছ কেমন ? এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে না তো ?"

"হুজুরের সহর তো দুনিয়া মশুর (প্রসিদ্ধ) আর হুজুর সরকারের মেহেরবাণী (কৃপা) যার উপর পড়েছে তার সুখের সীমা নেই, সে কথা এ বান্দা হরঘড়ি (প্রতি মুহুর্ত্তে) বুঝ্‌ছে।" নওয়াব খুসী হয়ে বল্লে "বেশ, বেশ, তবে আর কিছুদিন আরাম করো, তারপর দেশে ফিরে যাও।"

ভুট্টা সিং ফের ঝুঁকে লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে "যো হুকুম্ খোদাবন্দ। তবে গোস্তাকি মাফ (অপরাধী ক্ষমা) করলে এ গোলাম একটা আরজি পেশ (নিবেদন) করে।"

নওয়াব বল্লে "বেশ, বেশ, নির্ভয়ে বলো।" পালোয়ান বল্লে "হুজুর রাজা সাহাবের হুকুম ছিল এখানের কুস্তী দেখে যেতে।"

নওয়াব এ কথা শুনে একটু হাস্‌লো। তারপর খানিক চুপ করে তামাক টানলো। চারিধারে একেবারে চুপ, কেউ কথা বলে না। তারপর নওয়াব বল্লো "তোমাদের কি প্রাণের মায়া নেই। হাথি রমজানের হিম্মতের কিছু খবর রাখো ?"

ভুট্টা সিং ফের লম্বা সেলাম ঠুকে বল্লে—"হুজুর এ বান্দার জান (প্রাণ) ত মনিবের হাতে। আর গোস্তাকি মাফ করবেন, অনেক পালোয়ানের হিম্মৎ আমি দেখছি না হয় রমজানেরটাও দেখে নেবো।"

এই কথা শুনে নওয়াবের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠ্‌লো। সে একবার সিংহাসনের হাতলে ভর দিয়ে চোখ লাল করে তল্‌ওয়ার মুঠিতে চেপে ধরে, পালোয়ানের দিকে ঝুঁকলো, তারপরই একটু হেসে বল্‌লো—"বেশ বেশ, তবে তোমরা সব তৈরী হও, আমি তোমাদের শিখ্‌লাবার (শিক্ষা দেবার) বন্দোবস্ত করছি।" এই বলে নওয়াব জোর গলায় হুকম্ দিলে—"রমজানকে হাজির করো।" বলে সে সিংহাসনে ঠেস দিয়ে গম্ভীরভাবে তামাক খেতে লাগ্‌লো।

সন্তুপুরের পালোয়ানরা তৈরী হয়ে আখড়ায় নামলো। ওস্তাদের লম্বা চৌড়া শরীর, প্রকাণ্ড বুক, লম্বা হাত, মহিষের মত ঘাড়। সে আখাড়ায় নেমে একবার সেখানের মাটি মাথায় ঠেকালে, তারপর নওয়াবকে সেলাম করে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের উপর হাত গুটিয়ে, যে পথে হাথি রমজান আসবে সেদিকে তাকিয়ে অচল হয়ে রইলো। তার শাগির্দরাও ঠিক তারই মতো সব করলো।

অল্প দেরী হোলো, তারপর হঠাৎ দূরে একটা ভয়ানক চেঁচামেচি সোরগোল শোনা গেল। আওয়াজটা এগিয়ে আসতে ক্রমে দেখা গেল যে রাজার সড়ক (রাজপথ) দিয়ে চারটে হাথি আর এক দল বর্শা বল্লমধারী সিপাহি, বিষম সোরগোল আর হুড়োহুড়ি করতে করতে আসছে। আরো কাছে এলে দেখা গেলো যে, ডাইনে দুই হাথি, বাঁয়ে দুই হাথি, শিকলি ধরেছে আর তার মাঝে সেই শিকলিতে বাঁধা হাথি রমজান গর্জাতে গজ্জাতে চলে আসছে। তার দাপটে, শিকলি জঞ্জীরের ঝনঝনাতে আর সিপাইদের "হঠ যাও, হঠ যাও" চিৎকারে, পথের দুধারের লোক প্রাণের ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই রকম গোলমাল করতে করতে রমজান কুস্তীর আসরে এসে পৌঁছাল।

পাঁচ হাথ লম্বা, চার হাথ ছাতীর বেড়, ছমণ ওজন, লাল ভাঁটার মতো দুই চোখ, —তার উপর সে জুটো ক্রমাগত ঘুরছে—বাঘের মতো মোচ (গোঁফ)। তারপর লড়াইয়ের নামে সে ক্ষেপে রয়েছে, তার গায়ের লোম খাড়া, আর সে ক্রমাগত গজরাচ্ছে আর দাঁতে দাঁত ঘসছে ঠিক যেন একটা হাথি মস্ত্ (মত্ত) হয়েছে। আসরের ধারে এসে সে প্রথমে নওয়াবকে সেলাম করলে, তারপর এদিক ওদিক মাথা ফিরিয়ে খুঁজতে লাগলো, কে চায় তার সঙ্গে লড়তে।

সত্তুপুরের পালোয়ানরা তার নজরে পড়তেই সে কোমরের শিকলিতে টান মেরে, সেদিকে ঝুঁকে, বেশ ভাল করে তাদের দেখে নিলে। দেখা হয়ে গেলে হঠাৎ সে ভয়ানক জোরে হো হো করে হেসে উঠলো, আর তার পরেই মুখ চোখ লাল করে ঘাড় বেঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে, ভীষণ গর্জ্জন করে সত্তুপুরের পালোয়ানদের দিকে লাফিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—ঠিক যেন একটা বুনো বাঘ শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ছে।

তার চেহারা দেখে আর গর্জ্জন শুনে চারিধারের লোকের মধ্যে ভয়ের চীৎকার আর সত্তুপুরের পালোয়ানদের মধ্যে এক ওস্তাদ বাদে আর সবাই পালিয়ে ভেগে। ওস্তাদেরও মুখ ত সাদা, গায়েও ঘাম ছুটছে, কিন্তু সে ইজ্জৎ বাঁচানর জন্যে া দাঁড়িয়ে রইলো। চারিদিকে যখন এই মতো গণ্ডগোল, তখন নওয়াব সিংহাসন দাঁড়িয়ে উঠে জোরে হেঁকে বল্লো—'খবরদার বেয়াদব বেতমিজ, চুপ রও।' মনিবের তাড়া খেলে ডালকুত্তা যেমন চুপ হয়ে যায়, তেমনি নওয়াবের ধমকে

রমজানও আড়ষ্ট হয়ে গেলো। লওয়াব খানিক তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, ফের এসে বস্‌লো। বসে হুকম্ দিলে—"লোহার কে বোলো শিক্‌লি খুলে দিতে।" লোহার গিয়ে শিক্‌লি খুলে দিলে। মাহুতরা হাতি নিয়ে দূরে সরে দাঁড়ালো। রমজান চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

লওয়াব হুকম্ দিলে—"হাথ মিলাও।"

কটমট করে তাকাতে তাকাতে, ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে, রমজান আস্তে এগিয়ে ভুট্টা সিংয়ের দুই হাত চেপে ধরলে।

লওয়াব বল্লে "তফাৎ যাও"। রমজান সরে দাঁড়ালো। লওয়াব ফের ভুট্টা সিংকে জিগেস বল্লে—"কি, লড়্‌বে তুমি? ওস্তাদের তখন মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না, সে মাথা ঝুঁকিয়ে বুঝালো যে সে লড়্‌তে চায়।

লওয়াব একবার মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লে—"রমজান, লড়ো"। হুকম্ পাবামাত্র রমজান বাঘের মতো গর্জ্জিয়ে, তোপের মতো আওয়াজ করে তাল ঠুকে ভীষণ দাপটের সঙ্গে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আখড়া তোলপাড় করে ফেল্লে। সন্তুপুরের ওস্তাদও তাল ঠুক্‌বার, পাঁয়তারা কস্‌বার চেষ্টা কল্লে, কিন্তু তখন তার ধড় থেকে জান্ বেরোবার মতো হয়েছে, পা আর চলে না, হাথ আর নড়ে না।

দুচার দশবার লাফলাফি করে হঠাৎ মোড় ঘুরে ভয়ানক তেজে হুন্‌কো দিয়ে রমজান ভুট্টা সিংয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো। ভুট্টা সিং ঝুঁকে, দুপা ফাঁক করে, হাথ এগিয়ে রমজানের হম্‌লা (আক্রমণ) সাম্‌লাবার চেষ্টা কর্‌লো। কিন্তু তার হাথ পুরো এগোবার আগেই রমজানের দুই লম্বা হাথ তার ঘাড় গর্দ্দান বেড়িয়ে পিঠের উপর দিয়ে ঘুরে, তার দুই বাজু চেপে ধর্‌লো। তাকে এরকম করে ধরে রমজান খানিক চুপ করে দাঁড়ালো। তারপর দুই ঝাঁকিতে সন্তুপুরের ওস্তাদের পা মাটি থেকে ছাড়িয়ে এক ঝট্‌কায় তাকে মাথার উপর শূন্যে তুলে ধর্‌ল! চারিধার তখন চুপ, সবাই দম্ বন্ধ করে দেখ্‌ছে যে কি হয়।

তারপর "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে রমজান ভুট্টা সিংকে জোরে আছ্‌ড়িয়ে ফেলে দিলো। ভুট্টা সিং দাঁতে দাঁতে লেগে বেহুঁস অবস্থায় চিৎ হয়ে পড়ে রইলো।

লওয়াব হুকম্ দিলে—"হাথি লাও, রমজানকে শিকলি বাঁধো। আর একে ডুলিতে কোরে নিয়ে গিয়ে হকিম বৈদ্ (বৈদ্য) দেখাও।"

দুদিন পরে, ভুট্টা সিংএর জ্ঞান হোলে সত্তুপুরের রাজার লোকেরা তাকে নিয়ে দেশে ফিরলো। সাগিদ্‌রা তো পালিয়ে গিছলো, তারা সরমের (লজ্জার) দরুণ আর দেশে ফিরলো না।

লওয়াব রাজাকে চিঠ্‌ঠি দিলো—"হুজুরের পালোয়ানকে ঠিক মত কুস্তী শিখলাতে পারলাম না। এ লোকের সাহস আছে কিন্তু এ লেহাৎ কমজোর, একজন জোয়ান মরদ্ যদি পাঠাতে পারেন তো তাকে শিখ্‌লিয়ে দেবো।"

চিঠি পেয়ে রাজার মাথা হেঁট হোলো। রাজা সভাসদ সকলকে বল্লে—"দশ হাজার লাগে পঞ্চাশ হাজার লাগে, রমজানকে হারাতে পারে এমন পালোয়ান চাই। এ অপমানের শোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি আর মাথায় পাগড়ি লাগাব না।"

—এত দূর বলে দারোয়ানজি একটু দম নিলে। এই সুযোগে কালু মণ্টুকে বল্লে "কিরে, তোর ব্যাট্‌লিং প্যাট হাতি রমজানের সঙ্গে পারতো ?"

মণ্টু একটু দমে গিয়েছিল। সে ঢোক গিলে বল্লে—ব্যাট্‌লিং প্যাট তো মিড্‌ল ওয়েট, সে পারতো না, তবে ডেম্পসি কিম্বা টুনি হলে কি হোতো বলা যায় না।"

দারোয়ানজি জিগেস কল্লে "ডেম্‌সি কে"

কালু বল্লে "সে মার্কিন দেশের এক মস্ত ঘুষো লড়িয়ে।"

দারোয়ানজি বল্লে "হোঃ, মার্কিন! রমজান তাকে ঠিক মার্কিন কাপড়ের মতো ফেড়ে দুই টুকরা কোরে দিতো।"

গণেশ বল্লে "হাঁ হাঁ তা হবে। তারপর কি হোলো বলো না।" দারোয়ান বল্লে "রও বাবা, এখটু খইনি খাইয়ে লিই।" —বলে একটু খইনি মুখে দিয়ে সে ফের আরম্ভ কল্লে—"তারপর ত সত্তুপুরের রাজার লোক চারিদিকে ছুট্‌লো। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, মুলতান, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, বম্বই, সব দেশে লোক গেলো। কিন্তু কোনও পালোয়ান রমজানের সঙ্গে লড়তে রাজী হোলো না। সবাই বলে "জিত্‌লে তো অনেক পাবো, কিন্তু মরে গেলে জান ফিরে দেবে কে ?"

এদিকে সত্তু পুরে রাজ (রাজত্ব) ত অচল হোয়ে গেলো। রাজার মাথায় পাগড়ী নেই, কাজেই দরবার হয় না, লোক সব হয়রান হয়ে গেলো।

কিছুদিন যায়, তারপর এক দিন সত্তু পুরে এক সন্ন্যাসী এলো। সন্ন্যাসী যেখানে যায় সেখানেই হায় হায় শোনে, শেষে সে একদিন জিগেস করলে, হয়েছে কি। তাকে লোকে সব কথা বল্‌তে সে বল্লে—"আচ্ছা, এর উপায় আমি করছি।" এই বলে সে সটান রাজার সাম্‌নে গেল। সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী "মহারাজের জয় হোক" বলে আশীর্ব্বাদ করতে রাজা বল্লে 'ঠাকুর! হেরে অপমান হয়ে ত বসে আছি, জয় হবার ত কিছু লক্ষণ দেখ্‌ছি না।'

সন্ন্যাসী বল্লে 'মহারাজ আমি সব শুনেছি। কেউ রমজানের সঙ্গে লড়্‌তে চায় না, তাও জানি। তবে যে লোক লড়্‌তে পারে তার কাছে লোক গিয়েছিল কি?"

রাজা, উজির, সর্দ্দার সবাই মুখ উঁচিয়ে জিগেস কল্লে, "কে সে বাহাদুর মরদ?"

সন্ন্যাসী বল্লে "নেপালের সেরা ওস্তাদ ভেট্‌কুয়ার পাঁড়ে; সে জানে আড়্‌-চাই প্যাঁচ, তার দেড় প্যাঁচে সে দুনিয়ার সব পালোয়ানকে হারিয়েছে, তার হাতে আছে এখনো পুরা এক প্যাঁচ।"

রাজা একথা শুনে উজীরের মুখের দিকে তাকালো। উজীর বল্লে, "আড়্‌-চাই প্যাঁচ ভেট্‌কুয়ারের নাম আমরা শুনেছি। তবে সে ওস্তাদ কারুর কথায় বা খাতিরে লড়ে না, তাই তার কাছে লোক যায়নি।"

সন্ন্যাসী একটু হেসে বল্লে "ঠিক। তবে সে আমার ভক্ত, আর মহারাজের বাপও আমাকে ভক্তি করতেন, কাজেই আমি এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" এই বলে সন্ন্যাসী তার গায়ের বাঘছাল থেকে অল্প চারটি লোম ছিঁড়ে নিলো আর ঝুলী থেকে একটা শুক্‌নো আমলকী বার কল্লে। এই গুলো রাজার হাতে দিয়ে সে বল্লে—"তোমার লোকের মারফৎ এক চিঠি আর এই নিশান (চিহ্ন) দাও পাঠিয়ে ভেট্‌কুয়ারকে, আর চিঠিতে লিখো যে, বাবা টঙ্করনাথের হুকম্‌, তুমি হাজির হও।"

এই বলেই "মহারাজের জয় হোক" বলে সন্ন্যাসী হন্‌ হন্‌ করে চলে গেলো। না নিল ভিক্ষা, না নিল দান। যা হোক সে দিনই ত সত্তুপুর থেকে লোক রওয়ানা

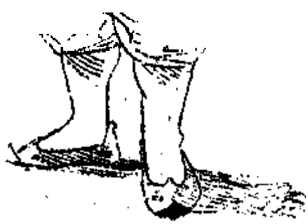
awni <?wtw 15 fa* 581 »iw ci *n CTWIR iir?n faa, «MI "slroi nx«?



sflta c*? afcq ^rta 5Rn ?1«t, cftfr
C5t§ C%f 11 —3fa «f$j>1 C'RI %

csts dOT?rf qpi ft*itl ftfaTO

stw, *i&' sfp*- st? cst*r iftr
*jfwa, ^ vw « wSfatt •top
cental i CT w wrt XCT CFIIT
*oi *"Unfa f\ m ofa" m*
*t?tFI, IMP 1«tW ffflf *> *Sfc**



C3SCT **WI "lilt* Ifcl 'rtvScBlt
, 4 ft* W •fan C?%
^fopffil WttS ft I *^RR *ffa*
•pi qi^-sft *Tjftw *faw& *ife^

4 Wftl 'RWH •"•VII ^ff-i
en 3*tft *fto?fsf* '<RW **PF»$OT(

*rt*ftfa *tw nfoi*iR «fw est ^Rfii *ttwhit^ *n arte* «ft Pwsflwi i

•'.; «ik«Pf «)W^ »NCTfelK* f*N *H*rfo *9C9* *flqfo TO Clt* »l«qp I #

*t«Sfa fcft *tCV5 C*C1 ^ *G1 ^eill 5fiW* «i|*£ C5CT «PlH

. *vm* S^tW «B *ttC*F Os| r>i fafar.g q|W I f^MfWs WS| Sift *rf<f
. ^3 *ri *rc'*<F si 5>;C*J ci fas *it« fan *iw*> T
flt«i csi^gfaw win »KJ? wtr.9fi i <sw %$fs? C5k«f ^cw #r»-

form 1 f«Hjrtre 5j f«t*i?i!wi r' st^ r.*it* *m$* iw to c*&.$st?i
*i"to? <ipi#R ?9ppc§ora «RWlca sit** c<nra c>wto ^KB I
^ Jttcs flw $w *tta $*ta *m* **H* *tt#, <flt ^ CHfol c<fc<t
•ieslw* *wtt «*, c*rtf $(*w 3^P« I c^S^nfe *ffa '«N «w,
HOT1CT9 fa* ftW,' C5N ^*,*f3 *foC*tOI HJCTlCT *P|OTI I <5fa
«JJpB C6C& T# owfa *C9 g[9]! fCT ClOT1 I • 1<R CI CW *l«jfalFF
CT^ ^01*U*I—"*rt»HCT CTW «fa ^I?19$3RI «RPft3R WOT* 43 ^W^

. ••jflf^^Wfl Cfc«flCWfo 13 ft? 9|W||»| ^foGHfl *rt*ft Wlfo

^w . <^f?rfare «i^ f^Ri faro ^cai ^sWi) 'slw b^ ?c^

' ^prft- wrfe^ror*iW?&i *HFQQ,* ^<R ^ <wt •fertcw';.

CWcKSl CTtefa C^fl, ^ 1 1 - SftS% <?R?9 ^>Jh C*ICT C1SC5? (• 5fa *M 5&1 s a* 5^1sftfs *wto* JlM 1

VftCatSlafSf "StoW fa* - 1 * | "stffCS CM W.s «Pt% CTl -" ilfa* StfajS ^1 ^to C51 scs^s w.s ws •iife ^1 1 ntc^sfs? on fa$ tfs ^fts ? ^*Hm* cfc*r <^ "Tf^w *t<j? sitsfo, $33 est wfa siftc* c«i>s<pita <?ites (%s) !^i fas fa/» f?f*t *R fa*i stc* *anps* »IM-{%' ft*. C?H ci 4*$i fsf^TNWs ^ wwse (*rcit?rto) cwts 1

t# 3^$ C^f^l W CS^fjitt "5ft fa* facs CBH ^"f wt'5 'Tta C*fcfl 'Sfc*l "5|(3 (3WC« ^tlWt—MTI5W «§l, TO,, ^; *lC5 Sty *ttO? <3t*J,

^*m y% ante* s ^ret*! iwsfftrei >ifet CFct flwi, ^w Wf W Cl lfil« *8ffa* «Pt CWI, fl *« 1^* *C3, 3|5S?El

%$.^s"cfiB—<?ra ^ <?na—vwtpu *ttora fas* fag iw c*wa

Q& ^*m-ipi wmm am* ** *tft- ^^11.»«?« cets •««



fell ;«ii3fts:;#M

আওয়াজে হাস্‌তে লাগ্‌লো, মনে হোলো যেন সে লওয়াবকে ভেংচাচ্ছে।

আছাড় খেয়ে রমজানের চেঁচান বন্ধ হোলো। সে মুখবন্ধ করে দস্তুর মাফিক লড়্‌তে লাগলো। কিন্তু কি করবে? ভেটুকুয়ার ঠিক ভেল্কী বাজির মতো সড়াক্‌ সড়াক্‌ এদিক ডুব ওদিকে গোঁত্তা খেয়ে তাকে এড়িয়ে তার প্যাঁচ ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লো।

—মণ্টু বল্লে "সাইড স্টেপিং। লোকটা নিশ্চয় বক্সিং জানতো।"

দারোয়ানজি চটে বল্লে "ফের বোক সিং! সে বেটা কুস্তীর কি জানে? বোক সিংএর বাপ এলেও এরকম লড়্‌তে পারতো না। শুনবে তো শোনো।"

কালু বল্লে "হাঁ, হাঁ, শুনবো। মণ্টু তুই চুপ কর।"

দারোয়ানজি বল্‌তে লাগ্‌লো—এই মতো ত লড়াই চল্লো। যদিই বা রমজান কোনও রকমে ভেটুকুয়ারের বদনের কোথায়ও হাথ লাগায়, তো সেখানে ঠিক যেন সাপ কিল্‌বিল্‌ করে খেলে উঠে আর রমজানের হাথ খুলে যায়। আর ভেটুকুয়ার সরে গিয়ে কেবল লাথি চালায় আর হাসে। হাথ একবারও উঠায় না। খানিকক্ষণ এরকম হবার পর রমজান আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারলোনা, সে আবার গর্জ্জন করে, দু হাথ বাড়িয়ে ভেট্‌কুয়ারের উপর লাফিয়ে পড়লো, যেন সে তাকে চেপে পিষে মার্‌তে চাহে।

রমজানের লাফানোর সঙ্গে সঙ্গে "জয় বাবা টঙ্করনাথ" বলে চেঁচিয়ে ভেট্‌কুয়ার, ঠিক বিজ্‌লীর চমকের মত, এক গোঁৎ খেয়ে রমজানের দুই পায়ের মাঝে ঝুঁকে নিজের ঘাড় ঢুকিয়ে দিলে, দেখে মনে হোলো যেন রমজান তার পিঠে সওয়ার হয়েছে। তারপর পলকের মধ্যে এক ভীষন ঝট্‌কায় সে সোজা হোলো, আর রমজান ঠিক্‌রে আস্‌মানে উঠে তিন চার ঘুর্ণি (ডিগ্‌বাজী) খেয়ে ধদ্দড়াম করে আছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়্‌লো।

তখন ভেটুকুয়ার পাঁড়ে লওয়াবের সামনে এগিয়ে এসে ঝুঁকে সেলাম ঠুকে বল্‌লে—"হুজুর ভেটুকুয়ার পাঁড়ে তো জানে আড়-ঢাই প্যাঁচ, আধা প্যাঁচে তো সরকারের পালোয়ান চিৎ হয়ে গেলো, এখন হুকম্‌ হোক জনাবের, অন্য কেউ আসুক বাকী দুই প্যাঁচ তাকে শিখ্‌লায়ে দি।"

লওয়াব ত এতক্ষণ মন্ত্র ফুকা সাপের মতো আড়ষ্ট হয়ে ছিলো। পাঁড়েজির কথায় উঠে বসে সে তার তারিফ (প্রশংসা) করে, তাকে শাল, দোশালা দিয়ে বল্লে—"আমি তোমার কুস্তী দেখে খুসী হয়ে গেছি। তুমি ফিরে যাও। আমি রাজা সাহাবকে চিঠি দিচ্ছি।''

ভেটকুয়ার চিঠি নিয়ে সন্তপুরে ফিরে এলো। চিঠিতে ছিলো—"যে শিখতে এসে ছিলো সে শিখে গিয়েছে। যে শিখ্‌লাতে এসে ছিলো সে শিখ্‌লিয়ে গিয়েছে। সাবাস্‌ হুজুর! আমি আস্‌বো হুজুরের সঙ্গে হাত মিলাতে।"

রাজা চিঠি পড়ে ভেটকুয়ারের পাগড়ীতে নিজের শিরপ্যাঁচ লাগিয়ে দিলো। তার পর তাকে দশ হাজার মোহর, শাল দোশালা, জওহরাৎ (মণিমুক্তা) ইনাম (বখসীস) দিয়ে, হাথির উপর বসিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলো।

[এই গল্পের ছবি চিত্রশিল্পী শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু অঙ্কিত]

"জগন্নাথ পণ্ডিত"

ডেম্পসীর পরাজয়

কয়েক মাস আগে আমরা টুনির কাছে মুষ্টি যুদ্ধে পৃথিবী-বিজয়ী ডেম্পসীর পরাজয়ের কথা মৌচাকে লিখেছিলাম। সেই যুদ্ধে ডেম্পসীকে হারিয়ে টুনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টি যোদ্ধা (World Champion) বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু এই পরাজয় ডেম্পসী মাথা পেতে নিতে পারেনি। কি করে যে তার নষ্ট গৌরব উদ্ধার করবে তাই সে এত দিন ভাব ছিল। সে কিছুদিন আগে একটা মুষ্টি যুদ্ধে সার্কি (Sharkey) নামে একজন বড় মুষ্টি যোদ্ধাকে হারিয়ে ডেম্পসী ও তার বন্ধুদের ধারণা হয় যে সে এইবারে টুনি যে হারাতে পারবে।

টুনি বড় না ডেম্পসী বড় এর একটা শেষ মিমাংসা ২৩সে সেপ্টেম্বর শিকাগো সহরে হয়ে গিয়েছে। এক খেলা দেখতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক জড় হয়েছিল। এই খেলাতেও টুনির কাছে ডেম্পসীকে ফের পরাজয় স্বীকার কোরতে হয়েছে। এই লড়াইটা দশম মণ্ডলের ছিল। ছয় মণ্ডল পর্য্যন্ত (6th round) দুই জনেরই প্রায় সমান

সমান অবস্থা ছিল। কিন্তু সপ্তম মণ্ডলে ডেম্পসীর প্রচণ্ড ঘুষির আঘাত অকস্মাৎ টুনির গায়ে এসে এমন ভাবে লাগল যে সে একেবারে পড়ে গেল। পড়বামাত্র রেফরী ওয়ান, টু, থ্রী, কোরে তের পর্য্যন্ত গুণতে আরম্ভ কোরলেন। বক্সিং এর নিয়ম অনুসারে এই তের গোণার মধ্যে যদি টুনি ফের দাঁড়িয়ে উঠতে পারে তবেই আবার খেলা হবে, তা না হলে টুনির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। বক্সিং এর আর একটী নিয়ম এই যে একজন পড়ে গেলে অপর জন তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে গিয়ে রিং এর চার ধারে যে দড়ী থাকে তাই ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। রেফরী এক, দুই, তিন চার পর্য্যন্ত গোণা হয়েছে; কিন্তু ডেম্পসী ভুল কোরে রিং এর দড়ার ধারে না গিয়ে টুনির মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছিল যদি সে উঠতে চেষ্টা করে তবে তাকে আর এক ঘুষি লাগাবে। রেফরী গোণা বন্ধ করলেন, ডেম্পসী নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি দূরে দড়ী ধরে দাঁড়ালেন। ডেম্পসী সরে গেলে রেফরী পুনরায় গুণতে আরম্ভ কোরলেন ৫, ৬, ৭, ৮, ৯। নয় বলবার মাত্র মাতালের মত টলতে টলতে টুনি আবার দাঁড়াল।

ডেম্পসী এই সামান্য একটু ভুল যদি না করতো, অর্থাৎ সে যদি রেফরীর গোণা আরম্ভ মাত্র টুনির কাছে ঝুঁকে না থেকে দড়া ধরে দাঁড়াত তা হলে আজ তাকে এই পরাজয় হয়ত স্বীকার করতে হত না। কারণ দেখা গেল ডেম্পসীর এই দোষের জন্যে রেফরী চার সেকেণ্ড থেমে ছিলেন; এই চার সেকেণ্ড সময় নষ্ট না হলে তের গোনার মধ্যে টুনি উঠতে পারত না। এই চার সেকেণ্ডের কি দাম তা ডেম্পসী হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন।

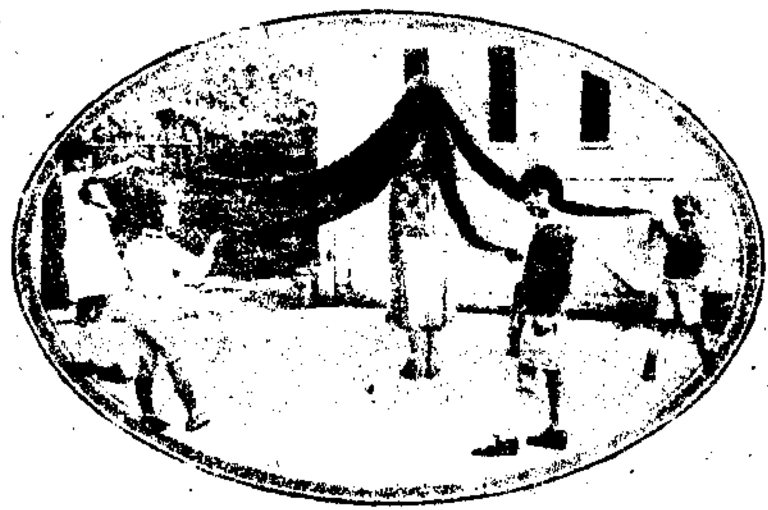
তারপর খেলার কথা। নয় গোণার সঙ্গে সঙ্গে টুনি মাতালের মত টলতে টলতে দাঁড়িয়ে উঠল। তখনও কিন্তু সে চারদিকে শর্ষের ফুল দেখছিল; আর তার উপর ডেম্পসীর বজ্রমুষ্টির আঘাত প্রতি সেকেণ্ডে তাকে চারদিকে গোলক ধাঁধা দেখিয়ে দিচ্ছিল। এই রকম করে সপ্তম মণ্ডল শেষ হল।

অষ্টম মণ্ডলের খেলা যখন আরম্ভ হোলো এখন এ টুনি সে টুনি নয়। তখন টুনি লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধারূপে দেখা দিল। টুনির হাতের অব্যর্থ ঘুষির সামনে পৃথিবী বিজয়ী ডেম্পসী ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল। ডেম্পসীর পা অবশ হয়ে এল, হাত শক্ত হয়ে গেল, চোখের সামনে

ছায়া পড়তে লাগল। ডেম্পসীর চোয়াল দিয়ে, চোখ দিয়ে, মাথা দিয়ে দরদর কোরে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। চোয়ালে ঘুষি, মাথায় ঘুষি, চারিদিকে ঘুষি—ডেম্পসী আর দাঁড়াতে পারছিল না। এমন সময় দশম মণ্ডলের খেলা শেষ হল এবং দর্শকের সামনে রেফরী টুনির জয় ঘোষণা করলেন।

সবজান্তা

এখানে যে ছবিটা ছাপা হোল তাতে দেখতে পাবে একটী মেয়ের চুল ভাগাভাগি কোরে কতকগুলি ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় চুল পৃথিবীতে আর



কারো নেই। এঁর নাম মিসেস্ ম্যাকফারসন। এঁর চুল আট ফিট দুই ইঞ্চি লম্বা।

তিন জন পার্শী ছেলে সাইকেল চড়ে বম্বে থেকে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, প্রায় তিন বৎসরে পৃথিবী ঘুরে তাঁরা কলকাতায় এসেছেন, এখন বম্বের দিকে রওনা হবেন।

যে তিন জন বাঙ্গালী ছেলে সাইকেল চড়ে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁরা এত দিনে টার্কিতে গিয়ে পৌঁছেছেন।

এখানে যে ঘুড়ির ছবি দেখছ, তা আমেরিকার মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনখানা বড় বড় বিছানার চাদর দিয়ে এই ঘুড়িটা তৈরী হয়েছে। এই ঘুড়িটা ওড়াতে তিন জন লোক লাগে। আর এর সুতো দড়ীর মত মোটা। ঘুড়িটা লম্বায় ১৯ ফিট ও চওড়ায় ১৩ ফিট।



সব চেয়ে বড় ঘুড়ি

সাধারণতঃ পিঁপড়ের জীবন দশ থেকে বার বৎসর পর্য্যন্ত।

জাপানের কাছে কোন কোন স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ৩৪,৪১৬ ফিট। এর চেয়ে বেশী গভীরতা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

হাতী ও ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘুমোয়, শ্লথ নামে এক জানোয়ার আছে, তারা গাছে নিজের শরীরকে ঝুলিয়ে পা দিয়ে গাছ ধরে ঘুমোয়; খরগোস, মাছ ও সাপ চোখ খোলা রেখে ঘুমোয়; শেয়াল, নেকড়েরা কুণ্ডলী আকারে মাথা পায়ের কাছে নিয়ে এসে ঘুমোয়। পেঁচারা দিনের বেলায় ঘুমোয় এবং চোখের উপর তারা এক রকম পরদা টেনে দিতে পারে যাতে দিনের আলো চোখে লাগে না। লম্বা পা-ওলা পাখী, যেমন Stork কিম্বা Gulls, এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়। মানুষই একমাত্র জীব যারা পিঠের উপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকে।

পৃথিবীর সব রকম ভাষার একটা মিউজিয়াম প্যারী সহরে করা হয়েছে। গ্রামোফোনে এই সব ভাষা তুলে রাখা হয়েছে। এখন এই সব ভাষা চিরকাল পৃথিবীতে থাকবে।

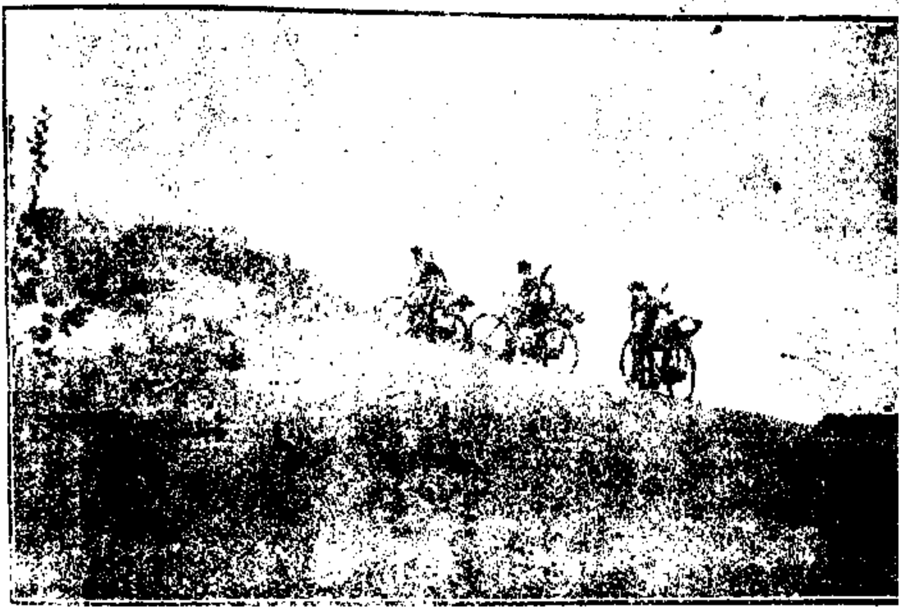
সে দিন কলেজ স্কোয়ারে ৬১ বৎসরের বৃদ্ধ বাঙ্গালী সাঁতারে আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর নাম শ্রীঅগ্নিকুমার সেন। সকাল ৬টা ২০ মিনিটের সময় তিনি জলে সাঁতার দিতে আরম্ভ করেন। আর রাত ৮টা ২৫ মিনিটের সময় তিনি জল থেকে ওঠেন। এইরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে। তিনি বলেছেন যে ইংলিস চ্যানেল সাঁতার দিতে চেষ্টা করবেন।

এই মাছের চেহারা দেখলে তোমরা নিশ্চয়ই হাসবে। কি সুন্দর চেহারা এর। কেমন সুন্দর গোল গাল চেহারা, কেমন চোখ ও কাণ। এই মাছের মজা হচ্ছে এই যে সময়ে অসময়ে সে শরীরকে অসম্ভব রকম ফোলাতে পারে। এখানে যে ছবি দেখছ তা নিজের শরীর ফুলিয়ে এই অবস্থা হয়েছে। এই মাছের নাম হচ্ছে টিয়া পাখী মাছ। সামনে যে চারটে দাঁত দেখছ, তা যেন ঠিক টিয়া পাখীর ঠোট। এই চারটী দাঁত এমন ধারাল যে তারা অনায়াসে তামার তার কেটে



ফেলতে পারে। এদের গায়ের রং খুব চমৎকার ও উজ্জ্বল। এর গায়ে খোঁচা খোঁচা আঁশ [illegible] [illegible]।

বাঙ্গালী ছেলেরা—যারা পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন, তাঁদের ছবি এখানে দেওয়া হোল।



বালির উপরে বাঙ্গালী ছেলেরা সাইকেল ঠেলে চলেছে

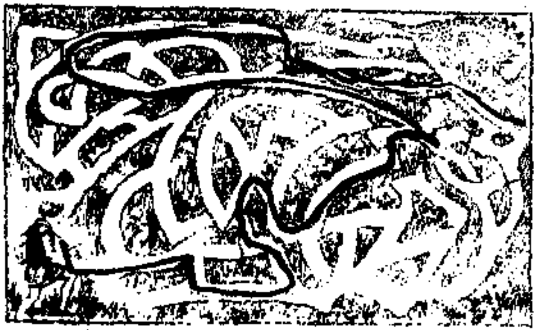




সিরিয়ার পাহাড়ের ধার দিয়ে বাঙ্গালী ছেলেরা চলেছে।



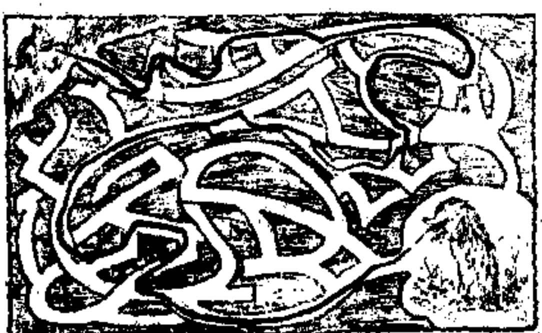
মজার ধাঁধা



গোলক ধাঁধা—তলোয়ার হাতে ছেলেটা উপরের দৈত্যকে কেটে ফেলতে চায়। তোমরা রাস্তা দেখিয়ে দাও।



এ জিনিষটা কি বল ত? কতক-গুলো কাটা লাইন হিজিবিজি যা তা। কিন্তু তা নয়; কতকগুলো লাইনকে পেনসিল দিয়ে কালো করে দেও। দেখবে দুটো চীনে ছেলে হাত ধরাধরি কোরে নাচছে।



গোলক ধাঁধা—নিচের বড় জন্তুটা উপরের ইঁদুরকে খেতে চায়। রাস্তা দেখিয়ে দাও।

বুদ্ধির প্রশ্নের উত্তর

১। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী

২। চেরাপুঞ্জী (আসাম)

৩। ছয় মাস

৪। হ্যানিম্যান

৫। হাইড্রোজেন

৬। সাজাহানের স্ত্রী মমতাজের কবর

৭। প্রেম-সাগর

৮। অগস্ত্য মুনি

মৌচাকের পুরস্কার

১। পুজোর সময়ে তোমরা অনেকে নানা জায়গায় বেড়াতে যাবে। মৌচাকের গ্রাহকগ্রাহিকারা যারা তাদের বেড়ানোর সুন্দর বর্ণনা পাঠাবে, তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। লেখা ছোট হওয়া চাই; বড় হোলে চলবে না। ছাপলে মৌচাকের তিন পৃষ্ঠা কিম্বা সাড়ে তিন পৃষ্ঠার বেশী যেন না হয়। প্রথম পুরস্কার ৫ খানা বই; দ্বিতীয় পুরস্কার ৩ খানা বই। লেখা ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে মৌচাক আপিসে আসা চাই।

২। পূজোর ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে তোমরা যারা ফটো তুলবে, তাদের জন্যে এই আর একটা পুরস্কার। সুন্দর দৃশ্যের ছবি চাই। গ্রাহকগ্রাহিকাদের নিজের তোলা ছবি হওয়া চাই, অন্য কেউ তুলে দিলে চলবে না। ছবি ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে মৌচাক আপিসে আসা চাই। এক জন যে কয় খানা ইচ্ছা ছবি পাঠাতে পারেন। প্রথম পুরস্কার ৮ টাকা; দ্বিতীয় পুরস্কার ৪ টাকা।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, কিনল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

মৌচাক

৮ম বর্ষ]　　অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪　　[৮ম সংখ্যা

পূজার বাজার

আজি এই　পূজার দিনে
যা' খুসী　আন্‌তে কিনে
মা দিলেন　পয়সা আমায়।
নিয়ে তাই　রাস্তা চলি
আমি আজ　কৌতূহলী
কি কিনি　ভাবছি তা ঠায়।

বাজারে　গেলাম চলে'—
দেখি ভাই　সদল বলে
কত লোক　কর্‌ছে বাজার,
কত কি　কিন্‌ছে আসি!
খেলানা　পুতুল বাঁশী
কত সব　হাজার হাজার।

কেহ বা　কিন্‌ছে সরেশ
বুঁদিয়া　ক্ষীর দরবেশ
কত কি　কিন্‌ছে মিঠাই ;—
আমারে　সাম্‌নে দেখে
দোকানী　বল্‌ছে হেঁকে
বাবু সাব্　তোমার কি চাই ?

কি কিনি　ভাবছি আমি
কত কি　সস্তা দামী
দেখে সব　চক্ষু ধাঁধায়,
ঝমাঝম্　বাজ্‌ছে কাঁসর
জমছে　মায়ের আসর
আবেগে　গড় করি মায়।

ও পাড়ার হাবুল গান্দুস
কিনেছে লাট্টু ফানুস্
আমারে দেখায় এসে,
বোঁ করে লাটু ঘুরায়
নিমেষে ফানুষ উড়ায়
দেখে সব মরছে হেসে ;

অদূরে একটি ছেলে
সকরুণ চোখটি মেলে
রয়েছে মুখটি নীচু :
মিনতির কাঁদন সুরে
বলে সে হাতটি যুড়ে'
'বাবু দে— ভিক্ষে কিছু,—

সারাদিন খাইনি যে গো
দু' মুঠি ভিক্ষে দে গো
মরি যে ক্ষুধার জ্বালায়—"
আহা তার শরীর কাঁপে
আঁখি জল নয়ন ছাপে
কথা তার কাঁপছে যে হায়।

গায়ে তার ছিন্ন বসন
অঝোরে ঝরছে নয়ন
মেখেছে পথের ধূলি ;
দেখে তাই ভিড় ঠেলে, ভাই
আমি তার সামনে আগাই
দিনু তায় পয়সা গুলি।

* * *

কিনে আজ খেলনা শত
যে টুকু স্ফূর্ত্তি হোতো
সে টুকুর মূল্য কি ভাই ?
আজি এই ক্ষুদ্র দানে
যা প্রীতি জাগছে প্রাণে
আহা তার মূল্য যে নাই।

শুনে মা উল্লাসে কয়
ওরে তুই আমার তনয়
এ কথা ভাব্‌তে মনে
পুলকে বুক ভরে যায়
ওরে তুই আয় বুকে আয়
পেয়েছি শুভক্ষণে।...

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

ক্লাব

(গল্প)

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বিজয়ার পরদিন সন্ধ্যাবেলা মণি দলবল নিয়ে রতনের কাছে হাজির। এসেই বললে, তারা একটা ক্লব করবে। রতন তখন এক মনে কি একটা বই পড়ছিল। চার-পাঁচজনকে হঠাৎ ঢুকতে দেখে বই বন্ধ করে সে শুধু চেয়ে রইলো। মণি বললে, "অমন হাঁ করে চেয়ে রয়েছ কি? তুমি তো ঘরের কোণ থেকে নড়বে না! কি হয়েছে জান? আমাদের ওরা অপমান করেছে। সে দিন গ্রীন রুমে ঢুকতে দেয় নি। আমি নয়, ভীম-দা ঢুকতে গেয়লো। সিধু মাস্টার বললে, "এখানে কেন? বাহিরে বসে দেখো না!"

রতন হাসতে হাসতে বললে, "এতে অপমানের কি আছে?"

মণি চটে গেল "অপমানের কি আছে! কি তোমার বুদ্ধি! ওরা না হয় কলেজেই পড়ে! তা বলে এত চাল কিসের? আমরাও তো আজ-বাদে কাল কলেজে ঢুকবো। আর আমরাও বুঝি একটা ক্লাব করতে পারি নে। প্লে-টে না হয় নে-ই হোল! দেখ রতন, আমরা সব ঠিক করে এসেছি, আমরাও একটা ক্লাব করবো। তুমি যদি রাজি হও, তো আজ থেকেই শুরু করে দি।"

রতন বললে "আরে, ক্লাব করে কি হবে?"

"কি হবে? তা-ই যদি তোমার মাথায় ঢুকবে, তা হলে ঘরের কোণে শুধু বই মুখে করে বসে থাক? ও ভীম-দা, চুপ করে আছ কেন? বুঝিয়ে দাও না রতনকে সব ভাল করে!" মণি এই বলে ভীম-দা, ওরফে ভীমের হাত ধরে টেনে নিয়ে রতনের সামনে বসিয়ে দিলে।

ভীম ছেলেটি নামেই ভীম, চেহারাতে কিন্তু মোটেই ভীমত্ব নেই। রোগা ডিগ্‌ডিগে আর লম্বা। সমস্ত চেহারাটার ভেতর কেবল নাকটাই বড়, আর নাকের ডগায় বসানো কালো ফ্রেমে আঁটা গোলগোল দুটো চসমা। ভীম এই সবেমাত্র মাস-দুই মণির ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। ছেলেটির অনেক গুণ। সে নাকি-সুরে গান গাইতে জানে,

দেশ-বিদেশের গল্প জানে, আর লম্বা-চওড়া কথা ফেঁদে সবাইকে নিজের দিকে টানতে জানে। কাজেই বয়সে সমান-সমান হলেও অল্প দিনের ভেতর সে ছেলে-মহলে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ভীম-দা।' ক্লাবটা তারই হুজুগ্।

ভীম এগিয়ে এসে বললে, "দেখ রতন, ক্লাব হলে অনেক লাভ। আমরা রোজ সকলে এক জায়গায় জড় হতে পারবো। গান, আমোদ-আহ্লাদ এই সব করতে পারবো, আর মাঝে মাঝে সকলে মিলে 'ফিষ্ট্' করবো –" রতন হো হো করে হেসে উঠ্‌লো, "তাই সোজা করেই বল যে, খাবে-দাবে আর ফূর্ত্তি করবে।"

রতনের হাসিতে ভীম একটু অপ্রস্তুত হোল, ঘাড় নেড়ে বললে "না না, তা কেন ? আমার সব কথা শোনই আগে।" তারপর চসমাটা একবারটি ঠিক করে নিয়ে, একটুখানি নড়ে বসে, আর খুক্ করে একবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে সে বলতে আরম্ভ করলে, "দেখ রতন, ক্লাব মানে মস্ত একটা জিনিষ। এখানে সবাই আমরা সমান। প্রথমেই আমাদের করতে হবে কি জানো ? সবাইকে জুটিয়ে এক করতে হবে। আমাদের এখানে কেউ বড়ও থাকবে না, কেউ ছোটও থাকবে না। সব এক। কি বল হে, মণি ?"

মণি বললে "তা নয় তো কি! সবাই আমরা সমান। নইলে, উপর ক্লাশে পড়ি বলে নীচু ক্লাশের ছেলেদের তাচ্ছিল্য করলুম,—এ ভাব আমরা রাখবো না।"

ভীম এবার দাঁড়িয়ে উঠে হাত-মুখ নেড়ে সুরু করলে, "শুধু কি তাই! এখানে থাকবে আমাদের সকলের সমান অধিকার, সকলের সমান ক্ষমতা, সকলের সমান আধিপত্য, আর হবে সকলের একই রকমের ব্যবহার।"

রতন বললে, "তা যেন বুঝলুম, কিন্তু ক্লাবটা হবে কোন্ জায়গায় ?"

মণি এজন্যে তৈরী ছিল, ফট্ করে বলে উঠ্‌লো, "কেন, তোমাদের বাগান বাড়ী তো এখন খালি পড়ে রয়েছে ?"

"তা কি হয়! বড়-দা না হয় এখন দিন-কতক পূজোর ছুটিতে বেড়াতে গেছেন। তিনি এসে যদি টের পান, তো সব ভেঙ্গে দেবেন।"

"আহা, বরাবরের জন্যে কি আর বল্‌ছি! ওহে শচীন, তুমি যে চুপ করেই রয়েছ! বল না, কি কি সব ঠিক করে এসেছ?"

শচীন বললে, "আমি বল্‌ছিলুম কি, কোজাগর পূর্ণিমার দিন তোমাদের বাগান বাড়ীতে খুব ভাল রকমের একটা 'ফিস্ট' হোক্‌।"

ভীম বললে "বেশ ভাল কথা। ঐদিন 'ফিস্ট্'ও হোক্, আর ঐদিন ক্লাবেরও 'ওপ্‌নিং' হোক্। এ অতি সুন্দর কথা। কেমন, সকলের এতে মত আছে তো? রতন, তুমি কি বল?" রতন বিশেষ কিছু না বলে শুধু ঘাড় নাড়লে, অন্য ছেলেরা কিন্তু ভারী খুশী হয়ে উঠ্‌লো।

মণি বললে, "দেখ, আমি তাহলে একটা কথা এখন বলতে চাই। ক্লাব করাই যখন ঠিক হোল, তখন আমাদের ভেতর কে কি হবে, এখন থেকে তা ঠিক করে ফেললে ভাল হয়। আমি বল্‌ছি যে, সেক্রেটারী হোক্ আমাদের —।"

ভীম কি জবাব দিতে যাচ্ছিল, হটাৎ ঘরের কোণ থেকে আওয়াজ এল,—"ম্যাঁও!"

সবাই মুখ ফিরিয়ে দেখে, রতনের ছোট ভাই কানু তার বেড়ালটাকে বগলে নিয়ে চুপ্‌টি করে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। সে যে কখন্ থেকে এসে এদের কাণ্ড-কারখানা দেখ্‌ছে, কেউ তা টের পায় নি। কানুকে দেখেই তো রতন রেগে উঠ্‌লো, "আরে তুই কখন্ এলি? যা বলছি এখান থেকে!"

ভীম বললে "আহা, থাক্ না। ও আমাদের কি আর ক্ষতি করছে?"

রতন বললে, "তা কি হয়?" ভীম তাকে বোঝাতে লাগলো, "তুমি বুঝ্‌ছ না রতন। ছোটদেরও আমাদের দরকার আছে। কাউকে আমরা বাদ দোব না—দিতে পারি না। সবাইকে নিয়েই আমাদের কাজ।

রতন বেঁকে বসলো "ওরা যদি থাকে, তো আমি এর মধ্যে নেই। ছোটদের সঙ্গে আমি মিশতে পারবো না, তা কিন্তু বলে রাখ্‌ছি।" এই নিয়ে তর্কাতর্কি বেধে গেল। কানু মুখটি চুণ করে বেড়ালটাকে বগলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এদেরও সেদিন গোলমাল করে সভা ভঙ্গ হোল।

কানুর ভয়ানক দুঃখ হয়েছে। সকাল বেলা উঠেই সে চল্‌লো দীঘির পাড়ে।

দীঘির এদিকটাতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কানুদের বাগানবাড়ী, আর ওদিকটাতে বটতলায় যত ছেলের আড্ডা। ঘর থেকে বার করে দেওয়াতে কানুর খুব দুঃখ হয়েছে নিশ্চয়, তবে তারও ভারি ইচ্ছা করছিল রুনু, বিশু, খুসু অরুণ এদের সবাইকে জড় করে ভীম-দার মতো হাত মুখ নেড়ে সেও বক্তৃতা সুরু করে দেয়, আর বলে –"এই, ক্লাব! এখানে সবাই আমরা সমান"—কিন্তু কাকেই বা বলে এখনো যে কেউ আসে নি! কানুর বেরালটা সঙ্গে সঙ্গেই ফিরতো। সে থেকে থেকে তার মুখের দিকে চেয়ে করছিল –'মেঁও'। কানু আর থাকতে পারলে না। বেড়ালটাকেই উদ্দেশ করে সে আরম্ভ করে দিলে, 'দেখ্ আমাদের এই ক্লাব। এখানে সবাই আমরা সমান। এখানে কেউ বড় নেই, কেউ ছোট নেই। এখানে সকলেরই আমাদের সমান ক্ষমতা, সকলেরই সমান অধিকার, আর—"। কানুর বক্তৃতা আরো খানিকক্ষণ হয়তো চলতো, এমন সময় কারা সব খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্লো। পিছন ফিরে দেখে—অরুণ, খুসু, বিশু, চনু, মনু এরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে আর হাসছে। কানু তড়াক্ করে কাছে এসে বললে, "আরে তোরা এসেছিস্? দেখ ভাই, ভারি এক মজা হয়েছে।" অরুণ হাসতে হাসতে বললে, "তোর মাথা খারাপ হোল না কি? আপনার মনে কি সব বকে যাচ্ছিলি?"

"মাথা খারাপ হবে কেন? বল্ছি তো, ভারি এক মজা হয়েছে? দাদারা সব ক্লাব করছে। আমাদের ভাই, একটা ক্লাব করতে হবে।"

অরুণ হোল মণির ছোট ভাই। অরুণ ভারি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ ভাই কানু বল্তো, কাল আমার দাদা তোদের ওখানে অত রাত অবধি কি করছিল?"

"তবে আর বল্ছি কি? ওরা সবাই ক্লাব কর্ছিল।"

"ও! ক্লাব করা হচ্ছিল। আচ্ছা দাঁড়াও, মাকে বলে এমন বকুনি খাওয়াব আজ!"

"বকুনি খাইয়ে আর কি হবে? তার চেয়ে আমরাও আমাদের ক্লব করি আয়!"

"ক্লাব করে কি হবে?"

"কেন, ওরা যা করবে— আমরাও তাই করবো!"

"ওরা কি করবে জানিস্?"

"পূর্ণিমার রাত্রে 'ফিস্ট' করবে।"

"আর"।

"শেষ অবধি যে আমায় থাকতে দিলে না! নইলে সব জেনে নিতুম!"

"থাকতে দিলে না কেন?"

"না ভাই, থাকতে দিলে না। আমি এক কোণে চুপটি করে বসেছিলুম, আমায় বার করে দিলে। ওরা বলেছে, আমাদের সঙ্গে মিশবে না!"

অরুণ মহা খাপ্পা হয়ে উঠ্‌লো "কি! বার করে দিয়েছে তোমায়! থাম, বার করে দেওয়া দেখাচ্ছি! আজ আমি নিজেই যাব। এ সব কি তোর কাজ! ওরা কি করে, না করে, আজ আমি সব জেনে আসবো।"

কানু মুখটি কাঁচু-মাঁচু করে বল্‌লে, "ঢুক্‌তে দিলে তো?"

"আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে। তোরা এক কাজ কর দেখি। চট্ করে হারুর কাছে যা। তাকে সব বলিস্, বুঝলি? ওকে চাই। নইলে পাল্লা দেবে কে? বলিস্ যে, আমাদের অপমান করেছে। যা শিগ্‌গীর! আমি ওদিকে চল্‌লুম, সন্ধান নিতে।"

তারপর সমস্ত দিন অরুণের আর দেখা নেই। সন্ধ্যা হতে না হতেই সে করলে কি, কানুর দাদার পড়বার ঘরে চুপি চুপি ঢুকে পড়লো, আর একটা টেবিলের নীচে লুকিয়ে বসে রইলো।

সন্ধ্যার পর মণি, রতন, ভীম আর তাদের সঙ্গে আরো পাঁচ-সাত জন এসে ঘরের ভেতর জড়ো হোল। আজকেও প্রথম বক্তা হোল মণি। মণি বললে, "খাওয়া-দাওয়ার যোগাড়ের ভার নিয়েছে শচীন আর পটল। সে দিকে আমাদের মোটেই দেখতে হবে না। এখন কথা হচ্ছে যে ঐদিন আর কি কি হবে, সে-সব আজকেই ঠিক করে ফেলা হোক্। কি বল ভীম-দা?"

ভীম বললে, "নিশ্চয়! এখনি একটা প্রোগ্রাম্ ঠিক করে ফেলা হোক্। প্রথমেই হবে গান, তারপর হবে আবৃত্তি, তারপর হবে আবার গান, তারপর হবে—"

রতন মহা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো, "তোমারা গান গেয়ে তা হলে হৈ চৈ করতে চাও না কি? না, না, গান-টান ওখানে হবে না!"

মণি চটে গেল "তুমি সব-তাতেই অমন ভয় পাও কেন বল তো! ভীম-দা একা গাইবে, তা হৈ চৈ হবে কেন, শুনি? ঐদিন ক্লাব খুল্‌ছো, একটু গান-টান না হলে মানাবে কেন? শুধু কতকগুলো খাবার খেয়ে পেট ভরালে আর হবে কি? আচ্ছা শচীন আর পটল গেল কোথা? তাদের তো আর দেখাই নেই। শেষটার সব পণ্ড করে বসবে না তো?"

এই কথা বল্‌তে না বলতেই শচীন, তার পিছু-পিছু পটল এসে হাজির। শচীন এসেই লম্বা এক ফর্দ্দ ধরে দিল আর চীৎকার করে উঠ্‌লো "এই দেখ্‌ কি গ্রাণ্ড্‌ ব্যাপার!" তারপর হঠাৎ ফর্দ্দটা নিয়ে পকেটে পুরে বললে, "না এখন বলা হবে না"।

"বলা হবে না কি হে!" এই বলে মণি তার মুখের দিকে চাইলে।

শচীন্‌ আবার ফর্দ্দটা বার করলে, তারপর একটু মুচকি হেসে বললে, "আচ্ছা তা হলে শোন্‌। এই প্রথম নম্বর হচ্ছে, ছানার পোলাও; দ্বিতীয় নম্বর—রাধাবল্লভি; তৃতীয়—"

রতন লাফিয়ে উঠ্‌লো, "ছানার পোলোও না কচু! অত-সব হবে কি করে শুনি!'

শচীন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো "কি হবে, সে খোঁজে তোমাদের অত কাজ কি? আমরা দু'জন যখন ভার নিয়েছি, আমরাই তখন দায়ী। কি বল হে, পটল!"

রতন কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেবিলটা হঠাৎ নড়ে উঠলো, আর সেই সঙ্গে টেবিলের নীচু থেকে খুব জোরে আওয়াজ এল—"ফ্যাঁচ্‌!"

ব্যাপার হয়েছে এই যে, অরুণ টেবিলের নীচে মশার কামড়ে অস্থির হয়ে উঠেছে। ধরা পড়বার ভয়ে সে এতক্ষণ কোন রকমে চুপ্‌চাপ্‌ ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা মশা 'পোঁ' করে তার নাকের ভেতরে ঢুকে পড়াতে সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গেল, আর হেঁচে ফেল্‌লে—'ফ্যাঁচ'!" আর যায় কোথায়! সবাই হৈ-হৈ করে উঠ্‌লো, রতন ঝুঁকে পড়ে দেখলে, কে একজন শুটি-সুটি মেরে বসে রয়েছে। "কে রে, তুই ওখানে? কানু বুঝি? বেরিয়ে আয় বল্‌ছি! দাঁড়া, তোর চোরের মতো লুকিয়ে থাকা বার কর্‌ছি।" এই বলে রতন তার একটা পা ধরে টানাটানি লাগিয়ে দিল।

ভীম বল্‌লে, "আহা, নামই না রতন, অত ব্যস্ত হও কেন? আমি ওকে বুঝিয়ে

বলছি।" এই বলে সে অরুণের ডান হাতটা ধরে টানতে-টানতে বললে, "বেরিয়ে এস তো খোকা। তোমার কোন ভয় নেই। বেরিয়ে এস—আমি বলছি কোন ভয় নেই।"

ওদিকে রতনও তার পা ধরে টান্‌ছে। এতক্ষণ মশার কামড়ে অরুণের মেজাজ ছিল বিগ্‌ড়ে। তার উপর হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়াতে আর টানাটানিতে তার ভয়ঙ্কর রাগ হয়ে গেল। সে অমনি রাগের মাথায় খুব জোরে মারলে এক কামড় ভীমের ডান পায়ের গোড়ালিতে। ভীম 'বাপ্‌' করে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, আর তার হাত ছেড়ে দিল। অরুণ তখন ভটাং করে টেবিলটা উল্‌টে ফেলে দিয়ে দে দৌড়—ধর্‌ ধর্‌ করেও তাকে কেউ ধরতে পারলে না, সবাই কিন্তু দেখলে যে, সে রতনের ভাই কানু নয়, সে মণির ভাই অরুণ।

এই ব্যাপারে সকলেই ভয়ানক চটে গেল, বিশেষ করে মণি আর রতন। মণি বললে "ভেবেছিলুম, ওদেরও সেদিন ডাক্‌বো। এখন কিন্তু আর আমাদের ত্রিসীমায় ঘেঁস্‌তে দিচ্ছি না। কি ভীম-দা, আর ওদের ডাকবে?"

ভীমের মুখে কথা নেই। সে মাটিতে বসে পড়ে গোড়ালিতে খালি হাত বুলোচ্ছে আর জোরে জোরে ফুঁ দিচ্ছে।

পরদিন সকাল বেলা কানু আর অরুণ দু'জনে মিলে চল্‌লো হারুর সঙ্গে পরামর্শ আঁট্‌তে। হারুকে প্রথমে এরা বাড়ীতেই দেখতে পেলে না। শেষে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখে, সে তাদের পাহাড়ী চাকর হীরা সিং-এর কাছে বসে বন্দুক সাফ্‌ করা দেখছে, আর পাশেই পড়েছিল একটা ভাল্লুকের চামড়া। সেইটা নিয়ে টানাটানি লাগিয়ে দিয়েছে। হীরা সিং মস্ত শিকারী, দিন-কতক হোল, সে একাই একটা ভাল্লুক শিকার করে এনেছে। ঐ চামড়াটা তারই।

হারু যেমন সাহসী তেমনি ফন্দিবাজ। অরুণ আর কানুর মুখে সব কথা শুনে সে চুপ করে রইলো। তারপর বললে, "দাদারা ক্লাব করছে, তো হয়েছে কি? ওরা যা করবে, আমাদেরও কি ঠিক তাই করতে হবে?"

অরুণ বললে, "কিন্তু ওরা যে আমোদ করবে, গান করবে, কত রকমের খাবার খাবে—রাধাবল্লভী ছানার পোলাও; কত কি যে নাম শুনে এলুম!"

অরুণ বললে, "বেশ তো, আমরাও সকলে মিলে আমোদ করবো, আর খাব-দাব। তবে, ছানার পোলাও-টোলাও নয়। সেদিন কোজাগার পূর্ণিমা তো? আমরা দীঘির পাড়ে বসে নারকোল, চিঁড়ে, নাড়ু—এই-সব খুব মজা করে খাব, আর হৈ হৈ করবো। ওরা বাগান-বাড়ীতে বসে গান করবে, আমরা বোটে চড়ে দীঘির জলে দাঁড় টানবো। কেমন, রাজি তো?"

অরুণ বললে, "ওদের দেখিয়ে-দেখিয়ে এ-সব করতে হবে কিন্তু।"

হারু হেসে ফেললে, "বেশ, তা হলে রুণু, অমল, চনু, মনু, বিমল এদের সবাইকে খবর দাও। সকলে যেন বেশী-বেশী করে চিঁড়ে-নারকোল নিয়ে আসে।"

কোজাগার পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার ঢের আগেই হারু তার দলবল নিয়ে দীঘির পাড়ে হাজির হোল। ছেলেদের চেঁচামেচি, ছুটোছুটিতে লাফালাফিতে দীঘির পাড় তোলপাড় হয়ে উঠ্‌লো। সন্ধ্যা হতে না হতেই পূর্ণিমার চাঁদ ছেলেদের খেলা দেখবার জন্যে বটগাছের পাশ দিয়ে মুখ বাড়ালে, আর দীঘির জল চাঁদের হাসিতে ঝল্‌মল্‌ করে উঠ্‌লো। ছেলেরা এবার লাফালাফি, ছুটোপাটি ছেড়ে দিয়ে বোটে চড়ে বসলো আর দাঁড় টানার সঙ্গে সঙ্গে সুরু করলে—

'দীঘির জলে
ঝলক্‌ ঝলে
মাণিক হীরা,
শর্ষে ক্ষেতে
উঠ্‌ছে মেতে
মৌমাছিরা—

অরুণের কিন্তু তেমন ফূর্ত্তি হচ্ছিল না। সে কেবলি ভাবছিল, ওরা ওখানে ছানার পোলাও, রাধাবল্লভী খাচ্ছে, আর আমরা শুধু চিবোচ্ছি কি না—চিঁড়ে নারকোল! হারুটার দেখ্‌ছি কোন বুদ্ধিই নেই। অরুণকে মুখ গোমড়া করে বসে থাকতে দেখে, হারু বললে, "অরুণ তুই অত ভাবছিস্‌ কেন? আজ চিঁড়ে নারকোল খাবার দিন। এখন তো মজা করে খেয়ে নে। তারপর দেখ্‌না, শেষ অবধি কি দাঁড়ায়।" এই বলে আবার সে সুরু করলে—

'আনন্দেরি সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ ব'স্‌ রে সবাই,
টান্‌ রে সবাই টান্‌।'

ওদিকে বাগান বাড়ীতেও হৈ চৈ লেগে গেছে। এক ঘর ছেলে জমায়েৎ হয়েছে। ষ্টোভের উপর হুস্ হুস্ করে চায়ের জল গরম হচ্ছে। আসল খাবার তখনো এসে পৌঁছায় নি। অনিল বলে বড়-সড় গোছের একটি ছেলে হঠাৎ এসে মণির সঙ্গে আজ ধুম তর্ক লাগিয়ে দিয়েছে। সে মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলছে "তোমরা যে ক্লাব করতে বসেছ হে, তা টাকা কই ? ক্লাব অমনি করলেই হোল ! টাকা চাই, জিনিষ-পত্তর চাই, গার্জেনদের মত নেওয়া চাই, তবে তো ?"

মণি বলছে, "আরে সে সব পরে হবে। আগে তো কাজ দেখাই ! কাজ দেখালে টাকার অভাব ! টাকার জন্যে আবার কোন কাজ আটকায় না কি ?"

"তবে তো তোমরা ছাই বোঝ ! আগে চাই টাকা, নইলে কি কিছু হয় !" এই বলে অনিল সোজা হয়ে বসে চায়ের পেয়ালায় খুব জোরে এক চুমুক মারলে।

রতন এ সব কথায় কাণ দিচ্ছে না। সে এক পেয়ালা চা হাতে নিয়ে, চেয়ারটা টেনে দরজার কাছটিতে গিয়ে বসলো আর বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। সে বোধ হয় ভাবছিল, শচীন আর পটল কতক্ষণে এসে পৌঁছবে। তারা সেই যে কতকগুলো পাতা আর খুরি-টুরি পাঠিয়ে দিয়েছে, তারপর তাদের কোন খবর নেই। খাবার-দাবার কতক্ষণে এসে পৌঁছবে, কে জানে !"

মণির আর অনিলের তর্ক কিছুতেই মিটছে না। ভীমের আজ আর তেমন উৎসাহ নেই। কেন না, অনিল ফট্ করে কোত্থেকে এসে যে-রকম তর্ক বাধিয়ে দিয়েছে, তাতে সেক্রেটারীর পোষ্টটা সেই বা নিয়ে নেয় ! সে মন-মরা হয়ে এক পাশে বসে হারমোনিয়মের চাবিগুলো এলোমেলো ভাবে টিপে যাচ্ছে। ও-দিকে চারজনে মিলে একটা ক্যারম্ বোর্ডে অনবরত ঘটাং ঘটাং করছে। খেলছে চার-জন, কিন্তু তাদের ঘিরে বসে বাহবা দিচ্ছে আরো দশজন। সবাই কিন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, খাবারের দেরী দেখে। একজন বললে, "তাইতো, এখনো ওদের দেখা নেই যে ! আর একজন বললে, শচীনের উপর ভার তো, তবেই হয়েছে ! রতন বাইরের দিকে চেয়ে বসেছিল ; সে বলে উঠ্লো, "আর ভয় নেই, ওই ওরা

আসছে।" বলতে বলতে শচীন আর পটল হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো। পটলের কাঁধের উপর একটা ঝুড়ি, আর শচীনের হাতে একটা হাঁড়ি।

"কি হে শচীন, এত দেরী কেন? শুধু কেবল হাঁড়ি আর একটা ঝুড়ি দেখ্‌ছি যে! সব এনেছ তো?" রতন ব্যস্ত হয়ে এই কথা জিজ্ঞেসো করলে।

শচীন ঢোক্ গিলে বললে "এনেছি বৈ কি। তবে ছানার পোলাও-টোলাও হয় নি।"

"সে কি?"

"আর বল কেন সে কথা! ব্যাটা উড়ে কি না, কিছুই জানে না। কেবল আমায় ভোগালে।"

"রাধাবল্লভি হয় নি?"

"না। তার বদলে গরম-গরম কচুরি ভাজিয়ে এনেছি। আর খুব বেশী করে বঁদে এনেছি—যে যত খেতো পার।"

হায় কপাল! কোথায় ছানার পোলাও, আর কোথায় বঁদে! বলাই বলে একটি ছেলে তো মহা খাপ্পা হয়ে উঠ্‌লো "দেখ্ শচীন্ আজ তোকে মেরেই ফেলবো। যদি পারবি না, তো ভার নিয়েছিলি কেন? আমাদের সঙ্গে চালাকি!"

শচীন বেচারীর রাগ টাগ নেই। সে ঠাণ্ডাভাবেই বললে "আহা, রাগ করিস্ কেন ভাই! একেবারে যে কিছু আনি নি, তা নয়। এক হাঁড়ি ভাল সন্দেশ এনেছি। খেতে সুরু করে দাও না এবার! ওহে পটল, দাও না সবাইকে এক এক খানা করে কচুরি—না না, দু' দু'খানা করে দাও।"

মণি বললে, "এরই মধ্যে খেতে সুরু করবে কি হে! না না, খাওয়া দাওয়া এখনি হতে পারে না তো! তার আগে গান হোক্, তারপর হোক্ আবৃত্তি,—অর্থাৎ যেমন-যেমন প্রোগ্রামে আছে। তারপর হবে ইলেক্‌শন্। ক্লাবের ইলেক্‌শনও আজ হওয়া চাই। এ সব হয়ে গেলে পর, সব শেষে হবে খাওয়া।"

শচীন চীৎকার করে উঠলো, "দুত্তোর ইলেক্‌শন্। গরম-গরম আগে খেয়ে নাও। তারপর ও সব কোরো, তখন।"

বেশীর ভাগ ছেলে শচীনের দিকে ঝুঁকলো। মণি চটে গেল, "তা হলে, প্রোগাম্ করবার দরকার ছিল কি? ও ভীম-দা, কথা কইছো না যে?"

ভীম-দা হারমোনিয়মের চাবিই টিপে চলেছে। ছানার পোলাওয়ের জায়গায় বঁদের আবির্ভাব দেখে সে বোধ হয় বড্ড হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে কারো কোন কথার জবাব না করে উদাসভাবে সুরু করলে—

'তোমার বাস কোথা যে, পথিক, ওগো
দেশে কি বিদেশে?
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্ব্বনেশে।
আমার বাস কোথা যে জান না কি
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতী?
হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানিনে,
মোদের বলে দেবে কে সে?
তোমার বাস কোথা যে, পথিক?'

ভীমের গানের রেশ্ চলেছে. শচীন কচুরির ঝুড়িটি হাতে নিয়ে সবে মাত্র দিতে সুরু করেছে, কচুরি হাতে পেয়ে কেউ-কেউ বা এক-আধটা কামড়ও দিয়েছে, এমন সময় সামনের দিককার জানালার কাছটাতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এক বিদ্‌ঘুটে শব্দ হোল সবাই সেদিকে চেয়ে দেখে,—ও বাবা! ওটা কি রে! এ যে মস্ত একটা ভাল্লুক! ভাল্লুকটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে যে! ও বাবা! হাঁ করে যে! ভাল্লুকটা তড়াক্ করে জানালা থেকে সরে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো, আর মানুষ যেমন চলে, তেমনি থপ্ থপ্ করে লাফাতে-লাফাতে একদম ঘরের মধ্যি খানে হাজির হোল। ঘরের ভেতর তখন যা বিভ্রাট বেধে গেল, তা আর বলবার নয়! খাওয়া-দাওয়া গেল ঘুরে। যে দিকে যে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো। ভীম ছিল সকলের পিছনে। আর একটু হলে, ভাল্লুকটা তাকে দিয়েছিল আর কি, ঘ্যাঁক্ করে এক থাবা! সে লাফ

মেরে পালাতে গিয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেল। তারপর উঠি কি পড়ি, পড়ি কি উঠি করতে-করতে দে ছুট্। তৈরী খাবার রইলো পড়ে, আধ মিনিটের ভেতর সব ফাঁকা।



ভাল্লুকটা থপ্ থপ্ করতে করতে এসে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়লো ধপাস্ করে। তারপর কি হাসি! ভাল্লুক আবার হাসে যে! শুধুই কি হাসি! দেখতে দেখতে ভাল্লুকের হাঁ-এর ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়লো, হারুর মাথা, আর ঠিক সেই সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে দেখা গেল, একে একে আরো অনেকগুলি ছোট-ছোট মুখ। তার সব প্রথমটি হোল কানু, তারপর অরুণ, তারপর শিলটু, তারপর রুনু, তারপর জিতু চনু, মনু, বিশু – এই রকম সব আরো আরো। কানু আর অরুণ ভাল্লুকটার কাছে এসে হেসেই একেবারে লুটোপুটি। তারপর ভাল্লুকটার ভেতর থেকে হারুকে টেনে বার করে সবাই মিলে তাকে ঘিরে ধেই ধেই নাচ। নাচ থামলে পর, সন্দেশ-মচুরির দিকে সকলে মন দিলে। অরুণ কিন্তু ভারি নিরাশ হোল। আতিপাতি করে খুঁজে সে ছানার পোলাও-ও পেলে না— রাধাবল্লভীও পেলে না।

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

এক দুই

এক দুই
শুই শুই,
　　চুপ্ কর্
　　　　খুকী তুই।
তিন চার
খাবে মার,
　　দুষ্টুমি
　　　　নয় আর।
পাঁচ ছয়,
কথা কয়?
　　ঐ জুজু,
　　　　নেই ভয়?
সাত আট

রে বাপু ? সুন্দর ছাড়া কি আর রাজ্যের মধ্যে কেউ লোক নেই নাকি ? রাজকুমারী বিরক্ত চিত্তে খালি ভ্রুকুটী করেন—নাঃ, আর এরকম ভাল লাগে না বাপু, এর একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। রাজকুমারীর সঙ্কল্প অটল হয়ে উঠ্‌ল।

(খ)

আচ্ছা সুন্দর, তুমি এত সুন্দর বাঁশী বাজাতে শিখ্‌লে কোত্থেকে বল তো ? সত্যি, তোমার ওপর আমার হিংসে হয়! রাজকুমারীর পাত্‌লা ঠোঁটের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি—আরোও তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠ্‌ল।

সুন্দর বাঁশীটা মুখ হতে পাশে নামিয়ে রেখে তার স্বপ্নময় চোখ দুটো রাজকুমারীর দিকে তুলে ধরে ধীরে বল্ল—সত্যি তা হোলে সে তো আমার সৌভাগ্য —এ কি বেয়াদপি কথা... ?

রাগে অভিমানে রাজকুমারীর চোখ দুটো জ্বলে উঠ্‌ল। ছিঃ সুন্দর, এ কথা তোমার মুখে মানায় না, তোমার এরকম বেয়াদপি আমি সহ্য করবো না জেনে রেখো।

হাসিমুখে সুন্দর জিজ্ঞাসা করল, কি করবে ?

রাজকুমারী ক্ষণেক কি ভেবে পরে বল্লেন—কি কোর্‌ব জান্‌তে চাইছ ? তোমাকে এ রাজ্য হতে চিরদিনের জন্যে নির্ব্বাসিত করে দেব বুঝলে ?

কি এক অপরিসীম বেদনায় সুন্দর প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গেল, পরে বল্ল—বেশ তো কিন্তু কথাটা কি খুব সত্যি ?

রাজকুমারী জরির ওড়্‌না দুলিয়ে অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন—রাজকুমারী কথার অপব্যয় কখনও করে না।

সুন্দরের পাত্‌লা ঠোঁট্ দুটী একেবার নড়ে উঠ্‌ল, কম্পিত কণ্ঠে সে বল্ল—না না তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি আমি, নির্ব্বাসন দণ্ড তুমি আমায় দিও না, সে আমি সইতে পারবো না ; আর যে শাস্তি দেবে দাও আমি তাই নেব.. নির্ব্বাসন দণ্ড দিওনা তুমি...

রাজকুমারী অবজ্ঞার হাসি হাস্‌লেন আবার ওড়্‌না দুলিয়ে বল্লেন—না না, সে আর হয় না ; তোমায় নির্ব্বাসন দণ্ড আমি দেবই ; এ আমার প্রতীজ্ঞা...

তোমায় আমি মোটে দেখতে পারিনা। কি জানি কেন তোমাকে দেখলেই আমার রাগ হয়! আচ্ছা, এখানে থাক্‌তে তোমার এত আগ্রহ কেন বল তো?

সুন্দর একবার যেন কি ভাব্‌ল তারপর বল্ল—শুন্‌বে? শোন তবে—তোমার মধ্যে আমি আমার হারানো বোনকে ফিরে পেয়েছি; সে ঠিক তোমার মত দেখতে ছিল; এমনি চোখ্ এম্‌নি মুখ, অবিকল ঠিক তোমার মত। এমন কি তোমার মত দর্পিত স্বভাব তারোও ছিল—এম্‌নি তোমারি মত সে কথা কইত! তাকে আমি বড্ড ভালবাসতুম; সে না হোলে আমার এক দণ্ড চল্‌ত না। এগার বছর বয়সেই সে মারা যায়! তার মৃত্যুর পর আবার আমি তোমাকে পেয়েছি; তুমিই সেই আমার মরে যাওয়া ছোট বোন্ মঞ্জরী। তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি রাজকুমারী, নির্ব্বাসিত আমায় করো না।

সুন্দরের দুই চোখে কাতরতা ফুটে উঠ্‌ল!

রাজকুমারী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন, পরে বল্লেন— এ কি অন্যায় কথা তোমার সুন্দর? ও সব অন্যায় কথা আমি শুন্‌তে চাই না; কালই, হ্যাঁ কালই, যেখানে যেতে চাও চলে যেও তুমি। এ রাজ্যে আর যেন কখনও তোমাকে না দেখি বুঝেছ। রাজকুমারীর হাসির ঝিনিক্ ফুটিয়ে জরির ওড়্‌না দুলিয়ে চলে গেলেন। আর সুন্দর বসে রইল অভিভূতের মত!!

পরের দিন রাত্রি—

কোজাগরী পূর্ণিমা; জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হয়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের সৌধ শিখরে রাজকুমারী দাঁড়িয়ে সখীর দলকে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখান হতে উচ্চ নির্জ্জনতার চেয়ে প্রিয় জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছু আছে কি?

রাজকুমারী পথের ধারে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই বনে জঙ্গলে ঘেরা আঁকা বাঁকা সরু পথ খানি; ওই পথ দিয়েই সুন্দর আজ চলে গেছে চিরদিনের জন্যই...আহা—রাজকুমারীর স্নিগ্ধ কালো চোখে দুই ফোঁটা মুক্তোর মত অশ্রু ফুটে উঠ্‌ল—টল্ টল্।

———

কুমারী মৃণাল গুপ্তা

পূজোর ক'দিন

তখন বিজয়ার সেই বিষাদ করুণ রাত্রি অস্তগামী সূর্য্যের মত আকাশের কোলে মিলিয়ে গিয়েছে। শুধু ছাপ রেখে গেছে, স্থির ব্যথায় রাঙ্গা সন্ধ্যা-কাশের বুকে, পাতার দেহবেষ্টনে, হাওয়ার অদৃশ্য অস্ফুট গুঞ্জনে, অধীরা নদীর ঢেউয়ের দোলায় আর দুঃখিনী ধরার কোলে। জ্যোৎস্না লক্ষ্মীর আগমনের পথে সোণালী চাদরটা পেতে দিচ্ছে আর তারই ওপর সেফালি দুষ্ট মেয়ের হাসি হেসে লুটিয়ে পড়ছে। এমনি সময়ে আমাদের বাধ্য হয়ে ভিজিয়ানাগ্রাম রওনা হতে হলো। নগরটি সামান্য, আড়ম্বরহীন। সমুদ্রের ধারে যে ওয়ালটেয়ার স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত, তার খুব কাছে। লক্ষ্মী পূজোর আগের দিন বিকেল পাঁচটায় মান্দ্রাজ মেলে চড়ে বসলুম। বাংলার পাশে উড়িষ্যা আর দক্ষিণাত্য —পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার আর অমাবস্যায় অন্ধকারের চাদর গায়ে ফেলে বোনের মত হাত ধরাধরি করে শুয়ে আছে।

বোধ হচ্ছিলো মাকে ছেড়ে দু'দিনের জন্য মাসির বাড়ী চলেছি। দাঁতন নামে ছোট একটী ষ্টেসনে বাংলা-মা দাঁড়িয়ে আমাদের শেষ দেখা দেখে নিলেন। গাড়ী চল্লে চকিতের মত মনে হলো ঐ আবছায়া বনগুলির সবুজ আঁচল জড়ানো জ্যোৎস্নায় গড়া হাত দুটী তুলে মা একবার আশীর্ব্বাদ করলেন। সেই মহামূল্য পাথেয়টী মাথায় তুলে নিলুম।

রম্ভা ষ্টেশনের কিছু আগেই একটা উত্তেজনায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই বল্লেন—এবার 'চিল্কা হ্রদ' দেখা যাবে। নামটী খুব সুপরিচিত হইলেও আর জীবনে হ্রদ দেখিনি ; তাই খুব নিবিষ্ট মনে চেয়ে বসে রইলাম। ঐ যে শান্ত শিশুর মত নিদ্রায় মাঠ শুয়ে আছে তার যে দিক অন্ধকারে লুকিয়ে রহস্যের সৃষ্টি করছিলো সেখানে জ্যোৎস্না ছুটে এসে সব লুকোচুরি ধরে ফেলছে। জ্যোৎস্নার এই ছুটোছুটি চোখে ভারি মিষ্টি লাগছিলো। তার মধ্যে দেখা দিলে—চিল্কা। বিশাল বক্ষে স্বচ্ছ জলগুলি যেন ঘুমে নিঝুম। জ্যোৎস্নার একখানি

অবশ হাত তার ওপর লুটিয়ে পড়েছে। নদীর ঠিক মাঝখানটায় সেই হাতের একটা কাঁকন যেন চিক্ চিক্ করে উঠছে। চিল্কা দুরন্ত মেয়ের মত ছুটে লাইনের ধারে এলো—আবার ধীরে ধীরে সরে গেল। বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টি যতদূর যায় পেছনে পাঠালুন। চিল্কা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। ভোরের আলোতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। দু'ধারে তালপাতার ছাওয়া কুঁড়েগুলি বিস্মিত বিদেশীর মত চেয়ে আছে। দু'দিকের পাহাড়ের সারি মেঘের ঘোমটা টেনে সামনের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। আঁকাবাঁকা পথে ঊষার আলো লুটিয়ে পড়েছে।

এমনি করে চলে বেলা সাড়ে এগারটার সময়ে গাড়ী ভিজিয়ানাগ্রামে এলো। বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় আমাদের নাইবার ও খাবার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন। অতি কৃতজ্ঞতায় আতিথ্য স্বীকার করা গেল। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় যদি এই সব যোগাড় না করতেন তা হলে যে কি কষ্টটাই হতো? তাঁর ছেলেপিলেদের পেয়ে আর ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না। এই এক দিনেই বাংলার মাটিটুকুরও দর বুঝেছি।

বাড়ী ফিরেই আসতে হলো। সেখানকার লোকদের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির নীচে পড়ে আমার তো কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। ক'দিন আড়ষ্ট ভাবেই কাটাল। তারপর হঠাৎ ঠিক হলো—পাহাড়ের কোলে রাজার যে একখানা বাগান বাড়ী আছে সেখানে যাওয়া যাবে। যায়গাটাকে এখানে বলে "ফুলতটা"। ভাই বোনে চারিটী আর মা, বাবা গোশকটে চড়ে অভিযান করলুম। আট আনা দর্শনী রীতিমত দিয়ে ঢুকে পড়লাম। সামনেই নানা ফ্যাশানে ফুল গাছ সাজানো। তার সামনে সাদা ধপ্‌ধপে দালানটী পাহাড়ের কোল ঘেঁসে রাজহাঁসের মত ডানা দুটী মেলে রয়েছে। চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি, তার মধ্যে নেহাৎ বেখাপ্পা মত ছোট পাহাড়গুলি কঠিন দেহ নিয়ে উঠেছে। সামনে ছোট ছোট লতা আর গাছ দিয়ে তৈরী সুন্দর গোলকধাঁধা। আমরা তার কুল কিনারা পেলুম না—বেশী চেষ্টাও করিনি, তবে guideদের অবশ্য মুখস্থ।

দালানটী তিন চারিটী তলা। সুন্দর চওড়া কাঠের সিঁড়ি। হলগুলি কার্পেট

মোড়া। ঝাড় ও নানা রাজবাদসার ছবি দিয়ে সাজানো। মোটামুটি দেখে নিলুম। guide মেঁ আঁশলা হিন্দিতে যা বকে যাচ্ছিল তাতে মোটেই কাণ দিই নি। তারপর বাড়ীতে ফেরা গেলো। আর একদিন মহারাজার প্রকাণ্ড কলেজটা, তারই পরে রাজার খাস দরবার দেখা গেলো। দরবারে সোনা রূপার সিংহাসন উঁচু মঞ্চ প্রভৃতি অনেক ছিল কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর জিনিষ হচ্ছে, soap caseএর আকারে ছোট্ট একটা পিয়ানো। তার আওয়াজটা কি মিষ্টি—যেন বীণার মত। তারপর ফের বাড়ী!

কিন্তু মুস্কিল বাধলো এই নব পরিচিতদের নিয়ে। তাদের মাস্তুতো ভাই বোন বলা চলে—খুব আগ্রহ করে আলাপ করতে আসত। আমাদেরও কম আগ্রহ ছিল না কিন্তু ঐ ভাষাটা আলাদা হয়ে সব মাটি করলে।

তারপর, যখনই নিষ্কর্ম্মা হয়ে নিরালায় বসি, তখনই বাংলা মায়ের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে। পড়ন্ত রৌদ্রটুকু গায়ে মেখে ভাই বোনদের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ি। বাতাস বয়ে গেলে ভাবি, বাংলারই খবর দিয়ে যাচ্ছে। গাছের পাতার সড়্ সড় শুনে ভাবি ওরা আমাদের দেশের পাতার মর্ম্মরটুকু চুরি করেছে। আর যখন ছেলেমেয়েরা দুর্বোধ ভাষায় আনন্দধ্বনি করে উঠতো তখন ভাবতুম—স্বরটুক যে আমাদের বাংলারই ভাইবোনদের কণ্ঠলগ্ন—চিরপরিচিত। যখন ফিরে আসি ভাবি, এই নির্দ্দিষ্ট বিদেশী বাড়ীটার দরজায় না থেমে কবে সেই তেপান্তরের মাঠের পাশে সরু পাড়ের মত পাথর ফেলা রেল লাইন ধরে ছুটে ছুটে আসব। সেই চলার শেষে দেশের কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বো।

শ্রীমাধুরী দাশগুপ্ত

পূজোর আমোদ

পূজোর ছুটী। আমরা ময়নামতী গেলাম পাহাড় বেড়াতে। যাত্রী আমরা মোটমাট ১০ জন। মোটর হচ্ছে আমাদের যান। বেলা ১৷৷০টার সময় বেরুলাম্ বাড়ী থেকে। সঙ্গে আমাদের ক্যামেরা, চায়ের সরঞ্জাম, খাবার, ২টা ওয়াটারপ্রুফ, ৪টে ছাতা।

বাড়ী থেকে রওনা হবার মিনিট দশেক পরে বেশ অন্ধকার হয়ে এল, মেঘ ডাক্‌তে লাগল আর আমরাও সব হাসাহাসি কর্‌তে লাগ্‌লাম।

ষ্টেশনের গেট পার হয়ে তবে যেতে হয়। ষ্টেশনের কাছে এসে দেখলাম্ গেট বন্ধ। কারণ, তখন ট্রেন আসবার সময় হয়েছে। ট্রেন হুস্ হুস্ করে চলে গেল, অমনি গেট খুলে গেল আর আমরাও রওনা হ'লাম। তখন অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে যেতে লাগ্‌ল আর আমাদেরও সামান্য একটু ভয় হতে লাগ্‌ল, ভয়টা আর কিছুর জন্যই নয় পাছে আমরা যেতে না পারি।

অর্দ্ধেক পথ না যেতেই সামান্য দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়্‌তে আরম্ভ কর্‌ল। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি বেশ জোরেই আরম্ভ হ'ল। মোটর থামান হ'ল আর তাড়াতাড়ি মোটরে পর্দ্দা টাঙাতে আরম্ভ করা গেল। কিন্তু এত জোরে বৃষ্টি পড়্‌তে লাগল যে পর্দ্দা ভেদ করেই আমাদের গায়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। তখন ওয়াটারপ্রুফ খুলে জড়িয়ে হাসলাম সব। ও হরি! তাতেও হ'লনা, মোটরের ছাতের ওপর দিয়ে জল পড়তে লাগল্, তখন আর কি করা যায়, তাই অগত্যা মোটরের মধ্যেই ছাতা খুলে বস্‌লাম কোন রকমে জড়সড় হয়ে।

তখন আরম্ভ হ'ল মতামতের পালা। কেউ বলে ফেরা যাক, কেউ বলে কিছুতেই না, কেউ কেউ বা একেবারে চুপ্।

ফেরা আর হ'ল না। চল্‌তে লাগ্‌লাম। মোটরের ঝাকানি, বৃষ্টির বেগ দুইএ মিশে বেশ মজাই হতে লাগ্‌ল। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত্ত; তাই বেশ দুলতে আর ঝাকুনি খেতে খেতে বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লাম। পাহাড়ের কাছাকাছি

আস্‌তেই বৃষ্টি থেমে গেল। তখন সকলের আমোদ দেখে কে! খানিক পরে আসা গেল রাজার বাংলোয়।

ছুটাছুটীর পালা পড়ে গেল। হাসি গল্প কর্‌তে কর্‌তে পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লাম যদিও দার্জ্জিলিংএর তুলনায় এ পাহাড় কিছুই নয়। বেশ মজা হতে লাগ্‌ল, তার কারণ বৃষ্টিতে পাহাড়ের গা পিছল হয়ে গিয়েছিল—উঠ্‌তে যাই পা ফস্‌কে যায়। তবু আমরা ছাড়বার পাত্র নই। ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি, চেঁচামেচি করতে লাগলাম।

বাগানের মালিদের বল্‌লাম "আমাদের ফুল দেবে?" বল্‌ল "দেবো"। আমরা বল্‌লাম "আমাদের তিন জনের জন্যে তিনটে বড় তোড়া বেঁধে দিও।" তোড়া পেয়ে আমাদের মহা স্ফূর্ত্তি।

বাংলোয় এসে দেখি চায়ের জোগাড় হচ্ছে। চা হ'লে পর খাবার আর চায়ে মিলে একপেট খেয়ে উঠ্‌লাম সব। তারপর একটু বেড়ালাম আর ফটো তুল্‌লাম।

চারটে সাড়ে চারটের সময় আবার মোটরে চড়লাম্ সার্ভে স্কুল দেখবো বলে। মোটর চল্‌ল আমাদের সার্ভে স্কুলে নিয়ে। দূর থেকে পাহাড়গুলো ধোঁয়ার মত দেখা যেতে লাগ্‌ল। ক্রমে ক্রমে আমরা এসে পড়লাম সার্ভে স্কুলে।

মোটর থেমে রইল রাস্তার ওপর। আমরা হেঁটেই চড়াই করলাম সব পাহাড়ে। এখানকার পাহাড়গুলো ভয়ানক চড়াই। একেবারে ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত খাড়া। মধ্য পথে যে একটু বিশ্রাম করে নেব তার উপায় নেই। থেমেছি কি নীচে পড়েছি। এক এক সময় মনে হচ্ছিল আর বুঝি পারবো না, কারণ পা একেবারে জবাব দিয়ে বস্‌ছিল। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে আর ৫।৬টা পাহাড়েও উঠেছি কাজেই ফেরা গেল। আমরা এসে মোটরে উঠ্‌লাম। চল্‌তে লাগলাম আর সব গল্প জুড়ে দিলাম বেড়াবার কথা নিয়ে।

মাত্র দু একজন রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে তখন। জোনাকি পোকারা সব নিজেদের গায়ে বাতি জ্বেলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠের মধ্যে। মোটর ছুটছে—হঠাৎ ফট্ ফট্ ফটা ফট্। মোটর একেবারে স্থির।—কি হ'ল। তেল ফুরিয়ে গেছে। তখন ড্রাইভার গেল তেল ঢাল্‌তে। ওমা! টিপে এক ফোঁটাও

তেল নেই। তবু ওরা কি সহজে বল্‌তে যায় যে তেল নেই। বলে "বেহানে এক টিন ত্যাল ডাল্‌লাম এর মদ্দেই কি ফুরাইয়া গেল ?"

তখন সকলের মনেই বেশ একটু ভয় হয়েছে। একে অন্ধকার রাত্তির তাতে বাড়ী পৌঁছতে আরো সাড়ে তিন মাইল বাকী। আমার আবার সর্দ্দি। ঠাণ্ডা লাগ্‌বে তাই আর একজনের চাদর নিয়ে মাথায় গায়ে দিয়ে জড়িয়ে বস্‌লাম।

ছোট্ট একটী ছেলে ছিল আমাদের সঙ্গে—বছর সাতেকের। সে বল্‌ল "তোমরা ঠেলে নিয়ে যাওনা মোটরটা, তবুত বাড়াটা একটু কাছে হবে।" ওর কথা শুনে সবাই হাসতে লাগলাম। এমন কোন উপায় নেই যে বাড়ী ফেরা যায়। আর রাস্তাও এমন যে কোন মোটর আসবার সম্ভাবনাও নেই, আর তেল আন্‌তে হলেও একজন যাবে সাড়ে তিন মাইল তবে আবার আস্‌বে।

তখন অগত্যা একজন লোক পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল তেল আনবার জন্যে আর বলে দেওয়া হ'ল আসবার সময় বাইকে আস্‌তে। সে রওনা হয়ে গেল আর আমরা সব নানা রকম দুর্ঘটনার গল্প করতে লাগলাম।

সত্যি। ভগবানের যে কি চক্রান্ত তা কে বল্‌লে পারে। এমন দুঃসময়ে যে আমরা আবার সাহায্য পাবো তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি!

লোকটীও তেল আন্‌তে: চলে গেল। পনর মিনিট পর ড্রাইভার বল্‌ল মোটর আসছে একটা। অমনি আমরা সব কান পেতে শব্দ শুনতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেক পরে হুস্ হুস করে মোটর কাছে এসে পড়্‌ল আর অমনি ড্রাইভার সোজা মটরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল, কারন যদি না থামায়। লোকটার ওপর দিয়ে ত আর মোটর যেতে পারে না। কাজেই থাম্‌ল।

মোটরখানা থামলে ড্রাইভার আমাদের ড্রাইভারকে বল্‌ল, তুই যে অ্যামন কর্‌য়া খাড়াইয়া আছিলি নীচে পড়্‌লে তুই ত মরতিই আমারে শুদ্দা মারতি। আরো আইক্ক কাইল হিন্দু মোছলমানে যে সম্ভাব (আমাদের ড্রাইভার হিন্দু ও অপরটী মুসলমান) কোন ছুতা পাইলেই ত আর কোন কথা নাই।



২য় পুরস্কার—সমুদ্রে মাছধরা
শ্রীসুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



পুরীর মন্দির—শ্রীসুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



দার্জ্জিলিং—শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

শু'নে বুড়ী খড়্ মড়্ করে উঠে বস্‌ল। তারপর দরজার ফাঁক দিয়ে শুন্‌লে—রাজবাড়ীর লোক—ট্যাড়া দিয়ে বল্‌ছে—রাজার ছেলের শক্ত ব্যারাম—রাজবৈদ্যেরা সব জবাব দিয়ে চলে গেছে। রাজার ঘোষণা করে দিয়েছেন—যে রাজপুত্তুরকে আরাম করতে পারবে—সে যা চাইবে রাজা তাকে তাই দেবেন আর যে অসুখ সারাতে পারবে না—তার গর্দ্দানা যাবে—ট্যাং ট্যাং—ট্যাং—।

ট্যাড়াওয়ালা চলে গেল।

বুড়ীর বাপ ছিল মস্ত বড় এক বৈদ্যি। তার কাছ থেকে সে অনেক টোট্‌কা টাট্‌কি অসুধ জান্‌তো। ট্যাড়াওয়ালার কথা শু'নে বুড়া ভাব্‌লে—এদিকেও না খেতে পেয়ে মরব—তার চেয়ে না হয় একবার রাজধানীতেই যাই। যদি অসুখ সারাতে না পারি ত একেবারে জন্মের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবো—ছেলেপিলের কষ্ট দেখতে হবে না—আর যদি ভগবান মুখ তুলে চান ত শেষ বয়সে আর দুঃখ পাবো না। সাত পাঁচ ভেবে বুড়ী চুপি চুপি ছোট এক কাপড়ের পুটলী হাতে করে উঠে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলে রাজবাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলে।

বুড়ী যখন গিয়ে রাজবাড়ীতে পৌছল—তখন সন্ধ্যে উৎরে গেছে। সাঁঝের মজলিসে বসে রাজা প্রজার আবেদন শুন্‌ছেন—ঠিক এমনি সময় বুড়ী রাজ সভার এক কোণে জড় সড় হ'য়ে দাঁড়াল। সকলকার বিচার শেষ হ'য়ে গেলে রাজা তার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—তোমার কি চাই, বুড়ী?

বুড়ী ভয়ে ভয়ে বল্লে—আমি রাজপুত্তুরকে সারাতে এসেছি মহারাজ।

রাজা বল্লেন—আমার ঘোষণা ভালো করে শুনেছ ত বাছা? কেন শেষ বয়সে অপঘাতে প্রাণ খোয়াবে বলো? তার চাইতে বুড়া তুমি ঘরে ফিরে যাও।

বুড়ী বল্লে, না মহারাজ আমি যখন এবারে এসেছি—তখন রাজকুমারকে আরাম না করে যাবো না।

রাজা আর কি করেন—শেষটা বুড়ীর হাতে তার ছেলেকে স'পে দিলেন।

বুড়ী বল্লে—আমি আলাদা এক ঘর চাই, মহারাজ। সেই ঘরে থাক্‌বো শুধু আমি আর রাজপুত্তুর। সাত দিনের ভেতর আর কেউ ঘরে ঢুক্‌তে পারে না।

রাজার আদেশে, মন্ত্রী সবই বুড়ীকে বন্দোবস্ত করে দিলে। বেদের কাছ থেকে গাছ গাছড়া নিয়ে বুড়ী গিয়ে ঘরে খিল দিলে। এক দিন যায় -দুদিন যায়—রাজপুরীর লোকেরা একেবারে অস্থির হ'য়ে ওঠে। শেষে সাতদিনের দিন দরজা খুলতেই অবাক্ সকলে চেয়ে দেখ্‌লে—রাজপুত্র বিছানায় ওঠে বসেছেন। রাজ্যে বুড়ীর জয় জয়কার পড়ে গেল। রাজা এসে বল্লেন—বল বুড়ী তোমার কি চাই—রাজভাণ্ডার খুলে তোমার ধন এনে দিচ্ছি।

বুড়ী হাত জোড় করে বল্লে—মহারাজ, আমি আর কিছু চাই নে, আপনি শুধু এই অনুমতি দিন - লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিন রাত্তিরে আমি ছাড়া আপনার এই গোটা রাজ্যে কেউ বাতি জ্বাল্‌তে পারবে না।

রাজা বল্লেন—এ তোমার কি খামখেয়ালী বর চাওয়া বুড়ী? মণিমাণিক্য হীরা জহরৎ—রাজভাণ্ডার খালি করে দিচ্ছি, বাকী জীবনটা তুমি সুখে কাটাতে পারবে।

কিন্তু বুড়ীর ঐ এক গোঁ! বল্লে মহারাজ—আমি আর কিছু চাইনে, শুদ্ধু আপনি ঐ ঘোষণা করে দিন।

রাজা বল্লেন—আচ্ছা বুড়ী তবে তাই হ'বে।

বুড়ী, রাজপুত্রকে ভালো করে রাজভাণ্ডারের সেরা ধন নিয়ে ঘরে ফিরছে—এই খবর চারিদিক ছড়িয়ে পড়ল। বুড়ীর সাত ছেলেও এই সংবাদ শুন্‌লে। তারা বুড়ীর পথ চেয়ে বসে রইল। কিন্তু খালি হাতে ফির্‌তে দেখে সাত ছেলে মার মুখো হ'য়ে খেতে এলো। বল্লে—সোনাদানার পুঁটলী কোথায় লুকিয়ে রেখে এলি শিগ্গির বল।

বুড়ী মাথা নেড়ে বল্লে, আনিনি ত' কিছু!

ছেলেরা মায়ের কথা বিশ্বাস করলে না—রাগে কাঁপতে কাঁপতে বুড়ীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গেল। বুড়ী কাউকে কিছু বল্লে না।--আকাশের দিকে চেয়ে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বিড় বিড় করে বল্লে—লক্ষ্মী পুজোর দিন্‌টা একবার এলে হয়!

ধীরে ধীরে কোজাগার পূর্ণিমার দিন এসে পড়ল। বুড়ীর আনন্দ দেখে কে সারাটা দিন ধরে পুজোর আয়োজন শেষ করে সন্ধ্যের পিদিম জ্বালিয়ে বসে

রইল। এদিকে গোলকে লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ তাঁর বাহন প্যাঁচাকে ডেকে বল্লেন—বাছা, আজ কোজাগার পূর্ণিমা—মর্ত্ত্যে পূজো খেতে যেতে হবে কিন্তু। প্যাঁচার পিঠে চড়ে গোলকের লক্ষ্মী মর্ত্ত্যে নেমে এলেন।

কিন্তু পৃথিবীতে এসে দেখেন, চার দিক ঘুটু ঘুটে আঁধার. কেউ সন্ধ্যে প্রদীপটি পর্য্যন্ত জ্বালে নি। লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ প্যাঁচাকে ডেকে বল্লেন, বাছা আমার কি ভুল হল? আজই ত কোজাগার পূর্ণিমা—কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা ত কেউ, আমার পূজোর জোগাড় করে নি! সব গেরস্ত ঘর আঁধারে ঘুঁট্ ঘুঁট্ কচ্ছে—আজ কি তবে অলক্ষ্মীর পূজো?

রাজার আদেশে গোটা রাজ্যে কেউ আলো জ্বালে নি। শুধু বুড়ী একটা মিট্‌ মিটে পিদিম্ জ্বালিয়ে দোর গোড়ায় চুপে চুপে বসে আছে। প্যাঁচা তার গোল চোখ দুটো দিয়ে চারদিকটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বল্লে—ওই যে মা ঠাক্‌রুণ, ঐ হোথা একটা বাড়ীতে আলো দেখা যাচ্ছে।

একটা আশ্রয় পেয়ে লক্ষ্মী দেবী বল্লেন—তবে চল বাছা ঐ বাড়ীতেই চল। প্যাঁচা লক্ষ্মীকে বুড়ীর উঠোনে নামিয়ে দিয়ে বাড়ীর পেছনে একটা গাছের কোটরে লুকিয়ে রইল।

একটি ছোট খাটো গেরস্ত ঘরের বৌ সেজে লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ বল্লে, ও বুড়ী, আমার তেষ্টা পেয়েছে—একটু জল দেওনা—

বৌয়ের মুখখানা দেখেই বুড়ী বুঝতে পারলে—এ লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণ না হয়েই যায় না। সে-ও কম সেয়ানা নয়—বল্লে, এসো বাছা, এসো আমি ঘাট থেকে জল নিয়ে আসি। এই বলে খানিক দূর গিয়ে বুড়ী আবার ফিরে এসে বল্লে—তা দেখ বাছা, আমি যতক্ষণ না ফিরি তুমি আর কোথাও যেওনা যেন।

গেরস্তবৌ বল্লে—আচ্ছা।

তারপর বুড়ী করলে কি—মস্ত বড় একটা কলসী কাঁখে নিয়ে ঘাটে গেল। শেষটা সেই কলসী গলায় বেঁধে পুকুরে ডুবে মরে রইল। বুড়ীও ফেরে না—লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণও

বসে আছেন। বাড়ী ছেড়ে যাবার উপায় নেই! কথা দিয়েছেন—সে না ফিরলে বুড়ীর ভিটে ছেড়ে এক পা'ও নড়বেন না।

এদিকে খবর পেয়ে বুড়ীর ছেলেরা ছুটে এলো। তখন একে একে তাদের চোখ খুল্‌লো। তারা বুঝ্‌তে পারলে ওদের মা নিজে প্রাণ দিয়ে ঘরে লক্ষ্মী চিরকালের জন্যে বেঁধে রেখে গেল। সেই থেকে তাদের ভিটের লক্ষ্মী অচলা হয়ে হয়ে রইল বটে—কিন্তু তারা মাকে আর ফিরে পেলে না।

শ্রীঅখিল নিয়োগী

জলার পেত্নী

(যতীন বাবুর শেষ কথা)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চা খাওয়ার পর জীবানন্দ বাবু আমাকে বল্লেন—তোমাকে যে কথাগুলো জিজ্ঞাসা করছি বেশ পরিস্কার কোরে উত্তর দাও। আচ্ছা এখানে যে আওয়াজটা হয় সেটা কিসের আওয়াজ বলে তোমার মনে হয়?

আমি বল্লুম—প্রথমে তো আমার মেঘ ডাকার শব্দ বলে মনে হয়েছিল কিন্তু শেষকালে মনে হোলো, না এ নিশ্চয় কোনো জন্তুর ডাক।

– কি জন্তুর ডাক?

আমি বল্লুম—তা ঠিক বুঝতে পারি-নি।

জীবানন্দ বাবু বলতে লাগলেন—আমি এখানে এসেই প্রথমে তোমার কথা শুনে সদাশিব বাবুর ওখানে গিয়ে উঠি। সদাশিব বাবু লোকটী ভাল ও ভারি সিধে। তাঁর কাছ থেকে এখানকার কৃষ্ণানন্দ স্বামীর খোঁজ পেলুম। তোমার চিঠি পেয়েই কিন্তু এই লোকটীর ওপরে আমার সন্দেহ হয়।

আমি বলে উঠলুম—বলেন কি! সে যে সন্ন্যাসী।

জীবানন্দ বাবু বল্লেন—রেখে দাও তোমার সন্ন্যাসী। লোকটি অতি সাংঘাতিক লোক। শোনো বলি আগে—সদাশিব বাবু তো আমাকে কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু আমি সেখানে না গিয়ে সোজা এই গুহায় চলে আসি। সেই রাত্রেই আমি পুলিশের পোষাক পরে একেবারে হেরম্বর ভাঙা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সে তো আমাকে দেখে ভয়ে প্রথমটা অজ্ঞানের মতন হোয়ে গেল। আমি তাকে বল্লুম—তুমি আমার কথার সত্যি উত্তর দাও, তোমার কোনো ভয় নেই। মিথ্যে বল্লেই তোমার ফাঁশী হবে জেনে রেখো।

সে বল্লে—আপনার কাছে আমি কিছু মিথ্যে বল্‌ব না। আপনি আমাকে বাঁচান।

আমি বল্লুম—জমিদার জয়নারায়ণ চৌধুরীকে কে খুন করেছে?

আমার কথা শুনে হেরম্ব চুপ কোরে রইল। তাকে চুপ কোরে থাকতে দেখে আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। আমি তাকে ধমক দিয়ে বল্লুম—বল, না হোলে এখুনি তোমাকে ধরে নিয়ে যাব।

আমার কথা শুনে ভয়ে সে কেঁদে উঠে বল্লে—দোহাই আপনার! আমি কিছু জানিনা, জমিদার মহাশয়কে খুন করেছে ঐ—ঐ সন্ন্যাসী।

কথাটা শুনে আমি তো চমকে উঠ্‌লুম। জীবানন্দ বাবু বলে যেতে লাগলেন—হেরম্বকে জিজ্ঞাসা করলুম—সন্ন্যাসীকে কেন খুন করলে? জমিদার জয়নারায়ন চৌধুরীকে খুন করার তার স্বার্থ কি?

হেরম্ব বল্লে—ঐ সন্ন্যাসী হচ্ছে শিবনারায়ণ চৌধুরীর মেয়ের ছেলে। জয়নারায়ণের ভাগ্নে। ও জানত যে জয়নারায়ণ বিয়ে করে-নি। জয়নারায়ণের দাদা হরিনারায়ণ কোথায় আছে, কেউ জানে না। জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তার ভাগ্নেই বিষয়ের অধিকারী হবে—সেই জন্য।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি কোরে খুন করলে?

হেরম্ব বল্লে—আজ্ঞে ষাঁড় লেলিয়ে দিয়ে। কথাটা শুনে অবাক হোয়ে গেলুম। বল্লুম সে আবার কি?

হেরম্ব বল্লে—সন্ন্যাসীর ভাল নাম হচ্ছে পশুপতি মুখুয্যে। জয়নারায়ণ বাবুর

আমলে ও একবার প্রায় লাখ খানেক টাকা নিয়ে সরে পড়ে। তার পরে অনেক দিন ওর আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। একদিন রাত্রে ও আমার এখানে এসে উপস্থিত হোলো। সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা পশ্চিম দেশের ষাঁড়। ও যাকে ঐ ষাঁড় লেলিয়ে দেবে তাকেই সে গিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেল্‌বে,—এমনি পোষা ষাঁড় সেটা! পশুপতি আমার কথা জান্‌ত, তাই আমার জিম্মেতে সেই ষাঁড় জমা দিয়ে নিজে সন্ন্যাসীর ভেক্ নিয়ে ঐখানে বসে গুরুগিরি করতে আরম্ভ কোরে দিলে। তারপরে মাঝে মাঝে রাত্রে সে ঐ ষাঁড়টার গায়ে ও মাথায় কি মাখিয়ে নিয়ে যেতো। সে জিনিষটা মাখালেই মনে হয় যেন জানোয়ারটার সর্ব্বাঙ্গ দাউ-দাউ কোরে জ্বলছে।

আমি বলে উঠলুম—ঠিক ঠিক! আমি ঐ অবস্থায় সেই ষাঁড়টাকে দেখেছি—তখন বুঝতে পারিনি যে সেটা ষাঁড়!

জীবানন্দ বাবু বল্লেন—জমিদার জয়নারায়ণ চৌধুরী যখন মারা যান তখন তাঁর দেহ পরীক্ষা কোরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়-নি। খুব সম্ভব ভয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমি বল্লুম—ভয়ে এই রকম মৃত্যু হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।

জীবানন্দ বাবু বলতে লাগলেন—তার ওপরে আরও শোনো। হেরম্ব বল্লে—এখানকার লোকেরা পাছে রাত্রি বেলা জমিদার বাড়ীর দিকে আসে সেজন্য সন্ন্যাসী একটা কাপড়ের পেত্নী তৈরি কোরে তাতে সেই জিনিষ মাখিয়ে, মাঝে-মাঝে সেটাকে নৌকো কোরে জলার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সেইটাকেই লোকে জলার পেত্নী বলে জানে।

হেরম্ব আরও বল্লে—যে বর্ত্তমান জমিদার অপূর্ব্ববাবুর ওপর ওর ভারি রাগ। কারণ তিনি না এলে, জমিদারী ওই পেয়ে যেত। এখন ওর মতলোব হচ্ছে যে অপূর্ব্ববাবুকে খুন কোরে দিন কতক এখান থেকে সরে পড়া। তার পরে হাঙ্গামাটা চুকে গেলে তখন সন্ন্যাসীর ভোল ছেড়ে দিয়ে একেবারে পশুপতি মুখুয্যে হোয়ে এসে বিষয়টার দাবী করা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তা হোলে উপায়?

জীবানন্দবাবু বল্লেন—আরে, এখনো আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয়-নি।

হেরম্ব বল্লে যে, ঠিক হয়েছে কাল রাত্রিবেলা অপূর্ব্ববাবু যখন সদাশিববাবুর বাড়ী ফিরবেন তখন তাকে ষাঁড় লেলিয়ে মেরে ফেলা হবে। সেই জন্য আজ রাত্রে জলার পেত্নীকে বের কোরে চারপাশের লোকজনকে ভয় দেখিয়ে রাখা হবে। যাতে কাল রাতে তারা আর বাড়ী থেকে ভয়ে বেরুতে না পারে।

আমি বল্লুম—আমি যখন এখানে আসি তখন অপূর্ব্ববাবু বলেছিলেন বটে যে কাল সন্ধ্যার সময় সদাশিববাবুর বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে। আমি তাঁকে রিভলভার নিয়ে বেরুতে বলেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য সে খবর এরা জানতে পারলে কি কোরে?

জীবানন্দবাবু বল্লেন—নিশ্চয় সদাশিববাবুর বাড়ীর কোনো চাকর পশুপতিকে অপূর্ব্বর খবরাখবর দেয়।

জীবানন্দবাবু আর আমি বসে কি করা কর্ত্তব্য তাই পরামর্শ করতে লাগলুম। অনেকক্ষণ পরামর্শ করবার পর স্থির হোলো যে কাল সকালে উঠে আমি অপূর্ব্ববাবুর বাড়ীতে চলে যাব এবং সন্ধ্যার সময় তিনি যখন সদাশিববাবুর বাড়ীতে যাবেন তখন তাঁকে না জানিয়ে তাঁর কাছাকাছি অস্ত্র নিয়ে তৈরি হোয়ে থাকব।

সমস্ত রাত্রি আমি আর জীবানন্দবাবু সেই গুহার মধ্যে কাটিয়ে সকাল বেলা উঠে অপূর্ব্ববাবুর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম। অপূর্ব্ববাবু আমাকে দেখে ভারী খুসী। তিনি বল্লেন, শীগ্‌গীরই একবার কলকাতায় যাব এখানে ভাল লাগ্‌ছে না।

আমি বল্লুম—বেশ। কবে যাবেন ঠিক করুন।

তিনি বল্লেন—এখানকার কতগুলো কাজ আছে, সেরেই যাওয়া যাবে।

সন্ধ্যাবেলা অপূর্ব্ববাবু এসে বল্লেন—আপনাকে ঘণ্টা দুই একলা থাকতে হবে। সদাশিববাবুর বাড়ীতে খাবার কথা আছে, সেখান থেকে খেয়েই চলে আস্‌ব। ফিরতে বোধ হয় নটা কি সাড়ে নটা হবে।

আমি বল্লুম—রিভলভারটা সঙ্গে নিয়েছেন তো?

রিভলভারটা পকেট থেকে বের কোরে আমাকে দেখিয়ে অপূর্ব্ব বাবু চলে গেলেন। আমি আর কোনো কথা না বলে অপূর্ব্ব বাবুর ভাল বন্দুকটা ও গোটা কয়েক টোটা নিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে লুকিয়ে এগুতে লাগলুম।

অপূর্ব্ব বাবু সদাশিব বাবুর বাড়ীতে ঢোকবার পর আমি কিছু দূরে একটা ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে বসে রইলুম। কিন্তু বাপ্ রে বাপ্! সেখানে বসে থাকে কার সাধ্য। আধ ঘন্টার মধ্যে মশার কামড়ে শরীর একেবারে দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হোয়ে ফুলে উঠ্‌ল। কিন্তু কি করা যাবে নড়বার উপায় নেই। সেইভাবে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক যন্ত্রণা ভোগ করবার পর দেখলুম অপূর্ব্ব বাবু খেয়ে-দেয়ে পান চিবোতে-চিবোতে বেরুলেন। যে ঝোঁপে বসেছিলুম সেই ঝোঁপটা অপূর্ব্ব বাবু পেরিয়ে যাবার পরেই আমি উঠে আস্তে-আস্তে তাঁর পেছন পেছন অগ্রসর হোতে লাগলুম।

সেদিন বোধ হয় অমাবস্যা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। জলার মধ্যেকার সেই কাল পাহাড়গুলো পর্য্যন্ত অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে। চলতে চলতে হঠাৎ সেই আকাশ পাতাল ফাটান চীৎকার শুনে চমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। অপূর্ব্ব বাবু আমার কাছে থেকে বোধ হয় হাত কুড়ি দূরে ছিলেন। দেখলুম তিনিও দাঁড়িয়ে গেছেন এবং পেছন দিকে ফিরে আসবেন কি না ভাবছেন। তখুনি আবার সেই রকম একটা চীৎকার! আর মুহূর্ত্ত পরেই দেখলুম একটা আগুনের গোলা লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকে তীরের মত ছুটে আসছে। আমি আর চিন্তা না কোরে টপ্ কোরে পথের এক পাশে সরে গিয়ে সেই আগুনের গোলা লক্ষ্য কোরে বন্দুক ছাড়লুম। বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আগুনের গোলাটা আবার চীৎকার কোরে উঠ্‌ল, তারপরে স্পষ্ট দেখলুম যেন সেটা অপূর্ব্ব বাবুর ঘাড়ে এসে পড়্‌ল। তারপর চারিদিক নিস্তব্ধ। আমার মনে হোলো ষাঁড়টা নিশ্চয়ই অপূর্ব্ব বাবুকে গুঁতিয়েছে। ছুটে তাঁর কাছে গেলুম। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মোমবাতি বার কোরে জ্বেলে দেখলুম তিনি চিৎ হোয়ে পড়ে আছেন আর তাঁর পাশেই ষাঁড়টার রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। হায় হায়! এত কোরেও শেষে অপূর্ব্ব বাবুকে বাঁচাতে পারলুম না। মনে বড় দুঃখ হোতে লাগ্‌ল। আমি অপূর্ব্ব বাবুর দেহের পাশে বসে পড়লুম। বসতে না বসতে জীবানন্দ বাবুর গলা পেলুম। তিনি আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমি চেঁচিয়ে বল্লুম—এদিকে, আসুন। ছুটতে ছুটতে এসে তিনি অপূর্ব্ব বাবুকে পড়ে থাকতে দেখে চমকে বলে উঠ্‌লেন—এ কি!

ক্ষোভে দুঃখে আর আমার মুখ দিয়ে কথা ফুট্‌ল না। শুধু বল্লুম—আমাদের এত চেষ্টা ও পরিশ্রম সব বিফল হোলো।

জীবানন্দ বাবু টপ্‌ কোরে অপূর্ব্ব বাবুর পাশে বসে পড়ে তাঁর দেহ পরীক্ষা কোরে বসে উঠলেন—কোনো ভয় নাই যতীন, আমাদের পরিশ্রম বৃথা যায়-নি। অপূর্ব্ব বাবু মরেন-নি ভয়ে অজ্ঞান হোয়ে পড়েছেন।

জীবানন্দ বাবুর কথা শুনে আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠ্‌লুম। তাঁকে ধরে জলার কাছে নিয়ে গিয়ে মুখে জলের ছিটে দিতে-দিতে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। জীবানন্দ বাবু বল্লেন—তোমরা এখানে বস, আমার এখানে থাকলে চল্‌বে না, এখনো পশুপতিকে ধরা হয়-নি।

জীবানন্দ বাবুর কথা শেষ হোতে না হোতে যেন মাটি ফুঁড়ে পশুপতি উঠে এল। সে বল্লে—এই যে পশুপতি তোমাদের সামনে! সাধ্য থাকে তো ধর। তার হাতে একটা রিভলভার।

জীবানন্দ বাবু যেমনি লাফিয়ে তাকে ধর্‌তে যাবেন অমনি সে নিজের মাথা টিপ কোরে বন্দুক ছাড়লে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তার নির্জ্জীব মৃতদেহ জীবানন্দ বাবুর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়্‌ল।

আমরা সেই রাত্রেই পুলিশে খবর দিয়ে পশুপতির দেহ তাদের হাতে জিম্মা কোরে জলা থেকে হেরম্বকে নিয়ে অপূর্ব্ব বাবুর বাড়ীতে ফিরে এলুম।

হেরম্ব সেই থেকে আবার জমিদারীর কাজ করছে। তার কোনো বিপদই হয়-নি। অপূর্ব্ব বাবু বলেছেন যে, তার বাবা মারা গেলে দেওয়ানের কাজ সেই পাবে।

শেষ

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সাঁতার

ফুটবল খেলায় বাঙ্গালী ছেলেরা যেমন খুব খ্যাতিলাভ করেছে, সাঁতারেও তারা এখন বেশ নাম করতে আরম্ভ করেছে। এটা খুব সুখের বিষয়। আশা করা যায় যে এই বিভাগেও বাঙ্গালীর ছেলেরা সকলকে হারিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করবে।

কয়েক বৎসর আগের কথা বলছি; তখনও সাঁতারের হুজুক দেশে মোটেই ওঠে নাই। খোঁজ করলে দেখা যেত খুব কম বাঙ্গালীর ছেলেই সাঁতার দিতে পারে। সাঁতারটা যেন একটা খেলার অঙ্গই ছিল না। সকলেরই এই ধারণা ছিল। বাংলাদেশে বাস আমাদের; জল নিয়েই আমাদের ঘর করণা। আমাদের চারদিকে বড় বড় নদী ছোট ছোট নদী, খাল, বিল, পুকুর, জলা,—এই নিয়ে বাংলাদেশ তৈরী। এদেশের ছেলেরা সাঁতার জানে না, এটা কি কম আশ্চর্য্য নয়।



জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় ২৩ মাইল সাঁতারে প্রথম হচ্ছেন

কয়েক বৎসর আগে কলকাতা সহরে এমন একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটল, যার পর থেকে চারদিকে সাঁতারের সাড়া পড়ে গেল। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে বিশ পঁচিশটা বাঙ্গালীর ছেলে, এক সঙ্গে বেড়াতে গেয়েছিল। সমস্ত দিন আমোদ করবার পর তারা ঘাটের কাছে এসে দেখে শেষ ষ্টিমার ছাড়ে ছাড়ে। ষ্টিমার ও ঘাটের মাঝে একটা ডিঙ্গী নৌকো ছিল! সবাই এক সঙ্গে ষ্টিমারে ওঠবার জন্যে নৌকোয় ঝাঁপিয়ে পড়ল! পড়বার মাত্র ভার সহ্য কোরতে না পেরে নৌকো উলটে গেল এবং সবাই জলে পড়ে গেল। এই দুর্ঘটনায় সাঁতার না জানার দরুণ বার তেরটী ছেলে মারা যায়। এই ব্যাপারের পর থেকেই চারদিকে সাঁতারের সাড়া পড়ে গেল। চারদিকে সাঁতারের ক্লাব হোল এবং সাঁতারের প্রতিযোগিতাও সুরু হোল।

সেই থেকে বাঙ্গালী ছেলেরা সাঁতারে ক্রমেই উন্নতি লাভ করছে। ফুটবল খেলা, টেনিস খেলা, টিকেট খেলা—খেলা বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাঁতারের বেলায় তা চলবে না। সাঁতার জিনিষটা একদিকে কেমন খেলা অন্য দিকে তেমনি পড়াশুনার মত দরকারী জিনিষ। সাঁতারে সব রকমে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। এক একটা খেলায় দেহের এক একটা অংশ উন্নতি লাভ করে। কিন্তু সাঁতারে তা নয়। বুক, হাত, পা, মাংসপেশী ঘাড়—ইত্যাদি সবারই উন্নতি সাঁতারে হয়। সেই জন্যে সাঁতার সব রকম ব্যায়ামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই তো গেল এক দিকের কথা। তারপর সাঁতার না জানলে নিজের প্রাণ রক্ষা করা এক রকম অসম্ভব। প্রায় সকলের জীবনে একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে—যাতে সাঁতার না জানার দরুণ বিপদে পড়েছে।



রবীন চট্টোপাধ্যায়

বাস্তবিক একটা সুন্দর নদীতে গরমের দিনে সূর্য্যের আলোতে স্নান করা ও সাঁতার দেওয়ার মত আনন্দ ও আমোদ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। সেই জন্যে তোমরা যারা নদী কিম্বা ভাল পুকুরের কাছে থাক, তারা রোজ নদীতে বা পুকুরে স্নান ও সাঁতার দেবার অভ্যাস করবে। জলের মধ্যে ডুবে থাকা, চিৎ হয়ে সাঁতার দেওয়া, মরার মত পড়ে থেকে সাঁতার দেওয়া, নানা রকম অঙ্গ চালনা করে সাঁতার দেওয়া এই সকলের যে কত আমোদ তা তোমরা সাঁতার জানলে বুঝতে পারবে।

সব জিনিষের যেমন শিক্ষা চাই, সাঁতারের বেলায়ও তাই। ভাল করে শিখতে চাইলে ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। অনেক সাধনা ও শিক্ষা চাই। বিলেতে সাঁতার শেখবার জন্যে বড় বড় শিক্ষক (Trainer) আছে। তাদের অধীনে অনেক দিন থেকে শিক্ষালাভ করতে হয়।

কলিকাতায় সাঁতারের অনেক ক্লাব আছে। এই সব ক্লাব সকলকে সাঁতার শেখায়। আবার প্রতিবারে প্রতিযোগিতাও হয়। এবারের তেইশ মাইল প্রতি-যোগিতায় জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় প্রথম হয়েছেন। তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে একজন বড় সাঁতারু। তিনি আরো দুই একবার এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। রবীন চট্টোপাধ্যায় আর একজন বড় সাঁতারু। এঁর বাড়ী এলাহাবাদে। দক্ষিণ ভারতের অনেক বড় বড় সাঁতারের বাজীতে তিনি জয়লাভ করেছেন। তিনি বম্বের কাছে সমুদ্রে ক্রমাগত ত্রিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সাঁতার সাড়ে বার ঘণ্টায় দেন। সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে ত্রিশ ঘণ্টা সাঁতার দেওয়া কি ব্যাপার তোমরা বুঝতে পারছ। একটা বারো বছরের ছোট ছেলে সে দিন কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে বার ঘণ্টা ক্রমাগত সাঁতার দিয়েছে। এই সব দেখে মনে হচ্ছে বাঙ্গালীর সঙ্গে সাঁতারে আর কেউ পারবে না।

হংসে বিপত্তি

বিশ্বনাথ পাল,—
বেজায় গোরা চাল!
প্যাণ্ট-কোট পরেন, শরীরখানি মোটা,
হাঁটায় খুব দড়, কঠিন তাঁর ছোটা!
মাংসে ভারী রুচি!—চচ্চড়ি, কি, ঝোল,
ডাল-ভাতের নামে ড্যাম্-ড্যাম্ বোল!

ছাগল-ভেড়া-পাঁটা,
হ্যাম,—তা ব্যাগে আঁটা,
নির্ব্বিচারে খান— রাঁধে বাবুর্চ্চিতে;

জাত যাবার ভয় —তিলেক নাই চিতে।
খান পশু-পক্ষী—মুর্গী-হাঁস-স্নাইপ্ ;
কারণ, তাঁর যুক্তি,—মাংসে বাঁচে লাইফ !

সেদিন খুব ভোরে
হাঁটন্ দিয়ে জোরে
দৈবাৎ হন্ হাজির বাজারের পাশে,
দেখেন, বাজার ভর্ত্তি রাশি রাশি হাঁসে !—
নোলায় তাঁর পানি হংস দেখে ঝরে !
দু'টাকায় একটি—কেনেন দর করে।

কিনেই হস্তে নিয়ে,
মাথায় ছত্র দিয়ে
দাঁতে বাহার তুলে, অর্থাৎ হাস্য-মুখে
পাল সাহেব চলেন,—বেজায় ফুর্ত্তি বুকে !
কিন্তু দু'পা যেতে পথে, আসে জিহ্বা মেলি—
আরে, একটা লেড়ি-কুত্তো ! নামটা বুঝি, ভেলি !

এধার পানে ফেরা—
আপদ আরো সেরা !
এ-ধারেতে আর-একটা ! এরো জিভ্ ঝোলে!
আরে মলো ! এগোন্ পাল, পড়েন আরো গোলে !
তিনটে জুটে গেছে… ! ছিল এরা কোথায় ?
পালের গা তো কাঁটা ! হংস-রক্ষা দায় !

পালের কাঁপে বুক,
কুঁকড়ে উঠে মুখ !
ছাতা তুলে হংস নিয়ে যত দেন তাড়া,—
দলে-দলে লেড়ি কুত্তো ঘেঁটিয়ে আসে পাড়া !
তাইতো, উপায় কি ? হংস শিরে ওঠে,—
পাল ছোটেন, কুকুরগুলো তাঁরি পিছে ছোটে !

হলো বিষম জ্বালা!
বকেন,—ধেৎ-পালা!—
হাতের ছত্র খসে, টুপি ছাড়ে শিরে,—
কুকুরগুলো ডাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরে ;
সাহেব হতভম্ব, চক্ষু ছানাবড়া—
হাতে হংস পক্ষী—এদের সাথে লড়া
অসম্ভবও! নিরুপায়ে সাহেব ডাকেন,—"ট্যাক্সি..."
কুত্তাগুলো ভ্যাভায়,—"ঘেঁউ, খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ খ্যাক্সি।"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সবজান্তা

রাক্ষুসে মাছ—ইংলণ্ডের নদীগুলিতে এক রকম রাক্ষুসে মাছ দেখতে পাওয়া যায়; হাঙর জ্যান্ত কি মরা জন্তুর মাংস খেয়ে পেট পূর্ণ করে কিন্তু এই মাছের হিংস্রভাব এত বেশী যে জ্যান্ত শীকার না হইলে চলে না। এরা ছোট মাছ, কেঁচো, ইঁদুর, হাঁসের ছানা, ব্যাঙ প্রভৃতি ধরে খায়, ভোঁদড়ই একমাত্র এই মাছের শত্রু। এই মাছের নাম পাইক মাছ, ইংরাজদের অতি প্রিয় খাদ্য। প্রতি বৎসর ইংলণ্ডের নদীগুলি হতে লক্ষ লক্ষ মণ পাইক মাছ ধরে য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে পাঠান হয়। আমাদের দেশে নদী ও পুষ্করিণীগুলিতে বৃহদাকার বোয়াল মাছ দেখতে পাওয়া যায়, পাইক মাছের মত এদেরও হিংস্র ভাব খুব বেশী; বোয়াল মাছকে আমাদের দেশের পাইক মাছ বলা যেতে পারে।

মোটরকার—১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রীট্ (Street) নামে একজন লোক সর্ব্বপ্রথম তেলের সাহায্যে মোটরকার চালান, তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছিলেন জানা যায়নি। এর ৭৫ বৎসর পরে নিকোলাস কুগনট (Nicolas Cougnot) নামে একজন ফরাসী জলীয় বাষ্পের সাহায্যে মোটরকার চালাবার চেষ্টা করেন, পরে আরও অনেকে তাঁর ন্যায় চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কেউ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভায়েনার জুলিয়াস হক (Julius Hock) নামে একজন লোক সর্ব্বপ্রথম পেট্রোল সাহায্যে মোটরকার চালিয়েছিলেন; এর কয়েক বৎসর পরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গত্‌লিয়েব ডেমলার (Gottlieb Daimler) উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ক্ষুদ্র পেট্রোল ইঞ্জিন প্রস্তুত করে মোটরকারে যোগ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ডেমলার তাঁর উদ্ভাবিত ইঞ্জিনের অতি সামান্যই পরিবর্ত্তন করে সাইকেলে যোগ করেছিলেন; সেই সময় হতে মোটর যুক্ত সাইকেল বা মোটর-বাইকের উৎপত্তি। ডেমলারের পর মোটরকারের আরও অনেক উন্নতি হয়েছে ও প্রতি বৎসর হচ্ছে।

নামজাদা চোর—য়ুরোপের বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর নামজাদা চোর হচ্ছে এ্যাডাম ওয়ার্থ; সে নগদ টাকা ও মূল্যবান অলঙ্কার ইত্যাদি ছয় লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের চুরি করেছিল। বড় বড় সিন্দুক নিমেষের মধ্যে ভেঙে ফেলে মূল্যবান হীরক ও অন্যান্য প্রস্তর চুরি করা, জোর করে ডাক কেড়ে লওয়া, ব্যাঙ্কে সিঁদ দেওয়া, সমস্তই সে সমান নিপুনতার সঙ্গে করতে পারত। অনেক দিন ধরে পুলিশ তার কিছুই করতে পারে নাই, সে বেশ নবাবী চালে কাটিয়ে গিয়াছিল কিন্তু কপর্দ্দক শূন্য হয়ে এ্যাডাম ওয়ার্থের মৃত্যু হয়। তার অসদ ভাবে উপার্জ্জিত ধন ও অর্থ সে কারও জন্যে রেখে যেতে পারে নাই।

জর্জ্জ হোয়াইট ও ম্যাক্স সিনবার্গ নামক আর দুইজন নামজাদা চোর আমেরিকার Ocean Bankএ চুরি করে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড উপার্জ্জন করেছিল। এর ফল ভোগ তাদের করিতে হইয়াছিল, পঁচিশ বৎসর ধরে সশ্রম কারাবাস; এত কষ্ট করেও তারা কিছুই রেখে যেতে পারে নাই।

গাউডি ছিল বিলাতের লিভারপুল ব্যাঙ্কের একজন কেরাণী, সে লিভারপুল ব্যাঙ্ক হতে এক লক্ষ সত্তর হাজার পাউণ্ড চুরি করে ছিল, তার কষ্টের উপার্জ্জন সে ভোগ করিতে পারে নাই, অন্য লোকে জোর করে কেড়ে নিয়ে গিয়াছিল।

জর্জ্জ মনলেস্কু চোরের রাজা বলে পরিচিত ছিল; এই চোরের রাজা প্যারি হতে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড, আর্জ্জেন্টাইন হতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড ও অন্যান্য স্থান হতে আরও অনেক টাকা চুরি করেছিল। মনলেস্কু বড় লোকের মত চলাফেরা করত, তার সঙ্গে সর্ব্বদাই একজন সেক্রেটারী ও একজন খানসামা থাকত, শেষে মনলেস্কুর বিদ্যা ধরা পড়ে ও দীর্ঘকাল ধরে কারাবাস তার ভাগ্যে ঘটে ছিল। জেল হতে বের হয়ে মনলেস্কু একখানি পুস্তক লিখেছে ও তাতে দেখিয়েছে যে চুরি করা লাভজনক ব্যবসা নহে। য়ুরোপের—জেরারড ল্যাণ্ডো, চিকটু, ওয়াল্টার শেরিডান, জর্জ্জ এংলিস্, লুইস ব্রাউন প্রভৃতি আরও অনেক নামজাদা চোরের নাম জানতে পারা যায়। চুরির কথা বেশী লেখা ভাল নয়—এই খানেই শেষ করা গেল।

"লণ্ডন জু"—'লণ্ডন জু' হচ্ছে ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড় পশুশালা। এই পশুশালার প্রাণীদের জন্য বাৎসরিক কি পরিমান খাদ্যের প্রয়োজন হয় শুনলে অবাক হতে হবে, নীচে একটী মোটামুটি তালিকা দেওয়া হল।

শুকনো পোকামাকড় ৫০০ পাউণ্ড ওজনের, হেরিং ও অন্যান্য মাছ পৌনে পঁয়তাল্লিশ হন্দর। চিংড়িমাছ ১৮২৫ পাইন্ট, মিলওয়ার্ম ২৫০ পাউণ্ড, কনডেনসড্ মিল্ক ১২৬২৪ টিন, সূর্য্যমুখী ফুলের বীজ ৯ কোয়ার্টার, আলু ৩৩½ টন, বিস্কুট ৯ টন ২ হন্দর। এই ত গেল সাধারণ খাদ্যের পরিমান; এ ছাড়া বিশেষ খাদ্যেরও ব্যবস্থা সেখানে আছে। বিশেষ খাদ্যের মধ্যে স্প্রেট নামে এক রকম মাছ ১ টন ১৮ হন্দর, ডিম ২৫২০০টী, কমলালেবু ১২০১৪টী, শাকসব্জী ২১৯৩ বুশেল, লেটিউস ১৯৫০১, এ্যাপেল ৬টন, খেজুর ১৭½ হন্দর।

মোটা খাবারের মধ্যে খড় বিচালী ইত্যাদি ৩৮৩ টন ও গম যব ইত্যাদি যাবতীয় খাদ্যশস্য ৫৯২ টন লাগে।

অলকেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

খুব ভাল এরোপ্লেন ঘণ্টায় ২৮০ মাইল যায়, ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ঘণ্টায় ৩০ মাইল, গ্রেহাউণ্ড ৫৮ মাইল, ট্রেন ৬০ মাইল, পায়রা ৬০ মাইল, সাধারণ ঝড় ঘণ্টায় ৬০ মাইল, ঘূর্ণীবাত্য ঘণ্টায় ১০০ মাইল, ঈগল পাখী ঘণ্টায় ৭০ মাইল, অষ্ট্রীচ ঘণ্টায় ৩০ মাইল, মানুষের চিন্তা ঘণ্টায় ৬০ মাইল ও পৃথিবী ঘণ্টায় ১০০০ মাইল যায়। সব চেয়ে বেশী হচ্ছে আলোর গতি—ঘণ্টায় ৬৬৯,৬০০,০০০ মাইল।

লিণ্ডবার্গ সর্ব্ব প্রথমে এরোপ্লেন চড়ে একবারও না থেমে এ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্র পার হোয়ে আমেরিকা থেকে ফ্রান্সের প্যারী সহরে আসেন। এই দুঃসাহসিক কার্য্যের জন্যে তাঁর এখন পৃথিবী জোড়া নাম। তিনি ২১ মে থেকে ১৭ জুন পর্য্যন্ত ৩৫ লক্ষ চিঠি, ১ লক্ষ তার ও ১৪ হাজার রকম উপহার পেয়েছেন।

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় মৌচাকের পাঠক পাঠিকা—

কার্ত্তিকের মৌচাকে যে সব পুরস্কারের কথা লেখা হয়েছিল, তার উত্তর এখানে দেওয়া হোল। ভ্রমন-কাহিনীর প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমাধুরী দাশগুপ্ত এবং দ্বিতীয় পুরস্কার শ্রীধীরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅশোকা সেন ও শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের লেখাও বেশ হয়েছে।

ফটোগ্রাফের প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য। ছবির নাম 'ভরা পাল'। তাঁর আর একখানি ছবিও বেশ হয়েছে। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীসুশীলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম "সমুদ্রে মাছধরা।" অন্যান্য যে সব ভাল ছবি এসেছিল তা এখানে ছাপা হোল।

ইতি মৌচাক সম্পাদক

এইবারের প্রতিযোগিতা

পৌষ মাসের প্রতিযোগিতার বিষয় হচ্ছে "বড় হোলে আমি কি হব এবং কেন হব"। অর্থাৎ ভবিষ্যতে তোমরা কোন লাইন গ্রহণ করবে এবং কেন গ্রহণ করবে তার সম্বন্ধ একটা ছোট লেখা চাই। লেখা যেন ছাপলে মৌচাকের দুইপাতা কিম্বা তিনপাতার বেশী না হয়। কেবলমাত্র মৌচাকের গ্রাহক-গ্রাহিকারাই লিখতে পারবেন এবং ২০এ অগ্রহায়নের মধ্যে লেখাগুলো আমাদের হাতে আসা দরকার। প্রথম পুরস্কার ৫ খানা বই, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩ খানা বই।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, কিরিন্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত



মাছ ধরা

শ্রীপূর্ণচক্রবর্ত্তী অঙ্কিত

মৌচাক

৮ম বর্ষ]　　পৌষ, ১৩৩৪　　[৯ম সংখ্যা

চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই

আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই,
আমি দুলন-দেওয়া ঢেউ-খেলানো
হাওয়ার দোলায় শুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

আমি চোখ-জুড়ানো চাঁদের সুধায়
আঁখিটি মোর ধুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

আমি ভুবনভরা চাঁদের হাসি
এই বুকেতে থুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

আমি রূপোয়-গলা একটি ফোঁটা
শিশির ভারে নুই।
আমি চাঁদ্‌নি রাতের জুঁই।

বব্বর-খোর বন্দুক

মণ্টুর ছোট-কাকা বিমলবাবুর হঠাৎ ভয়ানক শিকারের সখ হোলো। এ রকম সখ তাঁর প্রায়ই হোতো আর তাঁর নিজের তরফ থেকে বাধা না পাওয়া পর্য্যন্ত পুরো দস্তুর চল্‌তো। যাহোক এইবার অনেক বন্দুক কেনার পর, তিনি একটা নতুন রকমের রাইফল্‌ বন্দুক মেশান অস্ত্র বিস্তর দাম দিয়ে কিন্‌লেন। বড়দের বৈঠকে সেটা এনে তার কত গুণ সে সব তিনি পরিষ্কার করে বল্‌তে লাগলেন। কেমন সেটাতে বন্দুক রাইফল্‌ দুইয়ের সব গুণ আছে, কোন সাহেব সেটা দিয়ে কটা বাঘ, কটা সিংহ মেরেছে, ওর এক গুলি খেয়ে বড় বড় হাতী কটা ডিগ্‌বাজী খায়, এ সব বলা হোলো। আর আমাদের মণ্টুমাষ্টার এক কোণে বসে দুকাণ খাড়া করে সব শুনলো। তার পরের রবিবার দুপুরে, তাদের সেই বাইরের বারাণ্ডায় বসে মণ্টু তার সাঙ্গপাঙ্গদের সামনে বন্দুক রাইফল্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব বক্তৃতা চালালো।

মণ্টু বল্লে, "বন্দুক জিনিষটা কিছুই নয়, বন্দুক ছোড়া ত ছেলে খেলা। রাইফল্‌? হাঃ, সেটা একটা জোয়ান মরদের উপযুক্ত অস্তর। দুটোয় তফাৎ কতো, খুব ভাল বন্দুক দিয়েও দেড়শ গজের বাইরে একটা চড়ুই পর্য্যন্ত মারা যায় না, আর ভাল রাইফেলের গুলিতে পাঁচ মাইল দূরের হাতীও মারা যায়।"

শেষের কথাটা শুনে কানু বল্লে—"পাঁচ মাইল না পঞ্চাশ কোশ! ভাগ্‌!"

মণ্টু চটে বল্লে—"চুপ কর্‌! বন্দুক রাইফল্‌ কাকে বলে তুই জানিস্‌?"

লালু আস্তে আস্তে বল্‌লো, "রাইফেলের একটা নল, বন্দুকের দুটো নল।"

মণ্টু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বল্‌লো "তুই আরেক বুদ্ধিমান। খুব তফাৎ বুঝেছিস যাহোক। শোন তবে, বন্দুকের নলের ভেতরটা একেবারে ঝক্‌ঝকে প্লেন, রাইফলের নলের ভেতর ইস্ক্রুপের মত প্যাঁচ কাটা আছে, সেই জন্যে তার গুলি ফর্‌রর্‌ করে ঘুরতে ঘুরতে বেরোয়।"

কানু বল্লে—"ঠিক যেমন তোর মগজের প্যাঁচ কাটা আছে, তাই তোর মুখ দিয়ে ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌ কোরে কথা

মণ্টু মহা রেগে বল্লে —"ফের না জেনে শুনে যা-তা বলছিস, ইষ্টুপিড কোথাকার! আলবাৎ প্যাঁচ আছে রাইফেলের ভেতর।"

"যা যাঃ ভাগ্! ওসব পট্টি তুই লালু গনেশ, এদের কাছে লাগাস্।"

"তবে কিসের জন্যে বন্দুকের চেয়ে রাইফ্ল ভালো বল্ দেখি?"

"রাইফ্ল ভালো না আরো কিছু! রাইফেলে একটা গুলি ছুঁড়ে, বাস! বসে থাকো চুপ করে। আর বন্দুকে দুটো গুলি চালান যায়।"

"এই বিদ্যে নিয়ে ওস্তাদি করছিস্? জানিস, রাইফ্লে এক সঙ্গে পাঁচটা গুলি পোরা হয়, সেগুলো একের পর এক গুড়ুম গুড়ুম করে ছোঁড়া যায়।"

"পাঁচ পাঁচটা গুলি, আর ঠিক চানে পট্কার মত ফট্ ফট্ কোরে—উঃ কি গাঁজাখুরি—"

"চুপ কর বোকা গর্দ্দভ কোথাকার।"

"তুই চুপ কর, আফিংখোর মেড়া!"

ক্রমে ত মহা হট্টগোল, হাতাহাতির উপক্রম। বাড়ীর দারোয়ানদের জমাদার রামগিদ্ধড় সিং এতক্ষণ সেখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো। গণ্ডগোলে তার ঘুম ছুটে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্লে—"আরে আরে, এত্তো সোর গোল কেন? কি হইয়েছে?"

কালু বল্লে—"কি আবার হবে। এই মণ্টু গাধাটা বলে কিনা রাইফেলের নলের ভেতরে ইস্ক্রুপের মত প্যাঁচ কাটা আছে।"

জমাদার বল্লো, "হো, রাইফোল? তা মণ্টু দাদা তো ঠিক বলেছে। রাইফোলের ভিতরে গুরূপ আছে, সে তো প্যাঁচ কাটারই মত।"

মণ্টু মহা খুসী হয়ে বল্লো, "দেখলি তো? গাধা কোথাকার!" গণেশ এতক্ষণ ব্যাপার গুরুতর দেখে চুপ করে ছিলো। দাদার জিত হয়েছে বুঝে সে বল্লে— "জমাদার, বন্দুক ভালো না রাইফ্ল ভালো?"

জমাদার বল্লে, "বন্দুক ভালো। পল্টনে সব সিপাহী লোগের কাছেই রাইফোল থাকে। বন্দুক শুধু বড়ো বড়ো অফসর্ লোগের থাকে।"

কালু লাফিয়ে বল্লে "কিরে খুব যে চাল দিচ্ছলি. এবার কি হোলো? মণ্টু

সাক্ষী বিগড়েছে দেখে বিষম অপ্রস্তুত। কাজেই সে আরো জোরে বল্লো—"হাঃ, ও বুড়ো কি জানে, ও কটা বন্দুক রাইফেল দেখেছে ?" ছোটো কা' বলে রাইফল্ ভাল, তার কতগুলো আছে জানিস্ ?" কালু চুপ করে জমাদারের দিকে তাকাল। জমাদার খুব উদাসভাবে গোঁফে তা দিতে দিতে বল্লো—"হাঁ, ছোটবাবু ত সেদিন পর্য্যন্ত কাঠের বন্দুক কাঁধে কোরে, হামার লাঠিটাকে ঘোড়া বানিয়ে হেট্ হেট্ করেছে, আজ সে দু চারটা বন্দুক রাইফোল কিনে বহাদুর বনে গেছে; আর হামি মুখ্খু বুড়া, হামি রাইফোল বন্দুকের কি দেখেছি, কি জানি ?"

এই বলেই সে কালুর দিকে ফিরে বললো,—"কালুদাদা! জানো তুমি, হামি বর্ম্মা মুলুকে লড়াইয়ে গিয়েছিলো। সে ফৌজে ছিল, এই তিশ চালিশ হজার রাইফোল, দো এক হজার পিস্তৌল, তিন চার হজার বন্দুক, দো তিন শৌ তোপ, আরো কত্তো কি। তার মধ্যে কিছু তো না হোক তোভি, পাঁচ দশ হজার তো হামি দেখেছি। আরে, ছোটবাবুর তো দাঁতই উঠলো সেদিন, সে কি এত দেখেছে ?"

গুণতিতে জমাদার তাকে এক হাত নিলো দেখে মণ্টু তখন বল্লে—"ওঃ, ভারী ত জিনিষ সে সব। ছোটকা সেদিন যেটা কিনেছে তার দাম দেড় হাজার টাকা, ও রকম জিনিষ দেখেছো কখনো ?"

দারোয়ানজী গম্ভীরভাবে বল্লো—"না দেড় হজার টাকার বন্দুক তো দেখিনি বাবা, তবে সওয়া দো হজার অসরফি দামের বন্দুক একটা দেখেছি। আর এক অসরফি মোহরের দাম ছাবিবশ টাকা, যাকে খুসী জিগেস করে নাও।" গণেশ এই শুনেই চট্ করে সওয়া দুহাজারকে ছাবিবশ দিয়ে গুণ করে বল্লো—"আটান্ন হাজার পাঁচশো টাকা। বাপস্! দাদা তুমি একেবারে হেরে গেছো।" মণ্টু জোরে মাথা নেড়ে বল্লো "সব বাজে কথা। বন্দুকের অত দাম হতেই পারে না।"

দারোয়ানজী আরও গম্ভীর হয়ে বল্লো—"নাঃ, কি কোরে হোবে ? দুনিয়ার সত্তো বন্দুক সব দেখেছে তুমি আর তোমার ছোট কাকাবাবু, আর আমি রাজপুত, বন্দুক তল্ওয়ার হামার পেশা, হামি কি জানি ? শুনেছো কখনো "বব্বর-খোর" বন্দুকের নাম ?"

নাম শুনে মণ্টুর চক্ষুস্থির। কালু জিগেস কল্লে—"সেটা কি রকম বন্দুক জমাদার ?"

জমাদার "শুনবে তার কথা ?" বল্‌তেই সবাই "হাঁ শুন্‌বো, শুন্‌বো" বলে এগিয়ে বস্‌লো। তখন জমাদার সোজা হয়ে বসে, দুচার বার গোঁফে চাড়া দিয়ে বল্‌তে আরম্ভ করলো :—

"বহুত দিন আগে দিল্লী শহরে এক বন্দুকের কারিগর ছিল, তার নাম খাজা রওখন্ জুস্। তার তৈয়ারী বন্দুক সব দুনিয়া ভর মশুর (প্রসিদ্ধ) ছিল। সে অন্য কারিগরদের মত খরাব ভাল সব রকম বন্দুক বানাতো না। তার বন্দুকের ইস্পাত থেকে কোঁদাই, ঢালাই পিটাই সব সে নিজে দেখ্‌তো আর সমস্তক্ষণ মন্তর আওড়াত। এই রকম সারা বচ্ছর মেহন্নত কোরে যে বন্দুক তৈরী হোতো সেটা সে নিজে পরিচ্ছা (পরীক্ষা) কোরে তার একটা নাম দিতো। সে সব বন্দুক সোণা রূপার দামে বিক্রী হোতো। একবার এই রকম কোরে একটা বন্দুক তৈয়ারী হলো, নাম সে দিলো "বব্বর-খোর।" বব্বরখোর মানে যে বব্বর সিংঘিকে (সিংহ) খায়। লক্ষ্ণৌয়ের নওয়াব (নবাব) সেটা সওয়া দো হজার অসরফি দিয়ে কিনে নিয়ে গেলো। তারপর যখন কম্পনি বহাদুর নওয়াবকে লক্ষ্ণৌ থেকে তাড়িয়ে দিলে, তখন সেটা গিয়ে পড়্‌লো ঘাসবনৌলির জমিদার চৌধরি বজরবণ্টু সিংএর কাছে। চৌধরি বজরবণ্টু সিং ছিল প্রকাণ্ড জোয়ান লোক। আর যেমন তার চেহারা তেমন ছিল তার সাহস। তারপর সে ছিল তগা ব্রাহ্‌মণ (ব্রাহ্মণ), একেবারে খাস দরোন্ আচারের সন্তান।"

গণেশ বল্লে—"কিসের আচার বল্লে, জমাদার।"

"অরে, রাম, রাম ! আচার নয়, দ্দরোন আচার, দ্দরোন আচারিয়. মহাভারত জানো না ? ইস্কুলে লিখ্‌খা পড়া তবে কি শিখ্‌লাচ্ছে ?"

কালু বল্লে "কিরে বাবা ! মহাভারতে আচার কাসুন্দির কথা আবার কোথায় ?"

জমাদার হতাশ ভাবে বল্লে—"হুজেরী ! বঙ্গালীর ধরম, বিদ্যা কিছু নাই। অরে দরোন আচার ছিলো কুরু-পাণ্ডব লোগের গুরু, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন এদের লড়্‌তে শিখ্‌লাতো।"

মন্টু চট্ করে গম্ভীর ভাবে বল্লে—"হাঁ, হাঁ, জানি। তুমি দ্রোণাচার্য্যের কথা বলছো।"

জমিদার বল্লে—"বুঝেছো তো চুপ কেন করেছিলে?" এই বলে সে ফের আরম্ভ করলে—"হাঁ চৌধরি বজ্রবণ্টু সিং, দরোন-আচারের সন্তান, তার ওপর সে পেয়ে গেলো সেই ববররখোর বন্দুক। কাজেই মস্ত শিকারি বলে তার নাম জাহির হোয়ে গেলো। বড়ো বড়ো বাঘ, বড়ো বড়ো হাথী,ইয়া ভারা গণ্ডার এই সব সে শিকার খেলতো। কলকত্তার বাবুদের মত কবুতর (পায়রা) আর জঙ্গলা বত্তক (হাঁস) মেরে বাহাদুর বনতো না। অনেক দিন পর আমার পল্টনের এক অফসর, কাপ্তান উঁটরাম, আমাকে সঙ্গে লিয়ে চৌধরিজীর দেশে শিকার খেলতে গেলো।

কালু বল্লে—"তোমার কাপ্তান বুঝি হিন্দুস্থানি ছিলো?"

মন্টু বল্লে—"আঃ, জিগেস করছিস্ কেন, দেখছিস্ না নামের শেষে রাম রয়েছে?"

গণেশ বল্লে—"কেয়া গ্রেণ্ড নাম, দাদা, উঁটরাম!"

জমাদার এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিলো, ব্যাপারটা বুঝে সে হঠাৎ মাথা ঝাঁকি দিয়ে বল্লো "আরে না না! উঁটরাম, সাহাব খাস বিলাতি গোরা। জণ্ডেল উঁটরাম, যার নামে গঙ্গাজীতে ঘাট আছে, ইডেন বাগানের কাছে, যার পাথরের মূর্ত্তি আছে ময়দানে, হামার কাপ্তান তার ভাই কি ভাইপো লাগতো।"

ছেলেরা খানিক এ ওর মুখ চাওয়া চাওই করলো, হঠাৎ মন্টু হো হো করে হেসে বললো—"ওরে বাবা, জেনারেল আউট্রাম (Outram), জমাদারের পাল্লায় পড়ে "উঁটরাম" হয়ে গেছে।" সবাই তো খুব হেসে নিল। জমাদার বেজায় গম্ভীর হয়ে চুপ করে খইনি ডলতে লাগলো।

সে থেমে গেলো দেখে লালু বল্লে—"তারপর কি হলো জমাদার?"

জমাদার গম্ভীর ভাবে বল্লো—"মন্টুদাদাকে জিগেস করো। হামার কাপ্তানের নামও সে হামার চেয়ে ভালো জানে যখন তখন সব গল্পটাও জানে।"

কালু বল্লে—"কেন শোন তুমি ওর কথা জমাদার, ওটা একটা গাধা।"

এ কথায় খুশী হয়ে জমাদার ফের বলতে লাগলো—"কয় দিন তো শিকার বেশ চললো। আমাদের সঙ্গে শিকারের জন্তে আর জিনিষ-পত্তর লিয়ে যাবার জন্তে

আটটা হাথী ছিলো, রোজ আমরা নতুন নতুন জায়গায় তাম্বু ফেলে ছাউনী করে ঘুরতাম। এক দিন অম্নি করে এক গাঁয়ের কাছে আমরা এলাম। সে গাঁয়ে লোক জন নেই, প্রায় সব বাড়ি ঘর ভাঙ্গা, আর ক্ষেত-টেত নষ্ট হোয়ে যাচ্ছে। অনেক খুঁজে একটা বুড়োকে পাওয়া গেলো। সে বল্লে যে একটা বুনো পাগ্লা হাথীর অত্যাচারে তাদের গাঁয়ের এই অবস্থা। তার ভয়ে সবাই পালিয়েছে, কেবল সে বুড়ো বলে পালাতে পারে নি। রোজ হাথীটা এসে বাড়ি, ঘর ক্ষেত সব নষ্ট করে, আর মানুষ ধর্‌তে পার্‌লে তাকে মেরে খেয়ে ফেলে।"

মণ্টু বল্লে—"দূর! হাতী তো নিরামিষ খায়, মানুষ খাবে কি করে ?"

জমাদার বল্লে—"এ হাথীটা নিরামিষ খেতো না। মানুষ খেতো।"

মণ্টু বল্লে—"পাঁচটা হাতী যখন নিরামিষ খায় তখন সব হাতীই নিরামিষ খায়।"

জমাদার রেগে বল্লে—"হাঁ! তুমি তো সব জানো। আমি নিরামিষ খাই, তুমি মছ্‌লি খাও, নাগারা কুত্তা খায়, বির্‌হররা বাঁন্দর খায়, চীনারা অরসুলা খায়, বর্ম্মারা ঘড়িয়াল (কুমীর) খায়, সবাই তো মানুষ আছে ? মানুষের খাওয়া তফাৎ হোতে পারে, হাথীর পারে না ?"

মণ্টু ত চুপ হয়ে গেলো। জমাদার বল্‌তে লাগলো—"কাপ্তান সাহাব এ সব শুনে বল্লে—"বহুৎ ঠিক হ্যায়। হাম হাথিকা শিকার খেলেগা। হিয়া ছাউনী করো।"

রাত্তিরে চারিদিকে আগুন জ্বেলে ছাউনির পাহারা ঠিক রাখা হোলো। মাঝ রাত্তিরে বড় মাহুত এসে সাহেবকে বল্লে যে কোন বুনো হাথী কাছে এসেছে তাই আমাদের হাথীগুলো বড় অস্থির হয়েছে। আমরা উঠে দেখি সব হাথীগুলো গটর্ গটর্ ফোঁস ফোঁস্ গোঁ গোঁ কর্‌ছে। চারিদিকে চাঁদের আলো, কিন্তু বুনো হাথী কোথাও নেই। খানিক পরে হঠাৎ একটা ভয়ানক জোর চিচ্‌কার শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হাথীগুলো মহা সোরগোল লাগিয়ে দিলো। হাথী ঘোড়ার চেঁচামেচি, শিকলির ঝন্‌ঝনা, মাহুত লোগের "হোঃ বেটা, হোঃ মেরে বাবা" এই সব চলেছে, এমন সময় একটু দূরে এক টিলার (ঢিপ) ওপর প্রকাণ্ড কালো একটা কি দেখা গেলো। সেটা যখন এগিয়ে আস্‌ছে তখন আমাদের হাথীগুলো শিকলি ভাঙ্গবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলো।

ব্যাপার দেখে কাপ্তান সাহাব নিজে বন্দুক আওয়াজ করলে আর হুকম্ পেয়ে আমরাও করলাম। প্রথমে বন্দুক আওয়াজ হতেই বুনো হাথীটা গর্জিয়ে উঠলো। তারপর আট দশটা আওয়াজের পর হঠাৎ ফিরে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। পরদিন সকালে সেই ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল, সঙ্গে কয় জন লোক নিয়ে এসে কাপ্তান সাহাবকে আর্‌জি (অনুরোধ) করলে হাথীটাকে মেরে দিতে। কাপ্তান বল্লে—"হাথী কাঁহা হ্যায়, টুমলোগ্ ভেখানে সক্‌টা ?"

"হাঁ হুজুর দেখানে সক্‌তা।"

কাপ্তান "অলরৈট্" বলে মাহুতকে হাথী সওয়ারির জন্যে ঠিক করতে বল্লে। বড় মাহুত সেলাম ঠুকে বল্লে যে সে হুজুরের হুকুম তামিল করতে এখনি রাজি, কিন্তু তার হাথীগুলো বুনো পাগলা হাথীর সামনে ঠিক থাকবে কিনা সন্দেহ। যদি হাথীগুলো বিগ্‌ড়িয়ে যায় তা হলে সকলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। ব্যাপার বুঝে কাপ্তান বল্লে—"ও ড্যাম! যাও, নেহি মাংটা হাথী, ঘোড়া তৈয়ারি কড়ো।"

ঘোড়া এলো। সাহেব ঘোড়ায় আর বাকী সবাই হেঁটে চল্‌লো। কতদূর গিয়ে গাঁয়ের সীমানা পার হোয়ে আমরা একটা নালার ধারে পৌঁছালাম। জায়গায় জায়গায়, ইয়া ভারী ভারী হাথীর পায়ের দাগ। যখন আমরা জঙ্গলের সীমানায় এসেছি তখন কাপ্তান ঘোড়া থামিয়ে তার দোনলা রাইফেলটা হাতে নিয়ে তার গুলী বারুদ সব ঠিক আছে দেখে, সেটা কাঁধে রেখে তারপর ঘোড়া চালালো।

তারপর ক্রমে জমী উঁচা নিচা, চড়াই উৎরাই সুরু হোলো। বড়ো বড়ো গাছ, ঝাড়, ঝোপ জববর ঘাসের জঙ্গল, এই সব চারিদিকে দেখা গেল। এ সব পার হোয়ে এমন একটা জায়গা এলো যেখানটা জঙ্গল ঝাড়ে ঘেরা। মাঝখানে সেই নালা, তার এ পারে এক জায়গায় কতগুলো খুব বড়ো বড়ো পাথর আছে, সে গুলোর নীচে নালার অনেকটা জল এক জায়গায় জমে আছে, তার দুপাশ দিয়ে ঝির্‌ঝির্ কোরে বালির উপর অল্প জলের স্রোত চলেছে। নালার ওপারে ভয়ানক জঙ্গল, আর দুপাশের গাছগুলো ছাড়িয়ে একটু পরেই খুব বড় বড় ঘাস, আর মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। শীকারী লোকেরা আর এগোতে চাইলে না। তারা বল্লে হাথীটা এই

খানেই কোথাও লুকিয়ে আছে। সেটা দিনের বেলায় এই খানে জল খায় আর চান করে। সাহাব বল্লে—"টুমলোগ পেঁড় (গাছ) পর চড়কে ডেখো হাঠি কি ধর্ হ্যায়। হাম নালাকা কিনারাসে ডেখ্টা।"

আমরা সবে গাছে উঠেছি, আর সাহেব নালার ধারে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটা বেঁধে রাইফোল হাতে এদিক ওদিক দেখ্ছে, এমন সময় পাঁচটা বম্বই মেলের মত আওয়াজ করতে করতে একটা পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড হাথী, হঠাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কাপ্তানের দিকে ভয়ানক জোরে তেড়ে গেল। সাহাব বোঁ করে ফিরে হাথীর মাথা তাক্ কোরে রাইফোল চালালো। গুলী খেয়ে হাথীটা একটু থাম্তেই সাহাব ফের গুলী চালালো। কিন্তু ঐ দামী বিলাতি রাইফোলের দুই গুলী খেয়েও হাথী মর্লো না। দেখ্তে দেখ্তে সেটা ফের শুণ্ড্ তুলে চিচ্কার কোরে কাপ্তানের ওপর গিয়ে পড়্লো। ঘোড়াটা ভড়্কে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে মাঝে পড়েছিলো, হাথী এক ভীষণ ধাক্কায় ঘোড়া আর সাহাবকে ছিট্কে নালায় ফেলে দিলো। সাহাব ধাক্কা খেয়ে নালার ধারের এক খড্ডায় (গর্ত্তে) পড়ে গেলো। হাথীটা তাকে দেখতে পেলোনা। ঘোড়াটা নালার মাঝে রক্ত মাখা গায়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপরই সেটা ছুটে নালার ওপার দিয়ে পালালো, হাথীটাও তার পিছে পিছে ছুটে গেলো।

আমরা গাছ থেকে নেমে দেখ্লাম সাহাব বেহোস (অজ্ঞান) হয়ে খড্ডায় পড়ে আছে। তাকে তুলে নিয়ে আমরা ছাউনিতে ফিরে এসে হাথীতে সওয়ার হোয়ে সেই দিনই ঘাসবনৌলিতে চৌধরি বজরবণ্টু সিংএর বাড়ি চলে গেলাম।

মণ্টু বল্লে—"ক্যাপ্টেন সায়েবের রাইফল্টার কি হোলো?"

গণেশ বল্লে—"ঘোড়াটার কি হোলো?"

জমাদার বিরক্ত ভাবে বল্লে—"ধুত্তোরি! তোমরা গপ্পো শুনবে তো শোন, রাইফোল কি হোলো, ঘোড়া কি হোলো সে খবরে কি দরকার?"

লালু বল্লে—"ও সব দামী জিনিষ কিনা, তাই ওরা জানতে চায়।"

"অরে দামী জিনিষ আছে তো কি হোয়েছে! রাইফোল ঘোড়া এ সব ত দু পাঁচ হজার টাকার জিনিষ, পল্টনে ও রকম জিনিষের জন্যে কেউ পরোয়া করে না।"

দরোয়ানজীর দু পাঁচ হাজার টাকার প্রতি এ রকম তাচ্ছিল্য দেখে কেউ আর কিছু বলতে সাহস করলনা। জমাদার ফের বলতে লাগলো—"চৌধরি বজরবন্ট্ সিং তো কাপ্তান সাহাবের খুব সেবা যত্ন খাতির করতে লেগে গেলো। সাহাবের পা ভেঙ্গে গিয়ে ছিলো কিন্তু সে কথা সে ভাব্ছিলো না। সে কেবল বারে বারে চৌধরিজীর কাছে আফ্সোস্ (আক্ষেপ) করছিলো যে হাথীটা মরলোনা। চৌধরি সব শুনে গম্ভীর হয়ে বল্লো—"হম্ তো বুঢ্ঢা হো গয়া, কাপ্তান সাহাব! শিকার কা সওখ্ সব নহী হয়, মগর উয়ো হাথী আপকো জখম কিয়া, অওর উয়ো শয়তান গাঁওকা আদমীকা ভি বহুৎ খারাবী কিয়া, তব উস্কো সাজা দেনা চাহিয়ে।" এই বলে সে তার আর্দ্দালীকে বল্লে "বব্বর-খোর বন্দুক নিকালো।" তারপর আমাদের সামনে সেই বন্দুকটা আনা হোলো। প্রকাণ্ড লম্বা একটা কাঠের বাক্স, তার ভিতর একটা তামার চোঙ্গা। চোঙ্গার মুখ খুলে দুজন লোকে টেনে বন্দুকটা বার কর্লো। সেটার সমস্তটা কাপড় জড়ান আর কাপড় থেকে টপ্ টপ্ কোরে তেল পড়ছে।"

মণ্টু বল্লে—"কি, বন্দুকটা তেলে চুবিয়ে রেখেছিলো নাকি?"

দারোয়ানজী বল্লে—"হাঁ বন্দুকটাকে মাসে এক মন কোরে তেল খাওয়ান হোতো। তেল খেয়ে খেয়ে বন্দুকের জোর বাড়্তো।"

মণ্টু বল্লে—"বাঃ ইস্পাত লোহা আবার তেল খাবে কি? তেল দ্যায় শুধু মর্চে পড়া আটকাবার জন্যে।"

"হাঁঃ, তুমি তো অনেক জানো! ঘি খেলে যেমন মানুষের জোর বাড়ে, তেল খেলে তেম্নি হাথিয়ারের (অস্ত্রের) জোর বাড়ে।"

মণ্টু কি বল্তে যাচ্ছিলো এমন সময় গণেশ বল্লে—"দাদা বাঁশে তো মর্চে পড়ে না, তবে বাঁশের লাঠিতে তেল দ্যায় কেন?"

এ কথা শুনে মণ্টু কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো। জমাদার তাতে মহাখুসী হয়ে বল্লে—"সাবাস্ গণেশদাদা! ঠিক বলেছো মেরে বাবা, তুমি বড়ো হলে নিশ্চয় বাজিষ্টর (ব্যারিষ্টর) হবে।" এই বলে সে বল্তে লাগলো—কাপড়া লত্তা খুলে,

তেল মুছে বন্দুকটা যখন বার করলো, তখন সেটা দেখে, আমরা তো আমরা, কাপ্তান সাহাব, যে এত বড় লড়াইয়ে গোরা, সেও অবাক্ হোয়ে গেলো।

তার সারা বদনটার সোণার কাজ করা ফওলাদ ইস্পাৎ ঝক্‌ঝক্ করছে, প্রায় তিন গজ লম্বা, আমার কব্জার মত মোটা নল, সওয়া মণ ওজন, সে ত বন্দুক নয়, সে তোপ কি বাচ্ছা!

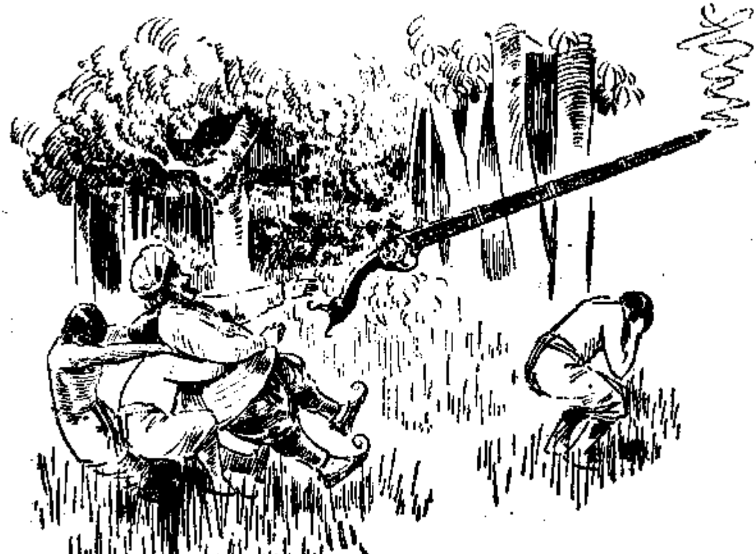
পরদিন খুব ভোরে চৌধুরী বজর্‌বণ্টু সিং দশটা হাথী আর বিস্তর লোকজন নিয়ে চললো পাগলা হাথী শিকারে। কাপ্তানের হুকম পেয়ে একটা পল্টনি রাইফেল নিয়ে আমিও সঙ্গে চল্‌লাম।

বিকালের দিকে আমরা আবার সেই নালাটার ধারে সেই বড়ো বড়ো পাথরগুলোর কাছে পৌঁছালাম। সেখানে জিনিষ-পত্র নামিয়ে হাতীগুলাকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। তারপর মুঠা মুঠা বিলাতি বারুদ আর ছোটখাট কামানের গোলার মত এক গুলি দিয়ে ববর খোরের পেট ভর্ত্তি করে ঠাসা হোলো। তারপর বন্দুক সাথে নিয়ে চৌধুরিজী, যেখানে অনেকগুলো পাথর মিলে একটা উঁচু চবুতরার মত ছিলো, সেখানে উঠ্‌লো। সামনে একজন লোক, তার কাঁধের ওপর বন্দুকের নলটা, তার পেছনে বন্দুক ধরে চৌধরি বজর্‌বণ্টু সিং, চৌধুরিজীর মোটা ভুঁড়ি পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে এক জোয়ান, তাকে ধরে আর একজন, আর তার পেছনে আবার একজন, এই রকম করে তো তারা তৈয়ার হোলো। অন্যরা তো সবাই গাছে উঠলো। আমিও উঠলাম। তারপরেই চৌধুরীজীর দল খুব হল্লা করে চেঁচাতে লাগ্‌লো সঙ্গে সঙ্গে আমরাও গাছের ওপর থেকে চিচ্‌কার কোরে হাতীটাকে গালি দিতে থাকলাম।

হঠাৎ জঙ্গলের ভিতরে ঝড় চলবার মত কড়্ কড়্ মড়্ মড়্ শব্দ আর তার সঙ্গে হাথীর গর্জ্জন শোনা গেলো। ক্রমেই আওয়াজ এগিয়ে এলো, দুড় দুড় শব্দ, জমীন্ কাঁপছে, গাছ পালা ভাঙছে, মধ্যে মধ্যে রেলের ইঞ্জীনের মত চিচ্‌কার, সে যেন ভুঁইডোলায় (ভূমিকম্পে) দুনিয়া খতম হচ্ছে। সবাই তো চুপ হয়ে গেলো, কেবল চৌধুরিজী দরোন-আচারের সন্তান, সে মাঝে মাঝে জোরে হাঁক দিয়ে বল্‌তে লাগলো—"চলে আও বদ্‌মাস্ চলে আও বেইমান কা বাচ্ছা, ইধর আও সয়তান্!"

দেখ্‌তে দেখ্‌তে, জঙ্গলের ধারের দু'তিনটা মোটা মোটা গাছ ঠিক দাতুইন (দাঁতন) কাঠির মত ভেঙ্গে, প্রকাণ্ড কালো একটা দানোর মত সেই পাগলা হাথীটা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালো। সেটা দাঁড়িয়ে এদিক ওদিকে খুঁজছে, এমন সময় চৌধুরি তাকে জোরে হেঁকে বল্লে "অবে, ইধর দেখ" (ওরে, এদিকে দেখ্)। এই বলেই সে সঙ্গীদের বল্লে "খবরদার।"

চৌধুরি কথা বল্‌তে বল্‌তেই হাথীটা বন্ করে তার দিকে ফিরল। তারপর কাণ দুটা এগিয়ে, শুণ্ড্ তুলে ভীষণ চিচ্‌কার গর্জ্জন কোরে, সেটা ভয়ানক জোরে হম্‌লা (প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ) করলো, সে যেন একটা পাহাড় ক্ষেপে পঞ্জাব মেলের মত ছুটে আস্‌ছে। যখন সেটা দশ্ বার গজ মাত্র তফাতে আছে তখন সে একবার



শুণ্ড্‌টা নামালো। সেই মুহূর্ত্তে চৌধুরী বন্দুকের ঘোড়া টিপে তার কপালে তাক করে গুলি চালালো।

বাপ্‌রে কি আওয়াজ! কি তেজ বব্বর-খোরের! কি জবরদস্ত হাতিয়ার!

দ্দড় দ্দড় দ্দুড়ুম করে বাজ পড়ার মত আওয়াজ হোলো আর সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রকাণ্ড ভারী পাগলা হাথীটা মাটিতে পড়ে, ঠিক আমাদের লালুদাদার খেলার মত, তিন ঘুমণ্ডি (ডিগ্‌বাজি) খেলো। বব্বরখোরের নলটা ক্ষেপা ঘোড়ার মত লাফিয়ে আকাশে উঠ্‌লো আর তার কুঁন্দার লাথি লেগে অত বড় জোয়ান মরদ বজ্জরবণ্টু সিং আর তার তিন জোয়ান ছিট্‌কে সেই নালার জলে ঝপ্পাত করে পড়ে গেলো। কেবল যে লোকটার কাঁধে নল ছিল সে দুহাতে কাণ চেপে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রইলো।

হাথীটা তো দু-এক বার পা ছুঁড়ে ঠাণ্ডা হয়ে মরে গেলো। আমরা তখন নেমে এসে চৌধরিজী আর তার দলের লোকদের তুললাম। তারপর সেই বুনো হাথীটার পাঁচ পাঁচ হাত লম্বা আর আমার জাংঘের মত মোটা দুই দাঁত নিয়ে আমরা ঘাসবনৌলিতে ফিরে এলাম।

পরদিন আমরা যখন কাপ্তান সাহেবকে নিয়ে শহরে ডাক্তার দেখাতে রওয়ানা হবো, তখন চৌধরিজী সেই দাঁত দুটো কাপ্তান সাহেবকে সওগাত (উপহার) দিলো।

কাপ্তান সাহাবের ইচ্ছা ছিলো বন্দুকটাও নিতে। কিন্তু সে কথা চৌধরিকে বল্‌তে সে বল্‌লো—"কাপ্তান সাহাব! ওটা দেওয়ার চেয়ে আমার অর্দ্ধেক জমিদারী দেওয়া কম কথা। তবে আমি চৌধরি বজ্জরবণ্টু সিং, তগা ব্রাহ্‌মণ, আমার বংশের রীতই হচ্ছে দান, তোমার যখন ওটা পসন্দ্‌ হয়েছে তখন নিতে পারো। খালি আফ্‌সোস এই যে খাজা রওঘন জুস্‌ বেঁচে নেই যে আর একটা বব্বর-খোর বানাবে, আর লক্ষ্ণৌয়ের নওয়াবও নেই যে তা হজার হজার অসরফি দিয়ে কিনবে।"

কাপ্তান সাহাব একথা শুনে চৌধরিজীর দুহাত চেপে ধরে বল্ল যে সে একথা জান্‌তো না তাই চেয়েছিল! বব্বর-খোর যখন একটা বই দুটো হতে পারে না, আর চৌধরি বজ্জরবণ্টু সিং ও আর হবে না, তখনও দুইই এক জায়গায় থাকা উচিত।

"জগন্নাথ পণ্ডিত"

লাল কুঠি

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ

চোর ধরা

অনেক দিনের কথা। কলিকাতার বাড়ী ভাঙ্গিয়া এমন বড় বড় পথ তখন চারিদিক দিয়া বাহির হয় নাই। মোটর গাড়ী চোখে দেখা দূরের কথা, তার কল্পনাও তখন কেহ করিতে শিখে নাই।

শীতকাল। বেলা তখন তিনটে বাজিয়া গিয়াছে; চারটে বাজিতে কিছু দেরী। বেলেঘাটা রেল-ষ্টেশন তখন ছিল আলাদা—শেয়ালদা ষ্টেশনের সঙ্গে এমন গায়ে গায়ে নয়। শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়াইয়া শশাঙ্ক ভাবিতেছিল, এখন তো ট্রেণ ছাড়িবার দেরী আছে—চট্ করিয়া বহুবাজারের মোড় পার হইয়া গোটা কয়েক কমলা লেবু কিনিয়া লইলে বেশ হয়! তাকে গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে, কথা আছে। থাকে সে পটল-ডাঙ্গায়। মস্ত বাড়ী। কলেজে পড়ে। জোয়ান ছোকরা—গায়ে বেশ জোর। মা-বাপ নাই। পৈত্রিক টাকা-কড়ি আছে; ব্যাঙ্কে মজুত্। সে নিশ্চিন্ত মনে লেখা-পড়া করে।

গোবিন্দপুরে যাওয়ার কারণটুকু মজার। তার এক দূর সম্পর্কের ঠাকুর্দ্দা চিরকাল পশ্চিমে থাকিতেন। সম্প্রতি তিনি মারা গিয়াছেন। তিনি এক উইল লিখিয়া তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সম্পর্কীয় নাতি-নাতনিদের দিয়া গিয়াছেন। নাতি-নাতনিদের চিঠি লিখিয়া তাঁর উকিল সে কথা জানাইয়াছেন। শশাঙ্ক ঠিক করিয়াছে, বাড়ী-বাগান-জমি যা পাইয়াছে, বেচিয়া টাকা-কড়ির যোগাড় করিয়া সে বিলাত যাইবে। শুধু বিলাত কেন, সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইবে। ঠাকুর্দ্দার বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে গোবিন্দপুরে আছে এক মস্ত বাড়ী—সে বাড়ী আট জনকে তিনি সমান ভাগে দিয়া গিয়াছেন। আর সাত

জনকে শশাঙ্ক তেমন চেনেনা ; মা বাঁচিয়া থাকিতে দু-এক জনের নাম যা শুনিয়াছে। তারা কোথায় থাকে, কি করে, বা কত বয়স, এ সব কোন খপরই তার রাখিবার দরকার হয় নাই! গোবিন্দপুরে বাড়ী দেখিতে যাইবার তাড়াও তেমন ছিল না। যত বড় বাড়ীই সে হোক্, পাড়াগাঁয়ের বাড়ী! কি-বা তার দর হইবে! তবু যে আজ গোবিন্দপুরে চলিয়াছে, এর কারণ আছে! সেই কারণটুকুই এখন খুলিয়া বলি।

কাল শশাঙ্ক ডাকে একখানা চিঠি পাইয়াছে। চিঠিখানা এই—

মহাশয়,

আপনার আত্মীয় ৺ত্রিলোকেশ্বর চক্রবর্ত্তীর শেষ উইল-মতে তাঁর গোবিন্দপুরের বসত-বাটীর দু' আনা অংশের মালিক আপনি। সে উইলের সম্বন্ধে যা-কিছু কর্ত্তব্য, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একজিকিউটার মহাশয় তা করিয়াছেন। গোবিন্দপুরে আমরা এক বড় কারখানা ও টেকনিক্যাল স্কুল খুলিব বলিয়া জমির সন্ধান করিতেছিলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীখানি এমনিই তো পড়িয়া আছে, আপনারা সে বাড়ীতে বাস করিবেন বলিয়াও মনে হয় না। কাজেই মহাশয়কে লিখিতেছি, আপনার দু' আনা অংশ যদি আমায় বিক্রয় করেন, তাহা হইলে নগদ মূল্যে আমি সে বাড়ী কিনিতে প্রস্তুত আছি। অপর সরিকদেরও এইরূপ অভিলাষ পত্র-দ্বারা জানাইতেছি। সমস্ত বাড়ী ও জমি আমি কিনিতে চাই। ও বাড়ীখানি পাইলে নূতন বাড়ী মেরামতের অনাবশ্যক অনেক ব্যয় বাঁচাইতে পারি, এবং স্কুল খুলিবার জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কাজেই মহাশয়কে নিবেদন জানাইতেছি, আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় যদি গোবিন্দপুরের বাড়ীতে দয়া করিয়া উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে দুই জনে বাড়ী দেখিয়া দর স্থির করিয়া লেখাপড়া প্রভৃতির কথাবার্ত্তা পাকা করিয়া ফেলি। ব্যাপারটা যথা-সম্ভব শীঘ্র সারিয়া লইলে আমার অশেষ উপকার হয়। আশা করি, মহাশয় কাল সন্ধ্যায় গোবিন্দপুরে উপস্থিত থাকিয়া কৃতার্থ করিবেন। ইতি

বিনয়াবনত—শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত

এই চিঠি পাইয়া শশাঙ্ক খুসীও হইয়াছে খুব। যে-বাড়ী সে কখনও চক্ষে দেখে নাই, যে-বাড়ী বহু কাল এমনি বেমেরামতিতে পড়িয়া ইটের পাঁজা হইয়া দাঁড়াইতেছে,

সে বাড়ীর উপর তার মায়া তো মোটেই নাই! সে বাড়ীর বদলে নগদ টাকা যদি তেমন পাওয়া যায় তো সে ভারী আনন্দের কথা! তাই আজ সে গোবিন্দপুরে যাইবার জন্য বেলেঘাটায় আসিয়া হাজির হইয়াছে।

মোড়ে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতেছিল, কটা কমলা লেবু কিনিয়া লইয়া যাই! পাড়াগাঁ! কে জানে, ফিরিতে কত রাত্রি হইবে—যদি হাঁটিয়া গলা শুকাইয়া ওঠে, তাহা হইলে পিপাসা দূর করা যাইবে তো! সেখানকার কাহাকেও যখন সে চেনে না! সুতরাং...

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল।

একটা ট্রাম আসিয়া মোড়ে দাঁড়াইবা মাত্র কয়েকজন লোক নামিল। সেই সঙ্গে একজন ভদ্রলোকও নামিলেন। যেমন নামা, অমনি তাঁর পাশ হইতে একজন মুসলমান ছোকরা আসিয়া তাঁর পকেটে হাত ঢুকাইয়া রুমালে বাঁধা কি-একটা



শশাঙ্ক তার পিছনে ছুটিয়া গিয়া তাকে ধরিল

তুলিয়া লইয়া সোজা দক্ষিণ দিকে ছুট দিল। 'চোর-চোর' বলিয়া মহা-শব্দ উঠিল। এই লোকটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই কিন্তু শশাঙ্ক তার পিছনে গিয়া তাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরা পড়িবামাত্র ছোকরা রুমালটা পথের ওধারে

ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। শশাঙ্ক চোরকে ছাড়িয়া রুমালের দিকে অগ্রসর হইল, আর সেই ফাঁকে এক দৌড়ে চোর অদৃশ্য হইয়া গেল।

রুমালটা কুড়াইয়া শশাঙ্ক দাঁড়াইল—তৎক্ষণে রুমালের মালিক সেই ভদ্র লোক, আর তাঁর সঙ্গে বহু লোক সেখানে আসিয়া হাজির! সকলের মুখে ভারী তারিফ! সাবাস্ ছোকরা! ভারী ধরিয়া ফেলিয়াছে! শশাঙ্ক ভদ্র লোকটির হাতে রুমাল দিলে ভদ্র লোক নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—ভারী ধরে ফেলেচেন! ওঃ—দেখি, জিনিষটা আছে কি না...বলিয়া তিনি রুমাল খুলিলেন। রুমালের মধ্যে একটা সাদা পাথর ঝক্ঝক্ করিতেছে! হীরা! আকারেও নেহাৎ ছোট নয়! ভদ্র লোক কহিলেন—ইঃ, খুব বরাত জোর! পাঁচ হাজার টাকায় খা দিয়ে ছিল...

আশপাশের লোকজন কহিল,—এমনি অসাবধানে ও জিনিষ রাখে মানুষ ..আচ্ছা লোক তো! নানা মন্তব্য করিতে করিতে ভিড় সরিয়া গেল। ভদ্রলোক শশাঙ্কর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন,—ধন্যবাদ, বিশেষ ধন্যবাদ! যে উপকার করলেন, তা কখনো ভুলবো না...যদি দিন পাই!

শশাঙ্ক সে ধন্যবাদ শুনিবার জন্য দাঁড়াইল না—রাস্তার ওধারে চলিয়া গেল এবং গোটা ছয় কমলালেবু কিনিয়া বেলেঘাটা ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিল, কিনিয়া ট্রেণের একটা ইণ্টার কামরায় গিয়া উঠিল। কামরায় বেশ ভিড়। সে ভিড়ের প্রতি লক্ষ্য মাত্র না করিয়া শশাঙ্ক লেবু ছাড়াইতে বসিল। একবার শুধু মনে হইল, ও লোকটার তো ঐ শ্রী, অমন হীরা ও কোথায় পাইল।

লেবুটা মিষ্ট তার স্বাদ পাইয়া হীরার কথা মনে থিতাইতে পারিল না। ওদিকে যথাসময়ে ঘণ্টা বাজিল, এবং বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণ প্লাটফর্ম্ম ছাড়িয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিচয়

সে দিন বুঝি শনিবার। ট্রেন অফিস-ফেরত লোকজনে ভরতি। প্রত্যেক ষ্টেশনে থামিয়া যাত্রী নামাইয়া ট্রেণ গিয়া সোনারপুর ষ্টেশনে থামিলে শশাঙ্ক নামিয়া পড়িল।

তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। শীতের বেলা। একটু পরেই অন্ধকার নামিবে। শুক্ল-পক্ষ নয় যে চাঁদের আলোয় পথ দেখার সুবিধা হইবে! শশাঙ্ক ভাবিল, তাইতো, ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায় না?

টিকিট দিয়া প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া সে দেখে, মাঠের উপর দিয়া পায়ে-চলা সরু পথ। গাড়ী-ঘোড়ার চিহ্ন-মাত্র নাই! তার উপর এখানে সে কখনো আসে নাই! আর কিছু নয়, পথ চিনিয়া আবার ষ্টেশনে ফিরিবে কি করিয়া, এইটাই যা ভাবনা! শীতের রাত্রি। মাঠে-ঘাটে পড়িয়া কাটানোও সম্ভব নয়!

যাক্, ফেরার ভাবনা পরে, আগে তো পৌঁছানো যাক্! কতকগুলা লোক বাজরা-মাথায় ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া মাঠের পথে নামিয়া ছিল। শশাঙ্ক তাদের ডাকিয়া প্রশ্ন করিল,—গোবিন্দপুরে যাবো কোন্ দিকে হে?

তারা দাঁড়াইল। একজন কহিল,—আপনারা...?

বহু বচনের অর্থ শশাঙ্ক বুঝিল না, আশে-পাশে চাহিয়া কহিল,—আমি গোবিন্দপুর যেতে চাই, পথ চিনি না...বিদেশী লোক।

লোকটি আবার প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবেন? কার বাড়ী?

শশাঙ্ক কহিল,—ত্রিলোকেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ী।

সে কহিল—ওঃ, চক্কোত্তি বাবুদের বাড়ী...তা, এই নোদো কাছাকাছি যাবেক বটে। আপনি ওর সঙ্গে ঝ্যান্ ..নোদোকে ডাকিয়া সে বলিয়া দিল,—ওরে, বাবুকে চক্কোত্তি বাবুদের বাড়ী দেখিয়ে দিস্...তা, কার কাছেই বা ঝ্যাবেন! বাড়ী নয় তো, যেন কেল্লা! তা, বাবুর বংশের কেউ নেই, বসত-বাড়ীতে ক'টা উড়ে মালী এসে আস্তানা নিয়ে রয়েছে...

শশাঙ্ক এ কথায় কর্ণপাত করিল না, শুধু বলিল—কতদূর হবে?

লোকটি বলিল—তা, ধূর নয়। কতই বা! পোয়াটাক, তিন পোয়াটাক্ পথ।

তাহা হইলে কাছেই!...শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্তু মাঠের পর মাঠ...পথ আর শেষ হয় না! অদূরে গাছপালা একটা সবুজ

লাইন টানিয়া আকাশ আর পৃথিবীকে দু ঠাঁই করিয়া রাখিয়াছে। শশাঙ্ক কহিল—পোয়াটাক পথ এলুম তো হে ?

লোকটি কহিল—আজ্ঞে, আর একটু খানিক...

শশাঙ্ক ভাবিল, ক্রোশ সম্বন্ধে ইহাদের জ্ঞান টন্‌টনে। তা লইয়া তর্ক বা বাদানুবাদ চলেও না! সে কহিল—তোমরা কোত্থেকে আসচো ?

তারা বলিল—কলকাতা।

শশাঙ্ক কহিল—কি করতে গেছলে ?

তারা বলিল—তরী-তরকারী বেচতে।

শশাঙ্ক কহিল রোজই যাও ?

তারা বলিল—যাই।

শশাঙ্ক কহিল—দেশের তরকারী দেশে রাখতে পারো না ?

তারা হাসিয়া জবাব দিল,—তরকারী খেয়ে তো থাকা যায় না বাবু। এই থেকে যা পয়সা পাই, তাতেই সংসার চালাতে হয়। ধুতি, চাল, ডাল...বলিয়া সে হাসিল।

এমনি কথায় কথায় বহুদূর আসিয়া গ্রামের দেখা মিলিল। দু'একটা রোগা কুকুর পথে শুইয়া আছে। ঝাঁপ-খোলা দোকান,— দোকানের সামনে ভাঙ্গা বেঞ্চে বসিয়া চার পাঁচজনে গল্প করিতেছে। বাঁদিকে একটা পুকুর। মেয়েরা কলসী কাঁখে লইয়া পুকুরের দিকে চলিয়াছে। আশে-পাশে ঘন বন,—পথে কোনো গোলমাল নাই।

কিছুদূর আসিয়া ডান দিকে বনের কাছ দিয়া একটা সরু পথ। পথের মোড়ে একখানি ছোট কুঁড়ে ঘর। সেই ঘরে বসিয়া এক বুড়ী মুড়ি ভাজিতেছে, আর বুড়ীর কাছে একটা পিঁড়ায় বসিয়া ছোট একটি ছেলে দোলাই গায়ে দিয়া বসিয়া এক-মনে সেই মুড়ি ভাজা দেখিতেছে; ছেলেটির হাতে একখানা মুড়ির চাক্‌তি।

একজন সেই গলির দিকে দেখাইয়া কহিল—এই পথ ধরে সোজা চলে যান্—বরাবর গিয়ে একটা মস্ত বটগাছ দেখতে পাবে। সামনেই বটগাছ...তাকে বাঁয়ে রেখে ডাইনে বেঁকবেন। একটু গিয়েই মস্ত বাগান, সেই বাগানের পরই চক্কোত্তি মশাইয়ের বাড়ী...তাহলে পেন্নাম বাবু—আমরা সোজা যাবো!

তারা চলিয়া গেল ; শশাঙ্ক গলির মধ্যে ঢুকিল। সে ভাবিল, পথটি তো বেশ— এই পথ ধরিয়া রাত্রে অন্ধকারে ফিরিব কি করিয়া ? গাছে মাথা ঠুকিয়া মরিতে না হয় ! ভূতের ভয় তার ছিল না। সহরে থাকে, মুগুর ভাঁজে ; ভূত যে কি বস্তু, তার কোনো পরিচয় সে কখনো পায় নাই !

কথামত চলিয়া সে আসিয়া দেখে, সত্যই বটে, মস্ত বাড়ী। গাছপালার আড়ালে কালো রঙের এক বিরাট দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। এরই নাম লালকুঠি ! কালো-কুঠি নামই মানায়। দেওয়ালে লাল রঙ কোনো কালে ছিল কিনা, তা ভাবিবার বস্তু।

লোহার বড় বড় পেরেক-আঁটা গুল্‌দার মস্ত দরজা। দরজার মধ্য দিয়া ভিতরে ঢুকিবা-মাত্র সে দেখে, দু'ধারে উঁচু রোয়াক, রোয়াকের উপর একগাদা খড়। সামনে মস্ত উঠান। উঠানের এক কোণে একটা গরু বাঁধা আছে। খালি বাড়ীতে গরু। সে একটু অবাক হইল। কাহাকে ডাকিবে ভাবিতেছে, এমন সময় এক উড়ে মালী আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল—কলকাতা-হতে আসতিচো বাবু ?

উড়িয়ার কথা বাঙ্‌লা— উড়িয়া-টান নাই। শশাঙ্ক কহিল,—হ্যাঁ।

উড়িয়া কহিল—আমরা তিন পুরুষ ধরে এ বাড়ীতে আছি, কত্তাবাবুর বাবার আমল থেকে। আর—

শশাঙ্ক কহিল—আর কোনো বাবু এসেচে ?

উড়িয়া কহিল—না।

শশাঙ্ক কহিল—ঐ সিঁড়িতেই বসি ! এক কাজ করতে পারিস, বাবা ? একটু জল দে দিকিন, হাত মুখ ধুই...ধুয়ে লেবু খাই বসে...

উড়িয়া জল আনিয়া দিল,—শশাঙ্ক হাত-মুখ ধুইয়া কমলা লেবু ছাড়াইয়া খাইতে বসিল। উড়িয়াকে বলিল—লণ্ঠন আছে রে ?

উড়িয়া কহিল—আছে।

শশাঙ্ক কহিল—যাবার সময় লণ্ঠন ধরে আমায় এই বনের পথটা পার করে দিস তাহলে—

উড়িয়া কহিল—দেবো বাবু। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

শশাঙ্ক তখন বাড়ীখানার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া মস্ত দালান, দালানে এক ঝাঁক পায়রা। সমস্ত বাড়ীখানা নিঝুম, নিস্তব্ধ। শশাঙ্কর মনে হইল, বাড়ীখানা যেন কি একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিবার জন্য নিশ্বাস বন্ধ করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া আছে! কথাটা তার হঠাৎ এমনি মনে পড়িল—মনে পড়িতেই তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ঐ দালানে একদিন হয়তো কত ধুমধামে কত দোল-দুর্গোৎসব হইয়াছে—কত পাঁটা বলি! লোকের কলরবে ভরপুর...আর আজ? বাড়ীটা সেই সব সুখের কথা ভাবিতে ভাবিতে কি করিয়াই যে এমন চুপ চাপ দিন কাটায়! উড়ে আসিয়া একটা ঘটি দেখাইয়া কহিল—একটু দুধ খাবে বাবু? গরুর খাঁটী দুধ। দুয়েছিলুম—গরম করে এনেছি।


বেঁটে কদাকার মূর্ত্তি!

শশাঙ্ক কহিল—যেৎ! আমি কি কচি খোকা যে দুধ খেতে যাবো শুধু-শুধু...

উড়ে সে কথার জবাব দিবার পূর্ব্বেই সদরে কে ডাকিল—ওরে মালী...

শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল—সেই ভদ্রলোকটি আসিলেন বুঝি...

তাই বটে! ভদ্রলোকটি মালীর জবাবের প্রতীক্ষা না করিয়া একেবারে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁর পিছনে একটা সরকার-গোছের লোক—বেঁটে, কদাকার মূর্ত্তি!

ভদ্রলোক কহিলেন—আপনিই শশাঙ্ক বাবু? আমার চিঠি তাহলে পেয়েচেন ঠিক...

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হইয়া আসিয়াছে। ভদ্রলোক আগাইয়া অলি-

লোক। শশাঙ্ক চাহিয়া দেখে—এ কি, এ যে বেলেঘাটার মোড়ের সেই ভদ্রলোকটি—যাঁর পকেট মারিয়া চোর পলাইতেছিল, সে চোর ধরিয়া চোরাই মাল উদ্ধার করে!

শশাঙ্ক কহিল—আপনি... !

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন,—তাই তো...আপনিই শশাঙ্কবাবু? বাঃ, ভারী আশ্চর্য্য তো...তা ষ্টেশনে দেখা হলো না যে? আপনি কি বারুইপুর ষ্টেশনে নামেন নি?

শশাঙ্ক কহিল—না। আমি সোনারপুরে নেমেছি—

ভদ্রলোকটি কহিলেন,—তাহলে হেঁটে আসতে ভারী কষ্ট হয়েছে তো...মোট কথা, সোনারপুরে ঘোড়ারগাড়ী পাওয়া যায় না...বারুইপুরে পাওয়া যায়...আমরা তাই এখানে আসতে হলে বারুইপুরে নামি।

শশাঙ্ক কহিল—যাক, সে কিছুই নয়...মোদ্দা আপনার নামই...

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন—শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত।

শশাঙ্ক কহিল—আপনিও কলকাতা থেকে এলেন দেখছি...তা কলকাতাতেই দেখা করতে পারতেন তো! তা না করে এই শীতের দিনে, তাও সন্ধ্যা বেলায়...

বিশ্বনাথ দত্ত হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—তারো কারণ আছে। বাড়ীখানা দুজনেই দেখতে পাবো...আপনি পাছে ভাবেন, ঠকিয়ে নিচ্ছি...তা...ওহে বাঁটুল্...

বেঁটে সঙ্গীটির নাম বাঁটুল। যেমন মূর্ত্তি, তেমনি নাম! কুৎকুতে ছোট চোখ... লোকটার মূর্ত্তি যেন কেমন...শশাঙ্কর ভালো লাগিল না!

বিশ্বনাথের কথায় বাঁটুল আগাইয়া আসিল। বিশ্বনাথ কহিল,—অন্ধকার হয়ে আসছে...তুই বাতি আর দেশলাই এনেছিস্ তো?

বাঁটুল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ

বিশ্বনাথ কহিলেন,—তা এখানে কেন...চলুন, উপরে বারান্দা আছে, সেইখানে গিয়ে বসে কথাবার্ত্তা কওয়া যাক্...

শশাঙ্ক অবাক হইয়া বিশ্বনাথের পানে চাহিল! বিশ্বনাথ বুঝিলেন, বুঝিয়া

কহিলেন —আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন...কিন্তু আশ্চর্য্য হবার এতে কিছু নেই...এ বাড়ী যে আমি এসে আগাগোড়া দেখে গেছি,—দু'তিন দিন অমন এসেছি...

বটে !...

বিশ্বনাথ কহিল—আসুন, সিঁড়ি এই দিকে ..বলিয়া সে অগ্রসর হইল। শশাঙ্ক তার পিছনে চলিল; আর তার পিছনে বাঁটুল! শশাঙ্কর গা কেমন ছমছম করিয়া উঠিল ..এই বেঁটে কদাকার লোকটা যদি...

কিন্তু না, কিসের ভয়! সে তো শত্রু নয়—তবু ছমছমানি থামে না! সে-ছমছমানি সে গ্রাহ্য করিল না। তিন জনে গিয়া দোতলার বারান্দায় উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সতরঞ্চির তলার ধূলো

একটা প্রকাণ্ড শালবনের ধারে একখানি ছোট কুঁড়ে ঘরে দু'টি ছোট ছোট মেয়েকে নিয়ে এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করতেন। যাতে মেয়ে দু'টি ভাল খেতে পরতে পায়, তার জন্যে তাঁর চেষ্টার অবধি ছিলনা। তিনি ভারী সুন্দর কাজ জানতেন বলে কখনো তাঁর কাজের অভাব হয় নি; আর কাজ করে যা পেতেন তাইতে মেয়েদের জন্যে এমন সব ভাল ভাল খাবার দাবার, পোষাক, খেলনা কিনে আনতেন যে তারা এক দিনের তরে-ও বুঝ্‌তে পারেনি যে তাদের বাবা নাই। এদিকে মেয়ে দুটিও ভারী লক্ষ্মী! বাড়ী-ঘর ঝক্-ঝকে তক্-তকে রেখে, বাড়ীর সমস্ত কাজ নিজেরা চমৎকার করে সেরে নিয়ে, তারাও অবসর সময়টা পয়সা রোজ-গারের জন্যে শিল্প কাজ করে কাটিয়ে দিতো।

মেয়ে দু'টির মধ্যে একটি ছিল খোঁড়া। সে বেচারী ঘরময় ছুটোছুটি করতে পারতো না; তাকে চুপ করে বসে থাক্‌তে হোতো, আর সে বসে-বসেই জামা সেলাই কর্‌তো, মোজা বুনতো আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে বাইরের প্রকাণ্ড ঘন

সবুজ শালবনটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তো। তার ছোট বোন রেণু বাসন মাজত, ঘর ঝাঁট দিতো আর রান্না-বান্না করতো। কাজকর্ম্ম শেষ হলে দুই বোন এক সঙ্গে বসে বাইরের দিকে চেয়ে থাক্‌তো। বাতাসে বনের লম্বা লম্বা গাছগুলো দুল্‌তো শেষে মনে হ'ত যে তারা বুঝি সত্যিকার মানুষ; এ-ওর পানে চেয়ে ঘাড় নাড়ছে!

বসন্তে, গাছে গাছে ফুল ফুট্‌ত; শাল ফুলের মধুর গন্ধ বন ভরে উপ্‌চে পড়্‌ত! জান্‌লা দিয়ে, দুয়োর দিয়ে রেণুদের ঘরের মধ্যে ঢুকে তাদের মাতিয়ে দিয়ে যেত! গ্রীষ্মকালে ঝির্ ঝির্ করে বন থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আস্‌ত; বর্ষায় ঝম্ ঝম্ করে সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে বৃষ্টি নাম্‌ত! শীতের সকালে, গাছের পাতায় পাতায় টুপ্ টুপ্ করে শিশির-বিন্দু ঝরে পড়্‌তো আর ভোরের সোণার আলোয় তার প্রত্যেকটা রত্ন-মণির মত ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌তো! দিনগুলি বেশ কেটে যাচ্ছিল!

কিন্তু :একদিন তাদের মা অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরলেন; তাদের ভারী মন-খারাপ হল। তখন শীতকাল, অনেক জিনিষের দরকার, অনেক জিনিষ কিন্‌তে হবে; অনেক টাকার দরকার। রেণু তার দিদির সঙ্গে উনোনের পাশে আগুন তাপ্‌তে তাপ্‌তে সেই সব কথা কইছিল। শেষে রেণু বল্‌লে, ভাই, আমাদের খাবার-দাবার ফুরোবার আগে, আমাকে কাজের খোঁজে যেতেই হবে।

সেই দিনই সে তার মায়ের আর দিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে. গায়ে একটা গরমের চাদর জড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো। ...

বনের ভেতর দিয়ে একটা সরু পথ চলে গিয়েছে, সে মনে মনে ঠিক করল সেই পথ ধরে গিয়ে যতক্ষণ না কোন এক যায়গায় কাজ পায়, ততক্ষণ চল্‌তে থাক্‌বে। সে যেমন তাড়াতাড়ি সেই পথ ধরে এগিয়ে চল্‌লো অন্ধকার-ও অম্‌নি চারিদিকে ঘনিয়ে উঠ্‌তে লাগলো। যখন রাত হয়ে এসেছে তেমন সময় রেণু দেখ্‌ল যে সুমুখে কাদের এক খানি ছোট বাড়ী রয়েছে। বাড়ীটা দেখে তার ভারী ফূর্ত্তি হল আর সে তাড়াতাড়ি দরজায় ধাক্কা দিতে লাগ্‌লো। কিন্তু তার ধাক্কা শুনে যখন কেউ এল না, তখন সে সাহসে ভর করে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। দরজা খোলাই ছিল, কিন্তু ভেতরে ঢুকেই সে চম্‌কে পেছিয়ে গেল। সে দেখলে তার সাম্‌নে বারোটা

ছোট বিছানা; তার চাদর, বালিস সমস্ত উল্টোপাল্! বারোটা এঁটো ময়লা থালা ছাড়ানো রয়েছে আর মেজেতে এত ধূলো, যে তাই দিয়ে দশ গাদা বাসন মাজা যায়!

ছোট্ট রেণু বলে উঠ্‌ল 'নাঃ এ কক্ষনো হতে পারেনা; কি নোংরা—মা গো!' এই না বলে আগে উনোনে তার হাত-পা তেতে নিয়ে সে ঘরটা গোছাতে লেগে গেল। থালাগুলো চট্‌পট্ করে মেজে ফেলে বিছানা ঝেড়ে পেতে, ঘর ঝাঁট দিয়ে সে সমস্ত আসবাব পত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখলো। যেমন তার এই সব কাজ শেষ হয়েছে অমনি দরজা খুলে গেল আর বারো জন আশ্চর্য্য-গোছের ছোট ছোট বামন-মানুষ ঘরে ঢুক্‌ল! তারা ঠিক এক হাত করে লম্বা, আর প্রত্যেকেরই পরনে হল্‌দে পোষাক। তারা ঘরে ঢুকেই ঘরের চেহারা বদ্‌লে গেছে দেখে এক জন বলে উঠ্‌ল :—

"বাঃ! বাঃ! বাঃ! দেখ্‌ছি এ ত
মন্দ মজা নয়—
চোখগুলোকে আর আমাদের
বিশ্বাস না হয়।"

এরা সব্বাই এক সঙ্গে, আর পদ্য করে কথা কইত। তারপর ঘরের এক কোণে ঝাড়ন-কাঁধে ঝাঁটা-হাতে রেণুকে দেখে তারা বল্‌লে,

"বাঃ, বাঃ, বাঃ, ঘরের কোণে
ওটি আবার কে!
এক রত্তি লক্ষ্মী মেয়ে
এ সব করছে!"

রেণু এগিয়ে এসে বল্‌লে "আমার নাম রেণু, মায়ের অসুখ করেছে বলে আমি কাজের খোঁজে ঘুর্‌ছি। যখন রাত হয়ে এল তখন আমি আপনাদের এই বাড়ীটি দেখ্‌তে পেলাম। তার পর ঘরে ঢুকে দেখি যে—" এইখানে বামনেরা খিল্ খিল্ করে হেসে খুসী হয়ে বলে উঠ্‌লো,

—"জিনিষ পত্র পড়ে আছে
নিজের ইচ্ছে মত
ময়লা ধুলো জমা হল
যেথায় ছিল যত!

তাই না দেখে লক্ষ্মী মেয়ে
কর্‌লে পরিষ্কার,
একটু ধূলো, ময়লা-গুঁড়ো
নেইক কোথাও আর !"

ভারী সব মজার বামন, না ? সবাই তখন সাদা রুটি আর মধু আলমারী হতে বের করে রেণুকে তাদের সঙ্গে খেতে ডাক্‌লে। তারা খেতে খেতে বল্‌লে, যে তাদের যে পরী চাকরাণী ছিল, সে ছুটি নিয়ে চলে যাওয়াতেই তাদের ঘর এই রকম আগোছালো হয়ে পড়ে আছে ! রেণু যখন সকলের খাওয়া দাওয়ার পর বেশ যত্ন করে বাসনগুলি ধুয়ে মুছে তুলে রাখছিল, তখন তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লে। যখন রেণু শেষ বাটীটা উপুড় করে রাখ্‌লো, তখন সবাই মিলে রেণুকে কাছে ডেকে বল্‌লে,

"মর্ত্ত্যলোকের লক্ষ্মী মেয়ে !
রও, অনুরোধ করি—
যতদিন না কাজ কর্‌তে
আস্‌ছে মোদের পরী ;
ভাল মত কাজ কর্ম্ম
কর্‌তে যদি পারো,
মাইনে পাবে মনের মতন,
আদর পাবে আরো"

রেণুরও এ-দিকে খুব পছন্দ হয়েছিল। সে তাদের কাজ করে দিতে খুব রাজী হল। তারপর সে হাল্কা মন নিয়ে শুতে গেল ; শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখ্‌লে যে তার মা-বোনের সমস্ত দুঃখ ঘুচে গেছে। সে তাঁদের জন্যে অনেক জিনিষ পত্র নিয়ে বাড়ী গেছে, আর তাই দেখে সকলে মিলে কি আনন্দটাই না করচে !

পরের দিন কাক-কোকিলের ডাকের সঙ্গে রেণু উঠ্‌লো। তারপর সে বেশ করে জল-খাবার তৈরী করলে ; বামনরা খেয়ে চলে যাবার পর সে ঘর-দোর পরিষ্কার করে তাদের কাপড়-জামা সেলাই কর্‌তে লাগ্‌লো। বিকেলে যখন তারা ফিরে

এল তখন দেখে যে সমস্ত বাড়ী-ঘর ফিট্‌-ফাট্‌ সাজানো, আর চমৎকার খাবার সব রাঁধা রয়েছে! এমনি করে রেণু রোজ ভাল করে কাজ করে চল্‌লো; শেষে সেই বাড়ীর পরী-চাকরাণীর ছুটির দিন শেষ হয়ে এল। এ দিকে রেণু-ও বাড়ী ফিরে গিয়ে তার মা ও দিদিকে দেখবার জন্যে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল। বামনরা তাকে যে মাইনে দেবে, তাই নিয়ে সে কার জন্যে কি কিন্‌বে সেই কথাটাই তখন তার মনকে তোলপাড় কর্‌ছে!

সেই দিন রেণু যখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বামনদের কাজ কর্‌তে বেরিয়ে যাওয়া দেখ্‌ছিল তখন সে হঠাৎ দেখ্‌লে যে জানালার একটা কাঁচে খুব সুন্দর একটি ছবি আঁকা রয়েছে। তেমন ছবি সে আর কখনো দেখে নাই। সেটি একটি পরীদের অট্টালিকা, চূড়ায় যেন সূর্য্য কিরণ লেগে সেখানটা একটা মস্ত বড় হীরের মত ঝল্‌মল্‌ কর্‌ছে! ছাবিটায় আরো কত কি সুন্দর জিনিষ ছিল; রেণু এখন তন্ময় হয়ে তার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল যে কাজ-কর্ম্মের কথা আর মনে রইল না। যখন দেয়ালের বড় ঘড়িটায় ঢং-ঢং করে বারোটা বাজল তখন রেণুর চমক্‌ ভাঙ্‌লো! সে তাড়াতাড়ি বিছানা তুলতে বাসন মাজতে ছুটে গেল। কিন্তু সব কাজই বেজায় তাড়াতাড়ি করে কর্‌তে গিয়ে, কোন কাজই ভাল করে হয়ে উঠ্‌ছিল না! সে যখন ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে ঝাঁটা তুলেছে, তখন বামনদের আসবার সময় হয়ে গেল!

তাড়াতাড়ি জানালা দরজার চৌকাঠগুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করে সে বল্‌লে "মেজের সতরঞ্চিটা আজ আর উল্টে ঝাঁট দেবার সময় নেই দেখ্‌ছি; থাক্‌গে, যেখানটা দেখা যায় না, সেখানে ধূলো রয়ে গেলেই বা আর কে দেখ্‌ছে!" মনকে এম্নি করে প্রবোধ দিয়ে রেণু তাড়াতাড়ি বামনদের খাবার যায়গা করতে গেল।

একটু পরেই খেটে-খুটে বামনরা ফিরে এল। ঘর-দোর সব আগের মতই পরিষ্কার দেখাচ্ছিল বলে কোন কথা উঠ্‌ল না। রেণুও তাদের খাওয়াতে খাওয়াতে সতরঞ্চির তলার ধূলোর কথা একেবারেই ভুলে গেল। সবলের খাওয়ার পর নিজে খেয়ে বাসনগুলি ধুয়ে মুছে রেখে রেণু শুতে গেল। শুয়ে শুয়ে জানালার দিকে চেয়ে রেণুর মনে হল তারাগুলো বুঝি বল্‌ছে

"ঐ যে মেয়েটি শুয়ে আছে, ও বেশ লক্ষ্মী!"

রেণুর মনের ভেতর একটা ছোট শব্দ বলে উঠ্‌ল, "সতরঞ্চির তলার ধূলো!" "সতরঞ্চির তলার ধূলো!" চাঁদ যেন তরার দলের মাঝখানে বিজ্ঞ বুড়োর মত বসে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে "আর ঐ মেয়েটি খুব ভাল করে সব কাজ করে!" তারার দল সে কথায় যেন খুসী হয়ে একবার আনন্দে ঝল্‌মল্‌ করে উঠ্‌ল! রেণুর বুকের ভেতর সেই ছোট শব্দটি আবার বলে উঠ্‌ল, "সতরঞ্চির তলার ধূলো! সতরঞ্চির তলার ধূলো!" রেণু আর সহ্য করতে পারল না; সে বিছানা হতে লাফিয়ে পড়ে ঝাঁটা নিয়ে সেই ধূলো পরিষ্কার করে ঝেঁটিয়ে দিলে। তারপর যেই সে ভাল করে সমস্ত সতরঞ্চিটা তুলে ঝেড়ে পাততে যাবে অম্‌নি কি মজা! বারোটা চক্‌চকে সোণার মোহর বারোটি পূর্ণিমার চাঁদের মত সতরঞ্চের তলা হতে ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌লো! খুব আশ্চর্য্য হয়ে রেণু চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "বাঃ, বাঃ, বাঃ!" আর অম্‌নি বামনরা ব্যাপার কি দেখ্‌তে ছুটে এল্‌!

তখন রেণু তাদের এই মোহরের কথা সমস্ত বল্‌লে। যখন সে তার কথা শেষ করছে, তখন সেই বামনরা রেণুর চারদিকে জড় হয়ে তাকে আদর করে বল্‌তে লাগলো:—

"লক্ষ্মী মেয়ে, মোহরগুলি
তোমার তরেই
রেখেছি
বিশ্বাসী, আর সত্যো ভালো
-বাস্‌তে তোমায়
দেখেছি!
কিন্তু যদি সতরঞ্চি
না উল্টেই
পালাতে,
তা হলে ঠিক তিনটি টাকা
[illegible]

এই যে আজ এই মোহর তুমি পেলে নিজের
কাজ করে
মোদের মনের মঙ্গলাশীষ এতেই দিলাম
সাদরে !
এর পরে মা লক্ষ্মী রেণু ! এ কথা আর
ভুলো না—
নিজের কাজটি করলে ভাল নেইক সুখের
তুলনা ।'

আদর যত্নের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার পর দিন ভোরে রেণু সেই মোহরগুলি নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। তাই দেখে তার মা আর দিদি কত খুশী!

সেই থেকে আর রেণুর সঙ্গে কখনো বামনদের দেখা হয়নি। লোকে বলে তারা স্বর্গের দেবতা শাপে ভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিল ; আবার স্বর্গে চলে গেছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে রেণু যে শিক্ষাটি পেয়েছিল, তা সে কখনো ভোলেনি। সে বরাবর নিজের কাজটি শেষ পর্য্যন্ত ভাল করে করতো। কখনো এতটুকু বাকী থাকা পর্যন্ত বিশ্রাম করতো না !

শ্রীরামেন্দু দত্ত

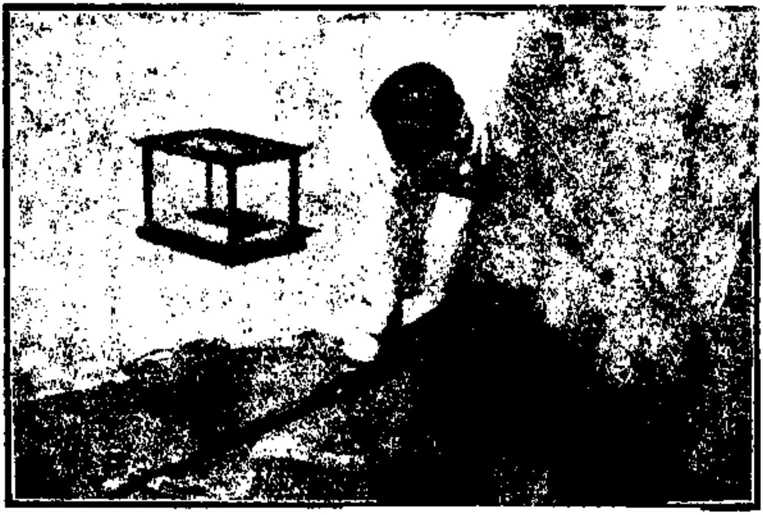
— —

সাপের বিষ

বিষে বিষক্ষয় হয়, এটা আমাদের দেশে প্রবাদ বাক্য। আজকাল কাজেও তা করা হচ্ছে। সর্পাঘাত হলে মানুষকে বাঁচানো যায় না। সাপে কামড়ানোর ওষুধ নেই, এ কথা আমরা সবাই শুনেছি। সেকালে রোজারা মন্ত্রে-তন্ত্রে বিষ ঝেড়ে দিত শুনতে পাই ; কিন্তু একালে কোথায় সে-সব রোজা! সাপে কাকেও কামড়ালে

এখন রক্ষা পাওয়া দায়। মিহিজামে কি ওসুধ নাকি পাওয়া যাচ্ছে। আর এক ব্যবস্থাও হয়েছে।

সর্পাঘাতে এখন বিষ-ইনজেক্ট করার ব্যবস্থা হয়েছে—অর্থাৎ [illegible] প্রভৃতি রোগে যেমন রোগের বীজ গা ফুঁড়ে রোগীর শরীরে পুরে [illegible] হয়, তেমনি সাপে কামড়ালে সাপের বিষ গা ফুঁড়ে সেই [illegible] শরীরে দিয়ে তাদের বাঁচানো হচ্ছে। সাপের বিষ কি-ভাবে [illegible] খপরটুকু জানবার মত। যে ল্যাবলেটরীতে সাপের বিষ [illegible]



বীজ সংগ্রহ হয়, সেই ল্যাবরেটরীতে [illegible] বিষ নেবার সময় খাঁচা থেকে সাপটাকে বার করেই [illegible] একটা লাঠী দিয়ে চেপে ধরে, আর ল্যাজের ডগাটা এক [illegible] (১নং ছবি দেখ); যারা এই কাজ করে তাদের সাহ[illegible]। সাপের কামড়ের ভয় তারা কিছুমাত্র করে না। [illegible] কারণ, সাপটা আর

কুণ্ডলী পাকিয়ে তার গায়ে জড়াতে পারবে না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ গোখ্রো সাপের বিষই সংগ্রহ করা হয়। গোখরোর বিষই সব চেয়ে জোরালো, তাই।

গভর্ণমেণ্ট আজকাল বোম্বাইয়ের অন্তর্গত পারেলে এই ল্যাবরেটরী খুলেছেন। সাপের বিষের ওষুধ তৈরী করবার জন্য ইনজেকসন্ দেওয়া হয়। ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, যে সাপগুলি কত বড়, আর কি ভীষণ। বিষ যখন বার করা হয়, তখন সাপের মুখের কাছে একটী কাঁচের গ্লাশ ধরা হয় (২নং ছবি দেখ); তার উপরে একটা রবারের গোল চাক্‌তি থাকে। যে লোক সাপের মাথায় লাঠি চেপে ধরে, সেই তার গলাটা জোরে টিপে মুখখানা কাঁচের উপর ধরে তারপর গলাটা খুব জোরে টিপতে থাকে—তাতেই যত বিষ সাপের



২নং ছবি

মুখ থেকে বেরিয়ে ঐ রবারের চাক্‌তির উপর ঝরে পড়ে। সমস্ত বিষ এই ভাবে বার করা হলে সাপটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সাপটা তখন নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন তাকে দুধ খাওয়ানো হয়। এই সাপকে কি করে দুধ খাওয়ানো হয়, ৩নং ছবিতে তা দেখতে পাচ্ছ। দুধ খাইয়ে সাপটাকে আবার খাঁচায় পোরা হয়। ক্রমে আবার তার বিষ গজায়।

এই যে বিষ বার করা হল, পরে [illegible]র গা ফুঁড়ে পুরে দেওয়া হয়।

ঘোড়ার দেহের রক্তের সঙ্গে এ বিষ মিশলে ঘোড়ার দেহের এক জায়গায় অস্ত্র চালিয়ে ঘোড়ার রক্ত বার করা হয়। তারপর সাপের বিষ আর ঘোড়ার রক্ত দুটোকে আলাদা



৩নং ছবি

করে ফেলা হয়। শেষে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই থেকেই বীজ তৈরী করা হয়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে র‍্যাট্‌ল্‌ সাপের বিষ থেকে সর্প বীজ তৈরী হয়।

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়



বড় হোয়ে আমি কি করব ?

[এবার আমরা অনেক লেখা পেয়েছিলাম। কয়েকটা লেখা আমরা বাছাই কোরে এখানে ছাপলাম। এই প্রতিযোগীতায় শ্রীদেবপ্রসাদ গুপ্ত প্রথম পুরস্কার ও শ্রীঅমিতা দাশগুপ্ত দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। মৌচাক সম্পাদক]

শ্রীদেবপ্রসাদ গুপ্ত (ঢাকা)—সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের একটি দুর্নাম আছে যে তারা শুধু ঘরে বসে থাকতেই ভালবাসে। নড়ে-চড়ে নানা জিনিষ দেখবার ইচ্ছা তাদের মোটে নেই। আমার এ নিন্দা সহ্য হয় না। কলম্বস, ন্যানসেন, লিভিংষ্টোন প্রভৃতি বীরদের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিস্কারের কথা আমার মনে পড়ে যায়, আর ভাবি আমিও তাদেরই মত এক জন হব। তাঁরা যে কত রকম বিপদে আপদে পড়েছিলেন, সে সব কথা শুনে আমি একটুও ভয় পাই না—বরং আমার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়, এবং মনে হয় বড় হোয়ে বাঙ্গালার ভীরুতার কলঙ্ক আমি নিশ্চয় ঘুচাব। ছোট বেলা পড়েছি :—

"আমি যখন বড় হব
দেখব জগৎ ঘুরে
কোথায় আছে কোন দেশে
নিকট কিবা দূরে"

সে কবিতাটিকে আমার জীবনে সার্থক করে তুলব। আমি নানা দেশ দেখে বেড়াব. নানা দেশ আবিস্কার করব। শত বাধা বিপত্তি এলেও ভয় পাব না। কি তুষার বৃষ্টি, কি সাগরের মস্ত ঢেউ, কি মরুদেশের অগ্নিবৃষ্টি, কি বরফের পাহাড়, কিছুতেই আমাকে ফেরাতে পারবে না ; "কুছ পরোয়া নেই" বলে এগিয়ে যাব। আমি নানা জাতীর সঙ্গে মিশব এবং নানা দেশ হতে জ্ঞান আহরণ করে আমার এই প্রিয় বঙ্গদেশে ঢেলে দেব। আমি কত রকম গাছ পালা দেখে আমার বহু দিনের দেখবার সখ মেটাব। কত বনে বনে ঘুরে ফিরে পশুপক্ষীর পরিচয় নিয়ে আসব। বিদেশীর

লেখা কত দেশ বিদেশের আবিষ্কারের কথা পড়ে আমরা কত আমোদ পাই। আমি কিন্তু সেই সব দেশে গিয়ে নিজের চোখে সব দেখে শুনে আসব। কি মজাটাই না হবে!

আমি উড়ো জাহাজে করে খুব উঁচুতে উঠব। আরও উঁচুতে আরও উঁচুতে উঠব। উঠে সারা পৃথিবী বেড়াব। আমাদের গৌরীশৃঙ্গ ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা বলে কেউ সেখানে যেতে পারে না। বিদেশীরা এর উপর উঠবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। কত কত লোক প্রাণ হারাচ্ছেন। কিন্তু হায়! আমাদের দেশের গৌরীশৃঙ্গ, অথচ আমাদের দেশ থেকে কেহই যাচ্ছেন না। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি আছে? আমি বড় হোয়ে তুষার বৃষ্টির মধ্য দিয়ে সেই পাহাড়ে উঠতে চেষ্টা করব। তাতে মৃত্যু হোক, ভয় পাব না। কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ ঢের শ্রেয়ঃ। আমার চোখের সামনে দিয়ে কত লোক প্রাণ হারাবে, আমি তবুও অগ্রসর হব। আমি হয় ত সেই উচ্চ শিখরে মানবের বিজয় পতাকা উড়িয়ে আসব। প্রকৃতির পরাভব ঘটাব। এখনও কত কত দেশ অনাবিষ্কৃত রয়েছে, সেই সব দেশের সন্ধানে আমি ঘুরে বেড়াব। দেশের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে অনেক বিপদে আমায় পড়তে হবে।

হয় ত আমিও একটি মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে একটি মরুদ্যান দেখতে পেয়ে তারই পারে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ এমন সময় কতগুলি ডাকাত এসে আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে, তখন আমি একটি মাত্র উট সম্বল করে আবার অগ্রসর হব। দুদিন ঘুরে ফিরে যখন ক্লান্ত হয়ে উঠব, তখন দূরে মরীচিকাকে জল ভেবে খুব ফুর্ত্তি করব। যখন কাছে গিয়ে দেখব, তখন হতাশ হোয়ে চারিদিক চেয়ে অবাক ধুঁকতে ধুঁকতে অগ্রসর হব।

মনে কর আবার হয়ত আমি কতগুলি অসভ্যদের মাঝে গিয়ে পড়লুম। প্রথমে তারা আমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করবে। তারপর আমার ব্যবহারে সব ভুলে গিয়ে আমাকে তাদের দলের মধ্যে নিয়ে যাবে। আমার তাদের সঙ্গে তাদেরই মতন হয়ে কত দিন থাকতে হবে।

হয় ত আবার আমি একটি জাহাজে করে অকূল সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় একটি বরফের পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের জাহাজের ধাক্কা লেগে গেল এবং জাহাজটা

ভেঙ্গে চুরে গেল। আমি একটি কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে কোন এক অজানা দ্বীপে গিয়ে উঠব। সেই দ্বীপে মানবের বসতি নেই, কেবল গাছ আর গাছ! আমি সেই দ্বীপে লতাপাতার কুঁড়ে বেঁধে কোন রকমে বাস করব। এই রকম ভাবে কত বছর হয় ত কেটে যাবে, সমুদ্রের ধারে সারাদিন বসে থেকেও কোন জাহাজ না দেখতে পেয়ে হতাশ মনে সন্ধ্যার সময় ফিরব। একদিন হয়ত সমুদ্রের ধারে বসে নানা চিন্তা করছি, এমন সময় বহু বহু দূরে ঢেউয়ের উপরে একটি জাহাজ দেখতে পাব। তখন মহানন্দে নানা সঙ্কেত করে তাদের ডেকে এনে দেশে ফিরে যাব।

আমার বিজয় পতাকা কোথায় উড়বে তা কে জানে? আমি হয়ত আবার কুমেরু সুমেরুর উদ্দেশ্যে যাব। কত কত বরফের মাঠ দেখব; শীতে আমার হাত পা জমে কত কষ্ট পাব কিন্তু সব তুচ্ছ করে এগিয়ে যাব। অখাদ্য শীলের মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করতে হবে। সেখানে আরোরার আলো দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাব। যতই আমি এগোতে থাকব ততই নানা সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখে কতই না দেখবার ইচ্ছা বেড়ে যাবে। আমার আগে যাঁরা এসে ছিলেন তাঁদের কোন কোন চিহ্ন হয়ত আমি দেখতে পাব। কোথাও একটা তাঁবুর খুঁটি, কোথাও একটা ভাঙ্গা জাহাজের অংশ আমার চোখে পড়বে। আমি তাতে একটু ও ভয় পাব না। যত্ন ছাড়া রত্ন মেলে না এই কথা মনে রেখে সব কষ্ট আমি সয়ে যাব।

—০—

শ্রীশান্তি কুমার চট্টোপাধ্যায় (জববলপুর)—আমার ইচ্ছা যে আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব। কেন না অনেক ডাক্তার আছেন, যাঁরা গরীব-দুঃখীদের কাছ থেকেও নিজের ফী না নিয়ে ঔষধ দেন না। তাই প্রায় একশত লোক রোগে রোজ প্রাণ হারাচ্ছে। অনেক লোকের পয়সার অভাবে অপমৃত্যু হচ্ছে।

এমন দেখা গিয়েছে একটি স্ত্রীলোক একটি ডাক্তারের কাছে গেল। তাঁর হয়তো ষোল টাকা ভিজিট কিন্তু স্ত্রীলোকটি অতিশয় গরীব; তাই সে ডাক্তার-বাবুকে বললে যে আমি অত টাকা দিতে পারব না, চার টাকা দেব, আপনি আমার ছেলেটিকে দেখুন, না হলে সে আর বাঁচবে না। এই বলে সে তাঁর পায় লুটিয়ে

পড়ল, তবুও ডাক্তারবাবুর পাষাণ হৃদয় গলল না। তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। ডাক্তার থাকতে কারুর অপমৃত্যু হওয়া ডাক্তার না থাকা সমান।

তাই আমি বড় হয়ে ডাক্তার হব, আর একটা ডিস্‌পেনসারী খুলব আর ধনীদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ঔষধ দেব। গরীবদের অমনি কিম্বা কম দামে ঔষধ দেব। আর বাড়ি গিয়ে রোগী দেখব।

শ্রীসরোজমোহন রায় (কলিকাতা)—জন্মেছি যে দেশে সে দেশে কত বড় হব বা কি করব তা আমার মতন একটা ছোট ছেলে ভেবে ঠিক করতে পারে না। যে ছেলেটা ভেবে কিনারা করতে যায় তার বন্ধু-বান্ধব আর বিশেষ করে তার বাড়ীর লোক বলে, "হয় ছেলেটা এঁচোড়ে পাকা আর নয় ত ক্ষ্যাপা"। বাপ মা ভাই, প্রভৃতি বড় যাঁরা তাঁদের কথার মতে সায় না দিয়ে যিনি উল্টে "তর্ক" করতে যান তবে তাঁর অবস্থা যে কি হয় তা যিনি করেন তিনিই জানেন; আমার একটা বন্ধু আছে—নাম নীরু, বয়স বার। বেচারা এই অল্প বয়সে এত ভাবতে পারে যে দেখলে অবাক হতে হয়—মনে হয়, কোন বড় একটা ভাবুক ঘরে সে জন্মেছে—খেলা-ধুলা তার এই বয়সে ভাল লাগে না। তাদের বাড়ী সেদিন কি একটা কাজ ছিল। তার বাবা, মা, আর বড় দাদারা মিলে কি একটা বিষয় পরামর্শ করছিল। সে একটা পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। হঠাৎ কি একটা কথায় সে বেশ বিজ্ঞের মতন তাঁদের সকলকার কথায় অমত করে নিজের একটা মতলব বলে ফেল্লে—আর যায় কোথায়? বাপ মা, দাদারা সবাই যেন তাকে খেয়ে ফেলে আর কি; বেচারী পালিয়ে বাঁচল। এহেন যে দেশ সে দেশে মানুষ হওয়া ষোল আনা কপালের উপর নির্ভর করে। আমি চাই ব্যবসা শিখতে, আমার মা বলেন আমার ছেলে হাইকোর্টের জজ হবে। নীরো চায় একজন বৈজ্ঞানিক হতে; তার বাবা বলেন নীরো একটা পাশ দিলেই সাহেবকে বলে কয়ে আফিসে ঢুকিয়ে দেব। যাদের লেখাপড়া হবার সম্ভাবনা, তাদের অবস্থা নেই—যাদের অবস্থা আছে তাদের লেখা-পড়ায় মন নেই—

দেখে শুনে আমার অগত্যা বলতে হয়, ভগবান যা করবেন আমি তাই হব—তবে আমার ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে বলে যে যাতে দু পয়সা ঘরে আসে, দেশে আসে, এমন কিছু করাই আজকাল সকলের চেয়ে দরকারী।

—০—

কুমারী অমিয়বালা দেবী(গুপ্তিপাড়া)—আমি বড় হলে ভাল হব। কেন ভাল হব তা জান ? ভাল না হ'লে কেউ ভালবাসে না, ভাল লোককেই সকলে ভালবাসে।

এখন আমি দাদার সঙ্গে বা আমার ছোট বোনের সঙ্গে, স্কুলের মেয়ের সঙ্গে, ঝগড়া করি না ও কখন কারো সঙ্গে করব না। মা বলেন "ঝিকে নিজের ছাড়া কাপড় ও জল খাবারের বাসন কখনও তোমার শরীর ভাল থাকিলে দিও না, তা হলে কুঁড়ে হয়ে যাবে।" সে জন্য আমি নিজেই আমার জল খাবারের বাসন ধুই ও ছাড়া কাপড় কাচি। এর পর আরো বড় হলে আরো কাজ শিখব। গুরুজনদের কথা শুনব, ভাল রান্না শিখব, নিজ হাতে খুব ভাল ভাল রেঁধে ও নানারূপ খাবার তৈয়ার করে গরিবদের যত্ন করে খাওয়াব, মা যেমন করে খাওয়ান। বেশ ভাল করে জামা সেলাই করতে শিখব। একটু বড় হ'লে এই শীতকালে ছোট ছোট গরিবদের ছেলে মেয়েকে জামা সেলাই করে দেব ; তাতে কত আনন্দ হবে। আর মামার মত খুব মোটা কাপড় পরব, নিজে নিজে হাতে সেলাই করে নিজে জামা সেমিজ পরব। মা আমায় বলে দিয়েছেন যে নিজে সব কাজ জানে, তার কখনও কষ্ট হয় না। আমিও তাই করব। আর মা আমায় বলে দিয়েছেন মেয়ে মানুষের পৃথিবীর মত সহ্য করতে হয়। আমরা কত লাফালাফি করিতেছি কিন্তু পৃথিবীর সবই সহ্য করছেন। আর যাঁরা ভাল লোক তাঁরা সকলেই কত প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন তা বইতেও পড়েছি ও মায়ের কাছে শুনেছি। আমি কখন কারও গয়না বা ভাল কাপড় দেখে হিংসা করব না ; মা বলেন হিংসাই মহা পাপ। নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়, যে থাকে তার কখনও কষ্ট হয় না। আমিও তাই থাকব। কখনও কাহারও মনে ব্যথা দেব না, সকলকে সুখী করবার চেষ্টা করব।

কুমারী ঊষা মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ)—আমার ইচ্ছা আমি বড় হলে বিলেত গিয়ে ভূগোল-শাস্ত্র খুব ভাল করে পড়ব; কারণ আমাদের দেশে ভূগোল-শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা হয় না, আর বেশীর ভাগ মেয়ে ভূগোলকে বাঘের মত ভয় করে। আমি তাদের ভয় ভাঙ্গাতেই চাই সে শাস্ত্রটাকে ছেলেমেয়েদের গল্পর মত করে লিখে। সেখান থেকে ফেরবার সময় কিছু চাঁদা তুলব। তার কারণটা বলছি ঃ— আমার ইচ্ছে সেই চাঁদার টাকা এবং দেশে থেকে যথাসাধ্য চাঁদা তুলে তা দিয়ে একটা অনাথাশ্রম করব। তার তিনটে বিভাগ থাকবে। (১) মেয়েদের ইস্কুল (২) হাঁসপাতাল (৩) ব্যায়ামাগার। ইস্কুলে অনেক রকম শিক্ষা দেওয়া হবে, যথা লেখাপড়া, গানবাজনা, সেলাইবোনা, রান্নাবান্না ইত্যাদি; ইস্কুলের principal হব আমি। ইস্কুলে একটি লাইব্রেরীও থাকবে, তাতে ভাল ভাল বই আনিয়ে রাখব এবং ছেলেদের যত মাসিক পত্র আছে যথা শিশুসাথী মৌচাক খোকাখুকু প্রভৃতি সব সেখানে থাকবে। প্রতি হপ্তায় একটা দিন দেশের খবর মেয়েদের পড়ে শুনান হবে। হপ্তায় দুদিন ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হবে। হাঁসপাতাল, ইস্কুল প্রভৃতির জন্য কোন ব্যয় হবে না। তবে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার বাৎসরিক উৎসবেতে যার যথাসাধ্য দান করিবে।

অনাথাশ্রমটী বাংলা দেশে স্থাপন করিবার ইচ্ছা, কারন এই দেশেরই অনাথ ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে দুর্গতি। আমার মেয়েদের ইস্কুল করবারই বেশী ইচ্ছে, কারণ এবার প্রবাসীতে (অগ্রহায়ণ সংখ্যা) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার লজ্জাকর অবস্থা" পড়লাম এবং দেখলাম ছেলেদের অনুপাতে মেয়েদের ইস্কুল কলেজ এবং ছাত্রীসংখ্যা কত কম। যদিও আমাদের দেশের পুরুষরাও খুব বেশী শিক্ষিত নন্! আমার মনের মধ্যে আর একটা কল্পনা মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দেয়—সেটা হচ্ছে আমার দেশের ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেখিতে।

—o—

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ঘোষ (রয়াপুরম, মান্দ্রাজ)—আমি যখন বড় হব, তখন আমি world tourist হব। আমি বইয়ে পড়েছি এই পৃথিবীতে নানা রকম দেশ আছে ও অনেক সুন্দর দৃশ্য আছে; তা দেখতে আমার ভয়ানক ইচ্ছা হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে কতকগুলি সাহেব হিমালয়ে উঠতে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে আর্ভিন আর ম্যালোরী হিমালয়ের চুড়ায় উঠেছিলেন কিন্তু হাওয়া না থাকায় তাদের মৃত্যু হয়। তারপর নর্টন আর সোমারভেল গিয়েছিলেন; তাঁরাও চুড়ার খুব নিকটে গিয়ে আর উঠতে পারলেন না, অবশেষে তাঁরা নেমে আসলেন। আরও পড়েছি ফ্র্যাঙ্কলিন কি রকম করে মেরু আবিস্কার করিয়াছিলেন। কুমেরু আর সুমেরু অতিশয় অদ্ভুত স্থান। সেখানে ছয় মাস রাত্রি এবং ছয় মাস দিন হয়। এই অদ্ভুত স্থান দেখতে আমার ভয়ানক ইচ্ছা হয়। শুনেছি যে সেখানে ছয়মাস রাত্রির সময় এক রকম রঙ্গিন আলো হয়, তা দেখতে রামধেনুর চেয়েও সুন্দর; সেই আলোতে লোকেরা কাজ করে। এই রকম অদ্ভুত জিনিষ আর পৃথিবীতে নাই, ইহাকে মেরু-প্রভা (Aurora Borialis) বলে।

এই রকম অদ্ভুত জিনিষ দেখলে যেমন আনন্দ হয় তেম্নি জ্ঞান বাড়ে। এই সকল জিনিষ দেখতে হলে সাহসের দরকার হয়। সম্প্রতি একটি বাঙ্গালি মেরু আবিস্কার করতে গিয়েছেন, আমাদের দেশে গৌরবের কথা। আমিও বড় হয়ে world tourist হব।

—o—

কুমারী রমলা দাশ (ডিব্রুগড়)—আমার বাল্যকাল হতেই ভ্রমণের দিকে খুব ঝোঁক, এখনও অনেক ভ্রমণ বিষয় কল্পনা করি। আমি ঠিক করেছি, বড় হলে আমি নানা দেশ ভ্রমণ করব। আমি আর অন্য কোন লাইনে যাব না। যদি দেশ ভ্রমণ করে আমি কোন জ্ঞানলাভ করতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক মনে করব। মানুষ কখনও স্কুলে এবং কলেজে পড়ে বিদ্বান হইতে পারে না। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেও অনেক বিষয় জ্ঞান লাভ করা যায়! দেশ ভ্রমণে কিরূপ উন্নতি লাভ করা যায় তা ভ্রমণকারী ভিন্ন অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। যাঁরা ভ্রমণ করে থাকেন, সাধারণতঃ তাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ থাকে না; নানা দেশের রীতিনীতি, অবস্থা ও ব্যবস্থা দেখে তাহাদের হৃদয় উন্নত হয়। ভ্রমণে মানুষের হৃদয়ের অনেক দুর্ব্বলতা দূর হয়। নানা দেশের ভ্রমণের ফলে শরীর ও মন দৃঢ়

ও উন্নত হয়; ভ্রমণে আমাদের বহুদর্শিতা লাভ হয়, সাহস বৃদ্ধি পায়। নানা দেশ ভ্রমণের ফলে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয় এবং কার্য্যদক্ষতা বাড়ে, ভ্রমণ দেশের, সমাজের অথবা জাতিবিশেষের উন্নতির প্রধান উপায়। ইতিহাসে আমরা নানা ঘটনা ও নানা দেশের বিষয় পড়ি; কিন্তু কেবল পড়লে উপকার হয় না। যখন আমরা কোন ইতিহাসে লেখা স্থানে যাই, যেমন কুরুক্ষেত্র, যেখানে একদিন কুরুকুল সমূলে ধ্বংশ হয়েছিল। যেখানে একদিন পাণ্ডবেরা অসীম বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন, পাপরাজ্য বিনাশ করে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্যে যেখানে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন, এই সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র! এই ভাব তখন প্রত্যেকের হৃদয়েই উদিত হবে। ভ্রমণ না করলে আমরা কোন দেশের কোন মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা ভূগোলে এবং ইতিহাসে হিমালয়ের বিষয় পড়েছি; যদি ভ্রমণ করতে করতে হিমালয়ে উঠা যায়, তখন মনে হবে এই হিমালয়ের পাদ-দেশে সেই কপিলাবস্তু রাজ্য—বুদ্ধদেব যেখান হতে রাত্রে গৃহত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য চলে গিয়েছিলেন। সেই হিমালয়ের কত ঝর্‌না হতে ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে দুধের ফেনার মত সাদা জল বেগে পড়ছে; কোথাও তার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাচ্ছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির অন্ধকার মধ্যে দিয়ে চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। এই হিমালয় এখন যেমন রয়েছে, এরূপই অনন্তকাল হতেই বরফের পাহাড় রয়েছে, সব সময়েই হিমালয়ের এরূপ গভীর অথচ মনোহর, এরূপ ভয়ঙ্কর এমন সুন্দর! এই সব কথা মনে হলেই আমার নানা জায়গা দেখবার উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠে; দেশ ভ্রমণের আমার উদ্দেশ্য এই যে যদি নানা দেশ ভ্রমণ করে নানা বিষয় জেনে দেশের কোন উন্নতি সাধন করতে পারি, তবেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

শ্রীঅমিতা দাশগুপ্ত (রমণা, ঢাকা)—এখন আমি কোনও মিশনরী স্কুলে পড়ছি। আমার ইচ্ছা এখান হতে ভালরূপে ইংরাজী শিক্ষা করে, ক্রমশঃ উচ্চতর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করব। এবং এম এ পর্য্যন্ত পড়ে ভগিনী নিবেদিতার মত জীবন যাপন করব। পাঠ সাঙ্গ

হলে অল্প কালের জন্যে কোনও স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করব। এতে সে স্কুলের শিক্ষা দিবার প্রণালী জানতে পারব ও স্ত্রী শিক্ষা প্রচার করবার জন্যে কিছু অর্থও আমার জমবে। এরূপে কয়েক স্থানে শিক্ষকতা করে কোনও গ্রামে একটা ছোট স্কুল খুলব। কেবল মেয়েরাই সেই স্কুলে পড়তে পারবে। কয়েক জন বিদুষী শিক্ষিতা নারীকে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করব। যাতে পল্লীর প্রত্যেক বালিকা ও বধূ অনায়াসে স্কুলে আসতে পারে সে জন্যে কেবল দুপুরে কয়েক ঘণ্টা স্কুল হবে। স্কুলে সংস্কৃত, বাংলা ও ইতিহাস বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে। কারণ আমাদের দেশের পূর্ব্বের অবস্থা না জানলে কেহই ভাল করে বুঝতে পারবেন না যে এখন আমরা কত দুর্ব্বল ও পরনির্ভর হয়ে পড়েছি। সকলকেই ভাল করে পুঁতি ও সূতোর কাজ, উলের কাজ ও অন্যান্য সেলাই শিক্ষা দেওয়া হবে; এবং এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে সময় থাকলে ছবি আঁকা শেখান হবে। রান্না ও সেবা-শুশ্রূষাও শেখান হবে। যে সকল সেলাই আমি পাব, সেগুলো বিক্রয়ের জন্যে কোন দোকানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। তাতে যা লাভ হবে তার কিছু স্কুলের শ্রমিকেরা পাবেন ও অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে একটী ছোট অনাথ-আশ্রম খোলা হবে। আশ্রমের অনাথ মেয়েরা স্কুলে শিক্ষিত হবে ও সেলাই প্রভৃতি শিখে ক্রমে আমার কার্য্যে সহায়তা করবে। যদি আমি বুঝতে পারি আমার উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে, তা হলে অন্য গ্রামেও ঐরূপ স্কুল স্থাপন করব ও ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে স্কুল স্থাপন করব।

যিনি শিক্ষা দিবেন তিনি যদি নিজে শিক্ষিত, কর্ম্মঠ, ও মনে প্রাণে পবিত্র না হন তাহা হলে তিনি শত বক্তৃতা দিলেও কেহই তাঁর উপদেশানুসারে কাজ করবে না; সুতরাং অন্যকে শিক্ষা দিতে হলে আপনার চরিত্র গঠন করতে হয়, সুশিক্ষা লাভ করতে হয় ও ভগবানে বিশ্বাস রাখতে হয়। আমি আমার জীবনকে এরূপ ভাবে গঠন করতে চেষ্টা করব যাতে স্ত্রী জাতির সব রকম উন্নতি করতে পারি।

এই আমার জীবনের ধ্রুবতারা—একমাত্র লক্ষ্য। আমি যদি এরূপ ভাবে জীবন যাপন করতে পারি তাহা হইলে আমি নিজকে ধন্য মনে করব।

শ্রীনিলীমা চৌধুরী (সুনামগঞ্জ)—সন্ধ্যার সময় পড়ার ঘরে বসে দেখছি এমন সময় বাবা এসে মৌচাক দিলেন আমার হাতে। মৌচাক হাতে পেয়ে আহ্লাদে আমার মন নেচে উঠল।

মনে করেছি পড়ে টড়ে বড় হোয়ে একজন শিক্ষয়িত্রী হব, আর কয়েদ, বেত একেবারে স্কুল থেকে তুলে দেব। ঐ যে আমাদের গ্রামে আছে একটা স্কুল, ওতে একটা শিক্ষয়িত্রীগিরি করব। গ্রামের মেয়েরা বড্ড ভাল, কি নম্র তাদের স্বভাব! কি সরল তাদের প্রাণ! কি মধুভরা বুক তাদের। এমন মেয়েই চাই যারা সরল প্রাণে মিশতে পারবে আমার সাথে।

শুনেছি আর আর দেশের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা এত কম যে বল্‌তে লজ্জা করে, আর স্ত্রীলোকদের ত কথাই নাই। যখন নিরালায় বসে থাকি তখন মধ্যে মধ্যে মনে হয় ভারতের এ লজ্জা দূর করবার কি কোন উপায় নেই? তখনই বুক সায় দিয়ে উঠে, লেগে যাও না তুমিই এ কাজে, ক্ষুদ্র হৃদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা নিয়ে। ভাবি আর বুক নেচে ওঠে স্ফীত হোয়ে, উচ্ছসিত সমুদ্রের মত আনন্দের বেগে। ভগবান আশীর্ব্বাদ কর, আজ এই মধুর জীবন প্রভাতে হৃদয় সার্থক হোয়ে ফুটে উঠুক তোমার স্নেহের মৃদু পরশে।

ভাল ছেলে

(গল্প)

এক

সে ছিল ভাল ছেলে। দেখতে সে ছিল কন্দর্প্যের চেয়েও সুন্দর। নাম তার মলয়েন্দু: সবাই কিন্তু ডাক্‌ত ভাল ছেলে বলে! এবার সে সসম্মানে স্কলারশিপ্ নিয়ে আই এ পড়ছে। ছেলেবেলা থেকেই সে পিতৃ-মাতৃহীন। সংসারে বন্ধন বলে তার কিছুই ছিল না; সবাই তাকে ভালবাসে-খু-উ-ব। সে না হোলে তাদের কলেজটা যে অন্ধকার হয়ে যাবে—এ বিশ্বাসটা মলয়ের বন্ধুদলের মধ্যে বেশ ভাল করেই জানা ছিল।

দুই

সারাদিন ধরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ে এখন সবে মাত্র বৃষ্টিটা একটু থেমেছে। অপরাহ্ন কাল। জানালার পাশে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে মলয় সবেমাত্র বই খুলে বসেছে; ঠিক্ এমনি সময়ে মলয়ের পাঁচ সাত জন বন্ধু হৈ হৈ করতে করতে সেই ঘরে ঢুকে পড়ল। একজন এগিয়ে এসে ছোঁ মেরে মলয়ের হাত থেকে বইখানা কেড়ে নিয়ে বল্ল, ওহে ও গুড্ বয়—আস্তে আস্তে উঠে পড় দিকি—ভাল ছেলের মত এক জায়গায় যেতে হবে।

বিস্মিত ভালছেলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সবাইকার মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর সেই বন্ধুটীকে জিজ্ঞাসা করল —কোথায় যেতে হবে শুনি? সুনীল বলে একটী বন্ধু চট্ করে উত্তর দিল, বুঝ্লে গুড্ বয়, আমরা এই ক জন বন্ধু মিলে ঠিক করেছি যে আজই আমরা সকলে কাশ্মীরে বেড়াতে যাবো। তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। এই হচ্ছে কথা; সেখানে আমার কাকার একটা বাড়ী পড়ে আছে; কেউ সে বাড়ীতে নেই; এক দম নির্জ্জন, সেইখানেই প্রথমে গিয়ে ওঠা যাবে; কি বল রাজি আছ?

মলয় লাফিয়ে উঠে বল্ল, আরে, একথা আগে বলতে হয়। রাজি হব না, বলিস্ কি? চল্ চল্ আজই বেড়িয়ে পড়া যাক্, বেশ অ্যাডভেঞ্চার জুটিয়েছিস্ তো?

অতঃপর সেই দিনই সন্ধ্যায় সব বন্ধু মিলে তারা মহানন্দে কাশ্মীরের উদ্দেশে যাত্রা করল।

তিন

পাঁচ সাত দিন পরের কথা।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঝিলম নদীর তীরে মলয় সুনীল যতীশ ইত্যাদি সব বন্ধুরা মিলে মহানন্দে সেদিন একটা মস্ত বড় ফিষ্ট্ লাগিয়ে দিয়েছে। সুনীল হয়েছে প্রধান উদ্যোগী। নরেন ষ্টোভে মাংসের কালিয়া চাপিয়ে দিয়ে গুন্ গুন্ করে গান গাইছিল। রান্নায় সে নাকি খুব পারদর্শী—তাই মাংস রান্নাটা তার ঘাড়েই চাপানো হয়েছে। বিমলের বন্ধু মহলে কবি বলে খ্যাতি ছিল, তাই সে এই সুযোগে চীৎকার

করে একটা কবিতা আবৃত্তি করে নিজের কবিত্বটা বের করবার চেষ্টা করছিল। কবিতাটা যদি তার নিজের স্বরচিত নয়, তবুও সে মহা চীৎকারের সঙ্গে বলে যাচ্ছিল :—

পঞ্চ নদীর তীরে— জাগিয়া উঠেছে শিখ্
বেণী পাকাইয়া শিরে নির্ম্মম নির্ভীক্...
দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে

পিছন থেকে তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে সুনীল বল্ল— থাম, আর গাধার মত চেঁচাতে হবে না, সময় নেই অসময় নেই তোর ওই ষাঁড়ের ডাক আর ভাল লাগে না বাপু, চট্ করে খাবার যোগাড়টা করে ফেল দেখি, তা হোলে বুঝব তুই কত বড় কবি......। বেচারা বিমল আর কি করে; নিতান্ত অনিচ্ছায় নিজের চিৎকার থামিয়ে সে উঠে পড়ল। হঠাৎ এমনি সময়ে সুনীল একটা যন্ত্রণাসূচক ভীষণ আর্ত্তনাদ করে সেই পথের উপরে হত-চেতনের মত ঢলে পড়্ল। সবাই কি হোল, কি হোল, বলে ছুটে এল তার কাছে; সুনীল নিজের বাঁ হাতের একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বল্ল, সাপ্, এইখানে সাপে কামড়েছে, উঃ বড় যন্ত্রণা—সুনীলের মুখের কথা আট্‌কে গেল; তার দুই চোখে কপালে উঠ্‌ল। হায়, হায় এ কি হোল? এক মুহূর্ত্তে তাদের আনন্দ খেলা ভীষণ দুঃখে পরিণত হোল। বন্ধুরা সবাই হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ মলয়ের মাথায় একটা অদ্ভুত বুদ্ধি গজিয়ে উঠ্‌লো। সে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করে নিল। না আর দেরী নয়—চকিতের মধ্যে সে সুনীলের হাতের ক্ষত স্থানটা দৃঢ়ভাবে ঠোঁটে চেপে ধরল যেন সুনীলের দেহের সমস্ত বিষটুকু সে উঠিয়ে ফেলতে চায়—এমনি ভাবে। কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুনীল পূর্ব্বেকার চেয়ে বেশ একটু সুস্থ হয়ে উঠ্‌ল। মনে হোল তার চোখ মুখের সে জড়তার ভাবটা কেটে গেছে। আর মলয়? সে পথের উপরই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ঢলে পড়েছে। ঠোঁট্ দুটো তার, আড়ষ্ট...নীল...তার সমস্ত মুখ খানায় কে যেন গাঢ় 'নীল রং' লেপে দিয়েছে। তার মুখের অস্ফুট যন্ত্রণার বাণী, যেন সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যে একটু পরেই সে এই শত শোভাময় পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে উপরের ওই অনন্ত 'উদার নীলাকাশের মাঝখানে বিলীন হয়ে যাবে।

আঁ্যা, তুমি একি কর্‌লে মলয় ? পরের জন্য এমন করে নিজের জীবন বলিদান দিলে ? সুনাল ধীরে ধীরে বসে পড়্‌ল। এমনি করে এই ভাল ছেলেটী, নিজের ভাল ছেলের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখে অকালে বন্ধুর জীবনের জন্যে আত্মবিসর্জ্জন দিল .....।

এই ঘটনার পর আরও অনেক দিন কেটে গেছে। এখনও কোন খানে মলয়ের কথা উঠ্‌লে সবাই তাকে 'গুড্‌বয়' বলেই অভিহিত করে থাকে......।

কুমারী মৃণাল গুপ্তা

ক্রিকেট খেলা

শীত পড়বার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ক্রিকেট খেলার ধুম্ পড়ে গিয়েছে। গতবারে এম, সি, সি. আসবার পর থেকে ক্রিকেট খেলার উৎসাহটা যেন বেড়ে গিয়েছে। এমন কি পাড়ার ছোট ছেলেগুলো পর্য্যন্ত কেরোসিন কাঠের ব্যাট দিয়ে ইঁটের উইকেট করে ফাঁপা বল দিয়ে ক্রমাগত বল পিঠছে। কলকাতাতেও অনেকগুলো ভাল ভাল নতুন ক্রিকেট ক্লাব হয়েছে। এমন কি মাড়োয়াড়ীর ছেলেরা পর্য্যন্ত এই খেলা খেলতে আরম্ভ করেছে।

এ সব খুব সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। এবারে আমরা কয়েকটা ভাল ভাল খেলা দেখেছি। দেখে যে সব কথা মনে হয়েছে তাই এখানে লিখছি। প্রতি বছরেই খেলা দেখ্‌তে গিয়ে আমরা আশা করি যে দুই এক জন নতুন ভাল খেলোয়াড় দেখতে পাব। কারণ ভাল খেলোয়াড় তৈরী না হোলে খালি ক্লাব বেড়ে কোন লাভ নাই। কিন্তু আমাদের এ আশা এবারেও পূর্ণ হয় নাই।

আমাদের মধ্যে বড়ই ভাল খেলোয়াড়ের অভাব। প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় একজনও নেই। ভিটল, মিস্ত্রী, রামজী, জয়, কনিকম্ ওয়াজীর আলীর মত খেলোয়াড় তো বাঙ্গলায় একজনও নাই। যখনই একটা সমস্ত ভারতবর্ষের দল তৈরী হয়, তখনই বাঙ্গালীরা বাদ পড়ে।

বাঙ্গালীদের খেলা দেখে মনে হয় যখন তাঁরা খেলতে নামেন তখন যেন তাঁরা প্রাণ হাতে কোরে নামছেন। ভাল বোলারের সম্মুখে সাহস করে সহজ-ভাবে দাঁড়াতে খুব কম খেলোয়াড়ই পারেন। অবশ্য আমরা কোন খেলোয়াড়কে আনাড়ি ভাবে খেলতে বলি না। সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা সকলকেই নিজের মনে ভরসা রেখে 'বোলারের' সামনে দাঁড়াতে বলি। সাধারণতঃ দেখি যে বাঙ্গালী খেলোয়াড় কোন রকমে ঠুক্‌ঠাক্ করে বলকে আটকে রেখে কত বেশী সময় বেঁচে থাকতে পারেন তার চেষ্টা করেন। এতে খেলা খুব খারাপ হয়। রান হয় না, মাঝ থেকে হেরে যেতে হয়। কেউ কেউ হয়ত বলবেন এই উপায় অবলম্বন করলে বিপক্ষ দলের বোলার ও Fielding দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। এ ধারণা একেবারে ভুল। খুচ্-খাচ্ করে ব্যাটে বল ঠেকিয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকার চেয়ে সাহস করে খেলে আউট হওয়া ঢের ভাল। এই সে দিনকার কথা বলছি, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও ক্যালকাটার সঙ্গে খেলা হচ্ছিল। ক্যালকাটা মাত্র ১২৯ রান করেছিল। স্পোর্টিং ইউনিয়ন করেছিল মোট ১১৪। এঁরা এত মন্থর গতিতে খেলে ছিলেন যে এক ঘণ্টায় মাত্র ৩০টা রান হয়েছিল। এইরূপ অকারণে "Stone walling" উপায় অবলম্বন করা খুব দুষণীয়। তাঁরা যদি কতক্ষণ Wicketএর কাছে থাকবো এইটা না ভেবে বলের দিকে লক্ষ্য দিতেন তবে নিশ্চয়ই জিততে পারতেন।



ক্যাপ্টেন মিস্ত্রী

এইবারে ক্রিকেটের নানা রকম খবর। আমাদের গভর্ণর স্যার ষ্টান্‌লি জ্যাক্‌সন

একজন খুব উঁচু দরের খেলোয়াড়। এখন তিনি বুড়ো হয়ে পড়েছেন কিন্তু তাঁর সময়ে তিনি ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি এখানে এসেই Governor's IX বলে একটা ক্রিকেটের দল তৈরী করেছেন। এই দলে তিনি ভাল ভাল বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিচ্ছেন ও ভাল ভাল দলের সঙ্গে খেলা হচ্ছে। আশাকরি এইরূপ উৎসাহ পেলে বাঙ্গলার খেলার আরও উন্নতি হবে।



ভিটল

ক্রিকেট খেলার জায়গা হচ্ছে বম্বে। যত বড় বড় খেলোয়াড় বম্বে থেকে আসে। এখানে সে দুই জনের ছবি দেওয়া গেল। একজন খুব বড় হিন্দু খেলোয়াড় ভিটল্—তিনি হিন্দু দলের ক্যাপ্টেন। আর একজন বড় পার্শী খেলোয়াড় কর্ণাল মিস্ত্রী। এঁর এখন বয়স হয়ে পড়েছে। তবুও এর মত খেলোয়াড় খুব কম দেখা যায়। বারান্তরে আরো ক্রিকেট সম্বন্ধে বলবার ইচ্ছা থাকল।

সবজান্তা

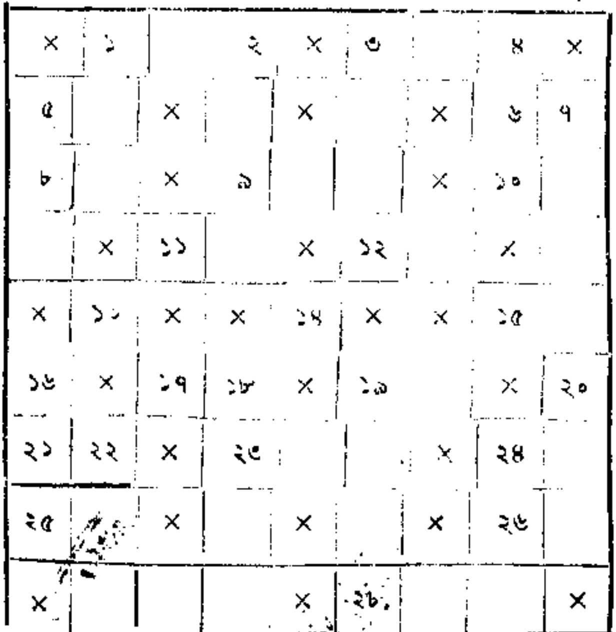
বিলাতে যে Crystal Palace আছে, তাতে যা কাঁচ আছে তা জোড়া করলে ২৪২ মাইল লম্বা হয়। সেই প্রাসাদের ছাদে এত কাঁচ আছে যে ১০০ বিঘা জমী অনায়াসে ছেয়ে ফেলতে পারা যায়।

ইংরাজী ভাষায় গড়ে প্রতি বৎসর ৩০০০ নূতন কথা যোগ হয়। এগুলো সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক ভাষা—নানা রকম নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যোগ হয়। Wireless আবিস্কারের জন্য ইংরাজীতে ৫,০০০ নূতন কথা যোগ হয়েছে।

বৃষ্টির ফোঁটা কত বড়? সেদিন ডাব্লিনের ইউনিভারসিটি কলেজ পরিক্ষা করে দেখেছেন যে গড়ে ৩১২টা বৃষ্টির ফোঁটা যদি পাশাপাশি রাখা যায় তবে এক ইঞ্চি স্থান অধিকার করে। ৫০০০ বৃষ্টির ফোঁটাকে পরিক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্যারী সহরে সম্প্রতি সেখানকার পাগলা-গারদের পাগলদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে। সে রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি কেউ কখনও দেখে নাই। একটা পাগল নিজের রক্ত দিয়ে ছবি এঁকেছে।

নূতন ধাঁধা (Cross-word. Puzzle)



বরাবর :—

১। রসযুক্ত
৩। শ্রীরামচন্দ্রের সৈন্য
৫। শব্দ
৬। শ্রেষ্ঠ বীর রমণী
৮। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিশেষ
৯। দেবতা বিশেষ
১০। কিরণ
১১। বীর
১২। সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষ
১৩। অসম্মতিসূচক
১৪। প্রণব
১৫। অথবা
১৭। চিত্র
১৯। পাদভূষণ
২১। কুলুপ ২৩। ভয়ঙ্কর ২৪। নিযুক্ত ২৫। অন্ন ২৬। যন্ত্র ২৭। দশরথের পুত্র ২৮। অস্ত্র (পদ্যে)।

নীচদিকে :—

১। বলশালী ২। জলাশয় ৩। একটি হিন্দু তীর্থ স্থান ৪। সভাসুন্দর ৫। রাত্রি ৭। দেবর্ষি ১৬। একখানি মনোরঞ্জন মাসিক ১৮। শ্রীরামের সখা ১৯। কন্দর্প ২০। জলহীন ২২। নির্ম্মল ২৪। আকার।

শ্রীনলিনীরঞ্জন বিশ্বাস

কলিকাতা—২৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের প্রেস, কিলিক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও



স্কুলের পথে--হিন্দুস্থানী ছেলে

মৌচাক

৮ম বর্ষ] মাঘ, ১৩৩৪ [১০ম সংখ্যা

নিঃস্ব

ছোটটো বিনুনী
একটী ফোঁটা মেয়ের পিঠে
ঝুম্‌কো দুলুনি ;

মস্ত দুটি চোখ
সবার পানে চেয়ে বেড়ায়
নাইকো কোন শোক।

ছোট্টো দুটি হাত
ভালোবাসার মায়ায় ভরা
ব্যস্ত যে দিন্ রাত।

শুনীল শাড়ীটি
মাটীর পরে লুটিয়ে চলে
সকল বাড়ীটি।

সাঁঝের যূথীটী
পাতার ফাঁকে চমক্ হানে
মুখের দ্যুতিটী।

বাসি যে ভালো
মিষ্টি হাসি ভরা চোখের
তারাটি কালো।

সত্যি ক'রে তাই
যা ছিলো মোর ওরেই দিছি
কিচ্ছু বাকি নাই।

শ্রীঅরিন্দম বসু

অকু অধিকারী

সে বার কালী পূজোর সময় কালীপুর গ্রামে মহা হুলুস্থুল বেঁধে গেল। কল্‌কাতা থেকে সখের যাত্রা এলো বারোয়ারী তলায় উপরি উপরি সাত দিন গাইবে বলে। গ্রামের ছেলেদের সখ এতে সব চাইতে বেশী। তারা মাস খানেক আগে থেকেই বলা কওয়া সুরু করেছে—কি কি পালা গাওয়া হবে। তাই নিয়ে দক্ষিণ পাড়ার ছুট্টুর সঙ্গে পুব পাড়ার নন্তার একদিন খুব মারামারি। ছুট্টু বল্লে—যাত্রায় যে হনুমান সাজে তার ল্যাজ সত্যিকারের হনুমানের চাইতে ছোট।

নন্তা ঘাড় নেড়ে বল্লে, কক্ষণো নয়। যাত্রার হনুমান হচ্ছে মস্ত বড় বীর—সে একটা বই দু'টা ছিল না, আর আজকালকার যে হনুমান গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়ায় তারা ঐ হনুমানেরই ছেলেপিলে ত? তখন ও হনুমানের ল্যাজ এদের চাইতে ছোট হবে কি করে?

ছুট্টু বল্লে—তা তুমি বল্লে হবে কি, আমি সেবারে 'সীতার বনবাসে' যে হনুমান দেখেছিলাম তার লেজ ঢের ছোট।

নন্তা মরিয়া হয়ে বল্লে—ফের এক কথা বল্‌ছিস ত মারবো এক চড়।

ছুট্টু বল্লে—মার দেখি কেমন মারতে পারিস্।

নন্তার যে কথা সে কাজ! ছুট্টুর মুখ থেকে কথা বেরিয়েছে কিনা বেরিয়েছে অমনি ধপ্ করে তার গালের ওপর এক চড় কসিয়ে দিলে। তখন ছুট্টুর চাৎকারের ঠ্যালায় সেখানে কাণ পাতে কার সাধ্যি। চ্যাঁচামেচি শুনে প্রথমটা ছুটে এলো অক্ষয় ওরফে অকু আর তার পেছন পেছন এক পাল ছেলে। অকু পালের গোদা। কাজেই নিজেদের ভেতর কোন মারামারি কিম্বা গোলমাল হলেই অকু তা মিটিয়ে দিত। আর ছেলেরাও তাকে মোড়ল বলে জানত। অকু বল্লে—তোদের আবার আজকে কি হল রে?—

বেন্দা মারামারির সময়টা সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল। সে ব্যাপারটা খুব অল্পের মধ্যে অকুকে বুঝিয়ে দিলে। সবটা শুনে নিয়ে অকু বল্লে—এই নিয়ে তোরা ঝগড়া কচ্ছিস; আচ্ছা আমি ব্যাপারটা তোদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। তোদের দু'জনকার কথাই সত্যি!

নন্তা ফোঁস্ করে বল্লে—কি করে?

অকু বল্লে—শোন্ না বোকা, আগে থেকেই ফুল্‌তে আরম্ভ করলি? ছুট্টুর কথা সত্যি এই জন্যে যে হনুমানের ল্যাজ বড় হলেও সাজ্‌তে গেলে তা খাটো করে নিতেই হবে, কারণ তা না হলে চল্‌তে গিয়ে একেবারে পিছ্‌লে আলুর দম্!

অকুর বিচার শুনে ছুট্টু খুব খুসী হয়ে চোখের জল মুছে বল্লে—হ্যাঁ, আমিও ত সেই কথাই বল্‌ছিলাম।

নন্তা বল্লে, আমার কথাও ত সত্যি? অকু তার পিঠ্ চাপ্‌ড়ে বল্লে, নিশ্চয়! সেদিনকার বিবাদটা এমনি হাসিখুসীর ভেতর দিয়েই মিটে গেল।

এর মাস খানেক পরের কথা। যাত্রার দল এসে পৌঁছবে। ছেলেদের এখন আব নাইবার খাবারও ফুরসুৎ নেই ; দলে দলে সব ছুটেছে যাত্রার লোক দেখ্‌তে। কে কি সাজ্‌বে তাই নিয়ে কথা। চাল্‌তা বল্লে— ঐ যে ভুঁড়িওলা লোকটাকে দেখেছ ও সাজ্‌বে কংস—

বেন্দা বল্লে, ও কেন কংস সাজ্‌তে যাবে ? সেবার মামাবাড়ীতে এই দলটাই যাত্রা করতে গিয়েছিল, ও সাজ্‌ল তাতে রাবণ —

হেমা বল্লে—না না, ও সাজে মহম্মদ তোগ্‌লক।

অকু বল্লে আজ্‌কেও তোরা সে দিনকার মত মারামারি করবি নাকি ? হুম্‌কী শুনে ছেলেরা থেমে গেল। উপরি উপরি সাত দিন যাত্রা শুনে, দেখা গেল কারো কথা মিথ্যা নয়—ভুঁড়িওয়ালা লোকটা কংসও সাজে, মহম্মদও সাজে, রাবণও সাজে এবং তা ছাড়া অনেক কিছু করে যা তারা আদবেই জান্‌তো না।

সে পার্ট বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ তবলাটীর পেছনে গিয়ে কল্‌কেতে গোটা দু তিন দম দিয়ে নেয়, সময় অসময়ে প্রমট্‌ চালায়, আবার দরকার হলে বেহালা বাজিয়ে আসর জমাতেও ছাড়ে না। ছেলেরা খোঁজ নিয়ে শুন্‌লো সে নাকি আবার গানও শেখায়। গুণ যার এন্নি চারদিকে ছড়িয়ে আছে তার ওপর স্বভাবতই একটা ভক্তি আসে। ছেলেরা দু দিনেই তাকে বিদ্যাদিগ্‌গজ ধনুর্দ্ধর ঠাউরে নিলে !

সাতটা দিন বইত নয় ! কাজেই এ সাতটা দিনও হঠাৎ অম্‌নি শেষ হয়ে গেল। দিন চলে গেল বটে কিন্তু যাত্রাটা বোকা ছেলেদের মগজের ভেতর কিল্‌ বিল্‌ করে বেড়াতে সুরু করলে। একদিন ইস্কুল ছুটি হতে অকু ছেলেদের ডেকে বল্লে—ওরে, আয় আমরা একটা যাত্রার দল খুলি। একে ত যাত্রার মতো অমন মিষ্টি জিনিষ— তারপর বল্‌ছে আবার স্বয়ং মোড়ল ! ছেলেদের তখন পায় কে ! তারা অকুকে ঘিরে ধেই-ধেই করে নাচতে সুরু করে দিলে !

অকু বল্লে—তোরা নাচ্‌টা একটু থামা দেখি—আগে ঠিক করে ফেলি কোথায় যাত্রা হবে ?

এ কথায় ছেলেদের মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়্‌ল। তারা এক সঙ্গে বল্লে

উঠ্‌ল—আমার বাসায় হলে বাবা ঠেঙিয়ে বিদেয় করে দেবে। অকু বল্লে—দূর ছাই—তবে আমাদের ভেতরকার উঠোনটাতেই হবে।

ছুট্টু ভয়ে ভয়ে বল্লে—তোমার বাবা?

অকু বল্লে—সে জন্যে ভাবনা নেই। বাবা বাইরের ঘরে দুপুর বেলা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুম দেন—ভেতরকার উঠোনে বেশ হবেখন।

বেন্দা বল্লে—কখন হবে?

অকু বল্লে—আরে বোকা, রোজ দুপুরে ইস্কুল পালিয়ে বেশ মজা! ছেলেরা লাফিয়ে উঠ্‌ল। পল্‌তা ছিল একটু ভীতু। বল্লে—তোমার বাড়ীতে, কেউ কিছু বল্‌বে না?

অকু বল্লে—বাড়ীতে বল্‌ব, যাত্রা শুনে হেড মাষ্টার মশাইর শরীর খারাপ, তাই সাতদিন ইস্কুল ছুটি! অকুর বুদ্ধি দেখে সকলকার তাক্ লেগে গেল। নইলে আবার মোড়ল কিসের! পরদিন দুপুর বেলা—ছুট্টু, নস্তা, বেন্দা, পল্‌তা, হেমা, আরো জনকয়েক চুপি-চুপি অকুর সঙ্গে এসে তাদের বাড়ীতে ঢুক্‌ল। অকুর মা শুধোলে—তোরা ইস্কুল থেকে ফিরে এলি যে?

অকুর পাকা মাথা—তখনি তার মীমাংসা করে দিলে।

সারাটা দুপুর অকুদের উঠোনে যাত্রার তাণ্ডব লীলা চলল। আর তার দর্শক হল—অকুর মা, দিদি, পিশিমা, তারপর ও বাড়ীর ক্ষ্যান্ত মাসি, পাশের বাড়ীর বিম্‌লি ঝি, ছুট্টুর খুড়ি, নস্তার জেঠাইমা, পল্‌তার মামি, হেমার বৌদি, এমনি অনেকেই—পরের দিন দুপুরে রগড়টা জম্‌লো ভালো! সেদিন পালা ছিল—লঙ্কাকাণ্ড। বেন্দা খড় দিয়ে ইয়া বড় এক লেজ তৈরী করে তাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে হনুমানের পার্ট কচ্ছে—

লঙ্কায় আগুন দিয়ে এসে সে সীতার কাছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছিল! সীতা সেজেছিল স্বয়ং অকু মোড়ল। অকু ছেলে বেলা থেকে গাইতে পারত—আর তার গলাটা ছিল সত্যি মিষ্টি। হনুর কথার জবাবে সে গান গেয়ে রামের কুশল শুধোচ্ছিল—ঠিক এমনি সময়ে উঠোনের মাঝখানে যার আবির্ভাব হল—স্বয়ং রাবণ এলেও বোধ করি সীতার এতটা চঞ্চল হবার কথা নয়।

মুহূর্ত্তে সীতা যে কোথায় পগার পার হল—তার কোনো টিকিই দেখা গেল না! হনুবেচারী আচম্‌কা এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল যে তার জ্বলন্ত ল্যাজটাকে নিয়ে



বিম্‌লিঝির কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল

পালাতে গিয়ে বিম্‌লিঝির কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। তারপর যেখানে যে যাত্রা সুরু হল—তা লঙ্কাকাণ্ডের চাইতেও ভয়াবহ! যার আগমনে সোনার লঙ্কা ছারখার হওয়া বন্ধ হয়ে গেল—তিনি অকুর বাবা—তারিণী চাটুর্য্যে।

চাটুয্যে অকুর মাকে ডেকে বল্লেন—ছেলেদের একি হচ্চে শুনি?

ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। বল্লেন—সাতদিন ছুটি কি না তাই ছেলেরা আমোদ কচ্ছিল—হঠাৎ বিম্‌লীর কাপড়ে কেমন করে আগুন লেগে গেল—

চাটুয্যে বল্লেন—ছুটি কেন?

অকুর মা কারণটা জানালেন! চাটুয্যে ব্যস্ত হয়ে বল্লেন—হেডমাষ্টারের অসুখ—

কৈ আমি ত জানি না। আজকেই দেখ্‌তে যেতে হবে ত! এই হেড্‌মাষ্টার মশাই ছিলেন চাটুয্যের বাল্য-বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে দু'জনে বহুদিন এক সঙ্গে পড়েছিলেন। কলেজে ছাড়াছাড়ি। তারপর এতদিন পরে এই গ্রামে মাষ্টারী নিয়ে আসায় নতুন করে পরিচয়। ছড়ি হাতে নিয়ে চাটুয্যে মশাই হেডমাষ্টারের বাড়ী গিয়ে হাজির! সামনেই তার ছেলেকে পেয়ে শুধোলেন—খোকা, তোমার বাবা আজ কেমন আছে?

খোকা যেন আকাশ থেকে পড়ল, বল্লে—কেন, বাবার কোনো অসুখ করেনি।

চাটুয্যে বল্লেন—বটে! তারপর ডাক্‌লেন—ওহে মাষ্টার বাড়ী আছ? হেড্‌মাষ্টার বেরিয়ে এলেন।

চাটুয্যে বল্লেন—তোমাদের স্কুল ছুটি কেন হে?

হেড্‌মাষ্টার অবাক্ হয়ে শুধোলেন, ছুটি? কৈ না ত!

চাটুয্যে বল্লেন—কি রকম—তোমার স্কুলের যত ছেলে জুটে সমস্তটা দুপুর কি কাণ্ডই না করেছে—আর তাদের পাণ্ডা হল অকু। চাটুয্যের মুখ থেকে আগাগোড়া সব ঘটনা শুনে নিয়ে হেড্‌মাষ্টার মশাই বল্লেন— বটে!

চাটুয্যে বল্লেন—বটে নয়, কালকেই এর একটা বিহিত করো। কি রকম মাষ্টার হে তুমি—ছেলেরা স্কুল পালিয়ে যাত্রা করে বেড়ায়—আর তুমি তার খোঁজই রাখ না?

হেড্‌মাষ্টার বল্লেন—আচ্ছা কালই আমি এর একটা ব্যবস্থা কচ্ছি। বাপের কাছে তাড়া খেয়ে পরদিন অকু আর স্কুল থেকে পালালো না। সঙ্গে সঙ্গে দলের সবাই শান্তশিষ্ট ভালো মানুষ হয়ে ক্লাশে রইল। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়তেই এমন একটা কাণ্ড ঘট্‌ল—যাতে গোটা স্কুলটায় সোর গোল পড়ে গেল। দপ্তরী ক্লাশে-ক্লাশে এসে জানিয়ে গেল—আজ ছুটির পর স্কুলে অকু অধিকারীর যাত্রা হবে—হেড্‌মাষ্টার মশাই সবাকে থাক্‌তে বলেছেন। ছেলেরা বলাবলি করতে লাগ্‌ল—স্কুলে যখন হবে তখন নিশ্চয়ই খুব ভাল যাত্রা।

আর অকু ভাব্‌লে—এ নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টু ছেলের কারসাজী। কিন্তু সবাই আশায় আশায় রইল—আসল ব্যাপারটা যে কি তা কেউ ঠাহর করতে পারলে না। চারটে বাজ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলের দল এসে স্কুলের মাঠে জমা হল। খানিক বাদেই

সব মাস্টারদের সঙ্গে করে হেডমাষ্টার মশাই এসে পৌঁছুলেন। ওপরের ক্লাশের জনা দু'য়েক ছেলে এগিয়ে গিয়ে শুধোলে—সতরঞ্চি নেই, আমরা বোস্‌বো কোথায় স্যার?

হেডমাষ্টার মশাই মুচ্‌কি হেসে বল্লেন—ওই ত মজা—অকু অধিকারীর যাত্রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে হয়। তারপর হঠাৎ ভিড়ের ভেতর থেকে অকুকে টেনে এনে একেবারে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলেন—তারপর একে একে ছুট্টু, নন্তু, বেন্দা, পল্টু হেদা দলের সবাইকে—ছেলের দল কিছু জানে না—বোকার মতো হাঁ করে রইল—

হেড্‌মাষ্টার মশাই বল্লেন—তোমরা হয় ত সবাই জানো—যাত্রা সুরু হবার আগে আসর জমিয়ে নিতে হয়। আর আসর জমাতে গেলে আগে দরকার বেহালার কান মুচ্‌ড়ে ঠিক করে নেওয়া—এই বলে তিনি একে একে সকলকার কান পাক্‌ড়ে খুব কসে মলে দিলেন—সকলকার মুখ থেকে এক সঙ্গে আওয়াজ বেরুলো—উঁ হুঁ—উঁ—উঁ—উঁ—উঁ!!!

হেড মাষ্টার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—এই বার কনসার্ট সুরু হল। তারপর আগাগোড়া সব তাদের কাছে খুলে বল্লেন। ছেলেরা বল্লে, স্যার যাত্রা একদিন ইস্কুলেও হোক না—

হেড মাষ্টার জবাব দিলেন—এই ত সুরু হল বলে—তারপর বেন্দার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—কাল তুই কি সেজেছিলি?



অকু ও হেড্‌মাষ্টার

বেন্দা মুখ কাচুমাচু করে বল্লে—হনু! ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠ্‌ল।

তারপর পল্‌তাকে ধরে বল্লেন---তবে তুই ?

পল্‌তা জবাব দিলে—আমি কিছু সাজিনি স্যার—

বেন্দা ফোঁস্‌ করে উঠে বল্লে—সাজিস্‌নি তুই ত' পেট মোটা করে ছিলি—

আবার হো - হো হাসি !!!

হেড মাষ্টার অকুকে ডেকে বল্লেন—কি অধিকারী মশাই—ইস্কুলে এক পালা হ'বে নাকি ? বল্‌তে আমারই লজ্জা করছে—এক ইস্কুল ছেলের সামনে স্বয়ং অকু অধিকারী এবার সত্যি সত্যিই—ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেল্লে! আর সে জীবনে যাত্রা কোরবেনা এটা ঠিক !

শ্রীঅখিল নিয়োগী

লাল কুঠি

(উপন্যাস)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কে ও ?

মালী একটা লণ্ঠন রাখিয়া গেল।

বারান্দায় নারিকেল পাতায় বোনা এক চ্যাটাই। বিশ্বনাথের হুকুমে বাঁটুল পকেট হইতে একটা গামছা বাহির করিল; ও সেই গামছায় চ্যাটাইটা ঝাড়িয়া দিলে বিশ্বনাথ শশাঙ্ককে কহিল,---বসুন। শশাঙ্ক বসিল। বিশ্বনাথও বসিল, বসিয়া কোটের পকেট হইতে একটা নীলরঙের কাগজ বাহির করিয়া বলিল,—এইটে হলো বাড়ীর নক্সা। কোনো কাজ রয়ে বসে করবার লোক আমি নই। বাড়ী দেখে সদ্যসদ্য মাপ-জোপ

করে নক্সা অবধি বানিয়ে ফেলেছি। বলিয়া সে নক্সাটায় আঙুল বুলাইয়া বলিতে লাগিল,—এইটে হলো বাড়ীর পিছনের বাঁশ বাগান, আর এই যে গোল দাগ দেওয়া জায়গা দেখচেন, এটা পুকুর। পুকুরে মাছ নেই, খালি ঝাঁজি।

শশাঙ্ক বিশ্বনাথের মুখের পানে চাহিল। লোকটি তো খুব চটপটে—ইহার মধ্যে এত কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছে—তাও পয়সা খরচ করিয়া! যদি বাড়ী না বেচি?

সে কহিল—এ তো দেখচি......তারপর বিশ্বনাথের এতখানি গরজ বুঝিয়া একটু দাঁও কষিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—দেখুন, পূর্ব্বপুরুষের বহুকালের বসত-বাড়ী ...তবে যদি বেশী টাকা পাওয়া যায়, তা হলে নয় বেচা যেতে পারে। তা আপনি কি রকম দাম দেবেন, একটা আঁচ দিন, শুনি—

বিশ্বনাথ কহিল—দেখুন, বাড়ীটা সৎকার্য্যে, মানে, দেশের কাজে ব্যবহার করবো আমরা...দেশের প্রতি আপনারো একটা কর্ত্তব্য আছে তো...তা বুঝে—অর্থাৎ ঠিক ব্যবসাদারী হিসাবে দর চাইবেন না, এই আমার বক্তব্য আর কি!

শশাঙ্ক হাসিল, হাসিয়া কহিল,—দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সে না হয় অন্য সময় করা যাবে—এখন আপনি একটা আঁচ দিন তো...

বিশ্বনাথ হাসিয়া কহিল—আমরা যখন কিনচি, তখন যথাসম্ভব কম দামেই কেনবার চেষ্টা করবো...কারন, আমাদের ফণ্ডের যে টাকাটা এদিক দিয়ে বাঁচাতে পারা যাবে, সে টাকাটা পাঁচটা যন্ত্র-পাতি কেনায় খরচ করা সম্ভব হবে!

শশাঙ্ক কহিল—আপনারা যেমন যথাসম্ভব কম দাম দেবার চেষ্টা করবেন, আমরাও তেমনি বেশী দাম আদায়ের চেষ্টা দেখবো তো! বিশেষ, যখন বুঝচি, পাড়াগাঁয়ের এত বড় বাড়ী এমনিতে কেউ কখনো কিনতে আসবে না...তখন যার গরজ হবে, তার কাছ থেকে যতটা সম্ভব আদায় করার চেষ্টা বুদ্ধিমানের কাজ... তা না করলে, আপনারাই বলবেন, কি বেকুব লোক—কি দাঁওয়েই বাড়ীখানা বাগিয়ে নিছি ...এই অবধি বলিয়া শশাঙ্ক হাসিল; হাসিয়া আবার কহিল—কেউ যে আমায় বোকা বলবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না!..

বিশ্বনাথ এবারে গম্ভীর হইয়া রহিল—তারপর গম্ভীর ভাবেই কহিল—আপনি দু' আনার অংশীদার মাত্র—আরো সাত জনকেও দাম দিতে হবে...

শশাঙ্ক কহিল,—তা তো হবেই।

বিশ্বনাথ কহিল,—তা হলেই দেখুন.....আপনার নিজের পয়সা-কড়ি বিলক্ষণ আছে—আপনার মত আর্থিক অবস্থা হয়তো আর সাত জনের নয়! আপনি ধরুন, আপনার অংশ পাঁচ হাজারে বেচবেন..তার কমে বেচবেন না···আপনার কোনো গরজ নেই...কিন্তু অন্য অংশীদার—যার আর্থিক অবস্থা খারাপ, সে এত বড় ইটের বোঝা বাড়ী নিয়ে কি করবে—তাও পুরো বাড়ীর মালিক যখন নয়...? সে হয়তো এক হাজার টাকা পেলেই তার দু' আনা অংশ বেচে দেবে...কাজেই...

শশাঙ্ক কহিল—বুঝেচি! আপনি সারা বাড়ীর একটা মোটমাট দাম না দিয়ে যাকে যাতে পারেন, তাকে সেই দাম দিয়ে কাজ সারবেন, এই আর কি...

বিশ্বনাথ কহিল—দেখুন, নিজের স্বার্থে বাস করবো বলে তো বাড়ী কিনচি না,—কিন্‌চি স্কুলের জন্য...আপনার দু' আনা অংশের জন্য আপনি কত টাকা চান—?

শশাঙ্ক কি ভাবিল, ভাবিয়া কহিল,—যদি বলি, দশহাজার টাকা নেবো...?

বিশ্বনাথ শিহরিয়া উঠিল, কহিল—দ—শ—হা—জা—র! বাপ্‌রে, দশহাজারে যে ভবানীপুর কালীঘাটে জমি পাওয়া যায়...দশহাজার যদি দু'আনা অংশের দাম হয়, তা হলে সারা বাড়ীর দাম হলো, দশ ইন্‌টু আট, অর্থাৎ আশি হাজার! আশি হাজার টাকায় গোবিন্দপুরের মত পাড়াগাঁয়ের একটা বাড়ী.. আপনি যে অবাক করে দিলেন!

শশাঙ্ক হাসিয়া জবাব দিল—কেন, সবাইকে আর এ দাম দিতে হচ্ছে না তো আপনার—এক হাজারেই তো অন্য অংশীদারদের বাগাতে পারেন।

বিশ্বনাথ কহিল—সে একটা কথার কথা বলেচি বলে..তা নয়, অর্থাৎ...আচ্ছা, সব বাড়ীর একটা দর ধরুন,—সে হিসেবে দু'আনা অংশের দাম কি হয়...

শশাঙ্ক কহিল—বেশ, ধরুন...

বিশ্বনাথ ডাকিল—বাঁটুল...

বাঁটুল কাঠের পুতুলের মত নিষ্কম্প দাঁড়াইয়া ছিল—এ ডাকে সে নড়িয়া একটু সরিয়া আসিল।

বিশ্বনাথ কহিল—আমার সেই পকেট-বুকটা বার কর্ দিকিন্...

কালো মলাট-দেওয়া একটা পকেট বুক বাহির করিয়া বাঁটুল বিশ্বনাথের হাতে দিল। বিশ্বনাথ কহিল—লণ্ঠনটা তুলে ধর্ তো রে...

বাঁটুল লণ্ঠন তুলিয়া ধরিলে বিশ্বনাথ পকেট-বুকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে একটা পাতা খুলিয়া দেখাইয়া কহিল—এই দেখুন বাড়ীর মাপ -এই লম্বা, এই চওড়া...আর, এর গাঁথুনি আছে, এই এত গজ...এই যে...

শশাঙ্ক অবাক হইয়া দেখে, একটা মস্ত অঙ্ক ..১২৩০ ··এমনি অসংখ্য অঙ্ক... যোগ-বিয়োগ-গুণ নানা ব্যাপারের যেন মস্ত এক ফাঁদ পাতা! ছেলেবেলা হইতেই অঙ্ক দেখিলে শশাঙ্ক শিহরিয়া ওঠে, এখানে টাকা-পয়সার কারবারেও সেই অঙ্ক! বাসরে, এ যেন একরাশ কেউটে সাপের ছানা কিল্‌বিল্ করিতেছে! তার মাথা ঘুরিয়া যাইবার জো! শশাঙ্ক কহিল—আপনার অঙ্ক রাখুন মশায়,...ও দায় থেকে বেঁচেছি ...কোনো মতে এফ্-এটা পাশ করে বি-এয়-এ-কোর্শ নিয়ে অঙ্ককে সেলাম দিছি... আপনি খুলে বলুন, যা বলবার আছে...

বিশ্বনাথ কহিল,—মানে, আমার কাজে গোঁজামিল পাবেন না—এই কালি কষেছি ...এত ইট আছে, এত কাঠ, তাও পুরোনো। যাক্, আমাদের যখন গরজ ..পুরোনো পুরোনোই সই...তা বাড়ীতে ইট্ যা আছে—তার একটা থোক দাম ধরেছি দেড় হাজার, বহু কেলে পুরোনো ভাঙ্গা ইট্...সুরকির কলেও যে বেচবো, সে আশা নেই! আর কাঠ যা আছে—রঙ পড়েনি বহুকাল, তাহলেও সেগুন-কাঠ! দর ধরেছি দু হাজার টাকা—এই হলো সাড়ে তিন হাজার টাকা। তারপর বাগানের গাছপালা—তেমনি। পচা পুকুরটা বোজাবার খরচ আমাদের লাগবে তো...সে কম পয়সার কাজ নয়...যাক্, তা সব ছাড়ছোড় বাদে সারা বাড়ীর দাম এমনিতে ছয় হাজার ছয়েক টাকা···তারপর আমাদেরই গরজ, কথায় বলে, গরজ বড় বালাই—সেই গরজের দরুণ খেসারতি দু'হাজার, অর্থাৎ সবশুদ্ধ আট হাজার টাকা আমরা দিতে এখনি প্রস্তুত!...আপনার

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বড় চালাক ছেলে !

বিশ্বনাথ মাথা তুলিয়া শশাঙ্কর পানে চাহিল, কহিল,—হিসেব করে যা দেখলুম,—তাতে দশ হাজার টাকার বেশী দিতে পারা যায় না...বুঝলেন...

শশাঙ্ক কহিল—বাড়ী বেচবো না, অন্ততঃ আমার অংশ...

বিশ্বনাথ কহিল—যদি পনেরো হাজার দি ?

শশাঙ্ক কহিল—না !

বিশ্বনাথ কহিল—আচ্ছা, বিশ হাজার দেবো ।

শশাঙ্ক হাসিল ; হাসিয়া জবাব দিল—বিশ হাজারেও না...

রাগে বিশ্বনাথের গা জ্বলিয়া উঠিল । দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সে কহিল,—আচ্ছা, ত্রিশ হাজার দেবো···অর্থাৎ তা কেন, আপনার অংশের দরুণ পাঁচ হাজার...

শশাঙ্ক কহিল—আমায় পঞ্চাশ হাজার দিলেও আমার অংশ আমি বেচবো না ।

বিশ্বনাথ দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল—পঞ্চাশ হাজারেও নয় ..?

শশাঙ্ক কহিল,—না । পঞ্চাশ ছেড়ে এক লাখ দিলেও নয়...

বিশ্বনাথ অবাক ! শশাঙ্ক কহিল,—ঘুরে বাড়ী দেখলুম, এত বড় বাড়ী .. পূর্ব্ব-পুরুষের একটা গৌরবের স্মৃতি...তুচ্ছ টাকার জন্য পরের হাতে ছেড়ে দিলে লোকে বলবে, লক্ষ্মীছাড়া...লোকের কথাও নয়, নিজের মনেও বাধবে বড্ড ! ঘুরতে ঘুরতে আমার মনে হলো, যেন সারা বাড়ী নিশ্বাস ফেলে আমায় বলছে—ওরে হতভাগা, কি অপরাধ করেছি যে আমায় পরের হাতে টাকার লোভে তুলে দিচ্ছিস্...?

বিশ্বনাথ একদৃষ্টে শশাঙ্কর পানে চাহিয়া রহিল—এ তো আচ্ছা পাগল ছোকরা... বাড়ীর নিশ্বাস ফেলা শুনিতে পায়, ...নাঃ...

বিশ্বনাথের ক্রোধ চড়িল ! সে কহিল, বাড়ী আমি কিনবোই...

শশাঙ্ক কহিল—আমার অংশ আমি বেচবো না, মরে গেলেও না...

বিশ্বনাথ কহিল—বাকী চোদ্দ আনা অংশ যদি কিনি, আপনি দু' আনা অংশ নিয়ে

কি করবেন...? আপনার দু আনা অংশ চিহ্নিত করা নেই...চোদ্দ আনা অংশ কিনে আমরা মামলা করে ভাগ করে নেবো...আপনার দু' আনা তখন কতটুকুতে দাঁড়াবে ?

শশাঙ্ক কহিল—আপনি যে চোদ্দ আনা অংশই কিনতে পারবেন, তার ঠিক কি ?

বিশ্বনাথ কহিল—আপনি বাধা দেবেন ? কিন্তু অন্য অংশীদার টাকার দাম বেশী বুঝবেন, বাড়ীর নিশ্বাসের চেয়ে।

শশাঙ্ক কহিল—আমিও তাঁদের কাছ থেকে তাঁদের অংশ কিনতে পারি তো...

বিশ্বনাথ কাঠ হইয়া দাঁড়াইল...কিছুক্ষণের জন্য। তারপর কহিল—বুঝেচি...কিন্তু আমি এ-বাড়ীর পিছনে অনেক ঘুরেচি, আমাদের মনে ভারী জেদ লেগেচে, তাছাড়া পয়সাও কিছু ব্যয় করেচি...সে সব পণ্ডশ্রম হবে !

শশাঙ্ক কহিল—যদিই হয়, সে কি, আমার অপরাধ !

বিশ্বনাথ কহিল—হুঁ ! আচ্ছা, বেশ,...দেখা যাক। আমি জেদী মানুষ মশায়, আমারও পণ, এ বাড়ীর চোদ্দ আনা অংশ আমরা কিনবোই ; কিনে এই বাড়ীতে স্কুল বসাবো...

শশাঙ্ক কহিল—বটে। তবে আমিও পণ করছি। চোখ রাঙ্গিয়ে আজ পর্য্যন্ত আমাকেও কেউ হঠাতে পারেনি...

বিশ্বনাথ কহিল—আপনি তো মশায় বয়সে বালক মাত্র, আমার ঢের বেশী বয়স হয়েছে...একজন ছোকরার কাছে হঠবার পাত্র আমি নই, জেনে রাখবেন...

শশাঙ্ক হাসিয়া কহিল—বেশ !

বিশ্বনাথ কহিল—উত্তম !

বিশ্বনাথ পাত্তাড়ি গুটাইয়া বাঁটুলকে লইয়া বিদায় হইল। [illegible] দাঁড়াইয়া কহিল, বহুক্ষণ...তারপর মালীকে ডাকিল। মালী আ[illegible] কাগজে নিজের নাম-ঠিকানা লিখিয়া তার হাতে দিয়া কহিল—[illegible] বাবু এখানে এলে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস্... [illegible] এসেছিলেন, এঁকে কখনো আর এ-বাড়ীতে ঢুকতে দিবিনে... [illegible] আমি প্রায়ই আসবো—বাড়ী মেরামত করাবো, কলকাতা থে[illegible]

তাছাড়া একটা খুব পালোয়ান-গোছ দরোয়ানও আমি কাল পাঠাচ্ছি; সে বাড়ী চৌকি দেবে। খবর্দ্দার, বাইরের লোক কেউ না ঢোকে...যদি ঢুকতে দিস্, তাহলে তোদের গুষ্টীশুদ্ধ বাড়ী থেকে বার করে দেবো...বুঝলি!

মালী মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে সব বুঝিয়াছে।

শশাঙ্ক কহিল,—আজ রাত হয়ে গেছে...তোর লাঠিটা সঙ্গে নিয়ে আমায় এই বনের পথটা পার করে দিবি চ...গাড়ী মিলবে বড় রাস্তায়?

মালী কহিল,—না—

শশাঙ্ক কহিল—থাকগে গাড়ীর দরকার কি! ঐ বড় রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে বারুইপুর ষ্টেশন পৌঁছুবো তো?

মালী কহিল—হাঁ।...

বড় রাস্তায় পড়িয়া মালীকে বিদায় দিয়া শশাঙ্ক সোজা দক্ষিণ দিকে চলিল।.. পাড়াগাঁ। পথে লোক চলিতেছে খুব কম। ইহার মধ্যেই চারিধার নিশুতি! মাঝে মাঝে এক-একটা কুকুর শুধু ডাকিয়া উঠিতেছে। দু' একটা দোকান, ঝাঁপ বন্ধ; ভিতরে আলো জ্বলিতেছে! শশাঙ্ক বেশ জোরেই হাঁটিয়া চলিল!...

খানিকটা পথ আসিবার পর হঠাৎ একটা কাৎরানির শব্দ তার কাণে গেল। মানুষের কাৎরানি! শশাঙ্ক টর্চ্চ জ্বালিয়া খোঁজ করিয়া দেখে, একটু দূরে একজন লোক পড়িয়া কাৎরাইতেছে। সে কহিল—কে...?

যে কাৎরাইতেছিল, সে অতি কষ্টে কোন মতে কহিল—আর বাবা, বুড়ো মানুষ... পড়ে গেছি, উঠতে পারছি না...একে বেতো পা—

শশাঙ্ক কহিল—তাইতো...তা আমি এ গাঁয়ের কোনো জায়গা তো চিনি না... আপনার বাড়ী কোথায়?

সে কহিল—মাঝের পাড়া।

শশাঙ্ক কহিল—সেটা কোন দিকে?

লোকটি কহিল—এখান থেকে ক্রোশ খানেক হবে...

শশাঙ্ক কহিল—গাড়ী পাওয়া যায়?

লোকটি কহিল—তা পাওয়া যেতে পারে।

শশাঙ্ক কহিল—আচ্ছা, দেখি, গাড়ী নিয়ে আপনাকে তাতে তুলে আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দিচ্ছি...

লোকটি কহিল—দয়া করে যদি পৌঁছে দেন...আঃ!

শশাঙ্ক কহিল—এ আর দয়া কি...এটুকু যদি না করি, তাহলে তো আমি মানুষ নই ..



শশাঙ্ক অগ্রসর হইয়া চলিল ..তার বরাত ভালো! দশ মিনিট হাঁটিবার পর একটা ঘোড়ার গাড়ী মিলিল। গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইতেছে, আর কোচবাক্সে তার পাশে একটা লোক মুড়ি দিয়া বসিয়া... শশাঙ্ক কহিল—খালি গাড়ী রে?

গাড়ী থামাইয়া গাড়োয়ান কহিল—হাঁ বাবু!

শশাঙ্ক কহিল—ভাড়া যাবি?

গাড়োয়ান কহিল—যাবো...কোথায়?

শশাঙ্ক কহিল—মাঝের পাড়া।

গাড়োয়ান কহিল—এক টাকা লিবো বাবু...

শশাঙ্ক কহিল—তা লিস্...তবে একটু আগে একটি লোক পড়ে গেছে, তাকে তুলে নিয়ে যাবো...

গাড়োয়ান কহিল—আচ্ছা!

শশাঙ্ক গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ী চলিল; তারপর পথে গাড়ী থামাইয়া সে লোকটিকে পাঁজাকোলা করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলে গাড়ী আবার চলিতে লাগিল। গাড়ীতে লোকটি পরিচয় দিল; তার এক ছেলে, দুই মেয়ে...সে গিয়াছিল তার মেয়েকে

শ্বশুর-বাড়ী মেয়েকে দেখিতে ; ফিরিবার সময় পড়িয়া গিয়া পায়ে চোট্‌ লাগিয়াছে। ভাগ্যে শশাঙ্ক এ পথে আসিতেছিল...বড় রাস্তা ছাড়িয়া এগলি, ওগলি বাঁকিয়া গাড়ী একটা বহু কালের পুরানো জীর্ণ বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। আশে-পাশে জঙ্গল, খানা, ডোবা, জায়গাটা যেন বহুকাল জন-মানবের মুখ দেখে নাই—স্তব্ধ, নিঝুম !

গাড়ী থামিল। বাড়ীর দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ; নামিয়া টর্চ্চের সাহায্যে বাড়ীর কড়া ধরিয়া নাড়িতে কম্বল-মুড়ি একজন লোক আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তার হাতে একটা লণ্ঠন ; লণ্ঠনটার দু' দিকে কাচ আছে ; বাকী দু দিকে কাগজ আঁটা...

শশাঙ্ক কহিল—তোমাদের কর্ত্তা পড়ে গেছলেন, আমি এনেছি ঐ গাড়ী করে...

কম্বল-মুড়ি লোক ছুটিয়া গাড়ীর কাছে আসিল, কহিল—এই কাণ্ড ! আমরা ভাবলুম, আজ আর বুঝি তারা ছেড়ে দিলে না...তারপর শশাঙ্কর পানে চাহিয়া সে কহিল—আপনি দয়া করে যদি ধরে তুলে দেন...

শশাঙ্ক কহিল—সরুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। বলিয়া পাঁজাকোলা করিয়া বুড়াকে তুলিয়া লইয়া সে প্রশ্ন করিল—কোথায় নিয়ে যাবো ?

—এই যে, এই ঘরে ..বলিয়া কম্বল-মুড়ি লোক লণ্ঠন লইয়া চলিল। গাড়োয়ান হাঁকিল —ভাড়া, বাবু ..

শশাঙ্ক কহিল—পাঠিয়ে দিচ্ছি...তার চেয়ে তুই দাঁড়া না, আমায় বারুইপুরের ষ্টেশনে পৌঁছে দিবি...

গাড়োয়ান কহিল—না বাবু, ঘোড়া খুলতে হবে আমায়। সেই বেলা ছুটোয় জোতা হয়েছে—

শশাঙ্ক কহিল—তবে দাঁড়া, ভাড়া পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বুড়াকে লইয়া সেই জীর্ণ বাড়ীর একতলার ঘরে তক্তাপোষের উপর শশাঙ্ক তাকে শোয়াইয়া দিল। বুড়া কহিল—ভারী বেদনা...হাড় ভেঙ্গে গেছে বোধ হয়...

শশাঙ্ক তার পায়ে হাত বুলাইয়া কহিল—না, ভাঙ্গেনি তো...

বুড়া কাৎরাইয়া উঠিল,—উহু, উহু, ভারী বেদনা।

শশাঙ্ক কহিল—রেড়ির তেল নেই ঘরে? মালিস করে দাও। কম্বল-মুড়ি লোক কহিল,—একটু বসুন—আমি ডাক্তারবাবুর কাছে যাই একবার...

শশাঙ্ক কহিল—আবার বসবো? ট্রেণ পাবো না যে! কলকাতায় ফিরতে হবে।

কম্বল-মুড়ি লোকটি কহিল—যে উপকার করলেন! দয়া করে একটু বসুন...

শশাঙ্ক কহিল—আচ্ছা। তবে এই টাকাটা ঐ গাড়োয়ানকে দিয়ে দিন্ গে। আর ঘোড়ার গাড়ী পাবো না?

কম্বল-মুড়ি লোকটা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল—গাড়া আমি ডেকে আনবো'খন—বলিয়া সে গাড়োয়ানকে ভাড়া দিতে গেল। ভাড়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া শশাঙ্ককে কহিল—এত কষ্ট করলেন আপনি! আর একটু যদি দয়া করে...

শশাঙ্ক কহিল—কি করতে হবে, বলুন।

সে কহিল—বুড়ো মানুষকে ধরাধরি করে উপরের ঘরে যদি···আপনি আছেন বলে উনি এমন শান্ত হয়ে আছেন, না হলে...

শশাঙ্ক কহিল—বেশ, নিয়ে যাচ্ছি। কোন্ দিকে...?

সে কহিল—এই যে, এই দিকে। আমি আলো ধরি...আপনাকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছি।

শশাঙ্ক কহিল—তা হোক গে, তার জন্য বিনয় প্রকাশ করতে হবে না...এটুকু আমার গায়েও লাগছে না।

লোকটা কহিল—মহত্তের লক্ষণই এই...আপনি মহৎ ব্যক্তি...

শশাঙ্ক কহিল—চলুন, মশায়...বলিয়া সে বুড়াকে আবার তুলিয়া লইয়া লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়া চলিল।

ঘর পার হইয়া উঠান—উঠানে মাচা, মাচার উপরে লাউ গাছ—নীচে আরো নানা শাক-সবজীর গাছ। উঠান পার হইয়া ভাঙা সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দালান। দালানের ও কোণে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতলার দালান। দালানের পর ঘর। ঘরের মধ্যে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, এক ধারে একখানা তক্তাপোষ। তক্তাপোষের উপরে বিছানায় বুড়াকে শোয়াইয়া কম্বল-মুড়ি লোকটি কহিল—আপনি আসুন তাহলে.. মেয়েদের ডেকে বলে দি, পায়ে রেড়ির তেল মালিস করতে।

বলিয়া সে বাহিরে আসিল। শশাঙ্ক তার পিছনে। দালানে আসিবামাত্র ভিতর হইতে ঘরের দ্বার কে বন্ধ করিয়া দিল। ভিতরে দ্বারে হুড়কা পড়িল।

শশাঙ্ক সিঁড়ির কাছে আসিয়াছে, হঠাৎ পিছন হইতে সবলে কে তাকে টানিয়া ধরিল—কম্বল-মুড়ি লোকটা অমনি সিঁড়ির দ্বার ওদিক হইতে বন্ধ করিয়া দিল। শশাঙ্ক অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে, তার মুখে টর্চ্চের আলো পড়িয়াছে...সে তাড়াতাড়ি নিজের টর্চ্চ জ্বালিয়া চাহিয়া দেখে, সামনে দাঁড়াইয়া বিশ্বনাথ দত্ত, আর তার পিছনে সেই বাঁটুল! সে যেন আকাশ হইতে পড়িল! বিশ্বনাথ কহিল—নমস্কার শশাঙ্কবাবু, আপনি বড় চালাক ছেলে —ভারী সাহসী, জবরদস্ত মেজাজ...না?

শশাঙ্ক কহিল—এ-সবের মানে?

বিশ্বনাথ কহিল—আপনাকে বাড়ীর দলিল লি[illegible] দি[illegible] আমার পণ।

শশাঙ্ক কহিল—যদি না দি...?

বিশ্বনাথ কহিল—তাহলে আপনাকে এইখা[illegible]থতে রাজী?

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া শশাঙ্ক কহিল—না।

বিশ্বনাথ কহিল—উত্তম...বাঁটুল—

চকিতে বাঁটুল একটা কাছির যে[illegible] এত চকিতে যে শশাঙ্ক কোন বাধা দিবার অবসরও পাইল না[illegible] তার মুখে একটা রুমাল চাপিয়া ধরিল। কি ঝাঁজালো [illegible]বিয়া উঠিল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

[illegible] মুখোপাধ্যায়

বনের জন্তু ঘরে

জানোয়ার পোষা, পাখী পোষার সখ আমাদের অনেকেরই আছে। সেই সখের ফলে আমরা পুষি হরিণ, কুকুর, খরগোষ, বিড়াল, বেজী, ময়না, কাকাতুয়া, শ্যামা, টিয়া, ক্যানারি, এমনি কত পশু, কত পাখী।



[illegible]

এই জানোয়ার আর পাখী পোষার সখ মেটাতে হলে চাই মায়া মমতা পয়সা আর বাড়াতে প্রচুর জায়গা। এর একটার অভাবে এ সখ মেটানো সম্ভব হয় না।

এ সব জানোয়ার আর পাখী পোষার উপর আমাদের এক বিশিষ্ট বন্ধু বাঘ আর ভালুক পুষেছেন! আমাদের সে বন্ধুটি থাকেন বরানগরে, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ভবদেব মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন স্পোর্টস্‌ম্যান্‌। এককালে স্পোর্ট্‌সে যোগ দিতেন---দিয়ে প্রাইজও পেয়েছেন প্রচুর। তাঁর গৃহে জায়গাও প্রচুর এবং কুকুর, হরিণ, ময়ূর, ক্যানারি, খরগোষ, লালমাছ প্রভৃতি ছাড়া তিনি বাঘ আর ভালুকও পুষ্‌ছেন। সেই বাঘ ভালুকের কথাই একটু বলবো।

বাঘটি জাতে প্যান্থার; ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে তার জন্ম হয় ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে। অতি শিশু অবস্থায় এটিকে এক শিকারী ধরেন এবং ভবদেববাবুকে ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উপহার দেন। আমরা সেই সময় থেকেই বাঘটিকে দেখছি। একটি বিড়ালের মত বাঘটি তাঁর বাড়ীময় ঘুরে বেড়াতো, কত খেলা করতো। এখন তার বয়স হয়েছে প্রায় আড়াই বছর। এই আড়াই বছর বয়সে তার দেহ খুব পরিপুষ্ট নধর হয়ে উঠেছে, শক্তিও তেমনি প্রচণ্ড হয়েছে। লম্বে বাঘটি এখন সাত ফুট দশ ইঞ্চি—নাকের ডগা থেকে ল্যাজের ডগা অবধি। দেহের শক্তি এমন যে দেড়-টনী শিকলে তাকে বেঁধে রাখতে হয়। দেড়-টনী শিকল কথাটির অর্থ—যে শিকলে ৪০ মণ ভারী পদার্থের জোর সইতে পারে। এ থেকে বুঝে নাও, তার শক্তির বহর।



চুপ রহো।

পাঁচ ছ মাস আগে পর্য্যন্ত ভবদেববাবু মোটরে বেরুবার সময় বাঘটিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন,—বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যেতেন ওকে সঙ্গে নিয়ে। তার শিকল অবশ্য তিনি ধরে থাকতেন। নইলে রক্ষে ছিল কি! এখনো যত দুর্দ্দান্ত বদমায়েসী

সে করুক, ভবদেববাবুর সামনে পোষা কুকুরের মত তাঁর পায়ের কাছে পড়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে, আর এমন জুলজুল্ নিরীহ চোখে চায়, যেন বদমায়েসী তার জাতের কেউ কখনো জানেনি। সারাদিন বাঘটকে তিনি বাড়ীর কোথাও না কোথাও শিকলে বেঁধে রাখেন,—বাঘ নিজের মনে খেলা করে, গর্জ্জন করে, —সন্ধ্যা



কি মতলব হে

হলে আবার তাকে পিঁজরায় পোরা হয়। মাস খানেক পূর্ব্বে বাঘ একবার শিকল ছিঁড়ে লাফ দিয়ে ভবদেববাবুর পোষা এক হরিণকে আক্রমণ করে, কিন্তু তাঁর লোকজন তাকে ধরে হরিণকে বাঘের গ্রাস থেকে বাঁচায়। হরিণটা বাঘের খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছিল, কিন্তু সে ঘা লাইশল্ দিয়ে 'ড্রেশ' করেন ভবদেববাবু স্বহস্তে। হরিণটি শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে।

এই বাঘটি কি খায়, জানো? রোজ দেড় সের খাঁটি দুধ, আর তিন সের করে খাসির কাঁচা মাংস। সপ্তাহে দু'দিন বাঘ-মশায় নারিকেল তৈল মেখে স্নান করেন। মাসে একবার করে তার নখ কেটে দেওয়া হয়। অনেক সাহেব মেম পোষা বাঘ দেখে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাবার জন্য ভবদেববাবুর বাড়ী গিয়ে

বহু চেষ্টা করে ছিলেন, কিন্তু বাঘ তাদের সব মতলব পছন্দ না করে লম্ফঝম্ফ করে এমন গর্জ্জন তুলতো যে সাহেবমেমরা ফটো তোলার বড় সুবিধা করতে পারেন নি। সম্প্রতি ভবদেববাবু ফটো তুলিয়েছেন—নিজে বাঘের সঙ্গে থেকে—তাতে বাঘ-মশায় তত আপত্তি তুলতে পারেন নি—তাঁর কাছে কুকুরটির মতই নিরাহ হয়ে থাকে। অবশ্য এটা বাঘবংশের কোষ্ঠীর বিপরীত সন্দেহ নেই।



বাহবা ভালুক!

তাঁর ভাল্লুকটি বেশ নিরীহ —আর ভারী মিশুক। সেটির বয়স মোটে ৭ সাত মাস। কালিম্পং থেকে ভবদেববাবুর এক বন্ধু এটিকে এনে তাঁকে আজ ছ'মাস হলো উপহার দেয়েছে। ইনি খান্ দিনে তিনবার। সকালে একসের খাঁটি দুধ, আর কয়খানি ডগ' বিস্কুট; দুপুরে ভাত আর একসের খাঁটী দুধ, রাত্রে গুটীকতক পাকা কলা আর একসের খাঁটী দুধ। এটি লম্বে এখন চারফুট দু'ইঞ্চি। ভাল্লুকটি বেশ খেলা করে বেড়ায়, গাছে চড়ে। তৃষ্ণা পেলে খাড়া দাঁড়িয়ে কলের টাপ খুলে জলখাবার চেষ্টাও করে। ভাল্লুক হলে হবে কি, দুষ্ট ছেলেদের মত ফন্দী ফিকির তার মাথায় খেলে প্রচুর।

এই বাঘ ভাল্লুক দেখবার জন্য প্রায়ই ভবদেববাবুর বাড়ী অনেক সাহেব-মেম

ভিড় করে আসেন —বাঙালী, মাড়োয়ারী দর্শকেরও অভাব ঘটে না। তোমরা যদি কেউ দেখতে যেতে চাও, আমাদের চিঠি লিখো —আমরা দেখার বন্দোবস্ত করে দেবো। দেখে খুসী হবে—চিড়িয়াখানায় বাঘ-ভাল্লুক নিত্য খেতে পায় না, তাদের মধ্যে প্রাণের সাড়া পাই না, যেমন পাই এই দুটী বাঘ-ভাল্লুকে।

বাপ্পা রাও

(ঐতিহাসিক গল্প)

বহুকাল পূর্ব্বে, বর্ত্তমান ভাওনগরের পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে খুব বড় একটি নগর ছিল—বল্লভীপুর। এখনও বল্লভীপুরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তি আছে, পারদ নামক অসভ্য জাতি বল্লভীপুর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল।

সেই সময়ে বল্লভীপুরের রাজা ছিলেন শিলাদিত্য। তিনিই বল্লভীপুরের শেষ রাজা। শিলাদিত্যের জীবনের ঘটনা অতি চমৎকার।

গুর্জ্জর রাজ্যে একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল দেবাদিত্য। দেবাদিত্যের সুভগা নামে একটি কন্যা ছিল। সুভগা ছিল বড়ই দুর্ভাগা। তাহার বিবাহের কিছুকাল পরেই তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। সুভগা তাঁহার গুরুর নিকট হইতে সূর্য্য-দেবের বীজমন্ত্র শিখিয়াছিলেন।

একদিন অন্যমনস্ক ভাবে সুভগা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, সূর্য্যদেব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর ন্যায়, সূর্য্যের বরে তাঁহার যমজ পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। গর্ভাবস্থায় তাহার পিতা তাঁহাকে বল্লভীপুরে পাঠাইয়াছিলেন—সেখানেই তাঁহার পুত্রকন্যার জন্ম হয়।

ক্রমে পুত্র বড় হইলে, তাহাকে পাঠশালায় দেওয়া হইল। পাঠশালার বালকেরা ঠাট্টা করিয়া তাহাকে "গয়বী" বলিয়া ডাকিত। গয়বী অর্থাৎ গুপ্ত; বালকের জন্ম

গোপনে হইয়াছিল বলিয়া সহপাঠী বালকেরা তাহাকে গয়বী নাম দিয়. মধ্যে তাহারা তাহাকে পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে গয়বী মাথা নীচু করিয়া থাকিত। মনের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে জননীকে বলিত—"মা, আমার পিতার নাম কি বল, আমি আর এ অপমান সহ্য করিতে পারি না।" সুভগা এ কথার কোন উত্তর দিতেন না। এইভাবে কিছুকাল কাটিল। ক্রমে গয়বী বেশ বড় হইয়া উঠিল। একদিন পাঠশালার অত্যাচারে অস্থির হইয়া, গয়বী বাড়ীতে আসিয়া কর্কশ স্বরে মাকে বলিল—"আজ যদি তুমি আমাকে পিতার নাম না বল, তবে তোমাকে মারিয়াই ফেলিব।"

এই সময়ে সূর্য্যদেব হঠাৎ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন এবং তাহার হাতে একখণ্ড শিলা (পাথর) দিয়া বলিলেন—"এই শিলাখণ্ড দ্বারা তুমি যাহাকে স্পর্শ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন।

এই শিলাখণ্ড দিয়া গয়বী ক্রমে তাহার বিদ্রূপকারী সহপাঠীদিগকে হত্যা করিল। রাজা এই সংবাদ জানিতে পাইয়া, গয়বীকে ডাকিয়া শিলাখণ্ড ফেলিয়া দিতে বলিলেন। গয়বী তখন হঠাৎ সেই শিলাখণ্ড দিয়া রাজাকে স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহার মৃত্যু হইল! রাজার মৃত্যুর পর গয়বী তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না -- তখন "শিলাদিত্য" নাম লইয়া গয়বী রাজা হইল। সেই সময়ে বল্লভীপুরে একটী প্রসিদ্ধ সূর্য্যকুণ্ড ছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শিলাদিত্য সেই কুণ্ডে গিয়া, সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। সূর্য্যের কৃপায় সেই কুণ্ড হইতে একটি এক-ঘোড়ার রথ উঠিত, সেই ঘোড়ার সাতটা মাথা ছিল। সেই রথে চড়িয়া শিলাদিত্য যুদ্ধে যাইতেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধে জয়লাভ করিতেন!

পারদগণ যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করিল, তখন এক বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, সূর্য্যকুণ্ডে গরুর রক্ত ফেলিয়া তাহা অপবিত্র করিয়া দেয়। সুতরাং, সে যাত্রা শিলাদিত্যের পূজায় রথ আর উঠিল না; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

শিলাদিত্যের সকল রাণীই তাঁহার সঙ্গে চিতায় পুড়িয়া মরিলেন, বাকি রহিলেন

শুধু রাণী পুষ্পবতী। পুষ্পবতী ছিলেন প্রথার রাজকন্যা, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন, গর্ভবতী অবস্থায়। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া পুষ্প-বতী পাগলের মত হইয়া গেলেন। তিনি আর পিতৃগৃহে থাকিলেন না, মালিয়া পর্ব্বতের এক গুহায় আশ্রয় লইলেন। এই গুহার মধ্যেই একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল।

মালিয়া পর্ব্বতের নিকটেই, এক ক্ষুদ্র গ্রামে, একজন ব্রাহ্মণী বাস করিতেন— তাঁহার নাম কমলাবতী। রাণী পুষ্পবতী এই ব্রাহ্মণীর হস্তে তাঁহার পুত্রটিকে সঁপিয়া দিয়া চিতারোহণ করিলেন। চিতায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীর পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিলেন—"দেবি! পুত্রটিকে আপনি নিজের সন্তানের মত পালন করিবেন। ব্রাহ্মণ কুমারের মত শিক্ষা দিয়া, ঠিক সময় ইহার বিবাহ দিবেন ক্ষত্রিয় কন্যার সঙ্গে।"

কমলাবতীর যত্নে শিশু দিন দিন বড় হইতে লাগল। গুহায় জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, কমলাবতী শিশুর নাম রাখিলেন 'গুহ'। কিন্তু কমলাবতী সুখী হইতে পারিলেন না। গুহ দিন দিন অবাধ্য এবং অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। লেখাপড়ায় মন নাই, বালকদিগের সঙ্গে সর্ব্বদা খেলা করিয়া বেড়ায়। পাখীর ছানা পাড়িয়া নির্দ্দয় ভাবে বধ করে। কখন বা বনে শিকার করিতে যায়। বাস্তবিক গুহকে লইয়া কমলাবতী অস্থির হইয়া পড়িলেন।

মিবারের দক্ষিণে, পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ইদর নামে একটী নগর আছে। সেই নগরের রাজা একজন ভীল—তাহার নাম মাণ্ডলিক। গুহ ভীল বালকের সঙ্গে মিলিয়া, সারা-দিন বনে বনেই কাটাইত। ক্রমে ভীল বালকেরা তাহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া উঠিল।

গুহ একদিন ভীল বালকগণের সঙ্গে খেলা করিতেছে, এমন সময় বালকেরা বলিল —"আমাদের মধ্যে একজন রাজা হউক।" তখন সকলে একমত হইয়া গুহকেই রাজা করিবে স্থির করিল। একজন ভীল বালক নিজের আঙ্গুল কাটিয়া, সেই রক্ত দ্বারা গুহের কপালে রাজতিলক দিল। বৃদ্ধ মাণ্ডলিক এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, গুহকেই তাঁহার সিংহাসনে বসাইলেন। ইহার পর গুহ একটি অতিশয় জঘন্য কাজ করিলেন। এই পিতৃতুল্য পরম উপকারী বৃদ্ধ মাণ্ডলিককেই হত্যা করিলেন। কেন

যে গুহ এরূপ অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারা যায় না। গুহের বংশধরেরা "গোহিলেট" বা "গিহ্লোট" নামে বিখ্যাত।

গুহের পর সেই বংশের আট পুরুষ পর্য্যন্ত ইদর প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অষ্টম পুরুষের পর, স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলেরা আর পরাধীনতা সহ্য করিতে পারিল না। অষ্টম পুরুষের রাজা নাগাদিত্য একদিন বনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন, ভীলেরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া নিজেদের পৈতৃক রাজ্য পুনরায় হস্তগত করিল।

নাগাদিত্যের মৃত্যুর পর রাজপুতরা মহা ভাবনায় পড়িলেন। উন্মত্ত ভীলগণের হস্ত হইতে রাজপুত মহিলাগণকে কে রক্ষা করিবে? নাগাদিত্যের তিন বৎসর বয়সের একটি পুত্র ছিল—তাহার নাম বাপ্পা—ইহার জন্যই সকলের চাইতে ভাবনা। সেই ব্রাহ্মণী কমলাবতী যিনি গুহকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরেরাই বাপ্পাকে রক্ষা করিলেন। তাঁহারা ছিলেন গিহ্লাট রাজপরিবারের কুলপুরোহিত।

নাগাদিত্যের শিশুপুত্র বাপ্পাকে লইয়া তাঁহারা ভাণ্ডীর দুর্গে চলিয়া গেলেন; সেখানে যদুবংশের একজন ভীল তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিল। কিন্তু সেখানেও সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে না করায়, ব্রাহ্মণেরা বাপ্পাকে লইয়া পরস্পর অরণ্যে চলিয়া গেলেন। সেই খানেই ত্রিকূট পর্ব্বত, নিম্নে ছিল নগেন্দ্র-নগর। নগেন্দ্র-নগরের ব্রাহ্মণেরা শঙ্করের উপাসক ছিলেন। বাপ্পাকে সেই ব্রাহ্মণগণের আশ্রয়ে রাখা হইল।

বাপ্পার তখন ছয় বৎসর বয়স, সে ব্রাহ্মণদিগের গরু চরাইত। সূর্য্য বংশের রাজকুমার বনে গরু চরাইতেছে, সে কথা কে জানিত? ভবিষ্যতে বাপ্পা কি হইবেন তাহাই বা কে ভাবিত? এইরূপে কিছুকাল কাটিল।

ঝুলন পূর্ণিমা রাজপুতদিগের একটি প্রসিদ্ধ আনন্দের উৎসব। নগেন্দ্র-নগরে শোলাঙ্কি বংশের এক রাজা ছিলেন। ঝুলন পূর্ণিমা উপস্থিত হইলে, সেই রাজার কন্যা সখীদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য কুঞ্জবনে গিয়াছিলেন। রাজকুমারীর দোল খাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু ঝুলনের দড়ি কোথায়?

দড়ির চিন্তায় তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় বাপ্পা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র রাজকুমারী বলিলেন—"তুমি এক গাছা দড়ি আনিয়া

দাও, আমরা দোল খাইব।" বাপ্পা ছিলেন আমোদপ্রিয় এবং একটু চঞ্চল স্বভাব। তিনি বলিলেন—"তোমরা যদি আমাকে বিবাহ কর, তবে দড়ি আনিয়া দিব।" বালিকাগণ তাহাতেই সম্মত হইল।

সেই মুহূর্ত্তে রাজকুমারীর ওড়নার সঙ্গে বাপ্পার কাপড়ের কোনা বাঁধিয়া দিয়া, সখীরা তাহাদিগকে লইয়া একটা আমগাছের চারিদিকে ঘুরিল; কি হইল বাপ্পা কিছুই খেয়াল করিল না, পরে কি হইবে তিনি ভাবিয়াও দেখিলেন না। এই ঘটনার পর আমোদ প্রমোদ করিয়া, রাজকুমারী সখীদিগের সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ক্রমে রাজকুমারীর বিবাহের বয়স হইলে, তাঁহার পিতা উপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন। পাত্র পক্ষ হইতে একজন জ্যোতিষী আসিলেন রাজকুমারীর হাত পরীক্ষা করিবার জন্য; রাজাজ্ঞায় কন্যাকে জ্যোতিষীর নিকট আনা হইল। কন্যার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া গণক মুগ্ধ হইলেন। তারপর রাজকুমারীর হাত দেখিয়া মহা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এ কি! রাজকন্যার যে ইতি পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে!"

রাজা মহা বিস্মিত হইলেন, পুরী শুদ্ধ সমস্ত লোক বিস্মিত হইল। কোথায় কাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, কন্যা তাহার কিছুই বলিতে পারিল না। অনুসন্ধানের জন্য রাজা চারিদিকে গুপ্তচর পাঠাইলেন।

বাপ্পাও এই কথা জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিয়াই তিনি সতর্ক হইলেন। তাঁহার সহিত যে সকল বালকেরা খেলা করিত, তাহারা তাঁহার বড়ই ভক্ত ছিল। তিনি তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন—তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা তাহারা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না! এবং তাঁহার নামে যাহা শুনিবে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বলিবে। সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। শোলাঙ্কি-রাজ বিশেষ প্রমাণ পাইলেন—তাঁহার কন্যার খেলার বিবাহ বাপ্পার সঙ্গেই হইয়াছে।

রাখাল বালকেরা এই কথা জানিতে পারিয়া বাপ্পাকে বলিল। বাপ্পা সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। বেশী দূরে গেলেন না, সেই পর্ব্বতেই অতিশয় নির্জ্জন একটি স্থানে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার খুব ভক্ত এবং বিশ্বাসী ভীল বালক রহিল—তাহাদিগের নাম ছিল "বালীয়" এবং "দেব।" উহারা বন্য

ভীল হইলেও তাহাদের মন ছিল পবিত্র। ইহাদিগের সঙ্গী না পাইলে, বাপ্পার দুর্গতির সীমা থাকিত না, এমন কি তাঁহার নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইত। বাপ্পার পরবর্ত্তী বংশ-ধরেরা আজ পর্য্যন্ত অভিষেকের সময়, সেই ভীলদিগের পুত্র পৌত্রাদির দেওয়া রক্ত-তিলক অতি আদরের সহিত ধারণ করেন।

বাপ্পা বনে বনে ব্রাহ্মণদিগের গরু চরাইতেন। সেই গরুর মধ্যে একটি দুগ্ধবতী গাভী ছিল। সন্ধ্যার সময় সেই গাভী আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে দেখা যাইত, তাহার স্তনে বিন্দুমাত্রও দুধ নাই! ব্রাহ্মণেরা সন্দেহ করিলেন—বাপ্পাই গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া ফেলে। তাঁহারা বাপ্পার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। বাপ্পাও তাহা বুঝিতে পারিলেন কিন্তু কি করিবেন? সন্দেহ দূর করিবার উপায় বাহির না করা পর্য্যন্ত তাঁহাকে চুপ করিয়াই থাকিতে হইবে।



শিবলিঙ্গের উপর দুধের ধারা পড়িতেছে

সেই দিন হইতে বাপ্পা গোপনে গাভীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। গাভী একদিন একটা নির্জ্জন পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ করিল, বাপ্পাও গোপনে তাহার পশ্চাৎ গেলেন। গিয়া দেখিলেন, অতি অদ্ভুত দৃশ্য!—গাভী একটা লতা গুল্মের মাথায় বৃষ্টি ধারার মত দুগ্ধ বর্ষণ করিতেছে! বাপ্পা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। লতার ঝোঁপে গিয়া দেখিলেন—সেখানে একটি শিবলিঙ্গ—এই শিবলিঙ্গের উপরে দুধের ধারা পড়িতেছে। আরো দেখিলেন সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে, বেত বনে এক যোগী চক্ষু মুদিয়া ধ্যানে বসিয়া

আছেন। বাপ্পা নিকটে যাইবা মাত্র, যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল। অসময় ধ্যানভঙ্গ হইবার দরুণ যোগী ক্রুদ্ধ হইলেন না। বাপ্পা ক্ষণকাল যোগীর করযোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কথিত আছে—সেই যোগী ছিলেন "হারীত।"

বাপ্পা হারীতের পায়ে প্রণাম করিলেন। হারীত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বাপ্পা যতটুকু জানিতেন তাহাই তিনি যোগীকে বলিলেন। সন্ধ্যার সময় বাপ্পা গরু লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন হইতে বাপ্পা প্রতিদিন যোগীর নিকট যাইতেন। যোগীর পা ধুইয়া দিয়া, তাঁহাকে পান করিবার জন্য দুগ্ধ দিতেন। যোগী ছিলেন মহাদেবের উপাসক, বাপ্পা তাঁহার পূজার ফুল আনিয়া দিতেন। বাপ্পার ভক্তি দেখিয়া হারীত খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

ক্রমে বাপ্পার প্রতি যোগীবর হারীত এতদূর প্রসন্ন হইলেন, যে, তাঁহার শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নিজের হাতে তাঁহার গলায় পৈতা পরাইয়া দিলেন। সেই হইতে বাপ্পার উপাধি হইল—"একলিঙ্গকা দেওয়ান।"

বাপ্পার ভক্তি দেখিয়া ভগবতী পার্ব্বতীও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। একদিন তিনি বাপ্পাকে দর্শন দিয়া, তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মার তৈরি শূল, খড়গ, ধনু, তূণ প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র সকল দিলেন। ইহার বলে এবং মহাদেবের কৃপায় বাপ্পা শত্রুকুলের অজেয় হইলেন।

ক্রমে যোগীবর হারীতের মহাপ্রস্থানের (স্বর্গে যাইবার) সময় উপস্থিত হইল। যেদিন তিনি চলিয়া যাইবেন, সেই দিন উষাকালে বাপ্পাকে তাঁহার নিকট আসিতে বলিয়াছিলেন। ঘুম ভাঙ্গিতে দেরি হওয়ায়, বাপ্পা ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পরে বাপ্পা আসিয়া দেখিলেন—যোগীবর হারীত দেবরথে চড়িয়া শূন্যে কিছু দূর পর্য্যন্ত উঠিয়াছেন। প্রিয় শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য হারীত রথ থামাইলেন এবং বাপ্পাকে তাঁহার নিকটে আসিতে বলিলেন।

হঠাৎ বাপ্পার দেহ কুড়ি হাত উঁচু হইয়া গেল। তাহাতেও তিনি গুরুর নিকট পৌঁছিতে পারিলেন না। গুরু তাঁহাকে মুখব্যাদন করিতে বলিলেন। বাপ্পা মুখ খুলিলে, গুরু তাঁহার মুখে থুথু ফেলিলেন। ঘৃণা করিয়া বাপ্পা হঠাৎ মুখ নীচু করিয়া ফেলাতে, গুরুর থুথু তাঁহার পায়ে পড়িল। বাপ্পা যদি ঘৃণা না করিয়া থুথু মুখে

লইতেন—তাহা হইলে নাকি তিনি অমর হইতেন। যাহা হউক, অমর হইতে না পারিলেও, গুরু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"বৎস! তোমার শরীর কোন অস্ত্র ভেদ করিতে পারিবে না।"

বাপ্পা গুরুর নিকটে বর পাইয়া তখন হইতে সাধনায় মন দিলেন। একদিন তিনি মায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন, যে তিনি চিতোর রাজের ভাগিনেয়। তখন হইতে তিনি অরণ্যবাস ছাড়িয়া লোকালয়ে দর্শন দিলেন। আসিবার সময় পথে প্রসিদ্ধ সাধু গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার দেখা হয়। সেই সিদ্ধপুরুষ তাঁহাকে একখানা তলোয়ার দিয়াছিলেন, তাহার দুই দিকেই ধার ছিল। সেই তলোয়ার দিয়া পাথরও কাটিয়া যাইত। তলোয়ারটি নাকি এখন পর্য্যন্ত উদয়পুরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে মানসিংহ ছিলেন চিতোরের রাজা—ইনিই ছিলেন বাপ্পার মাতুল। তিনি বাপ্পার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার অধীন সামন্তগণের দলপতি করিয়া দিলেন। তখন হইতে রাজা মান বাপ্পাকে খুব ভালবাসিতে লাগিলেন, বাপ্পাই যুদ্ধ বিভাগে সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন। ইহাতে সামন্তগণের মনে দারুণ হিংসা হইল—তাঁহারা বাপ্পার অনিষ্ট করিবার সুযোগ সন্ধান করিতে লাগিলেন।

এই সময় একজন মহাবলবান্ বিদেশী শত্রু আসিয়া চিতোর আক্রমণ করে। রাজা মানসিংহ সামন্তদিগকে ডাকিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। সামন্তগণ বলিলেন—"মহারাজ! আমাদিগকে কেন? আমরা ত অকর্ম্মণ্য। আপনার প্রিয় সেনাপতি বাপ্পাকে যুদ্ধ করিতে বলুন।"

সামন্তগণের ব্যবহারে মানসিংহ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু বাপ্পা তাঁহাদিগের গর্ব্বিত ব্যবহার গ্রাহ্যও করিলেন না—নিজেই সুদৃঢ় বর্ম্ম পরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। তখন সামন্তগণ সজ্জিত সেনাপতির সঙ্গে না গিয়া আর কি করেন?

বাপ্পার অমানুষিক বীরত্বের নিকট শত্রুদল পরাজিত হইল। সামন্তগণ বাপ্পার বীরত্ব দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইলেন—লজ্জিতও হইলেন তেমনই।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাপ্পা চিতোরে ফিরিয়া গেলেন না, তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের রাজধানী গজনী নগরে গেলেন। তখন যিনি গজনীর রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল

সেলিম্। বাপ্পা সেলিমকে পরাজিত করিয়া, সূর্য্যবংশের একজন সামন্তকে সেই সিংহাসনে বসাইলেন। তারপর তিনি ফিরিয়া আসিলেন চিতোরে। কথিত আছে, যে, সেলিমকে পরাজিত করিয়া, বাপ্পা তাঁহারই এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

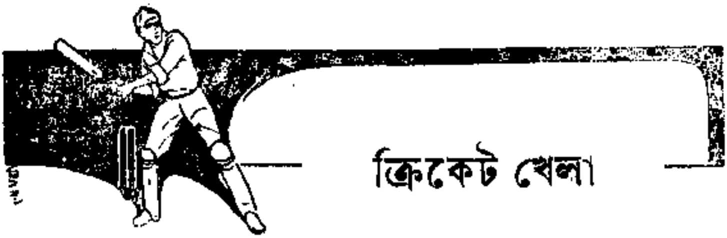
বাপ্পার বীরত্বে হিংসা করিয়া, চিতোরের পুরাতন সর্দ্দারগণ চিতোর ছড়িয়া অন্য স্থানে চলিয়া গেলেন। রাজা মান্ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেকবার দূত পাঠাইয়াছিলেন। একজন দূতকে নাকি তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"আমরা মানসিংহের নূন খাইয়াছি—এক বৎসর নিমকহারামি করিব না।"

তখন হইতে সর্দ্দারগণ দিবারাত্রি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি করিয়া চিতোরের গৌরব নষ্ট করিবেন। অবশেষে বাপ্পার গুণে এবং বলবীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকেই তাঁহারা দলপতি করিবেন বলিয়া স্থির করিবেন।

রাজ্যের লোভ কি ভয়ানক! ইহাতে মানুষের মনে ন্যায় অন্যায়ের বিবেচনা থাকে না। সর্দ্দারগণ রাজ্যের লোভে প্রতিহিংসার বশ হন নাই, তাঁহাদের উদ্দেশ্য চিতোর-রাজকে জব্দ করা। কিন্তু বাপ্পা এই রাজ্যেই লোভেই সর্দ্দারগণের দলপতি হইতে সম্মত হইলেন। অবশেষে সর্দ্দারগণের সাহায্যে পরম হিতৈষী মাতুলকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, নিজে চিতোরের রাজা হইলেন! শেষ বয়সে বাপ্পা নিজের মাতৃভূমি, আত্মীয় স্বজন সমস্ত ছাড়িয়া, খোরাসান রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। খোরাসান জয় করিয়া, তিনি অনেকগুলি ম্লেচ্ছ রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এক শত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার শব লইয়া, তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান সন্তানগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দু পুত্রেরা তাঁহার শরীর পোড়াইতে এবং মুসলমান পুত্রগণ তাহা কবর দিতে ইচ্ছা করে। ইহা লইয়া ছোট খাট যুদ্ধও হইয়াছিল। কিন্তু কিছুই মিমাংসা হয় নাই। এই বিবাদের সময় একদিন পুত্রেরা পিতার শরীরের আবরণ খুলিয়া দেখিল—শব দেহের পরিবর্ত্তে কতগুলি সাদা পদ্ম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে! সেই সকল পদ্ম নাকি মৃণালের সহিত তুলিয়া নিয়া, মানস সরোবরে পুঁতিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়



ক্রিকেট খেলা

ক্রিকেট খেলার কথা গেল বারে আমরা কিছু লিখেছিলাম। তোমরা অনেকেই লিখেছ যে যেন মৌচাকে প্রতি মাসে যেন খেলাধূলার কথা কিছু কিছু থাকে। আমরা তোমাদের কথা পালন কোরতে চেষ্টা কোরবো।

এবারে কলিকাতায় তিনটী বিদেশী দল ক্রিকেট খেলতে এসেছিল। মান্দ্রাজ, রাওলপিণ্ডি ও এলাহাবাদ। এ সব দলের খেলা আমরা কিছু কিছু দেখেছি। এই তিন দলের সঙ্গে খেলাতে বাঙ্গালীদলের প্রায় সব স্থানেই পরাজয় হয়েছে। কেবল-মাত্র দুই তিনটী খেলায় তাদের জয়লাভ হয়েছে। যাহোক তাতে কোন ক্ষতি নাই। বিদেশীদের সঙ্গে এই রকম খেলাতে আমাদের নানা রকম উন্নতি হয়। খেলোয়াড়দের সাহস বাড়ে—খেলা দেখে নিজেদের খেলার উন্নতি হয় ও খেলার উৎসাহ বাড়ে। সেই জন্যে আমরা এই সব খেলার পক্ষপাতী।

এ বৎসরের খেলা দেখে আমরা দুই জন বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের নাম কোরবো।



শ্রীগনেশ বসু



শ্রীকার্ত্তিক বসু

এঁরা দুই ভাই। শ্রীগনেশ বসু ও শ্রীকার্ত্তিক বসু। এঁরা বিখ্যাত পারফিউমার স্বর্গীয় এইচ বসুর ছেলে। বসু পরিবারে ক্রিকেট খেলার খুব অভ্যাস আছে। তাঁরা সব ভাই বেশ ক্রিকেট খেলতে পারেন। বড় ভাই শ্রীহিতেন্দ্র বসুও বেশ খেলতে পারেন। অনেকের মতে গণেশ ও কার্ত্তিক দুই ভাই বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ

খেলোয়াড়। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার কে বেশী ভাল খেলে সে ঠিক করা ভারী মুস্কিল। এঁদের বয়স খুব কম। এর মধ্যেই যে রকম খেলা দেখাচ্ছেন তাতে বেশ আশা হয় যে কালে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে তাঁরা শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হয়ে দাঁড়াবেন। দুই ভাইএর খেলাতে বেশ সাধনা আছে। বড় খেলোয়াড় হবার সমস্ত গুণ এঁরা পেয়েছেন। আশা করি দুজনে খেলার উন্নতি লাভ কোরে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল কোরবেন।

চিঠির খবর

আরামে ঘরে বসে যখন তোমরা বন্ধুবান্ধব কিম্বা আত্মীয়দের কাছ থেকে চিঠি পাও, তখন তোমরা একবারও ভেবে দেখনা যে এই চিঠি আসতে কত রকম জিনিষের সাহায্য নিতে হয়েছে এবং কত রকম উপায় অবলম্বন কোরতে হয়েছে। সেই সব কথা ভাল করে ভেবে দেখলে বড়ই আশ্চর্য্য হতে হয়। বাস্তবিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে মানুষের যতগুলো সুবিধা হয়েছে তার মধ্যে পোষ্ট অফিসের সুবিধাই সব চেয়ে বেশী।

মনে কর তুমি কলকাতায় বসে মান্দ্রাজের কোন পাড়া গাঁয়ে তোমার আত্মীয়কে চিঠি লেখেছ। চিঠিখানা বস্তা বন্দী হয়ে মোটর কার করে এসে হাওড়া ষ্টেসনে মান্দ্রাজ মেলের mail vanএ চড়ল। ট্রেনের মধ্যে ছোট খাট পোষ্ট আপিস। সেই-খানে চিঠি বাছাই চলেছে। কলকাতা থেকে মান্দ্রাজ যেতে অনেক গাড়ী ষ্টেসনে গাড়ী থামে না। কিন্তু সেই সব জায়গায় চিঠি দিতে হবে। ট্রেনে সেই সব স্থানের চিঠি আলাদা আলাদা ভাবে বস্তা বাঁধা হয়ে আছে। কিন্তু গাড়ী থামে না, তবে কি ভাবে চিঠির বস্তা দেওয়া যায়?

ষ্টেসনের আগে কিম্বা একটু পরে একটা থাম খাড়া করা আছে, সেই থামের সঙ্গে একটা বড় জাল (pouch) আছে। ট্রেনেও অন্য রকমের যন্ত্র আছে। চল্‌তি গাড়ী এই স্থানে আসা মাত্র কলের সাহায্যে গাড়ী থেকে চিঠির ব্যাগটা সেই জালে ফেলে



ট্রেণে পোষ্ট আপিস

দেওয়া হয়। তারপর পোষ্টম্যান এসে ব্যাগ নিয়ে যায়। এর পর তোমার চিঠি মান্দ্রাজে নেমে যে স্থানে যাবে সেখানকার গাড়ীতে চড়্‌ল। পর দিন সেই ষ্টেসনে তোমার চিঠি পৌঁছল। কিন্তু সেখান থেকে অনেক দূরে তোমার আত্মীয় থাকেন। তাই যে ব্যাগে তোমার চিঠি আছে, সেই ব্যাগটা এক ডাক হরকরার ঘাড়ে চাপল। ব্যাগটা একটা প্রকাণ্ড লম্বা বল্লমের সঙ্গে বেঁধে হরকরা কাঁধের উপর ফেলে চলল। বল্লমের আগা সরু ভাবে লোহা দিয়ে বাঁধান, ঠিক বন্দুকের কিরিচের মত। তার

সঙ্গে কয়েকটা ঘণ্টা বাঁধা। ঘণ্টার আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সে চলেছে। রাত হয়েছে —সে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে একা। তার এক হাতে মশাল জ্বালা। মশালের



ট্রেণ থেকে ডাকের চিঠির বস্তা ফেলে দেওয়া হচ্ছে।



এরোপ্লেনে ডাক চড়ছে

আলো দেখে আর ঘণ্টার শব্দ শুনে বনের জন্তু যারা তার কাছাকাছি ছিল সব সরে পড়ছে ভয়ে। লাঠির সঙ্গে যে কিরিচ বাঁধা আছে দরকার পড়লে তাই দিয়ে জন্তু

কিম্বা চোর ডাকাত সে আক্রমণ করবে। তারপর কত নদী পেরিয়ে কত রাস্তা পার হয়ে পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট ষ্টেসনে ব্যাগ এল। সেই ব্যাগ খুলে পোস্টম্যান তোমার আত্মীয়কে চিঠি দিল।

জাহাজের মধ্যেও ছোট ছোট পোষ্ট আপিস আছে। জাহাজের যাত্রীদের চিঠি সেখানে বিলি হয় এবং যাত্রীরা চিঠি ডাকে দিতে পারে। এরোপ্লেন যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে পোষ্ট আপিসের খুব সুবিধা হয়েছে। ইউরোপের অনেক দেশে এরোপ্লেনে চিঠি বিলি হয়। ভারতবর্ষ ও বিলেতের মধ্যে কয়েক বৎসরের মধ্যে এরোপ্লেনে চিঠি বিলি করা হবে। বাস্তবিক পোস্ট-আপিস আমাদের যেমন উপকারী তেমন আর কোন জিনিষ নয়।

খুব ছোট ছেলেমেয়েদের গল্প

পাখীর দুষ্টুমী

[অনেকে আমাদের লেখেন, খুব ছোটদের জন্তে লেখা মৌচাকে থাকে না। এবারে একটা গল্প দিলাম, ছয় বছর থেকে নয় দশ বছর ছোটদের জন্তে; এ রকম লেখা এখন থেকে মধ্যে মধ্যে থাকবে।]

ছবির বয়স মাত্র ছয় বৎসর। রোজ সকালে উঠে যখন জানলার ধারে বসে রুটি ও দুধ খায় তখন একটা সুন্দর শালিখ পাখী জানলার কাছে এসে বসে। ছবি রোজ তার রুটি থেকে কয়েকটা টুকরো পাখীর দিকে ফেলে দেয়। পাখী সেইগুলো খায় আর যাবার সময় ঠোঁট দুটো নেড়ে মিষ্টি সুরে ডেকে ছবিকে ধন্যবাদ দিয়ে যায়।

শেষ কালে ছবির সঙ্গে পাখীর এমন ভাব হোল যে শালিখ তার হাতের উপর বসে খাবার খেত এবং খাওয়া শেষ হলে উড়ে যেত।

একদিন সকালে ছবি বাগানে খেলা করছে। এমন সময় দেখে পাখীটা এক টুকরো ছোট কাগজ ঠোঁটে করে আনছে। কাগজটা এনেই সে ছবির পায়ের কাছে ফেলে দিল।

ছবি কাগজটা হাতে করে আশ্চর্য্য হোয়ে দেখে একখানা দশ টাকা দামের নোট। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কোরলে, "তুমি এ কোথা থেকে পেলে।"

পাখী হেসে হেসে ঠোঁট নেড়ে মিষ্টি সুরে বললে, "রোজ সকালের খাবারের দাম"—এই বলেই সে উড়ে চলে গেল।

একটু পরে বাড়ীর দরজার কাছে অনেকগুলো লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটা পুলিশ, পাড়ার হরি-গোয়ালা ও যত ছোট ছোট ছেলে এসে হাজির।

হরি বললে, "দশটা টাকার নোট মাটির উপর রেখে দুধ ওজন করছি, এমন সময় একটা পাখী নোটটা ঠোঁটে করে নিয়ে দে ছুট্। পাখীটা তোমাদের বাগানের দিকে উড়ে এলো; নোটটা ওর কাছ থেকে কেড়ে দাও না, খোকাবাবু।"

ছবি পকেট থেকে নোট বার করে হরির হাতে দিল এবং সব ঘটনা সবাইকে বললে।

হরি হেসে নোটটা ট্যাঁকে গুঁজে ফেললে। পুলিশ বললে, চোর যখন পালিয়েছে, ও চোরাই মাল যখন পাওয়া গেছে, তখন থানায় খবর দিয়ে লাভ নাই।

পরদিন পাখী আবার এসে ছবির কাছ থেকে রুটি চাইলে।

শ্রীসুলেখা সরকার

সবজান্তা

আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের সন্টো-রোজা নামক স্থানে ৬০ ফিট চওড়া ও ১০০ ফিট লম্বা একটি ব্যাপটিষ্ট গির্জ্জা কেবল মাত্র একটা রেড্ উড্ জাতীয় গাছ থেকে করা গেছে ; কাঁচ ছাড়া এ গির্জ্জার সমস্তই কাঠ ; তবুও এতে গাছটার ⅓ ভাগ মাত্র লেগেছে। গির্জ্জাটায় চারশো লোক এক সঙ্গে বসে উপাসনা কর্ত্তে পারে।

British Museum লাইব্রেরীতে ৪,০০০,০০০ বই ৫০ মাইল লম্বা সেল্ফএ রাখা হয়েছে। সেখানে পড়বার ঘরে দৈনিক ৬০০ থেকে ৭০০ লোক বসে পড়ে।

এবার টোরণ্টয় যে "বিশ্ব-সন্তরণ প্রতিযোগিতা" হবে, তাতে জর্জ্জ কুখ্‌স্ বলে একজন ২৪ বৎসরের যুবক নাম দিয়েছে। কিন্তু তার দুই পা হাঁটুর উপর কাটা।

একটা বাষ্পীয় এঞ্জিনের হুইসিল প্রত্যেক এক ঘণ্টা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাজাবার জন্য চার টন জল ও ১২০০ পাউণ্ড কয়লার আবশ্যক হয়।

ময়ূর বর্ণান্ধ। সে বিভিন্ন রং ধরতে পারে না। পরীক্ষায় জানা গিয়েছে বেশীর ভাগ দিবাচর পক্ষী সব জিনিষকে ঈষৎ রক্তিমাভ জরদ রং ও বেশীর ভাগ নিশাচর পক্ষী নীল এবং মখমল রং দেখে।

উদ্ভিদ ৬০০ ফিটের অধিক জলের নীচে থাকিতে পারে না। কিন্তু চার মাইল জলের তলায়ও জীব পাওয়া গেছে।

ভাল ভাল ক্রিকেট্ ব্যাট্‌, ইংলিশ উইলো গাছ হতে তৈরী করা হয়। পুরুষ উইলোর কাঠ যদিও বেশী দিন টেকে তবুও স্ত্রী উইলোর কাঠ বেশী স্থিতিস্থাপক বলে এই কাঠের ব্যাটে "drive" ভাল হয়।

বিলেতের রিজেণ্ট পার্ক ও Royal Botanic Gardensএ "Kaffir bread" বলে একটা গাছ আছে। সেটা নাকি নরমান বিজয়ের সময়ও বুড়ো ছিল। এটা দক্ষিণ আফ্রিকা অধিবাসী। বৈজ্ঞানিকেরা এটার পাতা প্রভৃতি পরীক্ষা করে বলেছেন এর বয়স কম হলেও ১০০০ হাজার বৎসর হবে।

শ্রীধারীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী



সাধুর নখ

এখানে এক সাধুর হাতের ছবি দেওয়া হল। সাধুর নখগুলো কি রকম বেড়ে উঠেছে দেখ।

পাতিয়ালায় শীঘ্র খুব বড় কুস্তী খেলা হবে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পালোয়ান বিস্কোর সঙ্গে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পালোয়ান গামার লড়াই হবে। এই খেলা আশি হাজার লোক দেখবে। এই খানে গঙ্গা ও ইমাম্ বক্সের সঙ্গে আর একটা বড় খেলা হবে। এ খেলার বিবরণ আমরা পরে দেব।

শ্রীবাঁশরী মুখোপাধ্যায় এখন ভারতবর্ষের মধ্যে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ হাঁটিয়ে। তিনি হাঁটার প্রতিযোগিতায় দিল্লী, এলাহাবাদ, বম্বে, লক্ষৌ ইত্যাদি সব স্থানে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। যে দিন জব্বলপুরে সমস্ত ভারতবর্ষের হাঁটার প্রতিযোগিতা হয়। তাতে সমস্ত

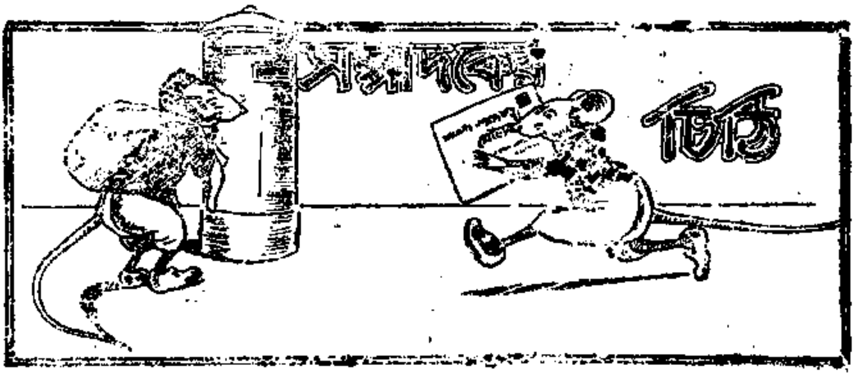
ভাল ভাল হাঁটিয়ে যোগদান করেছিলেন। তিনি নয় মাইল এক ঘণ্টা ছয় মিনিটে হেঁটে প্রথম হয়েছেন এবং এই প্রতিযোগিতার বিখ্যাত হাঁটিয়ে Grenvilleকে তিনি হারিয়েছেন এই হাঁটায় জয় লাভ কোরে তিনি Kings Cup ও Prince of Wales Cup পুরস্কার পেয়েছেন। এর আগে কোন ভারতবাসী এই পুরস্কার পাননি।



কামানের সম্মুখে মানুষ

একটা বড় কামানের নলের মধ্যে এক জন লোককে পুরে দিয়ে কামান দাগা হয়েছিল। লোকটি অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। লোকটার কত বড় সাহস বল ত? ছবিতে দেখ সে কামানের মধ্য থেকে বেরিয়েছে।

ভারতবর্ষ থেকে একটা হকি খেলার দল শীঘ্র ইউরোপে হকি খেলতে যাবে। আশা করি এই দল ভাল খেলে সবাইকে হারিয়ে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করবে।



প্রিয় মৌচাকের পাঠক-পাঠিকা--

অনেক দিন তোমাদের কোন চিঠি লিখতে পারিনি, আশা করি সে জন্য তোমরা ক্ষমা কোরবে।

কার্ত্তিক মাসের কাগজে হেমেন্দ্রবাবুর নূতন উপন্যাস আরম্ভ হয়েছিল। তারপর আর ছাপা হয় নাই। সে জন্যে তোমরা অনেকে চিঠি লিখেছ। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, হেমেন্দ্রবাবুর এ উপন্যাস মৌচাকে আর বের হবে না। অনেক চিঠি লেখা ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর লেখা দেন নি। সেই জন্যে বাধ্য হোয়ে বিখ্যাত উপন্যাসিক সৌরীন্দ্রবাবুর নূতন উপন্যাস আরম্ভ কোরতে হয়েছে। সৌরীনবাবুর এই উপন্যাস তোমাদের খুব ভাল লাগবে সে বিষয় সন্দেহ নাই। আগামী বারে নূতন পুরস্কার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে। ইতি

মৌচাক-সম্পাদক

এক মিনিটের গল্প

হরি—শরৎবাবুর ছেলেটা কাল মারা গেছে !

রাম—হায় ! হায় ! কি কোরে মারা গেল।

হরি—শরৎবাবু ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কোন জিনিষ শিখতে হলে একেবারে তলা থেকে আরম্ভ কোরবে। তাই ছেলেটী একেবারে পুকুরের তলা থেকে সাঁতার শিখতে আরম্ভ করেছিল—পুকুরের তলা থেকে আর উঠতে হয় নাই।

—o—

পথিক—খোকা, এ পুকুরের জল কত গভীর বলতে পার ?

খোকা—বেশী গভীর নয়—ঐ দেখুন না, ঐ হাঁসের ঠিক আধ খানা পর্য্যন্ত ডুবেছে !

শিক্ষক—উত্তাপে জিনিষ বড় হয় এবং ঠাণ্ডায় জিনিষ ছোট হয় !

ছাত্র !—স্যার, সেই জন্যে বুঝি গ্রীষ্মকালে দিন বড় এবং শীতকালে দিন ছোট !

কোন জিনিষ সহজে দেখা যায় কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না ?

আকাশ !

নূতন ধাঁধা

একটু সামান্য বাতাসে আমি কেঁপে উঠি কিন্তু আমিই আবার সব চেয়ে ভারী জিনিষ বইতে পারি। আমি কে ?

ধাঁধার উত্তর

×	স	র	স	×	বা	ন	র	×
র	ব	×	রো	×	রা	×	জ	না
জ	ল	×	ব	রু	ণ	×	ক	র
নী	×	শূ	র	×	সী	ল	×	দ
×	না	×	×	ওঁ	×	×	বা	×
মৌ	×	ছ	বি	×	ম	ল	×	অ
চা	বি	×	ভী	ষ	ণ	×	র	ত
ক	ম	×	ষ	×	সি	×	ক	ল
×	ল	ক্ষ	ণ	×	জ	ন	ম	×

বরাবর :—

১। সরস ৩। বানর ৫। রব ৬। জনা ৮। জল ৯। বরুণ ১০। কর ১১। শূর ১২। সীল ১৩। না ১৪। ওঁ ১৫। বা ১৭। ছবি ১৯। মল ২১। চাবি ২৩। ভীষণ ২৪। রত ২৫। কম ২৬। কল ২৭। লক্ষণ ২৮। জনম।

নীচদিকে :—

১। সবল ২। সরোবর ৩। বারাণসী ৪। রজক ৫। রজনী ৭। নারদ ১৬। মৌচাক ১৮। বিভীষণ ১৯। মনসিজ ২০। অতল ২২। বিমল ২৪। রকম।

শ্রীনলিনীরঞ্জন বিশ্বাস

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ পৌষ মাসের ধাঁধার জবাব দিয়েছেন :—

মিলনমালা, ব্রজদুলাল ও নন্দদুলাল ঘোষ (কলিকাতা), উর্ম্মিলা সেন (মজঃফরপুর), শৈলেন্দ্র ঘোষ (দিল্লী), শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (বেনারস সিটী), সুধীরচন্দ্র বসু (কলিকাতা), বিনয়কুমার ও অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পাটনা), সরোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), বিমলচন্দ্র বসু (কলিকাতা), কুমারী ধীরা দত্ত (গারো হিলস্), নীহারমালা দেবী (কলিকাতা), অরুণকুমার সেন (মালকেরা কলিয়ারী), আশীষচন্দ্র ঘটক (ঢাকা), মাধবানন্দ মাড়্গোকার (কলিকাতা), রেণু, কমল, আবুলু, নীরেন্দ্র, ক্ষিতিন্দ্র, সরোজেন্দ্র, হীরেন্দ্র, বীরেন্দ্র, দীপেন্দ্র ও মনুজেন্দ্র (কলিকাতা), কুমারী অমিয়বালা দেবী (গুপ্তিপাড়া), অশোকা সেন (কলিকাতা), কমলা ঘোষ (কলিকাতা), কমলা ঘোষ (কলিকাতা), নীলিমা চৌধুরী (সুনামগঞ্জ), সরোজকুমার সরকার (কলিকাতা), গুণেন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মোগলাবাজার), অমিয়, অম্বুজা, নিখিল, সাধনা ও আন্নুদেবী (স্বর্গ—মধ্য প্রদেশ), প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), সুধীররঞ্জন ভট্টাচার্য্য (নবিনগর), অশোককুমার সেন (কলিকাতা), রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (কলিকাতা), অমলেন্দু দাস (কুমিল্লা), অমলেন্দু মজুমদার (চাঁচল), শান্তি মৈত্র (ঘাটশীলা), হরিমোহন প্রসাদ সিংহ (পাকুড়), উপেন্দ্রকুমার সেনশর্ম্মা (ঢাকা), বীরেন্দ্রকুমার পাল (কটক), নরেন্দ্রনাথ মুখার্জী (মজঃফরপুর) শঙ্করপ্রসাদ সিকদার (বাঁকুড়া), বারীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (পেলগাঁ), রেণুকা বসু (কাশী), বিশ্বময়, ভক্তিময়, জ্যোতির্ম্ময়, শান্তিময়, পবিত্রময়, গৌরী, মনা, নীলু, মহালক্ষ্মী ও শশধর দাস (যশোহর), নীহার, দেবাশীষ, মঞ্জরী, নির্ম্মাল্য ও মাধুরী দাশগুপ্ত (ভিজিয়ানা গ্রাম), পরিমলরঞ্জন গুপ্ত (কুমারখালি), রনজিৎ লাহিড়ী (কলিকাতা), দেবীপ্রসাদ বসু মল্লিক, বেন্না, রামপ্রসাদ মল্লিক ও ইন্দুপ্রকাশ সরকার (কটক), সনৎকুমার ঘোষ (শিব-সাগর), জ্যোতি, দীপ্তি, শক্তি ও মুক্তি (বর্দ্ধমান), হীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (ঘোড়ামারা), সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ-দিল্লী), কুমারী শান্তিলতা চট্টোপাধ্যায় (আরিয়াদহ), সুনীতি, সুব্রতা, বেদা ও মুক্তি (ভাগলপুর), শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (পুরুলিয়া), কুমারকৃষ্ণ

মিত্র (লাহোর) ; শান্তি, হরিবিলাস, কাশেম, প্রকাশ, সুধীর, বিশ্বেশ্বর, মহসীন, মোয়াজ্জেম, বদরুদ্দোজা ও ধীরেন (মেমনগর); আর্য্যকুমার সেন (নবদ্বীপুর), শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (চুঁচুড়া), প্রমিলা রায় (পুরী), নন্দদুলাল, ওঙ্কার, অপূর্ব্ব, রঘু, জগন্নাথ (পাটনা), অমিয়া, ইন্দিরা, অশোক ও অজিত মিত্র, (দিনাজপুর), প্রবীরেন্দ্র বসু (সিউড়ী), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), মেনকা ও নন্দরাণী সরকার (কলিকাতা), নিমাইচন্দ্র পাল (খিদিরপুর), বিশ্বময় দাশগুপ্ত, লাখী, পাখী, মালু, গৌরী, নীলু, মলু, চুমটী, লতিকা ও সতু (যশোহর), উৎপলচন্দ্র গুহ (কলিকাতা), হিরণকুমার সেন (কলিকাতা), প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক (কলিকাতা), তারাদেবী (কলিকাতা), শঙ্করনারায়ণ সেন (কলিকাতা), সুব্রত চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী (হাজারিবাগ), নীলিমা দেবী (চুঁচুড়া), বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী (মেমনগর), রাণী দেবী (সিরাজগঞ্জ), দীপু, ভোলা ও অজিত (মেমনগর)।

কলিকাতা—২৯, কালিদাস সিংহের লেন, কিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅতীন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত



শ্যামদেশের ছেলে

মৌচাক

৮ম বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩৩৪ [১১শ সংখ্যা

সন্ধ্যাবেলার ফুল্-বাগে

ফুল্-পরীরা দু'লে বাজায় ফুলের বাঁশরী
সুর...হাওয়ায় ভেসে ভেসে
আমার...লাগ্‌ছে কানে এসে
তাই শুনে ভাই, আমায় আমি যাই যে পাশরি'—;
সন্ধ্যাবেলায় ফুল-বাগে
চক্ষে আমার ঢুল লাগে গো
ঢুল লাগে।......

বিদায় মাগে শীতের শীতল মলিন গোধূলী—
বিদায় নিতে পরাণ যেন উঠ্‌ছে গো দুলি'—;
তার...ব্যাকুল পূরবীতে
গান...জাগ্‌ছে আমার চিতে।

বাতাস এসে নাচ্‌ছে ঘিরে ফুলের আসরই —
হেলে দুলে ফুলী বাজায় ফুলের বাঁশরী।
আজ্‌কে বসে' ফুল্‌-বাগে
চক্ষে আমার ঢুল্‌ লাগে গো
ঢুল্‌ লাগে।……

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

পশু-পাখীর পোষমানা

সেদিন খবরের কাগজে পড়্‌ছিলাম, বিলাতের এক সাহেবের একটি চিতাবাঘ একদিন খাঁচা থেকে পালিয়ে একটা বাড়ীর উঠানের কোণায় আশ্রয় নেয়। সেই বাড়ীর একটি ছোট্ট ছেলে—মাত্র ২ বৎসর বয়স—বাঘটাকে দেখ্‌তে পেয়ে মস্ত বড় বেড়াল মনে করে, গম্ভীর ভাবে তার পিঠে হাত বুলাতে থাকে! ছেলেটির বাবা এই কাণ্ড দেখে ভয়েই অস্থির! এমন সময় রাস্তায় হৈ চৈ শোনা গেল, আর তিনিও শুন্‌লেন, যে চিতাবাঘ পালিয়েছে। বাঘটার মেজাজ যে সুবিধার নয় তা তিনি বুঝ্‌লেন, বাঘের মুখে "গোঁ" "গোঁ" শব্দ শুনে। তখনই রাস্তায় গিয়ে তিনি দেখ্‌লেন চিতাবাঘের সন্ধানে একদল লোক বন্দুক, দড়ি, খাঁচা ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়েছে। তাদের অবস্থাটা জানাতেই তারা এসে চিতাবাঘ মশাইকে আবার বন্দী ক'রে ফেল্‌ল।

এই ঘটনায় দেখ্‌তে পাচ্ছি, ছোট ছেলের আদরটা বাঘের ততটা অপছন্দ হয় নি; না হলে কি আর অত সাধু পুরুষের মত পিঠে হাত বুলাতে দিত? তবে, স্বভাব একেবারে যাবে কোথায়? কাজেই, নিজের মান রাখ্‌বার জন্যও মুখে "গোঁ" "গোঁ" শব্দ চল্‌ছিল।

বনের পশুপাখী সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা ভুল। যে জন্তু বা পাখী হিংস্র, সে খাবার সংগ্রহের অথবা আত্মরক্ষার দরকার হলে হিংস্র হয়। আবার এই হিংস্র

জন্তুই ভালবাসার ফলে একেবারে নিরীহ হ'য়ে পড়ে। সার্কাসে যে সব জন্তু খেলা দেখায় তাদের অধিকংশই ভালবাসায় বশ হয়। কোন কোন জন্তুকে আবার ভয় দেখিয়ে বশ কর্‌তে হয়। কিন্তু, চিড়িয়াখানার জন্তুও যে ভালবাসা এবং বুদ্ধির ফলে পোষ মানে, তা আমাদের এই দুটি ছবি দেখ্‌লে বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। লণ্ডনের চিড়িয়াখানার একটি মেম সাহেব অনেক জন্তু আর পাখীর সঙ্গে ভাব পাতিয়েছেন ;— শুধু তাদের খাবার খাইয়ে। প্রথম ছবিতে দেখ, মেম সাহেব কেমন শকুনিকে কোলে নিয়ে আদর কর্‌ছেন ; শকুনিও দিব্যি আরামে কোলে চ'ড়ে আছে। দ্বিতীয় ছবিতে মেম সাহেব একটি ফল ঠোঁটে ধরে আছেন ; ভালুক তাঁর ঠোঁট থেকে সেই ফল নিয়ে খেতে যাচ্ছে ! কতটা বেশী ভাব থাক্‌লে ভালুককে এ ভাবে খাবার দেবার সাহস হতে পারে, একবার ভেবে দেখ।



মেম সাহেব শকুনীকে কোলে নিয়ে আদর করছেন

এই মেমসাহেব চিড়িয়াখানার আরো অনেক জানোয়ারের সঙ্গে খুব ভাব পাতিয়েছেন। অনেক জানোয়ারের তিনি নামকরণ করেছেন, আর সেই নাম ধরে ডাক্‌লে, তারা তাঁর কাছে ছুটে আসে। কোন হিংস্র জন্তুকে তিনি বাদ দেন্ নি ;— বাঘ, সিংহ, নেকড়ে, বনবিড়াল—সকলেই তাঁর বন্ধু। তা' ছাড়া, ধনঞ্জয় পাখী, ঈগ্‌ল্‌, হিপ্পোপটেমাস্ এঁরাও সকলে মেম্‌সাহেবের বন্ধু।

চিড়িয়াখানার জন্তুদের দেখাশুনা করবার জন্য যে সব লোক রাখা হয় তাদেরও পশুপক্ষীদের সঙ্গে ভাব রাখা দরকার হয়। শুধু ভাব রাখা নয়, এই সব পশু পাখীকে

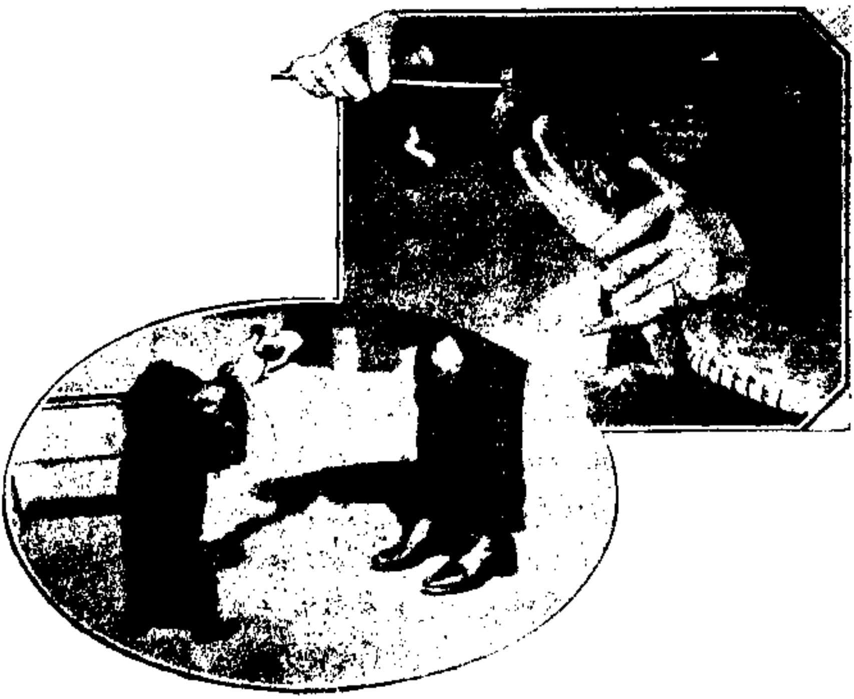
ভালবাসতে না পারলে তাদের যত্ন করা এবং কোন রোগ হ'লে চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। যে সব জন্তু নিতান্ত শিশু অবস্থায় চিড়িয়াখানায় আসে তাদের অনেক সময় হাতে ধ'রে খাওয়াতে হয়। ছবিতে দেখ একটি ছোট্ট কুমীরছানাকে কেমন ক'রে খাওয়ান হচ্ছে। বেচারার 'অগ্নিমান্দ্য' হয়েছিল; তাই তার ক্ষিদে মোটেই হ'তো না। দুটি মাস এই ভাবে একে খাওয়াবার পর এবং ওষুধ পত্র ব্যবহার করার পর কুমীরছানার রোগ সারে। পরের ছবিতে দেখ, ছোট্ট ভালুক ছানা কেমন তার রক্ষকের হাত থেকে বোতলের দুধ খাচ্ছে! নিতান্ত শিশু অবস্থায় ভালুক ছানাটিকে আনা হয়; কিন্তু, রক্ষকের যত্নে আর চেষ্টায় ভালুক ছানা দেখতে দেখতে বড় হ'য়ে ওঠে।



ভালুক ফল খাচ্ছে

কলকাতার চিড়িয়াখানায় দেখেছি, ওরাংওটাং "চার্লি" তার রক্ষকের সঙ্গে জড়াজড়ি ক'রে কুস্তি বাধিয়ে দেয়। কুস্তি করার সময় চার্লির মুখে রাগ বা বিরক্তির লেশ মাত্র থাকে না। স্পষ্টই বোঝা যায় কুস্তি তার ভারি পছন্দ।

ওরাংওটাংএর জাত ভাই সিম্পাঞ্জি—আরেক জাতের বনমানুষ। মানুষের অনুকরণ করতে শিখতে এঁরা বড়ই ওস্তাদ। ছবিতে দেখ, পোষা সিম্পাঞ্জি "জিমী" কেমন কাঁটা চামচ ধরে খানা খেতে যাচ্ছেন। জিমী খাওয়া পরিবেশন

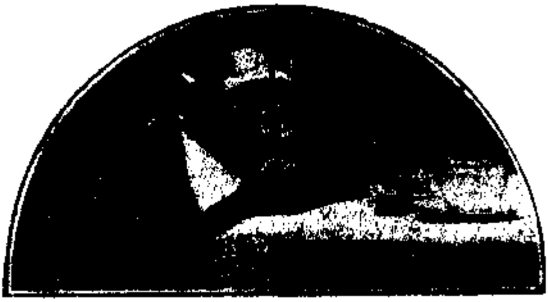


ভালুক ছানার দুধ খাওয়া

কুমীর-ছানার খাওয়া

করা, চেয়ার টেবিল ঠিক করা, গলায় তোয়ালে বেঁধে, কাঁটা চামচ নিয়ে খেতে বসা, সবই করতে পারে। যখন পোষাক প'রে ফিটফাট হ'তে হয় তখন নিজেই নিজের কোট, প্যাণ্ট, টুপি প'রে নেয়। হাণ্ডশেক করা, টুপি খুলে অভিবাদন করা—এ সব আদব কায়দা জিমীর বেশ জানা আছে। এমন কি টেবিলের আদব কায়দা (Table manners) জিমী বেশ ভাল রকম জানে।

পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তিনিকেতনে যখন থাক্‌তেন, তখন



শিল্পাচার্য্য জিমি

তাঁর কাছে কত পাখী রোজ খাবার খেতে আস্‌ত। একটি শালিখ পাখী তাঁর কাঁধের উপর ব'সে খাবার চাইত। ভালবাসায় বনের পাখীও এমনি বশ হয়!

"সন্দেশওয়ালা"

ট্রেনের মশা

রাত্রি তখন ঝাঁঝাঁ,
ইষ্টিশান্‌টি ফাঁকা,
গাড়ী হঠাৎ থাম্‌ল এসে
ভাঙ্গিয়ে ঘুমটি কাঁচা।

চোখটি ঘসে' দেখি—
প্রকাণ্ড এক এ কি!—
লম্বা পাহাড় বোধ হয়
যেন একটা ঢেঁকি!

ঝাপ্‌সা চাঁদের আলো
চাদর করে' ভালো
জড়িয়ে গায়ে বসে পাহাড়
ধোঁয়াটে আর কালো

পাহাড় দেখি বসে'
এমন সময় কশে'
শ্রীচরণে লাগিয়ে কামড়
রক্ত কে রে চোষে!

হাতটি নাড়া যেই
নাচ্‌লেন ধেই ধেই
হৃষ্টপুষ্ট মশক মশাই,
ভয় ত কিছুই নেই!

ভাব্‌লাম—হুঁ, ওরে,
দেখিয়ে দেবো তোরে
একটি চড়েই কর্‌ব সাবাড়,
পাঠাই যমের দোরে।

মেড়োর দেশের মশা
ছাতুখোরের দশা,
আস্‌ছে বোধ হয় গয়া থেকে
যেন ডালের খোসা।

ট্রেন ছাড়ে হুস্‌ হাস্‌;
শ্রীচরণের দাস
হবার জন্যে এলেন যেম্‌নি
মশক মহা ডাঁশ,

চড়টি তুলে জোরে
লাগাই চটাস্ করে,'
ছুট্টে পালায় বোঁ বন্ বন্
প্যাঁ পোঁ গান ধরে'।

দুঃখেতে আর রাগে
দেখ্‌ছি পিছে আগে
কোথাও নেই, ডুব মেরেছে,
কী শীগ্‌গির ভাগে!

হাতটি দিয়ে গালে
ভাব্‌ছি—ডোবায়, খালে,
কিম্বা কুয়োয় জম্মেছে এ,
শ্যাওড়া গাছের ডালে?

ছেড়ে বাপ, মা, বাড়ী,
ইষ্টিশানে গাড়ী
ধরলে কবে? আছে ত বেশ
ফুর্ত্তি মেরে ভারী।

কোন্ দেশে এর ঘর?
পাটনা? দেবীগড়?
কিম্বা মীরাট? দিল্লী? গয়া?
কিম্বা ধাপার চর?

ডাক-গাড়ীতে মজায়
হিল্লী দিল্লী বেড়ায়
আগ্রা দেখে আর আলিগড়
বেশ বিনা পয়সায়!

ট্রেনটা যতই ঘুরে
কাবুলি, মেড়ো, উড়ে,
বাঙালী, পাঞ্জাবী, ইংরেজ
ওঠে ও যায় দূরে।

মশা বেঞ্চির আড়ে
বেশ থাকে নিঃসাড়ে,
সবার পায়ে লাগিয়ে কামড়
রক্ত চুষে ছাড়ে।

ধরায় যত জাত
সব রক্তের স্বাদ
বসে বসে' নিচ্ছে সে রোজ
মজাসে দিন রাত।

ধন্য চালাক বীর,
সবায় হানো তীর,
ধন্য ধন্য তীর্থ-ঘোরা
হে মশা গম্ভীর!

ওমা! আবার পোঁ!
ওই আসে সোঁ সোঁ,
পায়ের গোড়ায় রক্ত আবার
টান্‌ছে সে চোঁ চোঁ।

দাঁড়াও তবে এবার
ঘুচাই তোমার খাবার,
গুছিয়ে দিলাম একটি যে চড়
মশক হ'ল কাবার!

হায়, কাবুলী-চোষা,
ইংরেজ-খাওয়া মশা,
আমার হাতে বীর মশায়ের
শেষ কালে এই দশা!

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

দরিদ্র-নারায়ণ

তোমরা একটা দৈত্যের গল্প শুনতে চাও? আমি জানতাম তোমরা চাইবে। সে দৈত্যের নাম দস্তাসুর; ভারী গায়ে জোর আর একজন মস্ত যোদ্ধা! চক্‌চকে আর ঝক্‌ঝকে তরোয়াল, এই ছিল তার সঙ্গী! চেহারাখানা যেমন লম্বা চওড়া, মেজাজটাও তেমনি অদ্ভুত। তার একটা খেলার কথা বলি, তা' হলেই বুঝতে পারবে; মাঝে মাঝে যখন তার বেড়াবার খেয়াল হ'ত সে তিব্বতের দিকে ছুট দিত। পাহাড়ে পাহাড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে টপাটপ্‌ চোখের বাইরে চলে যেত। তার সখ ছিল যুদ্ধ করা। যেমন তেমন লড়াই নয়; সে থাক্‌বে একা একদিকে, আর হাজার হাজার সৈন্য-সামন্ত, রথ, হাতী, ঘোড়া থাকবে আর একদিকে! আর যখন যে রাজা সব চেয়ে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠ্‌ত, দস্তাসুর তারই রাজসভা অন্ধকার করে বস্‌ত! "আলো করে বস্‌তোই" বলতুম, কিন্তু যা পাহাড়ের মতো চেহারা তার; আলো টালো সব আড়াল করে দিত! কিন্তু একধারে তার এই ভীষণ শরীরখানার জন্যে লোকে তাকে যেমন ভয় করত, তার মায়া-দয়া আর বীরত্বের জন্যে সবাই তাকে আবার ভালও বাস্‌তো তেমনি।

একদিন রাজা সভা করে বসেছেন; সারে সার পাত্র—মিত্র—মন্ত্রী—[redacted] চুপ করে রয়েছে, আর একজন সাধু পণ্ডিত বৃন্দাবন হতে এসে তাঁকে সত্য-নারায়ণের কথা শোনাচ্ছে। একে একে সে কথা শেষ হলে পর আবার কৃষ্ণ-কথা আরম্ভ

হল; কেমন করে দরিদ্রের সখা কৃষ্ণ, আতুরের হরি কৃষ্ণ, ক্ষুধার্ত্ত, বিপন্নের শরণ শ্রীকৃষ্ণ, পৃথিবীর অনাচারী অত্যাচারীদের ধ্বংস করেছিলেন। কি করে তিনি ভালবাসায় মানুষকে ভাসিয়ে দিয়ে, মানুষকে ভালবাসতে শিখিয়েছিলেন। রোগ-শোক-তাপ জরা মরণ-ক্লিষ্ট এই মর্ত্তালোককে তাঁর মাধুরী দিয়ে শ্যামল, সুন্দর অমৃত-লোকের মত করে তুলেছিলেন। সভাসুদ্ধ লোক নীরব বিস্ময়ে সেই কথা শুনছিল। আর এদিকে দন্তাসুর লক্ষ্য করছিল যে যতবার শ্রীকৃষ্ণের নাম করা হয়, রাজা ততবার মাথা নীচু করেন।

সভা ভঙ্গ হবার পর সে মহারাজকে জিগ্যেস করলে, "মহারাজ, যতবার শ্রীকৃষ্ণের নাম করা হচ্ছিল, ততবার আপনি মাথা নীচু করছিলেন কেন? আপনার চেয়ে বড় আর নিশ্চয় কেউ নাই, তবে আপনি মাথা নোয়াচ্ছিলেন কেন?" রাজা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন "না দন্তাসুর, ও-কথা বলো না, ওতে পাপ হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব রাজার চাইতে বড় রাজা; অমন ক্ষমতা, অত ঐশ্বর্য্য, অত গুণ আর কারো নাই; তিনি আছেন, তাই আমরা বেঁচে আছি। তাই পৃথিবী আজো মরুভূমি হয় নাই; তাই আজো ফুল ফোটে, চন্দ্রসূর্য্য ওঠে, পাখী ডাকে, হাওয়া বয়।"

দন্তাসুর ভীষণ আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে ঘাড় নেড়ে বল্লে "সে কি মহারাজ? শ্রীকৃষ্ণ এখনো আছেন? কই কোথায়? কেমন করে দেখা পাওয়া যায়?"

রাজা আনন্দিত হয়ে উজ্জ্বল হাসি হেসে বল্লেন "আছেন বই কি দন্তাসুর! ঐ ওপরে চেয়ে দ্যাখো নীল আকাশ! ওই দূরে দেখ নীল সমুদ্র! আর এদিকে দেখ, দিগ্বলয় পর্য্যন্ত শ্যামল শস্য ক্ষেত; সবুজ লতা-পাতা! শ্রীকৃষ্ণ এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন। বর্ষাকালে আকাশে তাঁর সাত রঙা শিখিচূড়া দেখতে পাবে। শ্রাবণ ধারায় টুপুর টুপুর বর্ষা-লীলায় তাঁর নূপুর শুনবে--চারিদিক স্বপ্নের ঘোরে ঢেকে দিয়ে বেজে উঠছে--ঝমুর! ঝুমুর!

সন্ধ্যা-আকাশে, গোধূলিতে দেখতে ইচ্ছে করলেই তাঁর দেখা পাওয়া যায়। বসন্তের বনফুলে বনমালীর গলার মালা, বেণু বনের শন্ শন্ শব্দে বংশীধারীর বাঁশীর সুর, তারার আলোয় তাঁরই শত সহস্র স্নেহদৃষ্টির আলো, দিনরাত আমাদের এই পৃথিবীকে ধন্য করছে।" এই বলে তিনি চুপ করলেন।

(২)

গভীর অন্ধকার। ঘন অমাবস্যা রাত্রি। বনের পর বন, পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে একটা দীর্ঘ মূর্ত্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে! সে যেন কত কতদূর হতে এসেছে—কত দূরই না যেতে চায়!

সে মূর্ত্তি আর কারো নয়, আমাদের দৈত্য দম্ভাসুরের। তার কপাল কোঁচকানো; যেন কী একটা প্রচণ্ড চিন্তা তাকে গম্ভীর করে দিয়েছে; চোখ কিসের তৃষ্ণায় জ্বল্ জ্বল্ করছে!—সে যেন কী একটা চায়! পায়ে গায়ে ধূলো ভরে গেছে, তবু জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়েই চলেছে! যেন উৎসাহের, উদ্যমের, চেষ্টার, সীমা সে জানেনা!

চল্‌তে চল্‌তে সে একটা আলো দেখ্‌তে পেল। আলো লক্ষ্য করে গভীর বনের ভেতর দিয়ে চল্‌তে আরম্ভ করেছে—পথের দু পাশ থেকে বাঘ, ভালুক, হাতী, গণ্ডার হুড়্ মুড়্ করে সরে তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। যখন সে আলোর কাছে পৌঁছলো, দেখ্‌লে একটা সন্ন্যাসীর তপোবন। এক দিকে একটা সিংহ পড়ে পড়ে চুপ করে চোখ বুঁজে ঘুম দিচ্ছে, আর একদিকে একটা হরিণ, তার ছানাটিকে কোলের কাছে নিয়ে মনের আরামে কতগুলি কচি কচি ঘাসের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে। সিংহ দেখেই দম্ভাসুরের খাপের তরোয়াল ঝন্ ঝন্ করে উঠল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও তার শব্দে সিংহটার ঘুম ভেঙ্গে গেল তবু সে একবার মিট্ মিট্ করে চেয়ে আবার পাশ ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে শুলে। দম্ভাসুর আত্মরক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, সন্ন্যাসী দেখ্‌তে পেয়ে বল্লেন "দরকার নাই, ভাই! তুমি কি চাও?" সন্ন্যাসীর শান্ত মুখ, মিষ্টি কথায় দম্ভাসুর মুগ্ধ হয়ে গেল। সে বল্‌লে "আমি দৈত্য; নাম দম্ভাসুর; আমার মহারাজের কাছে নারায়ণ-কৃষ্ণের নাম শুনে তাঁর খোঁজে বেরিয়েছি। কোথায় গেলে তাঁর দেখা পাবো বল্‌তে পারেন? আমি তাঁর সেবা করতে চাই; তাঁর হয়ে যুদ্ধ কর্‌তে চাই; তাঁর কাছে থেকে, তাঁকে রক্ষা কর্‌তে চাই।"

সাধু হেসে তাকে বল্‌লেন "বৎস, তুমি যাকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েছ, এ ভাবে সারা-জীবন খুঁজ্‌লে ত তাঁকে পাবে না। আর যদি তাঁর সেবা করতে চাও ত যুদ্ধ-টুদ্ধ করে তা হবে না; সে কর্‌তে হলে আরো শক্ত কাজ করতে হয়। তোমার

ঐ চক্‌চকে ঢাল আর ঝক্‌ঝকে তরোয়াল তা হলে খুলে রাখতে হয় ; আর যারা কষ্ট পাচ্ছে, যারা গরীব, বিপন্ন, অসহায়, তাদিকে সাহায্য করতে হয়। এমনি করে আতুর গরীবের সেবা কর্‌লেই তুমি তাঁর সেবা করতে পার। আর তিনি সর্ব্ব শক্তিমান, তাঁর রক্ষকের প্রয়োজন হয় না। দস্তাসুর মাথা হেঁট করে সমস্ত শুন্‌লে।

(৩)

দুধারে সারি সারি ভীষণ উঁচু সব কালো পাহাড়। তার কোল বেয়ে একটা খরস্রোতা পাহাড়ে নদী বয়ে যাচ্ছে। সেই নদীর ধারে একলা একখানা কুঁড়ে—ঘর বেঁধে দস্তাসুর বাস করে। ঢাল-তরোয়াল ফেলে রেখেছে। রাত্রে হোক, দিনে দিনে হোক ; আলোয় হোক, দুর্যোগে হোক, যত লোক সেই নদী পার হতে আস্‌তো, দস্তাসুর তাদের সকলকে হাসিমুখে সব সময় পার করে দিত। কেউ কিছু দিতে চাইলে কখনো নিতোনা ; এতে আশ-পাশের গ্রামের লোকদের বড়ই উপকার হতে লাগ্‌লো।

সে-দিন জন্মাষ্টমী। আকাশে ঘোর করে মেঘ নেমেছে। ভয়ানক জল ঝড় বজ্রাঘাত। দস্তাসুরের কুঁড়ে ঘরখানি ঝড়ের দোলায় দুল্‌ছিল ; বাইরে পাহাড়ী নদীটা হু-হু করে শব্দ কর্‌তে কর্‌তে ছুটে চলেছে ; তার কূলে কূলে প্রবল বান ! দুই পাড়ের পাথর খসে তার জলে হুড়্‌ মুড়্‌ করে পড়্‌ছে, গাছের শেকড় উপ্‌ড়ে নদীটা সে গুলোকে বুকে করে পাগলের মতো ফুঁসে ফুঁসে চলেছে। 'কড়াকড়্‌' শব্দে বিদ্যুৎ যেন পাহাড়ের বুকখানাকে চিরে ফাটিয়ে দিচ্ছে ! দস্তাসুর ভাব্‌লে, এই দুর্য্যোগে নিশ্চয়ই আর কেউ বেরুবেনা। কিন্তু ঠিক সেই সময় শুন্‌তে পেলে বাইরে কে যেন ডাক্‌ছে "ওগো কে আছ এই নদীটা আমায় পার করে দেবে ?" সেই না শুনে সে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়্‌লো। বেরিয়ে পড়ে কি দেখ্‌লো জানো ? দেখ্‌লো, একটা ছোট ছেলে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ভাব্‌লে ছেলেটা নিশ্চয়ই পথ হারিয়ে ফেলেছে। দস্তাসুর তাকে কাঁধে করে নদী পার হতে লাগ্‌লো। ঝড়ের আর বৃষ্টির ঝাঁটে সে সম্মুখে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিল না ; নদীটা গর্জ্জন করছিল, বুঝিবা তাকে গ্রাস করতেই চায় ! কিন্তু গায়ের জোরে জল ঠেলে সে সুমুখে চল্‌ছিলো। কিন্তু এদিকে আর একটা মুস্কিল ! ছেলেটা এত ভারী, যে তাকে

কাঁধে করে থাকা ক্রমে ক্রমে দস্তাসুরের মতো বলিষ্ঠ দৈত্যের পক্ষেও অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। যত এগিয়ে যায় তত যেন ছেলেটা আরো ভারী হয়! যখন মাঝ নদীতে পৌঁছল তখন যেন দস্তাসুরের কাঁধে একটা পাহাড় চেপেছে! অতি কষ্টে নিজকে সোজা রেখে সে নদী পার হতে লাগ্‌লো। যখন ওপারে পৌঁছবে, তখন তার শরীরটা পরিশ্রমে অবশ হয়ে গেছে! সে ছেলেটাকে পাড়ের ওপর নাবিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে! তারপর আশ্চর্য্য হয়ে তাকে জিগ্যেস কর্‌লে, বাছা তুমি কে? তোমাকে কাঁধে করা ত সোজা ব্যাপার নয়! আমার মত জোরালো লোকও হাঁফিয়ে উঠ্‌লো। বাবা, ছেলে ত নয়! একটা ব্রহ্মাণ্ড!

ছেলেটি তখন হেসে উঠ্‌লো! অমনি কি সুন্দর জ্যোতিতে চারিদিক ভেসে উঠ্‌ল! দস্তাসুর শুন্‌লে ছেলেটি বল্‌ছে, "আমিই শ্রীকৃষ্ণ, যার খোঁজে তুমি এতদিন ঘুরেছ।" সঙ্গে সঙ্গে এক নিমেষে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। চারিদিক ফুলের মধুর গন্ধে ভরে উঠ্‌লো। লক্ষ লক্ষ পাখী এক সঙ্গে বেণুর মত গেয়ে উঠ্‌ল; দস্তাসুর চেয়ে দেখ্‌লে, তার সুমুখে শ্রীহরি! তিনি মিষ্টি কথায় দস্তাসুরকে বল্‌লেন, "তুমি যে এতদিন বিপন্নের উপকার করেছ, অসহায়কে সাহায্য করেছ আর দরিদ্রকে সেবা করেছ, তাতেই আমি খুসী হয়েছি। জেনো, গরীবকে দয়া করলেই নারায়ণের সেবা করা হয়।"

ভক্তিভরে তাঁর পায়ে দস্তাসুর প্রণাম করলে। যখন নারায়ণ তাকে মনের মত বর চাইতে বল্‌লেন তখন সে সুধু এই কথা বল্‌লে, "ভগবান! মানুষ যেন মানুষকে ভালবাসতে শেখে!"

তারপর থেকে কেউ আর দস্তাসুরকে জল-ঝড়ের মধ্যে নদী পার করে দিতে দেখে নাই। তার কুটীরও এক দিনকার ঝড়ে উড়ে গেল। কিন্তু নদীটা সেই যায়গায় খুব শান্ত হয়ে বয়ে যেত; লোকের কোন সাহায্যের দরকার হোতো না। লোকে বলে, দস্তাসুর স্বর্গলোকে চিরশান্তিতে বাস করছে।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

জোয়ান্ জামাই

(বর্ম্মা দেশের উপকথা)

এক নেংটি ইঁদুরের একটি ভারী সুন্দরী মেয়ে হ'ল। সে একটু বড় হ'য়ে উঠ্‌লে তার মা তার বিয়ের জন্য বড় চিন্তায় প'ড়ে গেল। অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক্ করা হ'ল, যে সব চেয়ে বেশী জোয়ান্ তারি সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হবে। তার পর বরের খোঁজ চল্‌তে লাগ্‌ল। অনেকের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, বরুণ-দেবতা হচ্ছেন সকলের চেয়ে বেশী বলবান। এ কথা শুনে ইঁদুরণী একদিন তার সুন্দরী মেয়েটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে সঙ্গে নিয়ে বরুণ-দেবতার বাড়ীতে গেল। তাদের আস্‌বার কথা শুনে ও তাদের সাজ পোশাক দেখে দেবতার ভারী আমোদ হ'ল। তিনি তাদের ডেকে এনে কাছে বসিয়ে আস্‌বার কারণ জিজ্ঞেস কর্‌লেন। তখন ইঁদুরণী খুব ভরসা পেয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—"এই যে আমার সঙ্গে দেখ্‌ছেন এটি আমার মেয়ে। আমি মনে করেছি যে সবচেয়ে বেশী জোয়ান্ তার-ই সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দেব। লোকের কাছে শুনতে পাই আপ্‌নিই নাকি সকলের চেয়ে বেশী বলবান্। আপ্‌নি কি একে বিয়ে কর্‌বেন্ ?"

বরুণ-দেবতা বল্‌লেন—"তোমাদের মৎলবটা যে ঐরকম কিছু হবে তা তোমাদের রকম-সকমেই ত বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে কথা কি জান, আমি বলবান্ বটি, তবে আমার চেয়েও যে বলবান্ আছে। সে হচ্ছে বায়ু-দেবতা। আমি যখন বৃষ্টি করব ব'লে আমার মেঘগুলো জমা করতে থাকি, তখন সে এসে হঠাৎ এক নিঃশ্বাসে সে গুলোকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে চ'লে যায়। সেই জন্যই ত বল্‌ছি সে আমার চেয়েও বেশী জোয়ান্।"

এই কথা শুনে ইঁদুরণী তাড়াতাড়ি, বায়ু-দেবতার কাছে চলে গেল। তিনি তখন রোদে পিঠ দিয়ে আরাম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে সে বল্‌লে—"দেবতা, তোমার চেয়ে জোয়ান্ আর কেউ ত নেই। তুমি আমার মেয়েটিকে বিয়ে কর। তা হ'লে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে।"

দেবতা তার এই কথা শুনে হেসেই অস্থির। কতক্ষণ পরে বল্‌লেন—"তুমি ত ঠাউরেছ বেশ! আর তাতে আপত্তিই বা কি ছিল। তোমার সুন্দরী মেয়েটির কাছে ত দেবতাদের মেয়েরা দাঁড়াতেই পারে না! তবে মুস্কিল এই যে, আমি বিয়ে কর্‌লে তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'বে না। কারণ আমার চেয়ে ত বেশী জোয়ান্ রয়েছে। সে হচ্ছে পিঁপড়ের পাহাড়। আমি যতই কেন বাতাস ছাড়ি না, ও পাহাড়কে কিছুতেই উড়িয়ে ফেল্‌তে পারিনে।"

ইঁদুরণী তখন গেল পিঁপড়ের পাহাড়ের কাছে। "পিঁপড়ের পাহাড়, পিঁপড়ের পাহাড়, তুমি সব চেয়ে বেশী জোয়ান্। তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে কর।"

পাহাড় বল্‌লে—"আমি যে খুব জোয়ান্ তাতে সন্দেহ নেই। তবে আমার চেয়েও জোয়ানের খোঁজ ব'লে দিচ্ছি। ষাঁড় দেখেছ ত? সে তার মস্ত মস্ত শিং দিয়ে আমাকে উল্টে পাল্টে দেয়। তার সঙ্গে আমি পেরে উঠিনে। তুমি জোয়ান খোঁজ ত তার কাছে যাও।"

এ কথা শুনে ইঁদুরণী গেল ষাঁড়ের কাছে। "ষাঁড় মশাই, তুমি ত গায়ের জোরে পিঁপড়ের পাহাড় ভেঙ্গে ফেল্‌তে পার, তোমার চেয়ে জোয়ান্ ত কোথাও খুঁজে পেলাম না। তুমি যদি দয়া ক'রে আমার এই সুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে কর।"

ষাঁড় বড় কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে বল্‌লে—"বলেছ ত ঠিক কথাই। আমি এ দুনিয়ায় আর কাকেই বা গ্রাহ্য করি। এক জনের কাছে কিন্তু আমাকেও হার মানতে হয়েছে। সে হচ্ছে আমার এই নাকের দড়ি। দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব, আমার নাক ফুঁড়ে এ দড়ি আমাকে এমন ক'রেই রেখেছে যে এর যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।"

এত দিনের আশা একেবারে ছাড়্‌তে না পেরে ইঁদুরণী তখন ষাঁড়ের নাকের দড়িকে দেখ্‌তে পেয়ে তাকেই জিজ্ঞেস কর্‌ল—"সারা দুনিয়ায় তুমিই ত বাপু সকলের চেয়ে জোয়ান্ দেখ্‌ছি! তুমিই আমার মেয়েটিকে বিয়ে কর না?"

কিন্তু দড়িও রাজী হ'ল না। সে মনের দুঃখে গা-নাড়া দিয়ে অমত জানিয়ে বল্‌লে—"আমি জোয়ান্ ত আছিই, আমার চেয়েও আবার জোয়ান রয়েছে যে।

সে ত তোমাদেরি বড়-ঘরের ছেলে। তোমাদের ঐ বড় ইঁদুর আমাকে দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে। তার জোরের কাছে আমার আর জারিজুরি খাটে না, আমি যা বেঁধে রাখি সে সবই আলগা ক'রে দেয়।"

এত মুলুক ঘুরে ঘুরে ইঁদুরনী ত হয়রান্ হয়ে পড়ল। তখন আবার সকলের পরামর্শে তার সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে বড় ইঁদুরের বিয়ে হয়ে গেল। তাতে সব দিকই রক্ষা হ'ল।

শ্রীরমেশ বসু

লাল কুঠি

(উপন্যাস)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকূপ

শশাঙ্ক কতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিল, জানে না। তবে চোখ চাহিতে এটুকু বুঝিল যে তার হাতে-পায়ে দড়ি বাঁধা, এবং সে ঠাণ্ডা মেঝেয় পড়িয়া আছে। কণকণে শীতে তার হাড়-পাঁজরাগুলা অবধি ঝন্ঝন্ করিয়া উঠিল। চারিদিকে মিশ-কালো অন্ধকার! আলকাৎরার পিপার মধ্যে যেন সে পড়িয়া আছে! এমন অন্ধকার যে নিজের হাত-পা অবধি দেখা যায় না! এখন রাত্রি, না, দিন...তারো কোনো ঠিকানা নাই। শশাঙ্ক প্রমাদ গণিল— এমনি বন্দী থাকিয়া ইঁদুর-ছুঁচার মত এই অন্ধকার গর্ত্তে পড়িয়া তাকে মরিতে হইবে নাকি? এখান হইতে মুক্তি পাওয়া যায় কি করিয়া?...

বসিয়া নানা কথাই সে ভাবিতে লাগিল। নড়িয়া-চড়িয়া এটুকু বুঝিল, বেশ মোটা দড়িতে এরা তাকে বাঁধিয়াছে, দড়িটা মজবুতও। অতি বিপদে পড়িলে বুদ্ধি

কে যেন মাথায় জোগাইয়া দেয়।. একটা ফন্দী তার মাথায় আসিল। সে শুইয়া পড়িয়া হাতের বাঁধনটা মেঝেয় প্রাণপণে ঘষিতে লাগিল। বহুক্ষণ...হাত বেদনায় টনটন্ করিতেছে, আর নাড়া যায় না, তবুও...এ ছাড়া আর উপায়ও তো নাই। বহুক্ষণ ঘষিবার পর যখন বুঝিল, দড়ির একটা দিক ঘষার দরুণ ক্ষয়িয়া আসিয়াছে. তখন জোরে দুই হাত দুদিকে টানিতে লাগিল। একবার, দুবার, তিনবার—বার-কয়েক এরূপ করিবার পর দড়িটা পট করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। এমন বিক্রমে যুঝিবার পর সর্ব্বাঙ্গ তার ঘামিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছে! দড়ি ছিঁড়িতে আরাম যা মনে হইল, আঃ! হাতের বাঁধন ছিঁড়িবামাত্র দড়িটা খুলিয়া ফেলিতে বাধিল না। দড়িটা রাখিয়া সে পকেটে হাত দিয়া দেখে, টর্চ্চ-লাইটটা আছে, মনি-ব্যাগ, রুমাল এ গুলাও ঠিক! ভাগ্যে তারা বুদ্ধি করিয়া আলোটা কাড়িয়া রাখে নাই!

টর্চ্চ-লাইটের আলোয় সে দেখে, যেখানে সে পড়িয়া আছে, সে একটা ঘর; বেশ বড় ঘরই। একদিকে দুটো জানলা আর এক কোণে একটি মাত্র দরজা। বসিয়া সে জানলার কাঠ ধরিয়া নাড়িল, এমন টাইট-বন্ধ! তা ছাড়া ভিতর দিকে একটা ছিটকিনি নাই যে খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে তাকাইয়া দেখে। দরজা? বেশ মোটা কাঠের দরজা, বিষম ভারী: সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।...

কতক্ষণ বসিয়া থাকার পর হঠাৎ সে শুনিল, একটা শব্দ! কে যেন দরজার তালা খুলিতেছে। সে মালকোঁচা আঁটিয়া ওৎ পাতিয়া বসিল যদি কেহ ঘরে ঢোকে তো বাঘের মত বিক্রমে তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে!...

সশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, এবং একটা আলোর ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আসিয়া ঢুকিল বিশ্বনাথ দত্ত আর তার পিছনে সেই বাঁটুল! শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বনাথের হাতে লণ্ঠন। লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিয়া বিশ্বনাথ কহিল—কেমন আছেন গো শশাঙ্ক বাবু? বলিয়া সে দাঁত মেলিয়া হাসিল।

শশাঙ্ক চোখ রাঙাইয়া ঝাঁপাইয়া বিশ্বনাথের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল...হঠাৎ দেখে, বাঁটুলের হাতে কি একটা ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সর্ব্বনাশ! পিস্তল! বাঁটুল পিস্তলটা তার দিকেই তাগ্ করিয়া ধরিয়াছে! শশাঙ্ক একটু হঠিয়া আসিল।

বিশ্বনাথ কহিল—তুমি জোয়ান, তা দেখেই বুঝেছি। আরো বুঝতুম, দড়ি বোধ হয় খুলে ফেলবে, তাই সশস্ত্র হয়ে এসেছি। বেশী চালাকি করো তো ঐ পিস্তলের একটি গুলিতে...তারপর এই পাতালপুরীর মধ্যে ফেলে পচিয়ে রাখলেও কেউ কিছু জানতে পারবে না...বুঝলে ছোকরা ?

আগে এত না বুঝিলেও বাঁটুলের হাতে পিস্তল দেখিয়া শশাঙ্ক বুঝিল, এ কথা ঠিক! সে একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল—আমায় মেরে ফেললে বাড়ীর অংশ তো মিলবে না।



বিশ্বনাথ কহিল,—তা জানি। আর তা জানি বলেই তোমাকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা এখন নেই! তবে যদি রোখ করো তো নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে পিস্তল ছোড়া ছাড়া উপায় কি, বলো ?

শশাঙ্ক কহিল—বাজে কথা থাক্! কি চাও তোমরা ?.. আমায় বন্দী করে রাখার কারণ কি ?

বিশ্বনাথ কহিল—সে কারণ নাই বললুম। তবে চাই কি, তা তুমি তো জানো... বাড়ী-বিক্রয়ের দলিল তোমাকে সই করে দিতে হবে ..

শশাঙ্ক কহিল —দলিল তো সই করে দিলেই কাজ চুকবে না...সে দলিল রেজেষ্ট্রী করে দেওয়া চাই!

বিশ্বনাথ কহিল—সে ভাবনা আমার থাকবে...তুমি সই করে দিলেই তোমার সঙ্গে বিরোধ চুকবে।

শশাঙ্ক কি ভাবিল,—ভাবিয়া কহিল,—সই না হয় করে দিলুম, তারপর রেজেষ্ট্রী অফিসে গিয়ে যদি সব কথা বলে সই না করি? রেজেষ্ট্রী যদি না হয়, তা হলে দলিল কোনো কাজেই লাগবে না তো...!

বিশ্বনাথ কহিল—তোমার একটা সই পেলেই কাজ হবে—রেজেষ্ট্রী অফিসে দোসরা শশাঙ্ক ঢের মিলবে...

শশাঙ্ক শিহরিয়া উঠিল, সর্ব্বনাশ! সই দেখিয়া অপর লোককে সে সই মক্স করাইয়া দলিল-রেজিষ্ট্রীর সময় এরা জাল শশাঙ্ক খাড়া করিবে! এত বড় জালিয়াৎ, বদ্‌মায়েসের পাল্লায় সে পড়িয়াছে! জেলের ভয় রাখে না! এমন নিস্পরোয়া!

বিশ্বনাথ কহিল—কি ভাবছো?

শশাঙ্ক কহিল—সই আমি দেবো না।

বিশ্বনাথ কহিল,—সই দেবে না?

শশাঙ্ক কহিল—না, কখনো না। বলিয়া সে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বনাথ তার পানে স্থির দৃষ্টিতে একবার চাহিল, তারপর কহিল—গোঁয়ার্ত্তুমি করলে হাতে হাতে ফল পাবে···মনে রেখো।

শশাঙ্ক কহিল,—তার ভয় রাখি না। আমি দুধপোষা খোকা নই।

বিশ্বনাথ খপ্‌ করিয়া শশাঙ্কর একখানা হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—এই অন্ধকার গর্ত্তর মধ্যে যদি না খেয়ে মরো...?

শশাঙ্ক কহিল—তবু না!

বিশ্বনাথ শশাঙ্কর হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল—তোমায় ভূতে পেয়েছে। না হলে

এমন দুর্বুদ্ধি হয়! পাড়া-গাঁয়ের একটা ভাঙা বাড়ী, তার উপর এত মায়া করে নিজের বিপদ এমন করে ডেকে আনচো—এ পাগলের কাজ।

শশাঙ্ক হাসিল, হাসিয়া কহিল—যথা আজ্ঞা, ডাকাত মহারাজ! আমি পাগলই—আপনার অভিপ্রায় এখানে খাটচে না—সরে পড়ুন। আমার এক কথা, আমায় খুঁচিয়ে মারলেও আপনি সই পাবেন না...সাফ কথা।

বিশ্বনাথ কহিল—বেশ, তা হলে না খেয়ে এই গর্ত্তর মধ্যে ছুঁচোর মত পচেই মরো। কথাটা বলিয়া পিছু হটিয়া বিশ্বনাথ দ্বারের বাহিরে সরিয়া গেল। বাঁটুলও পিস্তল লইয়া এক পা এক পা করিয়া পিছু হটিয়া সরিয়া গেল। তাদের ভাব দেখিয়া শশাঙ্ক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল—ওঃ, আপনারা এসেছিলেন যেন মোগল-সম্রাট রাজপুত-বন্দীর কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে! এমন হুঁশিয়ার—হাতিয়ার হাতে! খুব খেলাই খেললেন মোদ্দা...যাক্ ও-সবের আমি কোনো তোয়াক্কা করি না। ও পিস্তলটা রেখে শুধু হাতে একবার আসতেন, তা হলে শশাঙ্ক চৌধুরীর বলের পরিচয় ভালো করেই পেতেন...

বাঁটুল ও বিশ্বনাথ এ কথার কোনো জবাব না দিয়া সতর্ক হাতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। শশাঙ্ক কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া জানলার কপাটটায় হাত রাখিয়া ভাবিল,—একখানা কাঠের কপাট মাত্র...হাতের জোর এই কাঠের উপর একবার পরখ করিতে দোষ কি! উহারা যদি শব্দ শুনিয়া আসে? আসুক, কি করিবে? পরক্ষণেই আবার ভাবিতে লাগিল.. যদি দড়ি-দড়া দিয়া বাঁধে, বাঁধিয়া আলোটা কাড়িয়া লয়? এ অন্ধকারে ভাগ্যে এই আলোটুকু সম্বল আছে- নহিলে পচিয়া মরিতে হইত! আলোর সাহায্যে হাত বুলাইয়া জানলার কপাটখানা ভালো করিয়া সে পরখ করিল। দুটা ঘুষি, আর দুটা লাথি, বেশ জোরসে... তাহাতে পুরানো কাঠখানা ভাঙা কি এমনি অসম্ভব...? কাণ খাড়া করিয়া সে দাঁড়াইল—বাহিরে কোথাও কোনো শব্দ পাওয়া যায় কি না! অর্থাৎ এটা সত্যই নির্জ্জন পুরী? না, জন-মানবের বাস এখানে আছে?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকার পর দুই হাত তার নিশপিশ করিয়া উঠিল।

না, এ ভাবে নিশ্চল পড়িয়া থাকা আর চলে না ! মারি তুই ঘুষি ওই জানলার কপাটে ...হাতই তাহাতে ফাটুক, কি জানলার কপাটই ভাঙ্গুক ! একখানা পাৎলা তক্তা বৈ তো নয় ! আরো বিপদ যদি ঘটে ? ঘটুক...এমন মাটীর পুতুলের মত চুপ-চাপ পড়িয়া থাকার চেয়ে বিপদের সঙ্গে লড়াতেও একটা আরাম আছে !

এমনি সাত-পাঁচ ভাবিয়া সে জানলার কপাটে সজোরে ঘুষি মারিল, এক, দুই, তিন, চার...তারপর জোর্‌সে দুই লাথি ! জানলার কপাট মচ্‌ করিয়া উঠিল। তার উপর আরো ক'টা লাথি। ফট্‌ করিয়া কপাটের খানিকটা ফাটিয়া গেল—তখন সেই ফাটা কপাটে আরো ক'টা ঘুষি ও লাথি মারার পর একটা কাঠের চাক্‌লা খসিয়া পড়িল। যেমন খসা, অমনি সেই ফাটলের ফাঁক দিয়া এক ঝলক দিনের আলো আর খানিকটা হাওয়া সেই অন্ধকার বন্ধ ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে একরাশ আরাম ! আলো দেখিয়া শশাঙ্ক বুঝিল, ও দিনের আলো...ফাটলের কাছে গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে, জানলায় গরাদ আঁটা। লোহার গরাদ, তার ও-পাশে বাঁশ-ঝাড়। বেশ খানিকটা জঙ্গল ! খুব ঘন জঙ্গল ! এটা একতলার ঘর—সে না দোতলায় বন্দী হইয়াছিল ? সেখানে হইতে তাকে নাড়িয়া এই ঘরে তবে ফেলা হইয়াছে ! চাহিয়া সে দেখিল, বাঁশঝাড়ের পর দূরে মাঠ। বহু দূর হইতে ধোপাদের পাটে কাপড় আছড়াইবার শব্দও তার কাণে আসিয়া লাগিল। কিন্তু পলাইবার তো উপায় নাই ! ঐ লোহার গরাদ ভাঙ্গা মানুষের কর্ম্ম নয়। উপায় ? দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল।

কতক্ষণ এভাবে কাটিল, হুঁশ নাই ! হঠাৎ পিছনে ধুপ্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল ! শশাঙ্ক ফিরিল। ফিরিতেই দেখে, কাপড়ে ঢাকা সেই মূর্ত্তি চট্‌ করিয়া দ্বারের বাহিরে সরিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বারটা চকিতে বন্ধ হইল। বাহিরের ঐ আলোর স্পর্শে ঘরের অন্ধকার অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল। সে আলোয় শশাঙ্ক দেখে, ঘরের মেঝেয় একটা পুঁটলি পড়িয়া আছে ! তাড়াতাড়ি পুঁটলিটা সে খুলিয়া ফেলিল। দেখে, তার মধ্যে আছে, ছোট একটা শাবলের মত অস্ত্র ; একটা কাগজের ঠোঙা তার মধ্যে নারিকেলের টুকরা, একটা কমলালেবু, দুটো শসা, মুড়ি আর একটু চিঠি। চিঠিখানা খুলিয়া সে পড়িয়া দেখে, তাহাতে লেখা আছে,—

শক্ত লোকের পাল্লায় পড়িয়াছ! দলিল সহি করিয়ো না—এরা সহি দেখিয়া জাল করিবে। তারপরও তোমায় কতকাল বন্দী করিয়া রাখিবে, তারো ঠিক নাই, অর্থাৎ যতদিন উহাদের কাজ হাঁসিল না হয়! এই যে অস্ত্র পাঠাইলাম, এই অস্ত্রের সাহায্যে জানলার নীচে ঘা মারিলে ইট্ খসিয়া যাইবে আর পথ পাইবে। বাঁশঝাড় সাফ করিতে বেগ পাইবে না। কচি বাঁশ। নামিয়া ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া খানিকটা গেলেই রাস্তা মিলিবে। সন্ধ্যার আগে পলাইবার চেষ্টা করিয়ো না।

চিঠি পড়িয়া শশাঙ্ক দ্বারের দিকে চাহিল—দ্বার বন্ধ। তার মনে হইল, এ লোকটি কে...? তাকে ক্রমাগত সতর্ক করিতেছে,—আহার অবধি জোগাইতেছে! অথচ পরিচয় দিতে এমন নারাজ কেন? কি তাহাতে ক্ষতি হইবে?...কে জানে, এ রহস্যের আড়ালে আরো কত কি ব্যাপার যে গোপন রহিয়াছে! বিশ্বনাথ আর বাঁটুলের সঙ্গে এই যে যুদ্ধ সুরু হইল, কে জানে, এরই বা শেষ কবে, আর কোথায় হইবে!...

জানলার ফাটল দিয়া সে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল,—গাছপালার ফাঁক দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল...চমৎকার। ঐ দিনের আলো, এই বাতাস, এ সব যে এমন সুন্দর, তা কোনো দিন তার চোখে পড়ে নাই! আজ অন্ধকূপের অন্ধকারে পড়িয়া আলোর আর বাতাসের মর্ম্ম সে বুঝিয়াছে! ঐ আলো, ঐ বাতাসে আজ গা ঢালিয়া দাঁড়াইতে পারিলে সে বুঝি রাজার সিংহাসনও কামনা করে না! অভাবে পড়িলে মানুষ এমনি করিয়াই সব জিনিষের দাম বোঝে! আজ আলোর অভাবে বাতাসের অভাবে শশাঙ্ক তাই তাদের দাম বুঝিয়া আলো-বাতাসের জন্য এমন হাহাকার করিতেছে!...সন্ধ্যার এখনো কত দেরী? সন্ধ্যার আগে পালানো চলিবে না! শশাঙ্ক বসিয়া ঠোঙা খুলিয়া খাইতে বসিল। এ তো মুড়ি নয়, যেন মোরব্বা!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নূতন সঙ্গী

সন্ধ্যার খানিক পরে শশাঙ্ক শাবল দিয়া জানলার নীচেকার ইট খুলিয়া ফেলিল। বেশী বেগ পাইতে হইল না। বেশ বড় রকম ফাঁক হইলে জানলার নীচে দিয়া

গলিয়া সে সেই কাঁটার জঙ্গলে নামিল। কচি বাঁশের কাঁটাগুলা যেন গুণ্-ছুঁচ মত! টর্চ্চের আলো জ্বালিয়া কতকগুলা কাঁটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হাতে পটপট্ করিয়া কাঁটা বিঁধিয়া হাত ছড়িয়া গেল—কিন্তু সেদিকে তখন লক্ষ্য করিলে চলে না। ওদিকেও বিপদ...। শাবলখানা হাতে লইয়া যেমন সে নীচে নামিয়াছে, অমনি ঘরের দ্বার খোলার শব্দ তার কাণে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথের চীৎকার,—ওরে বাঁটুল, ছোঁড়া পালাচ্ছে রে ..ঐ, ঐ জানলার নীচে থেকে ইট্ সরিয়ে...

ঘরের মধ্যে তখনি একটা দুপ্দাপ্ শব্দ...শশাঙ্ক মরিয়া হইয়া ডানদিকে ছুটিল। কঞ্চির খোঁচা, কুলের কাঁটা ফুটিয়া অস্থির! কাঁটায় হাত মুখ ছড়িয়া, বাড়ীর দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া বিষম আঘাত পাইয়াই সে ছুটিল, দমিল না। একটু ছুটিতেই রাস্তা মিলিল। এখন কোন্ দিকে যায়? ভাবিতে গেলেও চলে না। বাঁদিকে সে জোরে ছুট্ দিল...পিছনে নিমেষে একটা কোলাহল উঠিল, 'চোর-চোর'! অনেক লোক ছুটিয়া আসিতেছে। সর্ব্বনাশ! যদি সামনের দিক হইতে কেহ ধরিয়া ফেলে? শাবলটা হাতে আছে! যদি কেহ ধরিতে আসে তো এই শাবলের ঘা ..উপায় কি! সে তো সত্যই চোর নয়!...

ছুট্, ছুট্ ছুট ..শশাঙ্ক বেদম ছুটিয়া চলিয়াছে! পিছনে দুম্ করিয়া পিস্তলের আওয়াজ ..একটা, দুইটা...ওদিক হইতে কতকগুলা গোরুর গাড়ী আসিতেছিল - পিছন হইতে লোকগুলা হাঁকিল. 'চোর চোর' 'সিঁধেল চোর' —শশাঙ্ক ঘুরিয়া মাঠে নামিয়া পড়িল ..মাঠের একটু পরে ঘেঁষ-ঘেঁষ বড় গাছে জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। হোগ্লার বন। সে তার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।...খানিক অগ্রসর হইতেই একটা ডোবা ...সাবধানে ডোবার ধার দিয়া সে চলিল, তবু পাঁকে পা পড়িল! যদি পাঁকে ডুবিয়া যাই? টানিয়া পা তুলিয়া সে ডোবার ধারটা পার হইল। তার পরই একটা বস্তী... তার মধ্য দিয়াই সে ছুটিয়া চলিল। একটা কাঁঠাল গাছের নীচু ডালে মাথা ঠুকিয়া কপাল ছেঁচিয়া গেল সে-সব গ্রাহ্য না করিয়া সে ছুটিয়া গেল! করিমউদ্দিনের আঙিনা ফুঁড়িয়া বাসেৎ মিয়ার গোলা-ঘর ঘুরিয়া ছুটিয়াছে তো ছুটিয়াছে! দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়াছে! কোথায় গিয়া পৌঁছিবে, সে

কথা তার মনেও ছিল না! এমন ছুট্ ছুটিয়াছে যে শেষ আস্তানায় গিয়া বুঝি সমস্ত নিশ্বাসটাই তার নিঃশেষ হইয়া যায়! মাঠে ধান কাটা হইয়াছে; ধানের গোড়াগুলা কাঁটার ছড়ের মত! তার উপর জুতা পড়িতে পিছলাইয়া যায়, আবার তার খোঁচাও পায়ে ফোটে! গাছের মাঝে মাঝে আলো? এক একটা যেন আলোর টীপ্...জোনাকির মত দপ্ দপ্ করিতেছে! আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিয়া বহুদূর পথ আসিয়া একটা ভাঙ্গা মন্দিরের সিঁড়িতে হুঁচট খাইয়া সে ঠিকরাইয়া পড়িল। মাথায় বেশ চোট্ লাগিল। —মাগো বলিয়া সে চক্ষু মুদিল!...

যখন আবার শশাঙ্ক চোখ চাহিল, তখন চারিধারে জমাট অন্ধকার! আকাশে একরাশ নক্ষত্র প্রদীপের মালা সাজাইয়াও এ অন্ধকার একতিল কমাইতে পারে নাই! এ অন্ধকারে কোথায় যাইবে? কোন্‌দিকে গেলে বিপদ ডাকিয়া আনিবে না, তা স্থির করা দুঃসাধ্য! যাওয়া চলে না। অথচ রাত্রি যে কত, কখন ভোরের আলো ফুটিবে, তারো ঠিকানা নাই! শীতে হাত-পা ঝন্ ঝন্ করিতেছে, হাড়ে অবধি কাঁপুনি লাগিতেছে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়া সেই খানেই একটা ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর সে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল!...দূরে চৌকিদারের গলা শুনা গেল। মস্ত ছড়া আওড়াইয়া চৌকিদার রাত্রে রোঁদ দিতেছে। শশাঙ্ক ভাবিল, চৌকিদারকে পাইলে এ যাত্রা বোধ হয় রক্ষা পাওয়া যাইবে! সে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া টর্চ জ্বালিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।...

ঢিপি-ঢাপা ভাঙ্গিয়া টলিতে টলিতে আসিয়া বহু কষ্টে সে পথে পৌঁছিল। কিন্তু চৌকিদারকে ডাকিবার পূর্ব্বেই চৌকিদার তার হাতের লণ্ঠন তুলিয়া হাঁকিল,—খবর্দ্দার!

চৌকিদারের হাতে লাঠি। বাঁশের লাঠি। লাঠি তুলিয়া সে তার দিকেই আসিতেছিল। টর্চ্চের আলো চৌকিদারের চোখে পড়িয়াছিল।

আগাইয়া আসিয়া চৌকিদার হাঁকিল চোট্টা...আরে!

শশাঙ্ক কহিল—চোট্টা নই। বড় বিপদে পড়েছি চৌকিদার সাহেব।

ভাঙ্গা হিন্দী-বাঙলায় একটি গালি দিয়া চৌকিদার কহিল—ভদ্দর আদমি ..! আজকাল বহুৎ ভদ্দর ছোকরা চোট্টা বনতেছে! বিপদ তো বঢ়িয়া রে! তেরা হাত্‌মে...

চৌকিদার অতর্কিতে এক টান দিয়া শশাঙ্কর হাতের সেই শাবলখানা ছিনাইয়া লইল ; শাবলটা শশাঙ্ক হাত-ছাড়া করে নাই ! চৌকিদার কহিল —এঠো কি আছে ? এঁ্যা ? সিঁধকাঠি ! সিঁধেল চোট্টা হ্যায়…

সর্ব্বনাশ ! শশাঙ্কর গা কাঁপিয়া উঠিল। এ শাবলখানাকে চৌকিদার সিঁধ-কাঠি ঠাওরাইয়াছে !

শশাঙ্ক কহিল—এ সিঁধকাঠি নয় চৌকিদার সাহেব, শাবল…

চৌকিদার কহিল - হাঁ, হাঁ, হামার বারো বছর হইয়ে গেলো বাঙ্গাল পুলিশে নোক্‌রির ! হামি শাবল চিনে না…? আও---বলিয়াই চৌকিদার শশাঙ্কর হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

শশাঙ্ক বাধা দিল না। এর সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করিয়া চুপ করিয়া যাওয়াই ভালো ! সে কহিল—চলো…। কোথায় যেতে হবে ?

চৌকিদার হাসিয়া ঝঙ্কার তুলিল—শ্বশুর-ঘর ! আউর কুথা ! হঃ—সিঁধেল চোট্টা কোথায় যায় আর…ক'বারকার দাগী আছিস্…এঁ্যা ?

শশাঙ্ক কহিল—দাগা না হলে আর বন থেকে উঠে এসে তোমার হাতে ধরা দি !

– হাঁ হাঁ, ঠিকহি বাৎ। বলিয়া চৌকিদার শশাঙ্কর হাত ধরিয়া চলিল।

পথ ভালো - ঢিপিঢাপা নাই…পা ভারা, তা হোক্ ! মাঠ ভাঙ্গিতে হইতেছে না। শশাঙ্ক চৌকিদারের সঙ্গে আলাপ সুরু করিয়া দিল। কহিল—তুমি দাগী চোর পাকড়েছো, এতে সরকার থেকে বকশিস্ মিলবে চৌকিদারজী ?

—আরে হাঁ, হাঁ, বলিয়া চৌকিদার মুরুব্বির ভঙ্গীতে তার বীরত্বের দুই চারিটা গল্প সুরু করিয়া দিল। শশাঙ্ক তারিফ করিয়া শুনিতে লাগিল। খানিকটা পথ চলার পর শশাঙ্ক কহিল—একটু শুখা দেবে দারোগাসাহেব ? তাহলে মুখে দি। চার আনা পয়সা দেবো'খন…

চৌকিদার ভাবিল, ভারী তো জিনিষ শুখা ! চার আনায় একটু দিতে হানি কি ! সে কহিল, শুখা লিবে ? তা লাও ..লেকেন দাম্ পহিলে নিকালো !

—বিশ্বাস হচ্ছে না ! বলিয়া শশাঙ্ক হাতটা টানিয়া ছাড়াইয়া লইল। চৌকিদার

আপত্তি করিল না। শশাঙ্ক পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটা আধুলি তুলিল, কহিল—সিকি নেই,—তা এই আট আনাই রাখো...

আধুলিটা তুলিয়া সে চৌকিদারের হাতে দিল। চৌকিদার মহা খুশী-মনে লাঠি আর শাবল রাখিয়া সযত্নে পাগড়ি খুলিয়া তার কোণে আধুলিটা সযত্নে বাঁধিতে ছিল, হঠাৎ শশাঙ্ক লাফাইয়া চাৎকার তুলিল,—বাপ্...সাপ!

চৌকিদার চমকিয়া দুই পা সরিয়া গেল—আর সেই অবসরে শশাঙ্ক লাঠিটা কুড়াইয়া লইয়া দে ছুট্!...চৌকিদার প্রথমটা হতভম্বের মত দাঁড়াইল; আসামী পলাইয়াছে, এ কথাটা বুঝিতে তার একটু দেরী হইল। বুঝিবা মাত্র সে গালি দিতে দিতে তার পিছনে ছুটিল...শশাঙ্ক ততক্ষণে অন্ধকারে গা ভাসাইয়া ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে!...

বহুদূর গিয়া পিছনে ফিরিয়া শশাঙ্ক যখন দেখিল, চৌকিদারের চিহ্নমাত্র নাই, তখন সে দৌড় থামাইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কত পথ আর চলিবে! পা দুটা যেন ছিঁড়িয়া খসিয়া যাইবে, এমনি টন্‌টন্ করিতেছে! পা দুটাকে খাড়া রাখিতে আর পারা যায় না, কাজেই সে একটা গাছতলায় বসিয়া পড়িল।...তারপর গাছে ঠেশ দিয়া পা দুইটা ছড়াইয়া দিল...দারুণ ক্লান্তিতে দুই চোখে ঘুম আসিয়া দুশ্চিন্তার হাত হইতে নিমেষে তাকে মুক্তি দিল!...

ঘুম ভাঙ্গিতে দেখে, ভোরের আলো ফুটিয়াছে। গ্রামের পথ। গ্রা[illegible]। লাঠি ফেলিয়া সে হাঁটিতে সুরু করিল। আধ ঘণ্টা পরে একটা খালের পু[illegible]লিল। পুলটা পার হইতে দুই-চারিজন লোকের সঙ্গে ও দেখা হইল। তাদের কাছে প্রশ্ন করিয়া জানিল, এ জায়গার নাম গড়িয়া। আর একটু আগেই টালিগঞ্জ! গাড়ী মেলে না? লোকটি কহিল,—একটু আগে গাড়ীর আড্ডা। তবে এত ভোরে গাড়োয়ানকে তুলিয়া গাড়ী জুতাইতে হইবে।

তাই হইল! চার টাকা ভাড়ায় রাজি হইয়া এক গাড়োয়ান গাড়ী জুতিল এবং সেই গাড়ী চালাইয়া বেলা প্রায় সাতটায় শশাঙ্ক আসিয়া বাসায় পৌঁছিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ভাবিল, প্রাণ লইয়া যখন ফিরিয়াছি, তখন স্নানাহার সারিয়া উকিল-বাড়ী গিয়া অন্য সরিকদের নাম-ঠিকানা জোগাড় করিতে হইবে। আজই! এতটুকু দেরী করিলে বিশ্বনাথের কাছে হারিয়া যাইতে হইবে! তার গোঁ এমন চড়িয়া ছিল যে গায়ের ও পায়ের বেদনা সে গোঁকে দমাইতে পারিল না।

শশাঙ্ক ভাবিয়াছিল এক, কিন্তু ঘটিল অন্য রকম। স্নানাহারের পর তার গায়ের বেদনা বেশ বাড়িয়া উঠিল। মাথার সেই আঘাত, তার উপর সারা রাত্রি দৌড়িয়া বেড়ানো, তার ফলে দুই চোখে ঘুম এমন জড়াইয়া আসিল যে শশাঙ্ক বিছানায় না গড়াইয়া থাকিতে পারিল না! গড়াইবা মাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়! গাটা মাটী-মাটী করিতেছে। এখন আবার বাহির হইবে? শশাঙ্ক ভাবিল, আজ নয় থাক্। আজ শরীরটাকে বিশ্রামই নয় দেওয়া যাক্! ইহা ভাবিয়া সেদিন সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে শুইয়া পড়িল।



মকবুল কহিল—কোথা যাবেন ?

সারা রাত্রি আরামে নিদ্রা দিয়া পর দিন শরীরটা হাল্‌কা বোধ হইল। কাটা-ছড়া জায়গায় আর বেদনায় আগের দিন জাম্বাক ঘষিয়া দিবার দরুণ গায়ের ব্যথাও কম। সেদিন সে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আলিপুরের কাছারিতে গেল, উকিল বাবুর কাছে। তিনি ভারী ব্যস্ত। একগাদা মক্কেল তাঁর সঙ্গে নানা কথা বহিতেছে। উকিল বাবু তাকে বলিয়া দিলেন, সন্ধ্যার পর তাঁর বাসায় আসিতে। উকিল বাবুর বাসা সাহানগরে। সাহানগর কালীঘাটের দক্ষিণে।

শশাঙ্ক সন্ধ্যার পর ট্রামে চড়িয়া কালীঘাটের ট্রাম-ডিপোয় গিয়া নামিল। নামিয়া পশ্চিম মুখের পথ ধরিয়া সাহানগরে উকিল বাবুর বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। বাসায়

তেমনি ভিড়। উকিল তারিণী বাবু তক্তাপোষে বসিয়া, মুখে গড়গড়ার নল। এক মুখে তিনি পাঁচ জনের সঙ্গে কথা কহিতেছেন—এক জনের মকর্দ্দমার আর্জ্জী; অন্য জনের আর্জির জবাব; কারো সঙ্গে তার মকর্দ্দমার কাল জেরায় কি সব প্রশ্ন তুলিয়া সাক্ষীকে জব্দ করিয়া দেওয়া হইবে; কারো সঙ্গে কোন্ হাকিমের এজলাসে কি চালে উকিল বাবু কবে কোন্ মামলা জিতিয়াছেন, তার গল্পও চলিতেছে। শশাঙ্ক চোরের মত নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। উকিল তারিণী বাবু তার পানে চাহিয়াও দেখিলেন না। গরজ শশাঙ্কর, কাজেই চুপ্‌চাপ্ সে বসিয়া রহিল। না হইলে কখন উঠিয়া যাইত।

ভিড় থামিল রাত যখন এগারটা বাজিতেছে। উকিল বাবু এবার উঠিবেন।

শশাঙ্কর পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন—কি চাও তুমি?

শশাঙ্ক পরিচয় দিয়া কহিল—ত্রিলোকেশ্বর চক্রবর্ত্তী মশায়ের উইলে সেই সব অন্য সরিকদের নাম ..অর্থাৎ বাকী সাতজন...আপনি আসতে বলেছিলেন...

তারিণী বাবু একটা খাতা বাহির করিয়া তাহা হইতে নাম-ঠিকানা দিলেন। শশাঙ্ক তার পকেটবুকে টুকিয়া লইল। লেখা শেষ হইলে শশাঙ্ক কহিল—তাহলে আজ আসি, রাতও হয়েছে ঢের। তবে একটা কথা, যদি কেউ অন্য সরিকদের অংশ কিনতে চায় তো তাকে বেচবার আগে আমায় খপর দেবেন, আমি সে সব অংশ নিজে কিনবো··· পূর্ব্ব পুরুষের বাড়ী...

তারিণী বাবু কহিলেন—আচ্ছা। তোমার নাম তো শশাঙ্ক চৌ[illegible] আমার লেখা আছে ..

শশাঙ্ক বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় এক মুসলমান মক্কেল আসিয়া উকিল বাবুকে সেলাম করিল। তারিণী বাবু কহিলেন—কে?

মুসলমান মক্কেলটি কহিল—ফজলু পেশোয়ারী...একঠো মামলা হোগা...[illegible]মে গিয়াথা, সাব...

তারিণী বাবু বিরক্তভাবে কহিলেন—এত রাত্রে কথা হয় না, বাপু। কাল এসো, সন্ধ্যার সময়...

ফজলু সেলাম করিয়া কহিল—বহুৎ আচ্ছা সাব...

বলিয়া ফজলু বাহির হইয়া গেল। শশাঙ্কও পথে আসিল। এত রাত্রে ট্রাম পাওয়া যাইবে না। গাড়ী চা[illegible]...সে কালীঘাটের দিকে চলিল। ফজলু ডাকিল—বাবু সাব...

শশাঙ্ক দাঁড়াইল। ফজলু কহিল—কাঁহা যাবেন ?

শশাঙ্ক কহিল,—পটলডাঙ্গা।

ফজলু কহিল—হামার গাড়ী আছে। হামি যাবে বহুবাজার—এতো রাতমে গাড়ী মিলবে কি ? হামার গাড়ীমে আইয়ে বাবু-সাব...

শশাঙ্ক ভাবিল, ক্ষতি কি ! সে গিয়া ফজলুর গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পরীদেশের ছেলে

[illegible]রে একটা ছোট বাড়ীতে কর্ত্তা আর গিন্নী দুজনে থাকত। তাদের [illegible]রে নানা রকম ফুল ফুটে থাকত। পাখীগুলো এই বাগানটীকে [illegible] তারা সেখানে চিরদিনের জন্যই বাসা বেঁধে ছিল। বাড়ীর লোকদের [illegible]ও তাদের খুব [illegible]ব হয়েছিল।

কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তা ও তার স্ত্রীর মনে শান্তি ছিল না। তাদের ছেলেপুলে হয়নি। [illegible] বড় সাধ—একটি খোকা হয়। হঠাৎ একদিন কর্ত্তার মনে হ'ল যে পরীদেশের [illegible]কে চিঠি লিখ্‌লে তিনি হয়ত একটি ছেলে দিতে পারেন। সে কাগজ কলম নিয়ে [illegible]দেশের মহারাণীকে চিঠি লিখ্‌তে বসে গেল। তাতে সে আমাদের দেশের ম[illegible]ডাক টিকেট লাগালে না বা গিয়ে রাস্তার ধারের ডাক বাক্সেও ছেড়ে দিলে না। [illegible] সে ঠিকানা লিখলে—

পরীদেশের মহারাণী,

গোলাপ বাগ্।

রূপোলি নদীর ধার।

পরী উদ্যান।

চিঠিটা শেষ ক'রে সে শিষ্ দিতে লাগ্‌ল। একটু পরেই একটা পাখী উড়ে এসে ঠোঁটে ক'রে সেই চিঠিখানাকে নিয়ে পরীদেশের মহারাণীর কাছে হাজির করলে। চিঠি পেয়ে মহারাণী খুব খুসী হ'লেন। তিনি হুকুম দিলেন যে, ওদের বাড়ীতে একটী খোকার দরকার; শীঘ্রই যেন একটী শিশু ওখানে জন্ম নেয়।

কয়েক মাস পরে সেই বাড়ীতে একটী সুন্দর খোকার আবির্ভাব হ'ল। সে এত সুন্দর যে মনে হ'ত যেন তার গালে কত গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে। তার হাসি ছিল বনের পাখীর কলতানের মত। লোকটী ও তাঁর স্ত্রীর আর আনন্দের সীমা রইল না। তারা সারাদিন ছেলেটীর দিকে চেয়ে থাক্‌ত। তার মা যখন গৃহ কর্ম্ম করতেন তখন তার বাবা ছুরী দিয়ে তাকে কাঠের কুকুর বেড়াল ও পাখী তৈরী ক'রে দিতেন। খোকা দোল্‌নায় শুয়ে থাক্‌তো। আর তার মা ছেলেকে চোখে চোখে রাখ্‌তেন।

এদিকে একদিন রাতে বনে মস্ত বড় একটা উৎসবের আয়োজন হ'ল। সেদিন পরীরাণীর জন্ম দিন। তিনি তাঁর সখীদের ব'লে দিলেন যে, যত সব অতিথি আসবে তাদের যেন কোন অযত্ন না হয়। বনের ক্ষুদে পোকারা, প্রজাপতি, মাকড় কেউ নেমতন্ন থেকে বাদ গেল না। কোলা ব্যাং ঠ্যাং দুলিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে নেমতন্ন রাখ্‌তে হাজির হ'ল। গোলাপ ফুলের পাপ্‌ড়ির পিঠে ও শিশিরের সরবৎ খেয়ে বনের বেঁটে বামনগুলো প্রায় মাতাল হবার জোগাড় হয়েছিল। চারদিকে খালি আমোদ, আমোদ, গান, বাজ্‌না, দৌড়, ঝাঁপ, নাচ। ভোর বেলা যখন সকল মোরগ ভায়া কোঁকোর কোঁ ডাক্ ছেড়ে সকলকে জানিয়ে দিল যে, সূর্য্যদেব তখন অতিথিরা যে যার স্থানে ফিরে গেল। কেবল একজন পরী তাড়াতাড়ি ভুলে সেই বাড়ীটার মধ্যে ঢুকে পড়ল। গিয়েই দেখে যে একটী সুন্দর

আছে। তার মাথায় কুবুদ্ধি গজিয়ে উঠ্‌ল। সে নিজের কুৎসিত, ছেলেটাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সুন্দর শিশুটীকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

সকাল বেলায় মা উঠে দেখেন যে, তাঁর ছেলের বদলে একটা পরীশিশু শুয়ে আছে। উপায় না দেখে তিনি তাকে নিজের সন্তানের মতই তাকে পালন কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু সে ছেলেটার স্বভাব ছিল যে খারাপ। তাকে আদর করতে গেলেই আচড়ে, কামড়ে, চিম্‌টি কেটে হাঙ্গামা বাধিয়ে দিত। তখন বাড়ীর কর্ত্তা আবার পরীরাণীর আশ্রয় নিলেন। পরীরাণী জবাব দিলেন যে, যতদিন ছেলে না হাস্‌বে ততদিন তোমাদের দুর্ভাগ্য থাক্‌বে। আর ডিমের খোসায় জল গরম ক'রে দেখো যদি ও ছেলের তাঁতে হাসি পায়।

তার পরে একদিন মা একটী ডিমের খোসায় জল রেখে উনুনের উপর বসিয়ে দিলেন। পরী ছেলে দেখ্‌লে ভারী মজা. অবাক্ কাণ্ড। জল রাখা হয়েছে কিনা ডিমের খোসার মধ্যে! সে তার ছানাবড়ার মত চোখ দুটো আরও বড় ক'রে হাঁ ক'রে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো। জল আস্তে আস্তে গরম হ'য়ে যখন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে আরম্ভ কর্‌লে তখন তার স্ফূর্ত্তি দেখে কে! সে লাফিয়ে উঠে হাত তালি দিয়ে গান সুরু ক'রে দিলে—

অনেক মজা দেখেছি,
ডিমের খোসায় হচ্ছে কি ?
ডিমের খোসায় ফুট্‌ছে জল।
কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ!

তার হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল। সে কি হাসি! সেই মুহূর্ত্তেই সে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আর কর্ত্তা গিন্নী দেখলে যে, তাদের নিজেদের ছেলেটী দোল্‌নায় শুয়ে আছে।

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত